सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

“আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।”

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

*(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

*(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).

জীববিদ্যা

একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই

প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি ।

অনুবাদ ও অভিযোজন

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

© এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

একাদশ শ্রেণির জীববিদ্যা পাঠ্যবই

এন সি ই আর টি-র **Biology**
পাঠ্যপুস্তকের ২০১৭ সালের পুনর্মুদ্রণের অনূদিত সংস্করণ

এন সি ই আর টি অনুমোদিত প্রথম বাংলা সংস্করণ
প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০১৯
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০২০

প্রচ্ছদ : মরণ চন্দ্র শীল

অক্ষর বিন্যাস : মরণ চন্দ্র শীল

মূল্য : ২৩০ টাকা মাত্র

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড,
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

প্রকাশক
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা।

উপদেষ্টা

ড. অর্ণব সেন, সহ অধ্যাপক, এন ই আর আই ই (এন সি ই আর টি), শিলং

ড. অরূপ কুমার সাহা, সহ অধ্যাপক, আর আই ই (এন সি ই আর টি), ভুবনেশ্বর।

অনুবাদ

ডঃ গৌরব রায়	অধ্যাপক
ডঃ তাপসী সাহা	অধ্যাপিকা
প্রীতিকণা সাহা	অধ্যাপিকা
পান্না চক্রবতী	প্রধান শিক্ষিকা
পরিতোষ সাহা	অবসরপ্রাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক
অভিজিৎ চক্রবর্তী	শিক্ষক
পুর্বিতা সরকার	শিক্ষিকা
রামধন দেব	শিক্ষক
তটিনী ঘোষ	শিক্ষিকা
পৌলমী ভট্টাচার্য	শিক্ষিকা
কাকলি মজুমদার	শিক্ষিকা
পার্বতী দাশগুপ্ত	শিক্ষিকা

পরিমার্জনা

সুশীল চন্দ্র বণিক, শিক্ষক
ইন্দুমাধব চক্রবর্তী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক
প্রবুদ্ধ সুন্দর কর, শিক্ষক
সুপ্রিয় চক্রবর্তী, শিক্ষক

প্রাক্‌কথন

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা (২০০৫)-এর নির্দেশ অনুযায়ী, শিশুদের স্কুলজীবন ও স্কুলের বাইরের জীবনের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক থাকা খুব প্রয়োজন। তার কারণ, শিশুদের শিক্ষা যদি শুধুমাত্র স্কুল এবং পাঠ্যবইয়ের গণ্ডির মধ্যে সীমিত থাকে, তাহলে সেইসব শিশুদের স্কুল, বাড়ি এবং সম্প্রদায়—এই তিন জায়গার শিক্ষায় একটি বড়ো ফাঁক থাকার সম্ভাবনা রয়ে যায়। মূলত এই শূন্যস্থানটাকে পূরণ করার লক্ষ্যেই জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখার উপর ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যক্রম ও নতুন ধরনের পাঠ্যবই তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে শিশুদের মুখস্থ করা এবং চারদেয়ালের মধ্যে তীব্রভাবে আবদ্ধ করে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার প্রবণতা বন্ধ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি এটাও আশা করা হচ্ছে যে, এই পরিবর্তন জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তবে এই ধরনের প্রচেষ্টার সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষক/শিক্ষিকাদের উপরে, যাঁরা শিশুদের শিখন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এবং বিভিন্ন কাজে শিশুদের কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করবেন। আমাদের এটা মনে রাখা খুব জরুরি, শিশুরা যদি সময়, স্থান এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়, তাহলে বড়োদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নিয়ে তারা নতুন অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারবে। একমাত্র পাঠ্যবই পড়েই পরীক্ষায় পাস করা যায় - মূলত এই ধারণার ফলেই শিক্ষার অন্যান্য দিকগুলো সর্বদা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতার বিকাশ তখনই সম্ভব, যখন আমরা ওদের এই গোটা শিখন প্রক্রিয়ার কেবলমাত্র গ্রহীতা না ভেবে একটা পূর্ণ অংশীদার মনে করব।

তবে এই লক্ষ্যপূরণ করতে গেলে স্কুলের দৈনন্দিন কার্যসূচি ও ব্যবস্থাপনায় অনেক ধরনের পরিবর্তন অনিবার্য। স্কুলের দৈনন্দিন সময় সূচি যেমন নমনীয় হওয়া উচিত, ঠিক তেমনই বার্ষিক কার্যসূচি এমনভাবে তৈরি হওয়া প্রয়োজন যাতে শিক্ষাদানের দিনগুলোর সংখ্যায় কোনো পরিবর্তন না আসে। তবে বাস্তবে এই নতুন পাঠ্যবই শিশুদের কতটুকু কাজে লাগবে, ওদের স্কুলজীবন কতটা সমৃদ্ধ করবে কিংবা ওদের স্কুলজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে কিনা, সবটাই নির্ভর করছে শিক্ষক/শিক্ষিকারা কী পদ্ধতি অবলম্বন করে এই বইটি স্কুলে পড়াবেন এবং কীভাবে সেই পড়ার মূল্যায়ন করবেন। বিগত দিনগুলোর ন্যায় শিশুদের যাতে পাঠ্যবইয়ের বোঝা বইতে না হয়, এই নতুন পাঠ্যক্রম তৈরি করার সময় এই ব্যাপারে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। তার জন্য শিক্ষাদানের প্রদত্ত সময় এবং শিশুদের মানসিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি স্তরের পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলো এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুনর্গঠন করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে শিশুদের নানারকম প্রশ্ন করা, নতুন বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা, তর্ক-বিতর্ক, ছোটো ছোটো গ্রুপ বানিয়ে আলোচনা করা এবং হাতে-কলমে শিক্ষা এইসব কিছুর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

পাঠ্যবই উন্নয়ন কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিবর্গ যাঁরা কঠোর পরিশ্রম করে এই বইটি রূপায়ণ করেছেন তাঁদেরকে এন সি ই আর টি প্রশংসা জানাচ্ছে। এই কমিটির কার্যকলাপকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন অধ্যাপক জে ভি নারলিকর এবং এই পাঠ্য বইয়ের মুখ্য উপদেষ্টা অধ্যাপক কে মরলিধর, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় মহোদয়গণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই পাঠ্যবই পুনর্গঠনের পিছনে বহু শিক্ষক/শিক্ষিকার অবদান অনস্বীকার্য।

আমরা সেইসব স্কুলের প্রধান শিক্ষকদেরও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই পাঠ্যবই তৈরির ক্ষেত্রে যেসব প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন তাঁদের বহুমূল্য সময়, সম্পদ, উপাদান এবং লোকবল নিয়ে কাজ করার অনুমতি দিয়ে উদার মনের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের (এম এইচ আর ডি) চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মৃণাল মিরি এবং অধ্যাপক জি পি দেশপান্ডের তত্ত্বধানে মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা বিভাগ দ্বারা নিযুক্ত জাতীয় পর্যবেক্ষণ সমিতির সদস্যদের বহুমূল্য সময় ও অবদানের জন্য পর্ষদের পক্ষ থেকে তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

নিজেদের প্রকাশনা এবং ব্যবস্থাপনার গুণগত মান সংস্কারের কাজে নিরন্তর নিয়োজিত থাকা এন সি ই আর টি কর্তৃপক্ষ সর্বদা পাঠকদের মতামত এবং পরামর্শকে স্বাগত জানায়, যাতে ভবিষ্যতে পাঠ্যবই সংশোধনী প্রক্রিয়াগুলো সফলভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

নিউ দিল্লি
২০ ডিসেম্বর,২০০৫

অধিকর্তা
রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ
(এন সি ই আর টি)

Textbook Development Committee

Chairperson, Advisory Group for Textbooks in Science and Mathematics

J.V. Narlikar, *Emeritus Professor*, Chairman, Advisory Committee, Inter University Centre for Astronomy and Astrophysics (IUCAA), Pune University, Pune

Chief Advisor

K. Muralidhar, *Professor*, Department of Zoology, University of Delhi, Delhi

Members

Ajit Kumar Kavathekar, *Reader* (Botany), Sri Venkateswara College, University of Delhi, Delhi

B.B.P. Gupta, *Professor*, Department of Zoology, North-Eastern Hill University, Shillong

C.V. Shimray, *Lecturer*, Department of Education in Science and Mathematics, NCERT

Dinesh Kumar, *Reader*, Department of Education in Science and Mathematics, NCERT

J.S. Gill, *Professor*, Department of Education in Science and Mathematics, NCERT

K. Sarath Chandran, *Reader* (Zoology), Sri Venkateswara College, University of Delhi, Delhi

Nalini Nigam, *Reader* (Botany), Ramjas College, University of Delhi, Delhi

Pratima Gaur, *Professor*, Department of Zoology, University of Allahabad, Allahabad

Ratnam Kaul Wattal, *Reader* (Botany), Zakir Hussain College, University of Delhi, Delhi

R.K. Seth, *UGC Scientist C*, Department of Zoology, University of Delhi, Delhi

R.P. Singh, *Lecturer* (Biology), Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya, Kishan Ganj, Delhi

Sangeeta Sharma, *PGT* (Biology), Kendriya Vidyalaya, JNU, New Delhi

Savithri Singh, *Principal*, Acharya Narendra Dev College, University of Delhi; *Former Fellow*, Centre for Science Education and Communication, University of Delhi, Delhi

S.C. Jain, *Professor*, Department of Education in Science and Mathematics, NCERT

Sunaina Sharma, *Lecturer* (Biology), Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya, Dwarka, New Delhi

Tejinder Chawla, *PGT* (Biology), Guru Harkrishan Public School, Vasant Vihar, New Delhi

T.N. Lakhanpal, *Professor* (Retd.), Department of Bio Sciences, Himachal Pradesh University, Shimla

U.K. Nanda, *Professor*, Regional Institute of Education, Bhubaneshwar

Member-Coordinator

B.K. Tripathi, *Reader*, Department of Education in Science and Mathematics, NCERT.

ACKNOWLEDGEMENTS

National Council of Educational Research and Training (NCERT) gratefully acknowledges the contribution of the individuals and organisations involved in the development of the Biology textbook for Class XI. The Council is grateful to Arvind Gupte, *Principal (Retd.),* Government Collegiate Education Services, Madhya Pradesh; Shailaja Hittalmani, *Associate Professor* (Genetics), University of Agricultural Sciences, Bangalore; K.R. Shivanna, *Professor (Retd.),* Department of Botany, University of Delhi, Delhi; R.S. Bedwal, *Professor*, Department of Zoology, University of Rajasthan, Jaipur; P.S. Srivastava, *Professor,* Department of Biotechnology, Hamdard University, New Delhi and Pramila Shivanna, *former Teacher*, D.A.V. School, Delhi, for their valuable suggestions. The Council is also thankful to V.K. Bhasin, *Professor and Head*, Department of Zoology, University of Delhi, Delhi; P.P. Bakre, *Professor and Head*, Department of Zoology, University of Rajasthan, Jaipur and Savithri Singh, *Principal*, Acharya Narendra Dev College, New Delhi for their support. The Council is also grateful to B.K. Gupta, *Scientist*, Central Zoo Authority, New Delhi for providing pictures of zoological parks and Sameer Singh for the pictures on the front and back cover. All the other photographs used in the book provided by Savithri Singh and taken at either at NCERT, IARI Campus or Acharya Narendra Dev College is gratefully acknowledged.

NCERT sincerely acknowledges the contributions of the members who participated in the review of the manuscripts – M.K. Tiwari, *PGT* (Biology), Kendriya Vidyalaya, Mandsaur, Madhya Pradesh; Maria Gracias Fernandes, *PGT* (Biology), G.V.M.S. Higher Secondary, Ponda, Goa; A.K. Ganguly, *PGT* (Biology), Jawahar Navodaya Vidyalaya, Roshnabad, Haridwar; Shivani Goswami, *PGT* (Biology), The Mother's International School, New Delhi and B.N. Pandey, *Principal*, Ordinance Factory Sr. Sec. School, Dehradun.

The Council is highly thankful to M. Chandra, *Professor* and *Head,* DESM; Hukum Singh, *Professor*, DESM, NCERT for their valuable support throughout the making of this book. The contributions of V.V. Anand, *Professor (Retd),* Regional Institute of Education (RIE), Mysuru; A.K. Mohapatra, *Professor,* RIE, Bhubaneswar; Abhay Kumar, *Assistant Professor,* CIET, NCERT; G.V. Gopal, *Professor,* RIE, Mysuru; Ishwant Kaur, *AHM*, DMS, Ajmer; Sunita Farkya, *Professor*, DESM, NCERT; Pushplata Verma, *Assistant Professor*, DESM, NCERT; C. Padmaja, *Professor*, RIE, Mysuru and Jaydeep Mandal, *Professor*, RIE, Bhopal in the review of this textbook in 2017-18 are acknowledged.

The Council also gratefully acknowledges the contribution of Deepak Kapoor, *Incharge*, Computer Station; Mohd. Khalid Raza and Arvind Sharma, *DTP operators*; Saswati Banerjee and Hari Darshan Lodhi, *Copy Editor*; Archana Srivastava, *Proof Reader* and APC office and administrative staff of DESM, NCERT.

The efforts of the Publication Department, NCERT in bringing out this publication are also appreciated.

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা

জীববিদ্যা হল জীবন সম্পর্কিত বিজ্ঞান, এটি হল পৃথিবীতে সৃষ্ট প্রাণের গল্প। জীবনের ধরন ও জীবন প্রক্রিয়াগুলো বিজ্ঞানের জীবজতন্ত্রসমূহ প্রায়শই পৃথিবীস্থিত বস্তু ও শক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী প্রাকৃতিক নিয়মগুলো মেনে চলে না। ঐতিহাসিকভাবে জীববিদ্যার জ্ঞান ছিল মানবদেহ ও এর কার্যাবলীর আণুষঙ্গিক জ্ঞান। পরবর্তী সময়ে আমরা জানতে পারি যে এই জ্ঞান হল চিকিৎসাবিদ্যা অনুশীলনের স্বাধীনভাবে জীববিদ্যার জ্ঞানের কিছু অংশের উন্নতি ঘটেছিল। জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্নাবলী, জীববৈচিত্র্যের উৎপত্তি ও বিস্তার, বিভিন্ন পরিবেশে ফ্লোরা এবং ফনার বিবর্তন ইত্যাদি জীব বিজ্ঞানীদের কল্পনায় ধরা পড়েছিল।

অঙ্গ সংস্থানিক, শারীরবৃত্তীয়, বিন্যাসবিধি সম্বন্ধীয় ইত্যাদি দিক থেকে সজীববস্তুর বর্ণনা নিয়ে বিজ্ঞানীরা এতটাই জড়িত ছিলেন যে, তারা নিছক সুবিধার্থে বা অন্য কোনো কারণে এ সম্পর্কিত বিষয়বস্তুকে কৃত্রিমভাবে প্রথমে উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যার উপশাখায় ও পরে অণুজীব বিদ্যায়ও ভাগ করেছিলেন। ইতিমধ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বেশ কিছু বিষয়বস্তু জীববিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়ে জৈব রসায়ন ও জৈব পদার্থবিদ্যা নামক জীববিদ্যার এই দুই উপশাখার সৃষ্টি হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মেন্ডেলের কাজ এবং এই কাজের পুনরাবিষ্কার সুপ্রজনন বিদ্যা অধ্যয়নের উন্নতি ঘটিয়েছিল। DNA এর দ্বিতন্ত্রী হ্যালিক্যাল গঠনের আবিষ্কার এবং বহু বৃহৎ অণুর ত্রিমাত্রিক গঠনের রহস্য উদ্ধার আণুবিক জীববিদ্যা শাখাটির প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং এই শাখার প্রধান ক্ষেত্রজুড়ে-এর বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছিল। সেই অর্থে বলতে গেলে, জীববিদ্যার যে কার্যকরী শাখাগুলো জীবন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতিগুলোর উপর জোর দিয়েছিল সেগুলোই অধিক মনোযোগ, সহযোগিতা, বৌদ্ধিক ও সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত জীববিদ্যা বিষয়টি সনাতন ও আধুনিক জীববিদ্যা এই দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। জীববিদ্যার বেশিরভাগ গবেষককরা জীববিদ্যার যে বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করছিলেন সেগুলো তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা, ফলিত পদার্থবিদ্যা, গাঠনিক রসায়ন ও বস্তুবিজ্ঞানের গবেষণাগুলোর মতো কৌতুহল ও প্রকল্প পরিচালিত বৌদ্ধিক অনুশীলন না হয়ে তা ছিল অভিজ্ঞতা নির্ভর। সৌভাগ্যবশত ধীরে ধীরে জীববিদ্যার সাধারণ একত্রীকরণের নীতি ও অবিষ্কৃত, পুনরাবিষ্কৃত হয়েছিল এবং এর উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। মেয়ার ডবজানস্কি, হলডেন, পেরুজ, খোরানা, মরগান, ডারলিংটন, ফিসার এবং অন্যান্য আরও বহুবিজ্ঞানীর গবেষণা

জীববিদ্যার সনাতন ও আণবিক জীববিদ্যা উভয় শাখার প্রতি সবার গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা জন্মেছিল। বাস্তুবিদ্যা (Ecology) ও সিস্টেম বায়োলজি (System Biology) জীববিদ্যার একীভূত একটি শাখারূপে প্রকাশিত হয়েছিল। জীববিদ্যার প্রতিটি শাখা শুধুমাত্র জীববিদ্যার অন্যান্য শাখার সাথেই যুক্ত হয়েছে এমন নয়, এটি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা ও গণিতের সাথেও যুক্ত হয়েছে। শীঘ্রই জীববিদ্যা অধ্যয়নের গন্ডিটি ভাঙতে শুরু করেছিল। এই গন্ডি বর্তমানে পুরোপুরিভাবে অবলুপ্তির পথে এসে দাঁড়িয়েছে। মানব জীববিদ্যা, জীব-চিকিৎসাবিদ্যা, বিশেষত, মানব মস্তিষ্কের গঠন, কার্যাবলী ও বিবর্তন বিষয়ে উন্নতি জীববিদ্যার প্রতি মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত করেছিল। জীববিদ্যা এমনকি পরীক্ষাগার, মিউজিয়াম এবং জাতীয় উদ্যানের বাইরে বেরিয়ে এসে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকে উত্থাপনের মধ্য দিয়ে মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছিল এবং তাই রাজনৈতিক মনযোগও আকর্ষণ করতে পেরেছিল। শিক্ষাবিদরাও এ বিষয়ে পিছিয়ে ছিলেন না কারণ তারাও বুঝতে পেরেছিলেন যে জীববিদ্যাকে আন্ত:বিষয়ক (disciplinary) এবং একীভূত (integrated) বিজ্ঞানরূপে সর্বস্তরের শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণে বিশেষত বিদ্যালয়ে এবং আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্তরে পড়ানো উচিত। বর্তমান সময়ের চাহিদা হল জীববিদ্যার মৌলিক ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রের অঞ্চলগুলোকে নতুনভাবে সমন্বায়িত করা। জীববিদ্যা বর্তমানে উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও গণিতের মতোই জীববিদ্যারও একগুচ্ছ স্বাধীন ধারণা রয়েছে, সেগুলো সার্বজননীনও বটে।

বর্তমান পুস্তকটি হল বিদ্যালয়স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য লিখিত সমন্বয়িত জীববিদ্যার প্রথম উপস্থাপন। জীববিদ্যা শিক্ষণ ও অধ্যয়নের ক্ষেত্রে যে সীমাবদ্ধতাগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে একটি হল পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি শাখার সাথে এর সমন্বয়ের অভাব। এছাড়া উদ্ভিদ, প্রাণী ও জীবাণুর দেহে সংঘটিত বহু প্রক্রিয়াও ভৌত-রাসায়নিক দিক থেকে একইরকম। কোশ জীববিদ্যা, উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবে ঘটা আপাত বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনাবলির মধ্যে নিহিত কোশীয় স্তরের সাধারণ কার্যাবলীর একীকরণকে ব্যক্ত করে। একইভাবে আণবিক বিজ্ঞান (যেমন জীব রসায়নবিদ্যা বা আণবিক জীববিদ্যা) এর সাহায্যে এটা প্রকাশিত হয়েছে যে উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবের মতো এইসব আপাত বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবগুলোতে সংঘটিত আণবিক পদ্ধতিগুলোও একইরকমের হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে শ্বসন, বিপাক, শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, জনন ও পরিস্ফুরণের মত ঘটনাবলিকে সম্পর্কহীন পৃথক প্রক্রিয়ারূপে বর্ণনা করে এদের একীকরণ করার মাধ্যমে বর্ণনা করা যেতে পারে। পাঠ্যপুস্তকে বিজ্ঞানের এই ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ শাখাগুলোকে একীকরণ করার একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত আংশিক একীকরণই করা গেছে, সম্পূর্ণ একীকরণ সম্ভব হয়নি। এটা আশা করা যায় যে পরবর্তী কয়েকবছর পর শিক্ষণ ও শিখনক্ষেত্রে ঘটা পরিবর্তনসমূহ যখন এই পুস্তকের নতুন সংস্করণ বেরোবে তাতে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ও অণুজীববিদ্যার মধ্যে আরও সমন্বয়িত রূপ পাওয়া যাবে ও এটি প্রকৃত অর্থে জীববিদ্যার সঠিক প্রকৃতিটি প্রতিফলিত করবে এবং এই জীববিদ্যা হবে — মানুষের জন্য, মানুষের দ্বারা, মানুষের ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান।

একাদশ শ্রেণির জীববিদ্যা এই নতুন পাঠ্যপুস্তকটি পাঠ্যসূচির পরিমার্জন ও পুনগর্ঠনের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণরূপে পুনর্লিখিত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি লেখার ক্ষেত্রে জাতীয় পাঠ্যক্রম রূপরেখা (2005) এর মূল নীতি ও অনুসরণ করা হয়েছে। 22টি অধ্যায়ে উপস্থাপিত সমগ্র পাঠ্যবস্তু আবার 5টি বিষয়ভিত্তিক এককের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি এককের শুরুতে এর অন্তর্গত অধ্যায়গুলোর সারমর্মকে প্রাধান্য দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি এককে এর অন্তর্গত অধ্যায়গুলোর সাথে সম্পর্কিত একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর জীবনীও সংক্ষেপে দেওয়া আছে। প্রতিটি অধ্যায়ে প্রথম পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপশিরোনামগুলোকে একটি সারণির আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। আরবী সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহারের মাধ্যমে দশমিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে এই উপশিরোনামগুলোকে নির্দেশ করা হয়েছে। প্রতি অধ্যায়ের শেষে বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আছে। এই অধ্যায়টি অধ্যয়নের ফলে শিক্ষার্থীদের কী কী বিষয় শেখার কথা তা এই সারাংশ থেকে এরা বুঝতে পারবে। প্রতি অধ্যায়ের শেষে একটি প্রশ্নমালা দেওয়া আছে। এই প্রশ্নগুলো, শিক্ষার্থীরা এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু স্মরণমূলক প্রশ্ন। আবার কিছু প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো উত্তর করতে বিশ্লেষণাত্মক চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে এবং এইভাবে শিক্ষার্থীর প্রকৃত বোধগম্যতা যাচাই করা যায়। কিছু প্রশ্ন সমস্যা সমাধানমূলক। সবশেষে এমন কিছু প্রশ্নও রয়েছে যার জন্য বিশ্লেষণ ও অনুমান নির্ভর চিন্তনের প্রয়োজন। কারণ এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া থাকে না। এটি শিক্ষার্থীদের মনে বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর চিন্তনমূলক বোধগম্যতা জন্মেছে কিনা তা যাচাই করে। যে বিষয়গুলোর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় সেগুলো হল - বর্ণনাশৈলী, বিশদীকরণ, কার্য-বিষয়ক অনুশীলনী, বিষয়বস্তু প্রকাশে স্পষ্টতা, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়সমূহের পাঠদান শেষ করা। পাঠদানে নিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকা সহ বেশ কিছু সংখ্যক অত্যন্ত মেধাবী এবং বিষয়ের প্রতি একনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের ঐকান্তিক সহযোগিতায় এই অপূর্ব পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যালয়স্তরে জীববিদ্যা বিষয়টি যাতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের কাছে বোঝাস্বরূপ হয়ে না দাঁড়ায়— এই বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করা। আমাদের আন্তরিক আশা এই যে, জীববিদ্যা শিক্ষণ এবং জীববিদ্যা শিখন উভয়ই একটি আনন্দদায়ক কার্যক্রম হয়ে উঠবে।

অধ্যাপক

কে. মুরলিধর

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

একক I

[জীবগতে বৈচিত্র্য] পৃষ্ঠা - (1- 62)

অধ্যায়ঃ 1 সজীব জগৎ

অধ্যায়ঃ 2 জীববিদ্যা সম্পর্কিত শ্রেণি বিন্যাস

অধ্যায়ঃ 3 উদ্ভিদ জগৎ

অধ্যায়ঃ 4 প্রাণী জগৎ

একক II

[উদ্ভিদ ও প্রাণীদের গঠনতন্ত্র] পৃষ্ঠা - (63 - 122)

অধ্যায়ঃ 5 সপুষ্পক উদ্ভিদের গঠন

অধ্যায়ঃ 6 সপুষ্পক উদ্ভিদের অন্তর্গঠন

অধ্যায়ঃ 7 প্রাণীদের গঠনগত অঙ্গাসংস্থান

একক III

[কোশ ঃ গঠন ও কাজ] পৃষ্ঠা - (123 - 172)

অধ্যায়ঃ 8 কোশ ঃ জীবনের একক

অধ্যায়ঃ 9 জৈব অণুসমূহ

অধ্যায়ঃ 10 কোশচক্র এবং কোশ বিভাজন

একক IV

[উদ্ভিদ শারীরবিদ্যা] পৃষ্ঠা - (173 - 254)

অধ্যায়ঃ 11 উদ্ভিদে পরিবহণ

অধ্যায়ঃ 12 খনিজ পুষ্টি

অধ্যায়ঃ 13 উন্নত উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষ

অধ্যায়ঃ 14 উদ্ভিদে শ্বসন

অধ্যায়ঃ 15 উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশ

একক V

[মানব শারীরবিদ্যা] পৃষ্ঠা - (255 - 343)

অধ্যায়ঃ 16 পরিপাক এবং শোষণ

অধ্যায়ঃ 17 শ্বাসকার্য এবং গ্যাসের আদান-প্রদান

অধ্যায়ঃ 18 দেহতরল এবং সংবহন

অধ্যায়ঃ 19 রেচন পদার্থ ও তাদের নিষ্কাশ

অধ্যায়ঃ 20 চলন এবং গমন

অধ্যায়ঃ 21 স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয়

অধ্যায়ঃ 22 রাসায়নিক সমন্বায়ক এবং একীভবন

একক 1 (UNIT 1)

জীববজগতে বৈচিত্র্য
(DIVERSITY IN THE LIVING WORLD)

অধ্যায় 1
জীবজগৎ

অধ্যায় 2
জীববিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শ্রেণিবিন্যাস

অধ্যায় 3
উদ্ভিদজগৎ

অধ্যায় 4
প্রাণীজগৎ

বিজ্ঞানের যে শাখায় জীবনের গঠনসমূহ ও প্রক্রিয়াসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয় সেটিই জীববিদ্যা (Biology)। জীবজগৎ বিভিন্ন বিচিত্র ধরনের সজীব বস্তু নিয়ে গঠিত। আদি মানবরা সহজেই জড় বস্তু ও সজীব বস্তুর মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করতে পেরেছিল। এরা কিছু জড় বস্তুকে (বায়ু, সমুদ্র, আগুন ইত্যাদি) এবং কিছু কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দেবতারূপে জ্ঞান করত। এই ধরনের সজীব ও জড় বস্তুদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এরা সবই ছিল আদি মানবের মনে আতঙ্ক ও ভয় সৃষ্টিকারী বস্তু এবং এজন্যই মানুষেরা এদের দেবতারূপে আহ্বান করত। মানব ইতিহাসে মানুষ সহ অন্যান্য সজীব বস্তুদের বর্ণনা অনেক পরে শুরু হয়েছিল। জীববিদ্যার মানবকেন্দ্রিক ধারণাকে যে সব সমাজ প্রশ্রয় দিয়েছিল, তারা জীববিদ্যার জ্ঞানের সীমিত বিকাশ ঘটাতে পেরেছিল। প্রয়োজনের তাগিদে জীবনের ধরনের সুসংবন্ধ এবং ব্যাপক বর্ণনা, সনাক্তকরণ, নামকরণ এবং শ্রেণিবিন্যাসের বিস্তৃত পদ্ধতিগুলো সামনে নিয়ে এসেছিল। এ ধরনের অধ্যয়নের সবচেয়ে বড়ো দিকটি ছিল এই যে অনুভূমিক ও উল্লম্ব উভয় দিক থেকে সজীব বস্তুগুলোর মধ্যে যে সাদৃশ্য রয়েছে তা উপলব্ধি করতে পারা। বর্তমান সময়ের সব সজীব বস্তুই একে অপরের সাথে এবং এমনকি যেসব জীব কোনো এক সময় পৃথিবীতে বাস করত তাদের সাথেও সম্পর্কিত। এই উপলব্ধি এমন এক বিপ্লবের রূপ নিয়েছিল, যা মানুষের ধারণাকে খর্ব করেছিল ও জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা করেছিল। এই এককের অধ্যায়গুলোতে বিন্যাসবিদদের পরিপ্রেক্ষিত থেকে শ্রেণিবিন্যাসসহ প্রাণী ও উদ্ভিদের সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাই।

আর্নস্ট মেয়ার
(1904 -2004)

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তন বিষয়ক জীববিজ্ঞানী আর্নস্ট মেয়ার (Ernst Mayr) 1904 সালের 5 জুলাই জার্মানির কেম্পটন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাকে বিংশ শতাব্দীর ডারউইন বলা হত। সর্বকালের একশত বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন ছিলেন ডারউইন। 1953 সালে মেয়ার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন এবং Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus উপাধি গ্রহণ করার পর 1975 সালে অবসর গ্রহণ করেন। তার প্রায় 80 বছরের কর্ম জীবনে তার গবেষণা পক্ষীবিদ্যা (Ornithology), বিন্যাসবিধি, ভৌগোলিক প্রাণীবিদ্যা, অভিব্যক্তি, সিস্টেমেটিক্স এবং জীববিদ্যার ইতিহাস ও দর্শনে প্রসার লাভ করেছিল। তিনি প্রায় এককভাবে বিবর্তন সম্বন্ধীয় জীববিদ্যার প্রধান অংশ অর্থাৎ প্রজাতি বৈচিত্র্যের উদ্ভব ব্যাখ্যা করেছিলেন যা আজও প্রচলিত আছে। মেয়ার তিনটি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন যা সর্বত্র ত্রিমুকুট হিসেবে পরিচিত। এগুলো হল— বালজান পুরস্কার (Balzan Prize) 1983, দ্য ইন্টারন্যাশানেল প্রাইজ ফর বায়োলজি (The International for Biology)— 1994 ; ক্র্যাফোর্ড পুরস্কার (Crafoord Prize)— 1999 সালে, মেয়ার 2004 সালে তার 100 বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

অধ্যায় 1 (CHAPTER 1)

জীবজগৎ (THE LIVING WORLD)

1.1 'সজীব' (Living) কথাটির অর্থ কী?

1.2 জীব জগতে বৈচিত্র্য

1.3 বিন্যাসবিধির ক্যাটাগরিসমূহ

1.4 বিন্যাসবিধিতে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ

কী বিস্ময়কর এই জীবজগৎ! সজীব বস্তুর বিচিত্র ব্যাপক ধরন ও চমকপ্রদ। সাধারণ বাসস্থান থেকে শুরু করে একেবারে ভিন্ন কিছু বিশেষ বাসস্থান যেমন শীতল পর্বতমালা, পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য, সমুদ্র, স্বাদুজলের হ্রদ, মরুভূমি বা উষ্ণপ্রস্রবণেও আমরা সজীব বস্তুর সন্ধান পাই, যা সত্যিই আমাদের বাক্‌রুদ্ধ করে দেয়। ছুটন্ত ঘোড়ার সৌন্দর্য, পাখির পরিযাণ, ফুলের উপত্যকা বা আতঙ্কদায়ক আক্রমণাত্মক হাঙর, সবই অতি বিস্ময়কর। কোনো জীবগোষ্ঠীর জীবদের মধ্যে এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলের একটি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যে বাস্তুতান্ত্রিক বিরোধ এবং সহযোগিতা এমনকি কোশের ভেতরে বিভিন্ন অণু পরমাণুর চলাচল, আসলে 'জীবন' কী এই বিষয়টিকেই গভীরভাবে প্রতিফলিত করে। এই প্রশ্নটির মধ্যে আরও দুইটি প্রশ্ন নিহিত রয়েছে। প্রথমটি হল কৌশলগত প্রশ্ন, যা সজীব বস্তু এবং জড়বস্তুর মধ্যে কী কী বৈপরীত্য রয়েছে তার উত্তর খোঁজে এবং দ্বিতীয়টি হল দর্শনাত্মক যা জীবনের প্রয়োজনীয়তা কী, তার উত্তর খোঁজে। বিজ্ঞানী হিসাবে আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে যাব না। সজীব মানে কী? এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

1.1 'সজীব' মানে কী?

যখন আমরা 'সজীব' শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করি, তখন প্রথাগতভাবে আমরা সজীব বস্তুর কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য খুঁজি। সজীব বস্তুর বৈশিষ্ট্য হিসেবে তাৎক্ষণিকভাবে বৃদ্ধি, প্রজনন, পরিবেশ থেকে সংবেদন গ্রহণ এবং উপযুক্ত পরিবেশীয় সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি আমাদের মনে আসে। আবার কেউ কেউ সজীববস্তুর আরও কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন বিপাক, স্বপ্রজননশীলতা, স্ব-সংগঠিত হওয়ার ক্ষমতা, আন্তঃক্রিয়া এবং উদ্ভবের ক্ষমতা ইত্যাদিকেও তালিকাভুক্ত করেন। চলো আমরা এদের প্রত্যেকটিকেই বোঝার চেষ্টা করি।

সব সজীব বস্তুরই বৃদ্ধি ঘটে। সজীব বস্তুর 'বৃদ্ধি' বলতে— জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আয়তন বৃদ্ধি দুটোকেই বোঝায়।

কোনো জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আয়তন বৃদ্ধি দুইটি সমরূপ বৈশিষ্ট্য। বহুকোশী জীবকোশ বিভাজনের মাধ্যমে এই বৃদ্ধি সারাজীবনকালব্যাপী চলতে থাকে। প্রাণীতে এই বৃদ্ধি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত ঘটে। তবে বিনষ্ট কোশ প্রতিস্থাপনের জন্য কিছু কিছু নির্দিষ্ট কলাতে কোশ বিভাজন হয়। এককোশী জীব কোশ বিভাজন প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি পায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জীবদেহের বাইরে পালন মাধ্যম শুধুমাত্র কোশের সংখ্যা গণনার সাহায্যে খুব সহজেই কোশের সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা যায়। বেশির ভাগ উন্নত প্রাণী এবং উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি এবং জনন হল পরস্পর দুটি স্বতন্ত্র ঘটনা। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, জীবদেহের বেড়ে যাওয়াকেই বৃদ্ধি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। যদি আমরা ভর বেড়ে যাওয়াকে বৃদ্ধির মানদণ্ড হিসেবে ধরি, তবে বলা যায় জড় বস্তুও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পর্বত, পাথরের চাঁই, বালির স্তূপ এরও বৃদ্ধি ঘটে। যদিও জড় বস্তুর ক্ষেত্রে বস্তুর বহির্পৃষ্ঠে পদার্থ স্তূপীকৃত হয়ে বা জমা হয়ে বস্তুর ভরের বৃদ্ধি তথা সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটায়। কিন্তু সজীব বস্তুকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে 'বৃদ্ধি'কে সজীব বস্তুর একটি ধর্ম হিসেবে ধরা যায় না। এক্ষেত্রে কোন পরিস্থিতিতে কোনো সজীব বস্তুতে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়, তা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে এবং তখন আমরা বুঝতে পারব যে এটি সজীব বস্তুর একটি বৈশিষ্ট্য হতে পারে কিনা। একটি মৃত জীব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

একইভাবে জনন সজীব বস্তুর একটি বৈশিষ্ট্য। বহুকোশী জীবের ক্ষেত্রে প্রজনন বলতে জনিতৃ জীবের প্রায় হুবহু বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অপত্য জীব সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এখানে আবশ্যিকভাবে বা পরোক্ষভাবে আমরা যৌন জননের কথাই বলছি। অযৌন জনন পদ্ধতিতেও জীব জনন সংঘটিত করে। ছত্রাক অসংখ্য রেণু উৎপাদনের মাধ্যমে খুব সহজে সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় ও বিস্তার লাভ করে। অনুন্নত জীব যেমন, ইস্ট ও হাইড্রা এর ক্ষেত্রে আমরা কোরোকোদ্গম এবং বাডিং লক্ষ করে থাকি। প্ল্যানেরিয়া (চ্যাপ্টা কৃমি)তে প্রকৃত পুনরুৎপাদন পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ একটি খণ্ডিত জীব, দেহের হারিয়ে যাওয়া বাকি অংশ পুনরুৎপাদন করতে পারে এবং একটি নূতন সম্পূর্ণ জীবে পরিণত হতে পারে। এ পদ্ধতিতে ছত্রাক, সূত্রাকার শৈবাল, মস্-এর প্রোটোনিমা, এ সবগুলোই খণ্ডীভবন প্রক্রিয়ায় খুব সহজেই বংশবৃদ্ধি করে। আবার ব্যাকটিরিয়া, এককোশী শৈবাল এবং অ্যামিবার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি এবং জনন মানেই কোশের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটবে। এর মধ্যে আমরা এটা জেনে গেছি যে বৃদ্ধি বলতে কোশের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভর-বৃদ্ধি উভয়কেই বোঝায়। সুতরাং লক্ষ করার বিষয় যে এককোশী প্রাণীদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি এবং জননকে আমরা স্পষ্টভাবে আলাদা করতে পারি না। সুতরাং প্রজননকে প্রত্যক্ষভাবে সজীব বস্তুর বৈশিষ্ট্য বলা যায় না। তবে অবশ্যই কোনো জড় বস্তু প্রজননে বা নিজের প্রতিলিপি গঠনে সক্ষম নয়।

জীবনের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হল বিপাক। সব সজীব বস্তুই বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। এই রাসায়নিক পদার্থগুলো ছোটো-বড়ো বিভিন্ন আকৃতির এবং বিভিন্ন কার্যকারিতাসম্পন্ন হয়। এই বস্তুগুলো জীবদেহে অবিরাম তৈরি হচ্ছে এবং এগুলোই পরিবর্তিত হয়ে আরো কিছু জৈব অণু তৈরি করছে। এই পরিবর্তন বা রূপান্তর রাসায়নিক বিক্রিয়া বা বিপাকক্রিয়া। এককোশী বা বহুকোশী সব জীবের ক্ষেত্রেই কোশের অভ্যন্তরে একই সাথে হাজার হাজার বিপাকক্রিয়া চলছে। উদ্ভিদ, প্রাণী, ছত্রাক এবং অণুজীব সবার মধ্যেই বিপাকক্রিয়া

পরিলক্ষিত হয়। আমাদের দেহে অবিরাম ঘটতে থাকা সব রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমষ্টিগত ফলই বিপাক। কোনো জড় বস্তুই বিপাকক্রিয়া প্রদর্শন করে না। দেহের বাইরে অকোশীয় পরিবেশেও বিপাকক্রিয়া প্রদর্শন করানো যেতে পারে। জীবদেহের বাইরে পরীক্ষানলে ঘটা বিভিন্ন বিপাকক্রিয়াগুলোকে সজীব বা জড় কোনোটিই বলা যায় না। সুতরাং যদিও বিপাকক্রিয়া সব সজীব বস্তুরই একটি সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য, তথাপি দেহের বাইরে ঘটা বিচ্ছিন্ন বিপাকীয় বিক্রিয়াগুলোকে সজীব বস্তুর বৈশিষ্ট্য বলা যায় না। কিন্তু এরা অবশ্যই সজীব বিক্রিয়া। তাই দেহের কোশীয় সংগঠন, সজীব দেহ গঠনের একটি সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য।

সম্ভবত সব সজীব বস্তুরই অত্যাবশ্যকীয় এবং প্রায়োগিক দিক থেকে জটিল বৈশিষ্ট্যটি হল নিজের চারপাশ এবং পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করা এবং শারীরিক, রাসায়নিক বা জৈবিক যে-কোনো উপায়ে পরিবেশীয় উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে আমরা পরিবেশকে অনুভব করতে পারি। উদ্ভিদেরা পরিবেশের বহিঃপ্রভাব যেমন আলোক, জল, তাপমাত্রা, অন্যান্য জীব, দূষক ইত্যাদির প্রতি সাড়া দিতে পারে। প্রোক্যারিওটিক থেকে শুরু করে সর্বাধিক জটিল ইউক্যারিওটিক পর্যন্ত সব জীবই পরিবেশীয় ইঙ্গিতগুলোকে অনুভব করতে পারে এবং এদের সাপেক্ষে সাড়া দিতে পারে। উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয় ক্ষেত্রেই ঋতুভিত্তিক প্রজননকারীদের প্রজনন আলোকব্যাপ্তিকাল দ্বারা প্রভাবিত হয়। সব জীবই তাদের দেহে রাসায়নিক পদার্থসমূহের প্রবেশ -এর বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই সব জীবই তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে 'সচেতন'। মানুষ হল একমাত্র জীব যে কিনা নিজের সম্পর্কে সচেতন অর্থাৎ মানুষের আত্মসচেতনতা রয়েছে। সুতরাং 'সচেতনতা' সজীব বস্তুর একটি সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিগণিত হয়।

মানুষের ক্ষেত্রে জীবিত অবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করা অধিকতর কঠিন। আমরা পর্যবেক্ষণ করি যে হাসপাতালে শুয়ে থাকা কোমায় আচ্ছন্ন রোগীর হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসের ক্রিয়া কৃত্রিম উপায়ে চালিয়ে রাখা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই অবস্থায় রোগীটির মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘটেছে এবং সে সজ্ঞানে নেই। এমন অবস্থায় থাকা রোগীদের মধ্যে যারা আর কখনও স্বাভাবিক জীবনে ফিরবে না, এদের সজীব বলা হবে না জড়?

ওপরের শ্রেণিতে তোমরা জানতে পারবে যে সব সজীব ঘটনাবলিই অভ্যন্তরীণ আন্তঃক্রিয়ার ফলেই ঘটে। কলা গঠনকারী কোশসমূহে কলার ধর্ম অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু এই কোশসমূহের আন্তঃক্রিয়ার ফলেই কলা গঠিত হয়। একইভাবে কোশীয় অঙ্গাণু গঠনকারী অণুসমূহে অঙ্গাণুর ধর্ম দেখা যায় না, কিন্তু এই আণবিক উপাদানসমূহের আন্তঃক্রিয়ার ফলেই কোশীয় অঙ্গাণু তৈরি হয়। হায়ারার্কির সবস্তরেই সাংগঠনিক জটিলতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি সত্য। সুতরাং আমরা এটা বলতে পারি যে, সব সজীব বস্তু স্বপ্রজননক্ষম, তাও বিবর্তনক্ষমতা সম্পন্ন একটি স্বনিয়ন্ত্রিত আন্তঃক্রিয়া ব্যবস্থা, যারা বাহ্যিক উদ্দীপনায় সাড়া দিতে পারে। জীববিদ্যা হল পৃথিবীর বুকে জীবনের গল্প। জীববিদ্যা পৃথিবীতে সজীব বস্তুর বিবর্তনেরও ইতিহাস। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-এর সব সজীব বস্তুই বিভিন্ন মাত্রায় কিছু সাধারণ জিনগত বৈশিষ্ট্য বহন করে এবং এর মাধ্যমেই এরা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত থাকে।

1.2 জীবজগতে বৈচিত্র্য (DIVERSITY IN THE LIVING WORLD)

তুমি যদি তোমার চারপাশে লক্ষ কর, তাহলে বিভিন্ন ধরনের সজীব বস্তু তোমার চোখে পড়বে, তা হতে পারে টবে লাগানো গাছ, পতঙ্গ, পাখি, তোমার পোষা প্রাণী বা অন্যান্য প্রাণী বা গাছপালা। আবার এমন বহু জীব রয়েছে যাদের তুমি খালি চোখে দেখতে পাও না; অথচ এরা সবাই তোমাকে ঘিরেই রয়েছে। এবার যদি তোমার পর্যবেক্ষণের পরিসর আরও বৃদ্ধি কর, তবে সজীববস্তুর বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য আরও বৃদ্ধি পাবে। তুমি যদি কোনো ঘন অরণ্য পরিদর্শন করে থাক, তাহলে সেখানে অবশ্যই অনেক বেশি সংখ্যক এবং অনেক বেশি বৈচিত্র্যের সজীব বস্তু দেখে থাকবে। প্রত্যেকটি আলাদা ধরনের গাছ, প্রাণী অথবা জীব যা তুমি দেখ, এরা প্রত্যেকেই এক একটি প্রজাতিকে নির্দেশ করে। আজ পর্যন্ত প্রায় 1.7-1.8 মিলিয়ন প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এদের সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এটিই জৈব বৈচিত্র্য বা পৃথিবীতে বর্তমান জীবের সংখ্যা ও তার ধরন। আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে কোনো নতুন আবিষ্কৃত জায়গা এমনকি কোনো পুরোনো জায়গাতেও অনবরতই নতুন নতুন জীবের সনাক্তকরণ হচ্ছে।

পূর্বের বক্তব্য অনুযায়ী, পৃথিবীতে কোটি কোটি প্রাণী এবং উদ্ভিদ রয়েছে। আমাদের নিজের এলাকার প্রাণী ও উদ্ভিদরা তাদের স্থানীয় নামে আমাদের কাছে পরিচিত। এই স্থানীয় নামগুলো স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কোনো জীবের বিষয়ে পারস্পরিক মত বিনিময় করার কোনো উপায় এবং পদ্ধতি খুঁজে বের করতে না পারলে এক্ষেত্রে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে তা সম্ভবত তোমরা অনুধাবন করতে পার।

সুতরাং সব সজীব বস্তুরই এমন সাধারণ নামকরণের প্রয়োজন যাতে সারা পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট জীব একই নামে পরিচিত হতে পারে। এই পদ্ধতিকে বলে নামকরণ। তবে অবশ্যই একমাত্র তখনই নামকরণ বা কোনো জীবের নাম দেওয়া সম্ভব হবে যদি জীবটির বৈশিষ্ট্যাবলি সঠিকভাবে বর্ণিত হয় এবং যদি আমরা জানি যে কোনো জীবের সাথে এই নামটি যুক্ত করা হচ্ছে। একেই বলে সনাক্তকরণ।

অধ্যয়নের সুবিধার্থে বেশ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী প্রত্যেক জীবের একটি বিজ্ঞানসম্মত নাম ঠিক করার জন্য কিছু নীতি প্রণয়ন করেন এবং এটি সারা বিশ্বের জীববিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যে সর্বসম্মতনীতি ও মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিক নামকরণ করা হয়, ইন্টারন্যাশনাল কোড ফর বোটানিক্যাল নোমেনক্ল্যাচার (ICBN) -এ তা উল্লিখিত আছে। তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার প্রাণীদের নামকরণ কীভাবে করা হয়? প্রাণী বিন্যাসবিদ্‌রা প্রাণীদের নামকরণের জন্য ইন্টারন্যাশনাল কোড অব জুলোজিক্যাল নোম্যানক্ল্যাচার (ICZN) গঠন করেন। বিজ্ঞানসম্মত নামগুলো প্রতিটি জীবের একটি মাত্র নামকেই সুনিশ্চিত করে। কোন একটি জীবের বর্ণনা এরূপ হওয়া প্রয়োজন যে পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তের মানুষই এই বর্ণনার সাপেক্ষে একই নামে ওই নির্দিষ্ট জীবটিকে চিনতে সমর্থ হবে। এই দুই আন্তর্জাতিক সংগঠন এটাও সুনিশ্চিত করে যে কোনো একটি জীবকে প্রদত্ত এ ধরনের নাম অন্য কোনো জ্ঞাত জীবের নামকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে না।

জীববিজ্ঞানীরা কোনো জ্ঞাত জীবের বিজ্ঞানসম্মত নামকরণের ক্ষেত্রে সর্বজনগ্রাহ্য নীতিসমূহকে অনুসরণ করেন। এক্ষেত্রে প্রতিটি নাম দুটি পদের সমন্বয়ে গঠিত— প্রথমটি গণগত নাম এবং দ্বিতীয় পদটি প্রজাতিগত নামকে নির্দেশ করে। দুটি পদের সমন্বয়ে এইরূপ নামকরণ পদ্ধতিকে দ্বিপদ নামকরণ (Binomial nomenclature) বলে। বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস এই পদ্ধতির প্রণেতা — যে পদ্ধতি সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা চর্চা করে চলেছেন। দুটি পদ ব্যবহার করে এই নামকরণ পদ্ধতিটি অত্যন্ত সুবিধাজনক পদ্ধতি হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। এই বিজ্ঞানসম্মত নামকরণ পদ্ধতিটিকে স্পষ্টভাবে বুঝতে চলো আমরা আমকে উদাহরণ হিসাবে নিই। ম্যাঞ্জিফেরা ইন্ডিকা (***Mangifera Indica***)। চলো আমরা দেখি কীভাবে

এই দ্বিপদ বিশিষ্ট নামটি তৈরি হল। এই নামটিতে ম্যাঞ্জিফেরা হল আমের গণগত নাম, আর ইন্ডিকা আমের নির্দিষ্ট প্রজাতির নামকে নির্দেশ করে।

নামকরণের অন্যান্য সর্বজনীন নিয়মাবলি নিম্নরূপ:

১. বৈজ্ঞানিক নামগুলো সাধারণত ল্যাটিন শব্দে এবং বাঁকা হরফে লেখা হয়। এদের উৎপত্তি যেখানেই হোক না কেনো নামগুলো ল্যাটিন শব্দে বা ল্যাটিন থেকে উদ্ভুত শব্দে রূপান্তরিত করা হয়।

২. একটি বিজ্ঞানসম্মত নামের প্রথম শব্দটি গণগত নামকে বোঝায়, যেখানে দ্বিতীয় শব্দটি প্রজাতিগত নাম বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

৩. বিজ্ঞানসম্মত নামের দুটি পদকেই হাতে লেখার সময় আলাদাভাবে নিম্নরেখিত করতে হবে এবং ছাপার সময় এরা যে ল্যাটিন ভাষা থেকে উদ্ভুত তা বোঝাতে বাঁকা হরফে ছাপতে হবে।

৪. গণগত নাম নির্দেশক প্রথম শব্দটি বড়ো হাতের অক্ষর দিয়ে শুরু করতে হবে আবার প্রজাতির নামটি ছোটো হাতের অক্ষরে লিখতে হয়। আমের বিজ্ঞানসম্মত নাম ম্যাঞ্জিফেরা ইন্ডিকাকে উদাহরণ হিসাবে নিয়ে এই বিষয়টিও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

জীবটিকে প্রথম যে বিজ্ঞানী বর্ণনা করেছিলেন তাঁর নাম প্রজাতিগত নামের শেষে অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত নামের শেষে বসবে এবং এটি সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা হবে। উদাহরণস্বরূপ ***Mangifera indica* Linn.** এই নাম থেকে এটা বোঝা যায় যে এই প্রজাতিটির বর্ণনা করেছিলেন বিজ্ঞানী লিনিয়াস।

যেহেতু সব সজীব বস্তুর অধ্যয়ন প্রায় অসম্ভব তাই এই অসম্ভব বিষয়টিকে সম্ভবপর করার জন্য কিছু কৌশল উদ্ভাবন করার প্রয়োজন। এটিই শ্রেণিবিন্যাস। শ্রেণিবিন্যাস হল এমন একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে কোনো কিছুকে তার উপযুক্ত ক্যাটাগরিতে রাখা যায় এবং তা করা হয় সহজে পর্যবেক্ষণযোগ্য সেই বস্তুর কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে।

উদাহরণস্বরূপ আমরা সহজেই উদ্ভিদের অথবা প্রাণীদের বা কুকুর, বেড়াল অথবা কীটপতঙ্গাদের দলকে চিনতে পারি। যে মুহূর্তে আমরা এদের যে-কোনো একটি দলকে নিয়ে ভাবি তখন ওই দলভুক্ত জীবের সাথে কিছু বৈশিষ্ট্যকে যুক্ত করি। যখন তুমি একটি কুকুর সম্পর্কে ভাব, তখন কী ছবি তোমার চোখে ভেসে উঠে? অবশ্যই এক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকেই কুকুরকেই দেখি, বিড়ালকে নয়। এখন যদি আমাদেরকে 'অ্যালসেসিয়ান' নিয়ে চিন্তা করতে বলা হয়, আমরা জানি কী নিয়ে চিন্তা করব। একইরকমভাবে ধরো আমাদেরকে স্তন্যপায়ীদের কথা বলা হল, তুমি অবশ্যই এমন একটি জীবের কথা ভাববে যার দেহ লোমে ঢাকা এবং যার বহিঃকর্ণ রয়েছে। ঠিক সেইভাবেই উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যদি আমরা গম গাছ সম্পর্কে বলতে চেষ্টা করি, তবে আমাদের মনে গমগাছের চিত্রই ভেসে উঠবে, ধানগাছের নয়। সুতরাং 'কুকুর', 'বেড়াল', 'স্তন্যপায়ী', 'গম', 'ধান' উদ্ভিদগোষ্ঠী, প্রাণীগোষ্ঠী সবই সহজে বোধগম্য হয় এমন দলসমূহ, যেখানে দলের বৈশিষ্ট্যগুলো জীবদের সম্পর্কে অধ্যয়নে আমাদেরকে সাহায্য করে। এই ধরনের এক একটি দলকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'Taxa' বলে। এখানে আমাদের এটা বুঝতে হবে যে Taxa বিভিন্ন স্তরের দলকে নির্দেশ করতে পারে। সমস্ত উদ্ভিদ মিলে একটা ট্যাক্সা (Taxa) হতে পারে। আবার সমস্ত 'গাছ' মিলেও একটা Taxa হতে পারে। একইভাবে ' প্রাণী', 'স্তন্যপায়ী', 'কুকুর' প্রত্যেকটি দলই এক একটি Taxa। কিন্তু তুমি জান যে কুকুর একটি স্তন্যপায়ী এবং স্তন্যপায়ীরা আবার প্রাণীগোষ্ঠীভুক্ত। সুতরাং 'প্রাণী' 'স্তন্যপায়ী' 'কুকুর' সবাই ভিন্ন ভিন্ন স্তরে এক একটি Taxa কে বোঝায়।

তাই বৈশিষ্ট্যাবলির ওপর ভিত্তি করে সব জীবকেই বিভিন্ন Taxa তে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। শ্রেণি বিন্যাসের এই পদ্ধতিকেই বলে Taxonomy (ট্যাক্সোনমি) বা বিন্যাসবিধি। জীবের বাহ্যিক গঠন এবং অভ্যন্তরীণ গঠন, সেই সঙ্গে কোশের গণ, বিকাশ পদ্ধতি এবং জীবের প্রয়োজনীয় বাস্তুতান্ত্রিক তথ্য, আধুনিক বিন্যাসবিধি অধ্যয়নের ভিত্তি গঠন করে।

কাজেই বিন্যাসবিধি বা Taxonomy-এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো হচ্ছে, জীবের বৈশিষ্ট্যের বিবরণ, সনাক্তকরণ, গোষ্ঠীভুক্তকরণ এবং নামকরণ। Taxonomy বা বিন্যাসবিধি নতুন কোনো বিষয় নয়। মানুষ তাদের নিজস্ব ব্যবহারের সাপেক্ষে, সবসময়ই বিভিন্ন ধরনের বিচিত্র জীব সম্পর্কে অনেক বেশি জানতে আগ্রহী। আদিকালে মানুষকে খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের জন্য বিভিন্ন উৎস খুঁজতে হতো। কাজেই প্রাচীনতম শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিগুলো বিভিন্ন জীবের ব্যবহারিক দিকটির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল।

বহুদিন আগে থেকেই মানুষ যে কেবলমাত্র বিভিন্ন ধরনের সজীব বস্তু এবং এদের বৈচিত্র সম্পর্কে জানতেই আগ্রহী ছিল এমন নয়, এইসব জীবদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে জানতেও তারা আগ্রহী ছিল। জীববিদ্যায় এই বিষয়ক অধ্যয়নের শাখাকে সিস্টেম্যাটিক্স (systematics) বলে। Systematics শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'systema' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হল সজীব বস্তুর সুসংবদ্ধ সজ্জাক্রম। লিনিয়াস তাঁর প্রকাশিত পুস্তকের শিরোনাম ঠিক করেছিলেন 'Systema Naturae'। পরবর্তীকালে সনাক্তকরণ, নামকরণ এবং গোষ্ঠীভুক্তকরণ সিস্টেম্যাটিক্স এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে এর সুযোগ আরও বৃদ্ধি করেছিল। সজীব বস্তুর বিবর্তনগত সম্পর্কগুলোও সিস্টেম্যাটিক্সের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

1.3 ট্যাক্সোনোমিক ক্যাটাগরি (Taxonamic Categories)

শ্রেণিবিন্যাস বা গোষ্ঠীভুক্তকরণ একধাপ বিশিষ্ট কোনো পদ্ধতি নয়, কিন্তু এটি ক্রমপর্যায়ে সজ্জিত কিছু ধাপ সমন্বিত সংগঠন, যেখানে প্রতিটি ধাপ এক একটি স্তর বা ক্যাটাগরিকে নির্দেশ করে। যেহেতু ক্যাটাগরি বা স্তরগুলোই সামগ্রিক শ্রেণিবিন্যাসবিধির কাঠামোর একটি অংশ তাই একে ট্যাক্সোনোমিক ক্যাটাগরি বলে। সব ট্যাক্সোনোমিক ক্যাটাগরি একসাথে ট্যাক্সোনোমিক হায়ারার্কি গঠন করে। প্রত্যেকটি ক্যাটাগরি শ্রেণিবিন্যাসের এক একটি একক, যা প্রকৃতপক্ষে এক একটি স্তরকে উপস্থাপন করে এবং সাধারণভাবে এইরূপ প্রতিটি স্তরকে ট্যাক্সন (Taxon) (বহুবচনে: ট্যাক্সা) বলে।

ট্যাক্সোনোমিক ক্যাটাগরিগুলো এবং হায়ারার্কিকে একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। কীটপতঙ্গ এমন একটি গোষ্ঠীর প্রাণীদের বোঝায়, সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে যাদের তিনজোড়া সন্ধিল উপাঙ্গ রয়েছে। তার মানে কীটপতঙ্গ হল সুস্পষ্টভাবে চেনা যায় এমন প্রাণীগোষ্ঠী যাদের আলাদাভাবে শ্রেণিকরণ করা যায় এবং তাই এদের একটি স্তর হিসাবে গণ্য করা হয়। তুমি কি এমন আরও কোনও জীবগোষ্ঠীর নাম করতে পার? মনে রেখো কোনো গোষ্ঠী একটি ক্যাটাগরিকে উপস্থাপন করে। ক্যাটাগরি আবার আরেকটি স্তরকে নির্দেশ করে। এইরূপ প্রত্যেক স্তর অথবা ট্যাক্সন প্রকৃতপক্ষে শ্রেণিবিন্যাসের এক একটি একক। এই ট্যাক্সোনোমিক ক্যাটাগরিগুলো একেবারে স্বতন্ত্র এমন জীবগোষ্ঠী, যারা শুধুমাত্র জীবদের দৈহিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে গঠিত জীবগোষ্ঠী নয়।

সব জ্ঞাত সজীব বস্তুদের ট্যাক্সোনোমি বিষয়ক অধ্যয়নের ফলেই কিছু সাধারণ ক্যাটাগরির সৃষ্টি হয়েছে। যেমন: রাজ্য, পর্ব বা বিভাগ (উদ্ভিদের জন্য), শ্রেণি, বর্গ, গোত্র, গণ এবং প্রজাতি। উদ্ভিদ রাজ্য এবং প্রাণীরাজ্যের অন্তর্গত সব জীবেরই সর্বনিম্ন ক্যাটাগরিটি হল 'প্রজাতি'। এখন একটি প্রশ্ন তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার যে কীভাবে একটি জীবকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে স্থাপন করা হয়? এক্ষেত্রে মূল

প্রয়োজনীয় বিষয়টি হচ্ছে জীব সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান। এই জ্ঞান একইরকম জীব বা ভিন্ন ভিন্ন জীবের মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য সনাক্ত করতে সাহায্য করে।

1.3.1 প্রজাতি (Species)

বিন্যাসবিধি বিষয়ক অধ্যয়নের সাপেক্ষে মৌলিক সাদৃশ্যযুক্ত বেশ কিছু একক জীবের সমন্বয়ে গঠিত একটি দলকে 'প্রজাতি' বলা হয়। স্বতন্ত্র বহিরাকৃতিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে এক প্রজাতি থেকে খুব কাছাকাছি সম্পর্কযুক্ত অন্য প্রজাতিকে পৃথক করা সম্ভব। চলো আমরা ***Mangifera indica***, ***Solanum tuberosum*** (আলু) এবং ***Panthera leo*** এই তিনটি প্রজাতির জীবকে উদাহরণ হিসাবে বিবেচনা করি। ***indica***, ***tuberosum*** এবং ***leo*** (সিংহ) এই তিনটি নাম তিনটি প্রজাতিগত উপাধিকে উপস্থাপন করছে, যেখানে ***Mangifera***, ***Solanum*** এবং ***Panthera*** হল জীবদের গণগত নাম যেটি আরেকটি উচ্চতর ট্যাক্সন বা ক্যাটাগরিকে নির্দেশ করে। প্রত্যেক গণ এক বা একাধিক প্রজাতি নিয়ে গঠিত। কাজেই প্রতিটি গণে বিভিন্ন জীব অবস্থান করে, কিন্তু তারা বাহ্যিক দিক থেকে একই চেহারার হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় **tigris**, হল ***leo*** ছাড়াও ***Panthera*** এর আরও একটি প্রজাতি এবং ***nigrum*** এবং ***melongena*** এর মতো ***Solanum*** গণ এর আরও প্রজাতিগত নাম রয়েছে। মানুষ '***Homo***' গণের অন্তর্গত '***Sapiens***' প্রজাতিভুক্ত জীব। তাই মানুষের বিজ্ঞানসম্মত নাম '***Homo sapiens***'।

1.3.2 গণ (Genus)

অন্য গণভুক্ত প্রজাতির তুলনায় অধিক সদৃশ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কিছু প্রজাতি নিয়ে একটি 'গণ' গঠিত হয়। আমরা বলতে পারি যে গণ হল কতকগুলো নিকট সম্পর্কযুক্ত প্রজাতির দল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আলু এবং বেগুন দুটো ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত কিন্তু একই গণ ***Solamun*** এর অন্তর্গত। সিংহ (***Panthera leo***), নেকড়ে (***Panthera pardus***) এবং বাঘ (***Panthera tigris***) কতকগুলো সদৃশ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রজাতি এবং এই সবগুলো প্রজাতিই 'গণ' Panthera-এর অন্তর্ভুক্ত। এই ***Panthera*** গণটি বেড়াল-এর গণ Felis থেকে পৃথক হয়।

1.3.3 গোত্র (Family)

গণের পরবর্তী উচ্চ ক্যাটাগরি হল গোত্র। গোত্র কতকগুলো পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত 'গণ' নিয়ে গঠিত, যেখানে জীবদের মধ্যে 'গণ' এবং 'প্রজাতি'র তুলনায় কম সাদৃশ্য রয়েছে। উদ্ভিদ প্রজাতির ক্ষেত্রে এদের অঙ্গজ এবং জননগত উভয় বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে গোত্রের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, উদ্ভিদের মধ্যে ***Solamum***, ***Petunia*** এবং ***Datura*** এই তিনটি গণ একই গোত্র Solanaceae এর অন্তর্ভুক্ত। প্রাণীদের ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে সিংহ, বাঘ, নেকড়ে নিয়ে গঠিত 'গণ' Panthera এবং বেড়ালের 'গণ' Felis এই দুই-ই 'গোত্র' Felidae এর অন্তর্গত। একইভাবে যদি তুমি একটি কুকুর এবং একটি বেড়ালের বৈশিষ্ট্য লক্ষ কর তাহলে এদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্যের পাশাপাশি কিছু বৈসাদৃশ্যও খুঁজে পাবে। কুকুর ও বেড়াল দুটি আলাদা গোত্র যথাক্রমে 'গোত্র' Canidae এবং 'গোত্র' Felidae এর অন্তর্ভুক্ত।

1.3.4 বর্গ (Order)

তুমি দেখেছ যে প্রজাতি, গণ এবং গোত্রের মতো ক্যাটাগরিগুলো কিছু সংখ্যক সদৃশ বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে। সাধারণত বর্গ এবং ট্যাক্সোনমিক ক্যাটাগরিগুলোকে কতকগুলো সম্মিলিত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সনাক্ত করা যায়। 'বর্গ' একটি উচ্চতর ক্যাটাগরি হওয়ায় এটি কতকগুলো 'গোত্র' নিয়ে গঠিত যারা কিছু সংখ্যক সাধারণ বৈশিষ্ট্য বহন করে। কোনো গোত্রের অন্তর্ভুক্ত গণগুলোর তুলনায় বর্গের অন্তর্ভুক্ত গোত্রগুলোর মধ্যেকার সদৃশ বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা অনেক কম। Convolvulaceae এববং Solanaceae এর মতো উদ্ভিদ গোত্রগুলো 'বর্গ' Polymoniales বর্গের অন্তর্ভুক্ত। প্রধানত ফুলের বৈশিষ্ট্যাবলির ভিত্তিতেই ওই গোত্রগুলোকে Polymoniales বর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। Felidae এবং Canidae এর মতো প্রাণী গোত্রগুলো প্রাণীবর্গ Carnivora এর অন্তর্গত।

1.3.5 শ্রেণি (Class)

এই ক্যাটাগরিটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক বর্গ নিয়ে গঠিত। উদারণস্বরূপ Primata বর্গভুক্ত প্রাণী বানর, গরিলা, গিবন এরা সবাই Mammalia শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। আবার এই শ্রেণিতে Carnivora বর্গ-এর প্রাণী বাঘ, বেড়াল এবং কুকুরও রয়েছে। Mammalia শ্রেণির অন্তর্গত আরও কিছু গোত্রও বর্তমান।

রাজ্য (Kingdom)
↑
পর্ব বা বিভাগ (Phylum or Division)
↑
শ্রেণি (Class)
↑
বর্গ (Order)
↑
গোত্র (Family)
↑
গণ (Genus)
↑
প্রজাতি (Species)

চিত্র 1.1 : ট্যাক্সোনোমিক ক্যাটাগরিগুলোর হায়ারার্কিয়েল সজ্জাক্রম

1.3.6 পর্ব (Phylum)

মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ীদের শ্রেণিগুলো একত্রে পরবর্তী উচ্চতর ক্যাটাগরি 'পর্ব' গঠন করে। এই পর্বভুক্তিকরণ প্রাণীদের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, যেমন দেহে নটোকর্ড এবং পৃষ্ঠীয় ফাঁপা স্নায়ুতন্ত্রের উপস্থিতি এদেরকে পর্ব কর্ডাটা এর অন্তর্ভুক্ত করে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কিছু সদৃশ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শ্রেণি মিলে উচ্চতর ক্যাটাগরি 'বিভাগ' গঠিত হয়।

1.3.7 রাজ্য (Kingdom)

প্রাণীদের শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে বিভিন্ন পর্বভুক্ত সব প্রাণীরাই সর্বোচ্চ ক্যাটাগরি 'প্রাণী-রাজ্য' -এর অন্তর্গত। অন্যদিকে 'উদ্ভিদ রাজ্য'টি একেবারে স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন বিভাগের সব উদ্ভিদেরা মিলে এই রাজ্য গঠন করে। তাই আমরা এই দুইটি দলকে 'উদ্ভিদ রাজ্য ও প্রাণী রাজ্য' নামে আখ্যায়িত করি।

চিত্র 1.1 এখানে প্রজাতি থেকে রাজ্য পর্যন্ত শ্রেণিবিন্যাসের সবগুলো ক্যাটাগরিকে উর্ধ্বক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে। এগুলো সবই হল বৃহৎ ক্যাটাগরি। তবে শ্রেণিবিন্যাসবিদ্‌গণ বিভিন্ন ট্যাক্সাগুলোকে আরও সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্থানভুক্তিকরণের জন্য এই হায়ারের্কিতে আরও কিছু সাব ক্যাটাগরিও তৈরি করেছেন।

চিত্র 1.1 এ হায়ারার্কিটি দেখে তুমি এই সজ্জাক্রমের ভিত্তিটি মনে করতে পারছ কি? উদাহরণস্বরূপ, ধরো আমরা যদি প্রজাতি থেকে ক্রমশ রাজ্যের দিকে যাই, তবে সদৃশ বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ক্রমশ নিম্নতর ট্যাক্সাগুলোতে প্রতিটি ট্যাক্সনের অন্তর্গত সদস্যদের মধ্যে অধিকতর সদৃশ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অপরদিকে ক্রমশ উপরের ক্যাটাগরিগুলোতে

একই স্তরের বিভিন্ন ট্যাক্সাগুলোর মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করা অধিকতর কষ্টসাধ্য হয়। তাই শ্রেণিবিন্যাসের সমস্যাগুলো আরও জটিল হয়ে ওঠে।

সারণি 1.1 এ কিছু ট্যাক্সানোমিক ক্যাটাগরি দেখানো হয়েছে, যাদের অন্তর্গত পরিচিত জীবদের মধ্যে রয়েছে মাছি, মানুষ, আম এবং গম।

সারণি 1.1 কিছু জীব ও এদের ট্যাক্সোনোমিক ক্যাটাগরি:

সাধারণ নাম	বিজ্ঞানসম্মত নাম	গণ	গোত্র	বর্গ	শ্রেণি	পর্ব/বিভাগ
মানুষ Man	*Homo sapiens*	*Homo*	Hominidae	Primata	Mammalia	Chordata
গৃহমাছি Housefly	*Musca domestica*	*Musca*	Muscidae	Diptera	Insecta	Arthropoda
আম Mango	*Mangifera indica*	*Mangifera*	Anacardiaceae	Sapindales	Dicotyledonae	Angiospermae
গম Wheat	*Triticum aestivum*	*Triticum*	Poaceae	Poales	Monocotyledonae	Wheat

1.4 বিন্যাসবিধিতে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ (Taxonomical AIDS)

কৃষি, বনপালন, শিল্প এবং সাধারণভাবে আমাদের জৈব সম্পদগুলো, সঙ্গে তাদের বৈচিত্র্যকে জানার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অন্যান্য জীবকুলের বিন্যাসবিধি অধ্যয়ন খুবই প্রয়োজন। এই অধ্যয়নের জন্য জীবের সঠিক শ্রেণিবিন্যাস ও সনাক্তকরণ প্রয়োজন। কোনো জীবের সঠিক সনাক্তকরণ করার ক্ষেত্রে পরীক্ষাগারে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবটির সম্বন্ধে বিশদ অধ্যয়নের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির প্রকৃত নমুনা সংগ্রহ করা প্রয়োজন, যা হবে জীবের বিন্যাসবিধি অধ্যয়নের মূল সূত্র। এগুলো জীব সম্পর্কিত অধ্যয়ন এবং সিস্টেমেটিক্সের প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক উপকরণ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নমুনাটি ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য সংরক্ষণ করা হয়।

জীববিজ্ঞানীরা কোনো জীবের নমুনা ও এ সম্পর্কিত তথ্যাবলি সঞ্চয় ও সংরক্ষণের জন্য কিছু পদ্ধতি ও কৌশল প্রণয়ন করেছেন। এই উপকরণগুলোর ব্যবহার কী, তা যাতে তুমি বুঝতে পার তার জন্য এদের মধ্যে কিছু কিছু উপকরণ এর বর্ণনা করা হচ্ছে।

1.4.1 হার্বেরিয়াম (Herbarium)

হার্বেরিয়াম সিটে সংরক্ষিত শুষ্ক এবং চাপা দেওয়া সংগৃহীত উদ্ভিদ নমুনাগুলোর সংগ্রহশালাই হল হার্বেরিয়াম। এছাড়া এই হার্বেরিয়াম সীটগুলো সর্বজনগ্রাহ্য শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি অনুযায়ী সাজানো থাকে। বিশদ তথ্যসহ সংরক্ষিত হার্বেরিয়াম সীটের নমুনাগুলো ভবিষ্যতের জন্য একটি সংগ্রহশালা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সারণি 1.2 সজ্জিত নমুনাসহ হার্বেরিয়াম

(চিত্র 1.2 দেখ) এই হার্বেরিয়াম সিটে নমুনা সংগ্রহের স্থান এবং তারিখ, নমুনার ইংরেজি নাম, স্থানীয় নাম এবং বৈজ্ঞানিক নাম, গোত্র, সংগ্রহকারীর নাম ইত্যাদি সব তথ্যবহনকারী একটি লেবেলও থাকে। বিন্যাসবিধি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে হার্বেরিয়াম একটি তাৎক্ষণিক সহায়ক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

1.4.2 উদ্ভিদ উদ্যান (Botanical Gardens)

এটি এক বিশেষ ধরনের উদ্যান, যেখানে তথ্যসংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন জীবন্ত গাছপালার সংগ্রহ থাকে। এসব উদ্যানের উদ্ভিদপ্রজাতিগুলোকে সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে লাগানো হয় এবং এখানকার প্রতিটি গাছকে তার বিজ্ঞানসম্মত নাম এবং গোত্র লিখে লেবেল করা হয়। বিখ্যাত উদ্ভিদ উদ্যানগুলোর মধ্যে রয়েছে কিউ (ইংল্যান্ড), ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন (হাওড়া, ভারত) এবং ন্যাশনাল বোটানিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (লক্ষ্ণৌ)।

1.4.3 সংগ্রহশালা (Museum)

জৈব সংগ্রহশালা সাধারণত বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তৈরি করা হয়। সংগ্রহশালায় উদ্ভিদ এবং প্রাণীর সংরক্ষিত নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এই সংগৃহীত নমুনাগুলো তথ্য প্রদানে সাহায্য করে। নমুনাগুলো কোনো পাত্রে বা সংরক্ষক-দ্রবণ সমন্বিত জারে রাখা হয়। কখনো বা উদ্ভিদ এবং প্রাণী নমুনাগুলোকে শুষ্ক নমুনা রূপেও সংগ্রহ করা যেতে পারে। পতঙ্গাদের সংগ্রহ করার পর এদের মেরে পিন করে Insect Box এ রাখা হয়। পাখি এবং স্তন্যপায়ীর মতো বড়ো প্রাণীদের ক্ষেত্রে সাধারণত প্রথমে মৃত প্রাণীর ভেতরের সব কিছু বের করে নিয়ে এর ভেতরে অপচনশীল পদার্থ ঢুকিয়ে সেই প্রাণীর নির্দিষ্ট আকার দিয়ে সেই অবস্থায় তাকে সংরক্ষণ করা হয়। সংগ্রহশালায় কখনও কখনও কিছু প্রাণীর কঙ্কালও সংরক্ষিত থাকে।

1.4.4 প্রাণী উদ্যান (Zoological Park)

জুলজিক্যাল পার্ক হল মনুষ্য পরিচর্যাধীন এমন সংরক্ষিত স্থান যেখানে সংরক্ষিত পরিবেশে বন্যপ্রাণীদের সংরক্ষণ করা হয়। এ ধরনের উদ্যান আমাদেরকে এখানকার সংরক্ষিত প্রাণীদের খাদ্যাভ্যাস এবং আচরণ সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। এ ধরনের পার্কে রাখা প্রাণীদেরকে যতটা সম্ভব তাদের নিজস্ব বাসস্থানের অনুরূপ পরিবেশে রাখার চেষ্টা করা হয়। শিশুরা এ ধরনের পার্ক ঘুরে দেখতে পছন্দ করে। এইরূপ সংরক্ষিত স্থানকে চিড়িয়াখানা বলে।

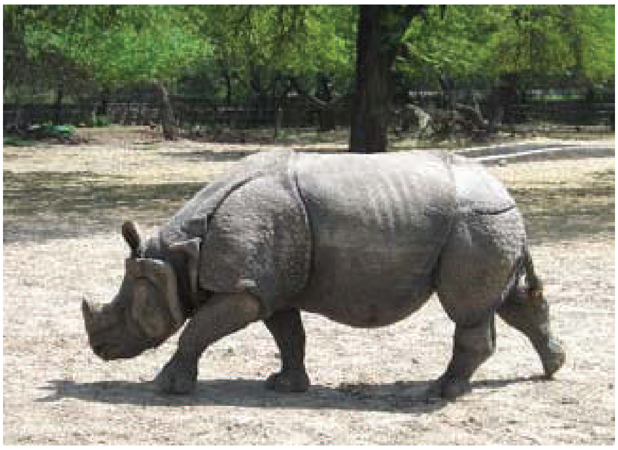

সারণি 1.3 ভারতের বিভিন্ন জুলজিক্যাল পার্কে সংরক্ষিত প্রাণী

1.4.5 বিন্যাসবিধিতে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ (Taxonomic Keys)

বিন্যাসবিধিতে ব্যবহৃত এই ধরনের উপকরণ, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রাণী ও উদ্ভিদদের সনাক্তকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই উপকরণ বা Key গুলো সাধারণত বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যজোড়কে ভিত্তি করে তৈরি করা হয় এবং সেই বিপরীত বৈশিষ্ট্যজোড়গুলোকে বলা হয় কপুলেট (Couplet)। এই কপুলেটগুলো দুটো বিপরীত পছন্দ থেকে একটিকে বাছাই করতে সহায়তা করে। ফলস্বরূপ যে-কোনো একটি বৈশিষ্ট্য গৃহীত হয় এবং অপরটি বর্জিত হয়। Key এর প্রতিটি বিবৃতিকে বলা হয় লিড (lead) গোত্র, গণ, প্রজাতির মতো প্রতিটি ট্যাক্সোনোমিক ক্যাটাগরির সনাক্তকরণের জন্য আলাদা আলাদা Key এর প্রয়োজন হয়।

Key গুলো সাধারণত বিশ্লেষণধর্মী হয়। ফ্লোরা, ম্যানুয়েলস, মনোগ্রাফ এবং ক্যাটালগ— বিভিন্ন নমুনার বিবরণ লিপিবন্ধ করার আরও কতকগুলো উপায়। এগুলো জীবের সঠিক শনাক্তকরণের ক্ষেত্রেও সহায়তা করে। ফ্লোরা বলতে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের সমস্ত উদ্ভিদের প্রকৃত বাসস্থান এবং এদের বিস্তারিত বিবরণকে বোঝায়। এটি ওই নির্দিষ্ট অঞ্চলের উদ্ভিদ প্রজাতিগুলোর একটি তালিকা প্রদানেও সহায়তা করে। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিভিন্ন প্রজাতির নাম এবং শনাক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি যোগানের ক্ষেত্রেও এগুলো অত্যন্ত উপযোগী। ম্যানুয়েলস্ এবং মোনোগ্রাফগুলোতে যে-কোনো একটি ট্যাক্সন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য পাওয়া যায়।

সারসংক্ষেপ (Summary)

জীবজগৎ বহু বিচিত্র ধরনের জীবে সমৃদ্ধ। হাজার হাজার উদ্ভিদ ও প্রাণী শনাক্ত হওয়ার পরেও এখনও বিশাল সংখ্যক জীব অজানা রয়ে গেছে। জীবের আকৃতি, বর্ণ, বাসস্থান, শারীরবৃত্তীয় এবং অঙ্গসংস্থানগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বৃহৎ পরিসরে বিচিত্র জীবকুল আমাদেরকে সজীব বস্তুর সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্যসমূহ অন্বেষণে সাহায্য করে। সজীব বস্তুসমূহের ধরন এবং এদের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অধ্যয়নকে সহজ করতে জীববিজ্ঞানীরা জীবের শনাক্তকরণ, নামকরণ এবং শ্রেণিবন্ধকরণের কিছু নিয়মনীতি প্রণয়ন করেছেন। যে শাখা এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে তাকেই ট্যাক্সোনোমি (Taxonomy) বা বিন্যাসবিধি বলে। বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের বিন্যাসবিধি অধ্যয়ন, কৃষি, বনপালন, শিল্প এবং সাধারণভাবে আমাদের জৈব সম্পদগুলো এবং এদের বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানার জন্য উপযোগী। জীবের শনাক্তকরণ, নামকরণ এবং গোষ্ঠীভুক্তকরণের মতো বিন্যাসবিধির ভিত্তিগুলো সর্বজনস্বীকৃত এবং আন্তর্জাতিক কোডের নিয়ন্ত্রণাধীন। সাদৃশ্য এবং সুস্পষ্ট বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রতিটি জীবের শনাক্তকরণ করা হয় এবং একে সঠিক বিজ্ঞানসম্মত নাম দেওয়া হয়, যে নামটি দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী দুটি পদবিশিষ্ট হয়। একটি জীব শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে একটি স্থান দখল করে বা একটি স্থানকে নির্দেশ করে। এই শ্রেণিবিন্যাস কাঠামোতে বহু ক্যাটাগরি/র‍্যাংক রয়েছে এবং এদের সাধারণত ট্যাক্সোনোমিক ক্যাটাগরি বা ট্যাক্সা বলে। সবগুলো ক্যাটাগরি ট্যাক্সোনোমিক হায়ারার্কি গঠন করে।

জীবের সনাক্তকরণ, নামকরণ ও গোষ্ঠীভুক্তিকরণকে সহজ করতে বিন্যাসবিদগণ বিভিন্ন ধরনের উপকরণ তৈরি করেছেন। হার্বেরিয়াম, সংগ্রহশালা, উদ্ভিদ উদ্যান এবং প্রাণী উদ্যানে সংরক্ষিত নমুনা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সংগৃহীত প্রকৃত নমুনা নিয়ে বিন্যাসবিধি সংক্রান্ত গবেষণা করা হয়। হার্বেরিয়াম এবং সংগ্রহশালায় নমুনা সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের জন্য বিশেষ কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন। অন্যদিকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সজীব নমুনা উদ্ভিদ উদ্যান বা প্রাণী উদ্যানে সংরক্ষিত থাকে। বিন্যাসবিদগণ ম্যানুয়েল এবং মনোগ্রাফের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রস্তুত করেন এবং ট্যাক্সোনোমির আরও বিশদ অধ্যয়নের জন্য তা সম্প্রচার করেন। ট্যাক্সোনোমিক Key হল সেইসব উপকরণ বা উপাদান যা কোনো জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তার শনাক্তকরণে সাহায্য করে।

অনুশীলনী (Exercise)

1. সজীব বস্তুদের শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজন কেন?
2. সময় সময় শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির পরিবর্তন হয় কেন?
3. তোমার সঙ্গে প্রায়ই সাক্ষাৎ হয় এমন মানুষদের শ্রেণিবিন্যাস করতে গিয়ে বিভিন্ন মানদণ্ড হিসাবে তুমি কী কী বেছে নেবে?
4. কোনো একক জীব বা জীবগোষ্ঠীকে শনাক্তকরণের মাধ্যমে আমরা কী জানতে পারি?
5. নীচে আমের বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া আছে। সঠিকভাবে লেখা নামটি শনাক্ত করো:
   Mangifera Indica
   Mangifera indica
6. 'ট্যাক্সন' এর সংজ্ঞা লিখো। হায়ারার্কির বিভিন্ন স্তরে উপস্থিত, কিছু ট্যাক্সা-এর কয়েকটি উদাহরণ দাও।
7. তুমি কি বিন্যাসবিধির সঠিক সজ্জাক্রমটি শনাক্ত করতে পারবে?

   ক) প্রজাতি → বর্গ → পর্ব → রাজ্য
   খ) গণ → প্রজাতি → বর্গ → রাজ্য
   গ) প্রজাতি → গণ → বর্গ → পর্ব
8. সাম্প্রতিককালে গৃহীত 'প্রজাতি' শব্দটির সবগুলো অর্থ সংগ্রহ করার চেষ্টা করো। এবার তোমার শিক্ষক মহাশয়ের সাথে একদিকে উন্নত প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এবং অপরদিকে ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে 'প্রজাতি' শব্দটির অর্থ কী হবে তা আলোচনা করো।
9. নীচের পরিভাষাগুলোর সংজ্ঞা লিখো এবং এদের বুঝতে চেষ্টা করো।
   (i) পর্ব (ii) শ্রেণি (iii) গোত্র (iv) বর্গ (v) গণ
10. একটি জীবের শনাক্তকরণ এবং শ্রেণিবিন্যাসকরণের ক্ষেত্রে একটি ট্যাক্সোনোমিক Key কীভাবে সাহায্য করে?
11. একটি উদ্ভিদ ও একটি প্রাণীর উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে ট্যাক্সোনোমিক্যাল হায়ারার্কি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করো।

অধ্যায় 2 (CHAPTER 2)

বায়োলজিক্যাল শ্রেণিবিন্যাস (BIOLOGICAL CLASSIFICATION)

2.1 রাজ্য মনেরা

2.2 রাজ্য প্রোটিস্টা

2.3 রাজ্য ছত্রাক

2.4 উদ্ভিদরাজ্য

2.5 প্রাণী রাজ্য

2.6 ভাইরাস, ভাইরয়েড এবং লাইকেন

সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই সজীব বস্তুদের শ্রেণিবিন্যাসকরণের ক্ষেত্রে বহু প্রচেস্টা নেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞানসম্মত কোনো মানদণ্ড ব্যবহার না করে, খাদ্য, বাসস্থান এবং বস্ত্রের জন্য আমাদের নিজস্ব ব্যবহারের প্রয়োজনে, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি থেকে জীবের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছিল। অ্যারিস্টটল-ই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী যিনি অধিকতর বৈজ্ঞানিক উপায়ে শ্রেণিবিন্যাসকরণের প্রচেস্টা নিয়েছিলেন। তিনি সরল অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যাবলি ব্যবহার করে উদ্ভিদকে বৃক্ষ, গুল্ম এবং বীরুৎ-এ বিভক্ত করেছিলেন। তিনি প্রাণীদেরকেও দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ করেছিলেন- একদল হল লাল- রক্ত বিশিষ্ট জীব, আর অন্যদল হল যারা লাল- রক্ত বিশিষ্ট জীব নয়।

লিনিয়াসের সময় উদ্ভিদ রাজ্য এবং প্রাণীরাজ্য সমন্বিত একটি দুই- রাজ্য শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি গঠিত হয়েছিল যেগুলোতে যথাক্রমে সব উদ্ভিদ এবং সব প্রাণীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্তও এই পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হত। এই পদ্ধতি ইউক্যারিওটিক ও প্রোক্যারিওটিক, এককোশী ও বহুকোশী এবং সালোকসংশ্লেষে সক্ষম (সবুজ শৈবাল) ও সালোকসংশ্লেষে অক্ষম (ছত্রাক) জীবদেরকে পৃথক করতে সমর্থ ছিল না। জীবদেরকে উদ্ভিদ এবং প্রাণী এই দুটি ক্যাটাগরিতে শ্রেণিভুক্তকরণ এবং তা বোঝার পক্ষেও সহজ ছিল, কিন্তু একটি বিশাল সংখ্যক জীবগোষ্ঠীকে এদের কোনো ক্যাটাগরিতেই অন্তর্ভুক্ত করা যাচ্ছিল না। তাই বহুদিন ধরে ব্যবহৃত দুই -রাজ্য শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিটি যথার্থ ছিল না। স্থূল অঙ্গ সংস্থানিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরও কিছু চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেমন জীবের কোশের গঠন, কোশপ্রাচীরের প্রকৃতি, পুষ্টি পদ্ধতি, বাসস্থান, জনন পদ্ধতি, বিবর্তনগত সম্পর্ক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলোকে অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়েছিল। কাজেই সময়ের সাথে সাথে শ্রেণিবিন্যাস ও প্রাণী রাজ্যের জীবদের বিভিন্ন সব তন্ত্রই অপরিবর্তনীয় তথাপি এই রাজ্যগুলোর অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠী বা সজীববস্তুর সম্পর্কে ধারণা নিয়ত পরিবর্তনশীল। বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে আরও অন্য রাজ্যের সংখ্যা এবং প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

সারণি 2.1 : পঞ্চরাজ্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	পঞ্চরাজ্য				
	মনেরা	**প্রোটিস্টা**	**ছত্রাক**	**উদ্ভিদরাজ্য**	**প্রাণীরাজ্য**
কোশের প্রকৃতি	প্রোক্যারিওটিক	ইউক্যারিওটিক	ইউক্যারিওটিক	ইউক্যারিওটিক	ইউক্যারিওটিক
কোশ প্রাচীর	উপস্থিত, সেলুলোজ বিহীন (পলিস্যাকারাইড + অ্যামাইনো অ্যাসিড	কিছু জীবে উপস্থিত	উপস্থিত (সেলুলোজ বিহীন)	উপস্থিত (সেলুলোজ বিশিষ্ট)	অনুপস্থিত
নিউক্লীয় পর্দা	অনুপস্থিত	উপস্থিত	উপস্থিত	উপস্থিত	উপস্থিত
দেহ সংগঠন	কোশীয়	কোশীয়	বহু কোশীয়/ শিথিল কলা	কলা/অঙ্গ	কলা/অঙ্গ/ অঙ্গাতন্ত্র
পুষ্টি পদ্ধতি	স্বভোজী (রাসায়নিক সংশ্লেষকারী এবং সালোক সংশ্লেষকারী) এবং পরভোজী (মৃতজীবী/পরজীবী)	স্বভোজী (সালোক সংশ্লেষকারী) এবং পরভোজী	পরভোজী (মৃতজীবী/ পরজীবী)	স্বভোজী (সালোকসংশ্লেষকারী	পরভোজী (হলোজোয়িক/ মৃতজীবী ইত্যাদি)

R.H. Whittaker (1969) একটি **পাঁচরাজ্য বিশিষ্ট শ্রেণিবিন্যাস** পদ্ধতির প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর প্রস্তাবিত শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে রাজ্যগুলো ছিল **মনেরা, প্রোটিস্টা , ছত্রাক, উদ্ভিদ রাজ্য ও প্রাণী রাজ্য**। যে প্রধান মানদণ্ডগুলো তিনি শ্রেনিবিন্যাসের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন, সেগুলো হল- জীবের কোশের গঠন, থ্যালাস-এর সংগঠন, পুষ্টি এবং জনন পদ্ধতি এবং বিবর্তন জনিত সম্পর্ক। সারণি 2.1 এ পাঁচটি রাজ্যের অন্তগর্ত জীবদের বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমূহের তুলনামূলক তথ্যাবলি দেওয়া আছে।

শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত বিষয় এবং যে চিন্তাভাবনা শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছিল তা বোঝার জন্য চল আমরা এই পাঁচ-রাজ্য শ্রেণিবিন্যাসের দিকে তাকাই । অতীতের শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিগুলোতে ব্যাকটিরিয়া নীলাভ সবুজ শৈবাল, ছত্রাক ,মস্, ফার্ন, ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদ, এ সবই উদ্ভিদ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল । যে একটি বৈশিষ্ট্য এতগুলো সজীববস্তুকে একই রাজ্য অর্থাৎ উদ্ভিদ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিল তা হল এই সব জীবের কোশেই কোশপ্রাচীরের উপস্থিতি । অন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই একটি বৈশিষ্ট্যই ভিন্ন ভিন্ন জীবগোষ্ঠীকে একত্রিত করেছে। এটি প্রোক্যারিওটিক ব্যাকটিরিয়া, নীলাভ সবুজ শৈবাল এবং পূর্বে ইউক্যারিওটিক ছিল এমন জীবগোষ্ঠীদের ও একত্রীভূত করেছে। এটি আবার এককোশী জীবদেরকে কোনো বহুকোশী জীবের সাথে গোষ্ঠীবদ্ধ করেছে। যেমন উদাহরণস্বরূপ ক্ল্যামাইডোমোনাস এবং স্পাইরোগাইরা উভয়ই শৈবাল গোষ্ঠীভুক্ত। শেণিবিন্যাস পদ্ধতি পরভোজী ছত্রাক গোষ্ঠীকে স্বভোজী সবুজ উদ্ভিদ থেকে আলাদা করতে পারে না। যদিও এদের কোশপ্রাচীর ভিন্ন উপাদান বিশিষ্টি। ছত্রাকের কোশপ্রাচীর কাইটিন নির্মিত এবং সবুজ উদ্ভিদ-এর কোশপ্রাচীর সেলুলোজ নির্মিত।

যখনই এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিবেচনা করা হয়েছিল, তখনই ছত্রাকগুলোকে একটি পৃথক রাজ্য, রাজ্য-ছত্রাকের (kingdom Fungi) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সব প্রোক্যারিওটিক জীবদের রাজ্য মনেরায় অন্ত র্ভু ক্ত করা হল এবং সব এককোশী ইউক্যারিওটিক জীবদেরকে রাজ্য প্রোটিস্টার অর্ন্তভুক্ত করা হল। ক্ল্যামাইডোমোনাস, ক্লোরেল্লা (পূর্বে উদ্ভিদরাজ্যের অর্ন্তভুক্ত শৈবাল গোষ্ঠীভুক্ত ছিল এবং উভয়ই কোশপ্রাচীর বিশিষ্ট) এবং সে সাথে প্যারামেসিয়াম এবং অ্যামিবা (এরা পূর্বে প্রাণীর রাজ্যভুক্ত ছিল এবং এরা উভয়ই কোশপ্রাচীরবিহীন) একসাথে প্রোটিস্টা রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। এই শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি সেইসব জীবদের একটি গোষ্ঠীভুক্ত করেছিল যারা পূর্বের শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যভুক্ত ছিল। শ্রেণিবিন্যাসের জন্য ব্যবহৃত মানদণ্ডের পরিবর্তনের কারনেই এইরূপ ঘটেছিল। জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের বোধগম্যতার উন্নতি সাধন এবং বিবর্তনজনিত সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে এ ধরনের পরিবর্তন ভবিষ্যতেও ঘটতে পারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি সৃষ্টির পদক্ষেপ নেওয়া হল, যেটি শুধুমাত্র অঙ্গসংস্থানিক, শারীরবৃত্তীয় ও জননগত সাদৃশ্য এবং সেই সঙ্গে জাতিজনিগত (Phylogenetic) অর্থাৎ এটি বিবর্তনজনিত সম্পর্কের উপরও নির্ভর করে।

এই অধ্যায়ে আমরা Whittaker প্রবর্তিত শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির অন্তর্গত রাজ্য ছত্রাক-এর অন্তর্ভুক্ত জীবদের বৈশিষ্ট্যবলি সম্পর্কে জানবো। রাজ্য Plantae এবং Animalia যারা সাধারণভাবে উদ্ভিদ-রাজ্য এবং প্রাণীরাজ্য হিসাবে পরিচিত, তাদের সম্পর্কে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে।

2.1 রাজ্য- মনেরা (KINGDOM MONERA)

ব্যাকটিরিয়া হল রাজ্য মনেরার একমাত্র সদস্য। অণুজীবদের মধ্যে ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি এবং প্রায় সর্বত্রই এদের পাওয়া যায়। একমুঠো মাটিতে হাজার হাজার ব্যাকটিরিয়া বর্তমান। উষ্ণ প্রস্রবণ, মরুভূমি, বরফাচ্ছাদিত অঞ্চল, এবং সুগভীর সমুদ্রের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশ, যেখানে খুব কম সংখ্যক জীবই টিকে থাকতে পারে, ব্যাকটিরিয়া সেখানেও স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে পারে। এদের মধ্যে অনেকেই অন্য জীবদেহের বাইরে বা ভেতরে পরজীবী রূপে অবস্থান করে।

আকৃতির উপর ভিত্তি করে ব্যাকটিরিয়াদের চারটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায়— গোলাকৃতি কক্কাস (বহুবচন: কক্কাই), দণ্ডাকৃতি ব্যাসিলাস (বহুবচন: ব্যাসিলাই), কমাকৃতি ভিব্রিয়াম (বহুবচন: ভিব্রিও)

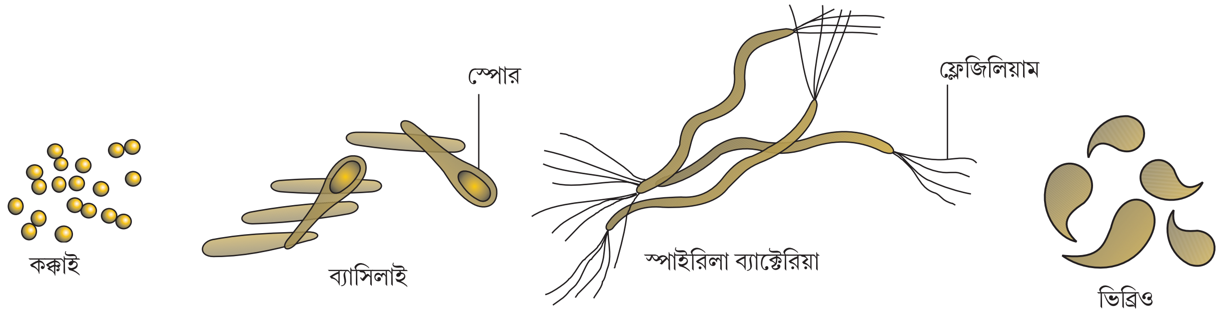

চিত্র 2.1 বিভিন্ন আকৃতির ব্যাক্টেরিয়া।

এবং সর্পিলাকৃতির স্পাইরিলাম (বহুবচন: স্পাইরিলা) (চিত্র 2.1 দেখ)।

যদিও ব্যাকটিরিয়ার গঠন খুবই সরল। কিন্তু এদের আচরণ অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির হয়। অন্য বহু জীবদের তুলনায় ব্যাকটিরিয়া গোষ্ঠীতে বিপাকীয় ক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। কিছু ব্যাকটিরিয়া স্বভোজী অর্থাৎ এরা বিভিন্ন অজৈব বস্তু থেকে নিজের খাদ্য নিজে সংশ্লেষ করতে পারে। এরা সালোক সংশ্লেষকারী স্বভোজী অথবা রাসায়নিক সংশ্লেষকারী স্বভোজী হতে পারে। তবে বেশির ভাগ ব্যাকটিরিয়াই পরভোজী অর্থাৎ এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা সংশ্লেষ করতে পারে না, এবং খাদ্যের জন্য এরা অন্য জীব অথবা মৃত জৈব পদার্থের উপর নির্ভরশীল।

2.1.1 আর্কিব্যাকটিরিয়া (Archaebacteria)

এই ব্যাকটিরিয়াদের বিশেষ ধরনের জীব বলা হয়। কারণ এরা অত্যন্ত লবণাক্ত অঞ্চল, উষ্ণপ্রস্রবণ এবং তৃণজাতীয় উদ্ভিদ সমৃদ্ধ জলাভূমির মতো অত্যন্ত প্রতিকূল কিছু পরিবেশেও বেঁচে থাকতে পারে। আর্কিব্যাকটিরিয়া-র Archaebacteria কোশপ্রাচীরের গঠন অন্য ব্যাকটিরিয়া থেকে পৃথক হয় এবং এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই এরা অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে। মিথানোজেনিক ব্যাকটিরিয়াগুলো গোরু, মহিষের মতো বহু রোমন্থক প্রাণীদের অন্ত্রে বাস করে এবং এরা ওই রোমন্থক প্রাণীদের মল থেকে মিথেন (বায়োগ্যাস) উৎপাদনে সাহায্য করে।

2.1.2 ইউব্যাকটিরিয়া (Eubacteria)

হাজার হাজার ধরনের Eubacteria বা প্রকৃত ব্যাকটিরিয়া পরিবেশে বর্তমান। এদের একটি বৈশিষ্ট্য হল কোশে সুদৃঢ় কোশ প্রাচীরের উপস্থিতি। এছাড়া সচল ব্যাকটিরিয়াতে ফ্ল্যাজেলাও দেখা যায়। সায়োনাব্যাকটিরিয়ার দেহে (এদের নীলাভ সবুজ শৈবাল ও বলা হয়) সবুজ উদ্ভিদের মতো ক্লোরোফিল বা রঞ্জক থাকে এবং এরা সালোকসংশ্লেষকারী স্বভোজী হয় (চিত্র 2.2)। সায়ানোব্যাকটিরিয়া এককোশী, সূত্রাকার, অথবা কলোনী গঠনকারী, মিষ্টি জলে/সমুদ্রে বসবাসকারী, অথবা স্থলজ শৈবাল। কলোনীগুলো সাধারণত জিলাটিন জাতীয় আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে। দূষিত জলাশয়ে এরা প্রায়শই দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়ে ব্লুম গঠন করে। এদের মধ্যে কিছু জীব তাদের এক ধরনের বিশেষিত কোশে পরিবেশের মুক্ত নাইট্রোজেনকে সংবন্ধন করতে পারে। এই কোশগুলোকে বলা হয় হেটোরোসিস্ট (Heterocyst)। যেমন নস্টক ***(Nostoc)*** এবং অ্যানাবেনাতে ***(Anabaena)*** এই ধরনের হেটোরোসিস্ট (Heterocyst) দেখা যায়। রাসায়নিক সংশ্লেষকারী স্বভোজী (Chemosynthetic Autotrophs) ব্যাকটিরিয়া নাইট্রেট, নাইট্রাইট এবং অ্যামোনিয়ার মত বিভিন্ন অজৈব বস্তুর জারণ ঘটায় এবং এর ফলে উৎপন্ন শক্তিকে এরা দেহে ATP উৎপাদনে ব্যবহার করে। এরা নাইট্রোজেন, ফসফরাস, আয়রন এবং সালফার এর মত পরিপোষকগলোর পুনরাবর্তনে বিশাল ভূমিকা গ্রহণ করে।

প্রকৃতিতে পরভোজী ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। এদের মধ্যে বেশিরভাগই গুরুত্বপূর্ণ বিয়োজক অণুজীব এবং অনেকেরই মানুষের জীবনের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। দুধ থেকে দই তৈরি, অ্যান্টিবায়োটিক

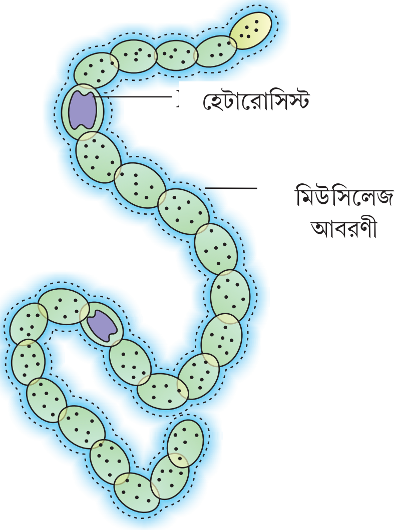

চিত্র 2.2 একটি ফিলামেন্টযুক্ত নীলাভ সবুজ শৈবাল নস্টক

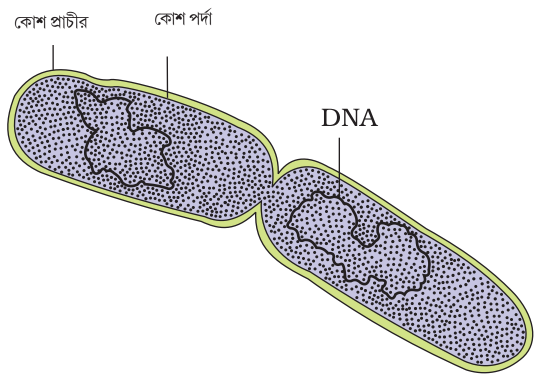

চিত্র 2.3: একটি বিভাজনরত ব্যাকটিরিয়া

উৎপাদন, সিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদের মূলে নাইট্রোজেন সংবন্ধন ইত্যাদি কাজে এরা সাহায্য করে। এদের মধ্যে কিছু হলো রোগসৃষ্টিকারী অণুজীব বা প্যাথোজেন। এরা বিভিন্নভাবে মানুষ, ফসল, খামারে প্রতিপালিত প্রাণী এবং পোষা প্রাণীর ক্ষতি সাধন করে। বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়া সৃষ্ট কয়েকটি সুপরিচিত রোগ হল — কলেরা, টাইফয়েড, টিটেনাস, লেবুর ক্যাঙ্কার রোগ।

ব্যাকটিরিয়া প্রধানত ফিসন বা বিভাজন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করে (চিত্র 2.3)। কখনো কখনো প্রতিকূল অবস্থায় এরা রেণু উৎপাদন করে। এদের মধ্যে যৌনজননও পরিলক্ষিত হয়। একটি ব্যাকটিরিয়াম থেকে আরেকটি ব্যাকটিরিয়ামে অত্যন্ত সরল ভাবে DNA স্থানান্তরণের মাধ্যমে যৌনজনন সংঘটিত হয়।

মাইকোপ্লাজমা (Mycoplasma) সম্পূর্ণরূপে কোশপ্রাচীরবিহীন হয়। যতদূর জানা গেছে, এরাই ক্ষুদ্রতম জীবিত কোশ এবং এরা অক্সিজেন ছাড়াই বেঁচে থাকতে পারে। বহু মাইকোপ্লাজমা প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে রোগ সৃষ্টি করে।

2.2. রাজ্য-প্রোটিস্টা (Kingdom- Protista)

সমস্ত এককোশী ইউক্যারিওটিক জীবদের এই রাজ্যভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এ রাজ্যের সঠিক সীমারেখা সুস্পষ্ট নয়। একজন জীব বিজ্ঞানীর মতে যেটি একটি সালোকসংশ্লেষকারী প্রোটিস্ট, অন্য জীব বিজ্ঞানীর মতে সেটি একটি উদ্ভিদও হতে পারে। এই পুস্তকে ক্রাইসোফাইটস (Chrysophytes), ডাইনোফ্ল্যাজেলেটস (Dinoflagellates), ইউগ্লিনয়েডস (Euglenoids), স্লাইমমোল্ড (Slime mould) এবং আদ্যপ্রাণী (Protozoans) এদের সবাইকে রাজ্য প্রোটিস্টার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রোটিস্টা রাজ্যের সদস্যরা প্রাথমিকভাবে জলজ জীব। এই রাজ্যটি অন্য রাজ্য যেগুলো উদ্ভিদ, প্রাণী এবং ছত্রাক নিয়ে চর্চা করছে তাদের সাথে একটি যোগসূত্র স্থাপন করেছে। ইউক্যারিওটিক হওয়ায় প্রোটিস্টা রাজ্যভুক্ত জীব কোশে সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস এবং পর্দাবৃত অঙ্গানুগুলো পরিলক্ষিত হয়। এদের কারো কারো সিলিয়া অথবা ফ্ল্যাজেলা রয়েছে। প্রোটিস্টা রাজ্যভুক্ত জীবরা কোশের সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে অযৌন জনন, এবং জাইগোট সৃষ্টির মাধ্যমে যৌন জনন করে।

2.2.1 ক্রাইসোফাইটস (Chrysophytes)

ডায়াটম এবং সোনালি শৈবাল এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদেরকে যেমন মিষ্টিজলে দেখা যায় আবার লবণাক্ত পরিবেশেও এদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এরা আনুবীক্ষণিক এবং জলের স্রোতে নিষ্ক্রিয়ভাবে ভাসমান শৈবাল— যাদের বলা হয় প্ল্যাঙ্কটন (plankton)। এদের বেশির ভাগই সালোকসংশ্লেষে সক্ষম। ডায়াটমের কোশপ্রাচীর এমন দুটি পাতলা অধিক্রমণ-যোগ্য খোলক দ্বারা গঠিত হয় যারা সাবানের বাক্সের মতো একটি অপরটির খাপে আটকে থাকে। এই কোশ প্রাচীরে সিলিকার আস্তরণ থাকায় এই প্রাচীরগুলো ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। তাই ডায়াটমের বাসস্থানে প্রচুর পরিমাণে কোশপ্রাচীরের স্তূপ দেখা যায়। কোটি কোটি বছর এই ডায়াটমীয় কোশপ্রাচীরগুলো জমা হয়ে ডায়াটমীয় মৃত্তিকা (Diatomaceous earth) গঠন করে। এই মৃত্তিকা দানাদার হওয়ায়, এটি পালিশ করার কাজে, তেল এবং সিরাপ পরিস্রাবণের কাজে ব্যবহার করা হয়। ডায়াটমদের সমুদ্রের মুখ্য উৎপাদক রূপে গণ্য করা হয়।

2.2.2 ডাইনোফ্ল্যাজেলেটস (Dinoflagellates)

এই জীবরা বেশির ভাগই সামুদ্রিক এবং সালোকসংশ্লেষকারী। তাদের দেহে উপস্থিত প্রধান রঞ্জকের উপস্থিতির কারণেই এদের হলুদ, সবুজ, বাদামি, নীল অথবা লাল বিভিন্ন রঙের দেখায়। এদের কোশ প্রাচীরের বহিঃপৃষ্ঠে সেলুলোজ নির্মিত শক্ত প্লেট রয়েছে। এদের বেশির ভাগের দেহেই দুটো করে ফ্ল্যাজেলা রয়েছে। একটি লম্বালম্বিভাবে এবং অপরটি আড়াআড়িভাবে প্রাচীরের প্লেটগুলোর মধ্যকার খাঁজে বর্তমান। প্রায়শই, লাল ডাইনো ফ্ল্যাজেলেট ***(Gonyaulax)*** এত দ্রুত হারে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে, যার ফলস্বরূপ সমুদ্রের উপরিতল পুরোপুরি লাল দেখায় (Red tides)। এই গোষ্ঠীভুক্ত বিশাল সংখ্যক জীব নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী যেমন মৎস্যকুলকে মেরে ফেলতে পারে।

2.2.3. ইউগ্লিনয়েড্স (Euglenoids)

এরা বেশির ভাগই স্বাদু জলের বাসিন্দা এবং এদেরকে বদ্ধ বা জমাজলে দেখা যায়। কোশ প্রাচীরের পরিবর্তে এদের ক্ষেত্রে একটি প্রোটিন সমৃদ্ধ স্তর দেখা যায় একে পেলিকল বলে। পেলিকলের উপস্থিতির জন্যই এদের দেহ নমনীয় হয়। এদের দুটো ফ্ল্যাজেলা রয়েছে-একটি ছোটো এবং অন্যটি লম্বা। যদিও সূর্যালোকের উপস্থিতিতে এরা সালোকসংশ্লেষে সক্ষম, তথাপি সূর্যালোকের অভাবে এরা পরভোজীর মতো আচরণ করে । তখন এরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব শিকার করে পুষ্টি সাধন করে । মজার বিষয় হল এই যে ইউগ্লিনয়েডদের দেহে উপস্থিত রঞ্জক পদার্থগুলো উন্নত উদ্ভিদের দেহে উপস্থিত রঞ্জক গুলোর মতোই হয়। উদাহরণ ইউগ্লিনা (চিত্র- 2.4(ক)

2.2.4. স্লাইম মোল্ড (Slime Moulds)

স্লাইম মোল্ড হল মৃতজীবী প্রোটিস্ট। এরা পচনশীল উদ্ভিদ কাণ্ড এবং পাতার মধ্য দিয়ে চলার সময় ওইসব পচনশীল বস্তু থেকে জৈব পদার্থ সংগ্রহ করে । অনুকূল পরিবেশে এরা দলবদ্ধ হয়ে প্লাজমোডিয়াম নামক বিশেষ গঠন তৈরি করে যা বৃদ্ধি পায় এবং কয়েক ফুট জায়গা জুড়ে বিস্তার লাভ করে । প্রতিকূল পরিবেশে ওই প্লাজমোডিয়াম বিভেদিত হয় এবং এদের শীর্ষভাগে রেণু বহন করে। এই রেণুগুলো প্রকৃত কোশপ্রাচীর যুক্ত । এই অবস্থায় রেণুগুলো খুবই প্রতিরোধক্ষম হয় এবং বহু বছর ধরে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশেও বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়। রেণুগুলো উপযুক্ত পরিবেশে বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

2.2.5 প্রোটোজোয়ানস (protozoans)

সব প্রোটোজোয়ানরা পরভোজী হয় এবং এরা শিকারজীবী বা পরজীবী রূপে বেঁচে থাকে। এদেরকে প্রাণীকুলের আদি পূর্বপুরুষরূপে গণ্য করা হয়। প্রোটোজোয়ানদেরকে চারটি প্রধান গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়-

অ্যামিবয়েড প্রোটোজোয়া (Amoeboid protozoans)

এরা মিষ্টিজল , সমুদ্র অথবা স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে বসবাস করে। খাদ্য সংগ্রহ এবং চলাফেরা করতে এরা ক্ষণপদ বা pseudopodia এর সাহায্য নেয়। যে ক্ষণপদের

(ক)

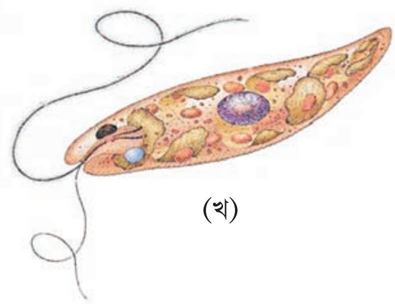

(খ)

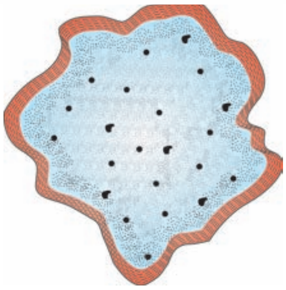

(গ)

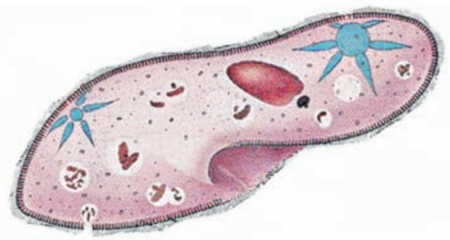

(ঘ)

চিত্র ***2.4*** *(ক) ডাইনোফ্লাজেলেটস*
(খ) ইউগ্লিনা
(গ) স্লাইম মোল্ড
(খ) প্যারামেসিয়াম

উপস্থিতি অ্যামিবাতে লক্ষ করা যায় । সামুদ্রিক প্রোটোজোয়াদের দেহের বহিঃপৃষ্ঠে সিলিকার খোলস রয়েছে। এছাড়া এদের কেউ কেউ আবার পরজীবী (যেমন এন্টামিবা)। ফ্ল্যাজেলা বিশিষ্ট প্রোটোজোয়া (Flagellaled protozoa)এই গোষ্ঠীভুক্ত জীবরা স্বাধীনজীবী বা পরজীবী হয়। এদের দেহে ফ্ল্যাজেলা বর্তমান। এই গোষ্ঠীভুক্ত পরজীবী জীবরা 'ঘুম রোগ' (sleeping sickness) এর মতো রোগ সৃষ্টি করে। উদাহরণ-ট্রাইপ্যানোসোমা (***Trypansoma***)।

সিলিয়াযুক্ত প্রোটোজোয়া (ciliated protozoa) এরা জলজ, এবং দেহে হাজার হাজার সিলিয়ার উপস্থিতির কারণে এরা সক্রিয়ভাবে সঞ্চরণশীল। তাদের দেহে একটি নালী বা gullet বর্তমান, যা কোশীয় তলের বাইরে উন্মুক্ত থাকে। সারি সারি সিলিয়ার সমন্বিত চলনের ফলে জল সহ খাদ্যনালী বা gullet- এ প্রবেশ করে অর্থাৎ সিলিয়ার চলনের ফলেই এরা জল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। উদাহরণ- প্যারামোসিয়াম (চিত্র-2.41)

স্পোরোজোয়ান্স (sporozoans)-

এই গোষ্ঠী এমন কিছু বৈচিত্রপূর্ণ জীবের সমন্বয়ে গঠিত হয়, যাদের জীবনচক্রের কোনো এক পর্যায়ে সংক্রামক রেণু সদৃশ দশা দেখা যায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জীবটি হল ***Plasmodium*** (ম্যালেরিয়া পরজীবী) এবং যেটি ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে, যার কারণে মনুষ্যকুল হতভম্ব হয়ে পড়ে।

2.3 ছত্রাক-রাজ্য (Kingdom Fungi)

ছত্রাক রাজ্যটি পরজীবী জীবদের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বতন্ত্র রাজ্য। এদের বহিরাকৃতি এবং এদের বাসস্থানের ক্ষেত্রে বিশাল বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় । তোমার পাউরুটিতে যখন ছাতা জন্মায় অথবা তোমার কমলালেবুটি যখন পচে যায়, তখন এটি ছত্রাকের কারণেই ঘটে। আমাদের খাদ্যপোযোগী মাশরুম এবং পরিচিত বিষাক্ত মাশরুমগুলোও ছত্রাক। সরিষা পাতার উপর যে সাদা ছোপ জন্মায় তার কারণও পরজীবী ছত্রাকের সংক্রমণ, ইস্টের মতো কিছু এককোশী ছত্রাক রুটি এবং মদ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য কিছু ছত্রাক উদ্ভিদ এবং প্রাণীদেহে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে, গমের মরিচা রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক পাকসিনিয়া-এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার কিছু ছত্রাক অ্যান্টিবায়োটিক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, যেমন পেনিসিলিয়াম নামক ছত্রাক। ছত্রাকদের বিস্তৃতি সর্বত্র। জল, বায়ু ,মাটি, উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহ সর্বত্র এদের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এরা উষ্ণ এবং আর্দ্রস্থানে বেড়ে উঠতে পছন্দ করে। তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে, যদি ভাব কেন আমরা খাবার রেফ্রিজারেটরে রাখি। হ্যাঁ, এটিতে রাখা হয় খাবারকে ছত্রাক এবং ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য ।

এককোশী ছত্রাক ইস্ট ব্যতীত অন্য সব ছত্রাক সূত্রাকার গঠন বিশিষ্ট হয়। এদের দেহ দীর্ঘ, সরু সুতার মতো অনুসূত্র দ্বারা গঠিত। এদের হাইফি বলে। অনেকগুলো হাইফির জালকে মাইসিলিয়াম বলে। এক্ষেত্রে কিছু হাইফি বহুনিউক্লিয়াস সমন্বিত, সাইটোপ্লাজম পরিপূর্ণ, প্রস্থপ্রাকারহীন নালীকা, যাদের সিনোসাইটিক হাইফি বলে। অপর ক্ষেত্রে কিছু ছত্রাকের হাইফিতে প্রস্থপ্রাকার দেখা যায়। ছত্রাকের কোশপ্রাচীর, কাইটিন ও পলিস্যাকারাইড নির্মিত।

বেশির ভাগ ছত্রাক পরভোজী এবং মৃত পচনশীল জৈববস্তু থেকে দ্রবণীয় জৈবপদার্থ শোষণ করে যে কারণে এদের বলা হয় মৃতজীবী ছত্রাক। আর যেসব ছত্রাক জীবিত উদ্ভিদ ও প্রাণীদের উপর খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল, তাদের বলা হয় পরজীবী ছত্রাক। এদের কিছু কিছু মিথোজীবী হিসাবেও বসবাস করে। কিছু ছত্রাক শৈবালের সঙ্গে মিথোজীবী রূপে থেকে লাইকেন গঠন করে। আবার কিছু ছত্রাক উন্নত উদ্ভিদের মূলের সাথে মিথোজীবী মাইকোরাইজা গঠন করে। এরা বিভিন্ন ধরনের রেণু, যেমন— কনিডিয়া বা স্পোরানজিও রেণু বা চলরেণু সৃষ্টির মাধ্যমে অযৌন জনন করে এবং উস্পোর, অ্যাসকোস্পোর ও

ব্যাসিডিওস্পোরের মাধ্যমে যৌন জনন করে। বিভিন্ন ধরনের রেণু যে সুনির্দিষ্ট অঙ্গে উৎপন্ন হয় তাদের ফ্রুটবডি বলে। এদের যৌনজনন চক্র নীচের তিনটি ধাপে ঘটে —

(i) দুইটি সচল বা নিশ্চল গ্যামেটের প্রোটোপ্লাজমের মিলন— এটি প্লাজমোগ্যামী।

(ii) দুইটি গ্যামেটের নিউক্লিয়াসের মিলন— একে ক্যারিওগ্যামী বলে।

(iii) জাইগোটে মিয়োসিস বিভাজনের ফলে হ্যাপ্লয়েড রেণু সৃষ্টি।

যৌন জনন কালে কোনো ছত্রাকের বিপরীত যৌনের দুটি হ্যাপ্লয়েড অনুসূত্র বা হাইফি পরস্পরের কাছাকাছি আসে এবং মিলিত হয়। কিছু কিছু ছত্রাকে দুটি হ্যাপ্লয়েড কোশের মিলনের পরপরই ডিপ্লয়েড কোশ (2n) গঠিত হয়। তবে অন্য কিছু ছত্রাকে (অ্যাসকোমাইসেটিস এবং ব্যাসিডিও মাইসেটিস শ্রেণিভুক্ত ছত্রাকে) একটি অন্তর্বর্তী ডাইক্যারিওটিক দশা (n+n, অর্থাৎ প্রতিটি কোশ দুটি নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট) দেখা যায়। এই অবস্থাকে বলা হয় ডাইক্যারিওন (dikaryon) এবং এই দশাটিকে ছত্রাকের ডাইক্যারিওটিক ফেজ বলে। পরবর্তী সময়, মাতৃ নিউক্লিয়াসদ্বয় মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড কোশ গঠন করে। ছত্রাকের ফলদেহে (Fruiting body) হ্রাস বিভাজন ঘটে এবং এর ফলে হ্যাপ্লয়েড রেণু সৃষ্টি হয়।

মাইসেলিয়ামের অঙ্গসংস্থান, রেণু সৃষ্টি এবং ফলদেহ (fruiting body) গঠন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই ছত্রাক রাজ্যটিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

2.3.1 ফাইকোমাইসেটিস (Phycomycetes)

ফাইকোমাইসেটিস অন্তর্গত ছত্রাকদের জলজ পরিবেশে আদ্র স্যাঁতস্যাতে স্থানে পচনশীল কাঠের উপর অথবা উদ্ভিদদেহে বাধ্যতামূলক পরজীবী হিসেবে বাস করতে দেখা যায়। মাইসেলিয়ামটি প্রস্থ প্রাকারবিহীন এবং বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত বা সিনোসাইটিক প্রকৃতির হয়। এরা জুস্পোর (সচল) বা অ্যাপ্লানোস্পোর (নিশ্চল) সৃষ্টির মাধ্যমে অযৌন জনন করে। এই রেণুগুলো অন্তর্জনিষ্ণু (endogenous) ভাবে রেণুস্থলীর অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়। দুটি গ্যামেটের মিলনের ফলে একটি জাইগোস্পোর সৃষ্টি হয়। এই গ্যামেটগুলো অঙ্গসংস্থানিক ভাবে একই রকম হলে তাদের বলে আইসোগ্যামেট এবং ছত্রাকটিকে আইসোগ্যামাস, এবং গ্যামেটগুলো ভিন্নরকমের হলে এদের অ্যানাইসোগ্যামেট বা ঊগ্যামেট বলে এবং সংশ্লিষ্ট ছত্রাককে অ্যানাইসোগ্যামাস বা ঊগ্যামাস বলে। কিছু পরিচিত উদাহরণ হলো— মিউকর ***(Mucor)*** (চিত্র 2.5 ক), রাইজোপাস ***(Rhizopus)*** রুটিতে জন্মানো ছত্রাক), অ্যালবুগো ***(Albugo***— সরিষা গাছেত্র উপর নির্ভরশীল পরজীবী ছত্রাক)

2.3.2 অ্যাসকোমাইসেটি (Ascomycetes)

এরা সাধারণত ‘স্যাক ফান্‌জাই’ বা ‘থলে ছত্রাক’ নামে পরিচিত। এই শ্রেণির ছত্রাকগুলো বেশিরভাগই বহুকোশী হয়, (উদাহরণ: পেনিসিলিয়াম)। তবে এই শ্রেণির অন্তর্গত এককোশী ছত্রাক খুবই বিরল, উদাহরণ: ইস্ট (Saccharomyces)।

(ক)

(খ)

(গ)

চিত্র 2.5 ছত্রাক : (ক) মিউকর(খ) অ্যাসপারজিলাস (গ) অ্যাগারিকাস

এরা মৃতজীবী, বিয়োজক, পরজীবী অথবা কপ্রোফিলাস (পশুর মলে জন্মানো ছত্রাক)। এদের মাইসেলিয়ামটি শাখান্বিত এবং প্রস্থ প্রাকারবিশিষ্ট হয়। অযৌন রেণুগুলোকে কনিডিয়া বলে এবং এরা কনিডিওফোর নামক বিশেষ মাইসেলিয়ামের উপর বহির্জনিষ্ণুভাবে (Exogenons) সৃষ্টি হয়। কনিডিয়া অঙ্কুরিত হয়ে মাইসেলিয়াম গঠন করে। যৌন রেণুগুলোকে অ্যাসকোস্পোর (Ascospore) বলে এবং এরা অ্যাসকাই (Asci, একবচনে অ্যাসকাস) এর মতো থলির ভেতরে অন্তর্জনিষ্ণু (Endogenous) ভাবে উৎপন্ন হয়। এই অ্যাসকাই (Asci) গুলো বিভিন্ন ভাবে সজ্জিত হয়ে ফলদেহ গঠন করে যাদের (Fruiting body) অ্যাসকোকীর্প (Ascocarp) বলে। এ ধরনের ছত্রাকের কিছু উদাহরণ হল — অ্যাসপারজিলাস ***(Aspergillus)*** চিত্র 2.5 (খ)) ক্ল্যাভিসেপস্ ***(Claviceps)*** এবং নিউরোস্পোরা ***(Neurospora)*** জৈব রাসায়নিক এবং জিনগত পরীক্ষার ক্ষেত্রে নিউরোস্পোরা বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। মোরেল (morel) এবং ট্রাফেল (truffle) এর মতো বেশ কিছু ছত্রাক খাদ্যপোযোগী এবং সুস্বাদু ছত্রাক হিসাবে বিবেচিত হয়।

2.3.3 ব্যাসিডিওমাইসেটিস (Basidiomycetes)

ব্যাসিডিওমাইসেটিস শ্রেণিভুক্ত পরিচিত ছত্রাকগুলো হল মাশরুম, ব্র্যাকেট ছত্রাক বা পাফ্বল। এরা মাটি, কাঠের বড়ো টুকরো বা লগ্, গাছের গুঁড়ি এবং বিভিন্ন সজীব উদ্ভিদ দেহে পরজীবী রূপে বাস করে, উদাহরণ, Rusts (রাস্ট) এবং Smuts (স্মাট)। মাইসেলিয়ামটি শাখান্বিত এবং প্রস্থ প্রাকারবিশিষ্ট হয়। এদের ক্ষেত্রে সাধারণত: অযৌন রেণু অনুপস্থিত থাকে। এরা সচরাচর খণ্ডীভবন পদ্ধতিতে অঙ্গজ জনন সম্পন্ন করে। এদের দেহে জনন অঙ্গ অনুপস্থিত, কিন্তু ভিন্ন ধরনের স্ট্রেইন বা জিনোটাইপ এর দুটি অঙ্গজ বা দেহকোশ মিলিত হয়ে প্লাজমোগ্যামী সম্পন্ন করে। এর ফলে উৎপন্ন ডাইক্যারিওটিক গঠনটি শেষপর্যন্ত ব্যাসিডিয়ামে পরিণত হয়। ব্যাসিডিয়ামে ক্যারিওগ্যামী এবং মিয়োসিস ঘটে এবং এর ফলে চারটি ব্যাসিডিওস্পোর উৎপন্ন হয়। ব্যাসিডিওস্পোর ব্যাসিডিয়ামের উপর বহির্জনিষ্ণু (Exogenous) ভাবে উৎপন্ন হয়। ব্যাসিডিয়ামগুলো ফলদেহে সজ্জিত থাকে এবং এই ফলগুলোকে ব্যাসিডিওকার্প বলে। এই শ্রেণিভুক্ত কিছু পরিচিত ছত্রাক হল ***Agaricus*** (মাশরুম) (চিত্র 2.5 গ), ***Ustilago*** (স্মাট) এবং ***Puccinia*** (রাস্ট ছত্রাক)

2.3.4 ডিউটারোমাইসেটিস (Deuteromycetes)

এই শ্রেণিভুক্ত ছত্রাকেরা সচরাচর জননগতভাবে অসম্পূর্ণ ছত্রাক হিসাবেই পরিচিত। কারণ এদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অযৌন অথবা অঙ্গজ দশার উপস্থিতি জানা যায়। যখন এ ধরনের ছত্রাকে যৌনদশা আবিষ্কৃত হয়, তখন এদেরকে এদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ছত্রাক শ্রেণিতে স্থানান্তরিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে এদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হলে ছত্রাকটির সঠিক শনাক্তকরণ হয় এবং তখন এদেরকে ডিউটারোমাইসেটিস শ্রেণি থেকে সরিয়ে এনে অ্যাস্কোমাইসেটিস বা ব্যাসিডিওমাইসেটিস শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ডিউটারোমাইসেটিসের অর্ন্তভুক্ত ছত্রাকরা কনিডিয়া নামক অযৌন রেণুর সাহায্যে বংশবৃদ্ধি করে। এদের মাইসেলিয়ামটি প্রস্থপ্রাকারবিশিষ্ট এবং শাখান্বিত হয়। এই শ্রেণিভুক্ত কিছু ছত্রাক মৃতজীবী অথবা পরজীবী হয়। কিন্তু এদের বিশাল সংখ্যক ঝরা পাতার বিয়োজন এবং বিভিন্ন খনিজের আবর্তনে সাহায্য করে।

2.4 উদ্ভিদ রাজ্য (Kingdom Plantae)

সব ইউক্যারিওটিক, ক্লোরোফিলযুক্ত জীব যাদের সচরাচর উদ্ভিদ বলা হয় তারা সবাই উদ্ভিদ রাজ্যের (Kingdom Plantae) অন্তর্ভুক্ত। এদের কিছু কিছু আংশিক পরভোজী (যেমন পতঙ্গভুক উদ্ভিদ) অথবা পরজীবী হয়। পাতাঝাঁঝি (Bladderwort) এবং সূর্যশিশির (Venusflytrap) পতঙ্গভুক উদ্ভিদের উদাহরণ এবং স্বর্ণলতা একটি পরজীবী উদ্ভিদ। উদ্ভিদ কোশগুলো সুস্পষ্ট ক্লোরোপ্লাস্ট সহ ইউক্যারিওটিক গঠনবিশিষ্ট হয় এবং এদের কোশপ্রাচীর প্রধানত সেলুলোজ নির্মিত। তোমরা অষ্টম অধ্যায়ে ইউক্যারিওটিক কোশের গঠন সম্পর্কে বিশদভাবে পড়বে। শৈবাল, ব্রায়োফাইটা, টেরিডোফাইটা, ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদ— এরা সবই উদ্ভিদ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্ভিদ এর জীবনচক্রে দুইটি সুস্পষ্ট দশা দেখা যায়। একটি হলো ডিপ্লয়েড রেণুধর (Sporophytic) দশা, অপরটি হলো হ্যাপ্লয়েড লিঙ্গাধর (gametophytic) দশা। উদ্ভিদের জীবনচক্রে পর্যায়ক্রমিক ভাবে এই দুই দশার আবর্তন ঘটে। এই ঘটনাটিকে 'জনুক্রম' (Alternation of generation) বলে। এই হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড দশার বিস্তৃতি এবং এই দশাগুলোর স্বাধীনজীবী অবস্থা অথবা কোনো এক দশার উপর নির্ভরশীলতা বিভিন্ন উদ্ভিদ গোষ্ঠীতে ভিন্ন ভিন্ন হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে তোমরা এই রাজ্য সম্পর্কে আরও বিশদভাবে জানবে।

2.5 প্রাণীরাজ্য (Kingdom Animalia)

এই রাজ্যভুক্ত জীবদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল এই যে এরা পরভোজী, ইউক্যারিওটিক, বহুকোশী জীব এবং এদের কোশে কোশ প্রাচীর অনুপস্থিত। এরা খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। এদের দেহের অভ্যন্তরীণ গহ্বরে খাদ্যের পরিপাক ঘটে এবং গ্লাইকোজেন অথবা স্নেহপদার্থ হিসাবে এরা খাদ্য সঞ্চিত রাখে। এদের ক্ষেত্রে হলোজয়িক পুষ্টি পদ্ধতি দেখা যায় অর্থাৎ খাদ্যগ্রহণ করার মাধ্যমে এরা পুষ্টি সম্পন্ন করে। প্রাণীরা একটি নির্দিষ্ট বৃদ্ধির নক্সা (growth pattern) অনুসরণ করে এবং বৃদ্ধি পেয়ে একটি নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতি সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়। উন্নত প্রাণীদের দেহে বিস্তৃত সংজ্ঞাবহ (Sensory) এবং আজ্ঞাবহ (Neuromotor) কার্য পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। এদের বেশির ভাগ প্রাণীই গমনে সক্ষম।

পুরুষ এবং স্ত্রী দেহের মিলনের মাধ্যমে যৌনজনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং এরপর ভ্রূণের বিকাশ ঘটে। বিভিন্ন পর্বে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

2.6 ভাইরাস, ভিরিয়ড, প্রিয়নস এবং লাইকেন (Viruses, Viroids, Prions and Lichens)

হুইট্টেকার (Whittaker) তাঁর পঞ্চরাজ্য শ্রেণিবিন্যাসের কোথাও কিছু অকোশীয় জীব যেমন ভাইরাস, ভাইরয়েড, প্রিয়নস এবং লাইকেন এর কথা উল্লেখ হয়নি। এখানে এদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হল।

আমরা যারা সাধারণত ঠান্ডা বা ফ্লুতে ভুগেছি আমাদের দেহের উপর ভাইরাসের প্রভাব কীরূপ হতে পারে, সে সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। তথাপি আমরা ভাইরাসকে আমাদের এই শারিরীক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত করি না। ভাইরাসরা প্রকৃত অর্থে কোন সজীব না হওয়ায় শ্রেণিবিন্যাস কাঠামোতে এদের স্থান থাকে না। কারণ, যদি আমরা সজীব বস্তু বলতে কোন কোশীয় গঠনকে বুঝি তবে ভাইরাসকে প্রকৃত সজীব বস্তু বলা যায় না। ভাইরাস এমন ধরনের অকোশীয় বস্তু যাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো এই যে এরা সজীব কোশের বাইরে একটি নিষ্ক্রিয় ক্রিস্টাল বা স্ফটিক দানার মতো গঠন রূপে বিরাজ করে। যে মুহূর্তে ভাইরাস কোনো একটি সজীব কোশে সংক্রমণ ঘটায় তখন পোষক কোশের কোশীয় সংগঠন নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসে এবং নিজের প্রতিলিপি গঠন করে ও সেই সাথে পোষক কোশটিকে মেরে ফেলে। তুমি ভাইরাসকে কী বলবে— সজীব না জড় বস্তু? ভাইরাস শব্দটির অর্থ যে 'বিষ' অথবা 'বিষাক্ত তরল'।

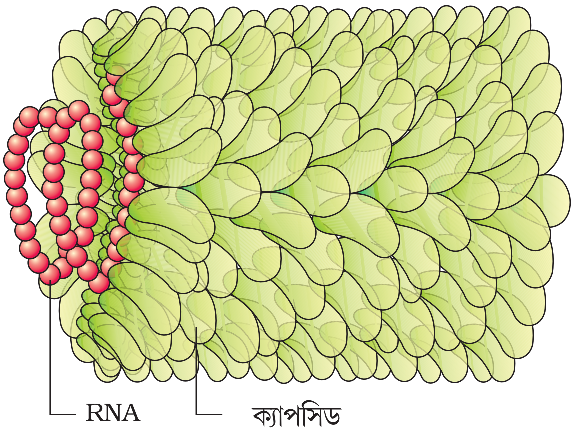

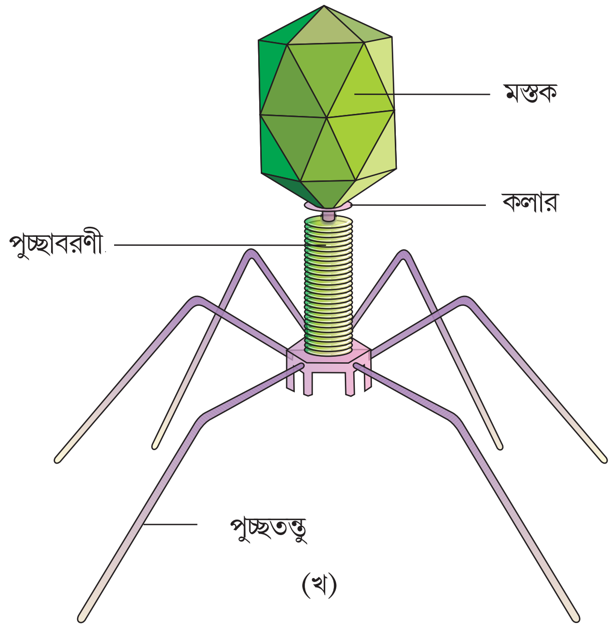

চিত্র - 2.6 (ক) টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (TMV) (খ) ব্যাকটেরিওফাজ

এই কথাটি প্রথম বলেছিলেন বিজ্ঞানী পাস্তুর। ডি জে ইভানোস্কি (D.J. Ivanowsky) 1892 সালে কিছু অণুজীবকে তামাকের মোজাইক রোগ সৃষ্টিকারী জীব রূপে চিহ্নিত করেন। এরা ব্যাকটিরিয়ার চাইতেও ক্ষুদ্র কারণ ব্যাকটিরিয়াকে আটকাতে সক্ষম তেমন পরিস্রাবকের মধ্য দিয়েও এরা চলে যেতে পারে। এম. ডব্লিও বেইজারনিইক (M. W. Beijerinek) 1898 সালে প্রদর্শন করেছিলেন যে আক্রান্ত তামাক পাতার নির্যাস কোনো সুস্থ গাছকে সংক্রমিত করতে পারে। তিনি এই তরলটির নাম দেন 'সংক্রামক জীবন্ত পদার্থ'— ***(Contagium Vivum fluidum)***। ডব্লিও. এম. স্টেনলি (W.M. Stanley) দেখিয়েছিলেন যে ভাইরাসদের কেলাসিত করা যেতে পারে এবং এই কেলাস প্রধানত প্রোটিন সমৃদ্ধ হয়। নির্দিষ্ট পোষক কোশের বাহিরে ভাইরাস নিছক নিষ্ক্রিয় বা জড় বস্তু। ভাইরাসেরা বাধ্যতামূলক পরজীবী। ভাইরাস প্রোটিন ছাড়াও অতিরিক্ত হিসাবে জিনগত বস্তুও বহন করে। এই জিনগত বস্তু হয় DNA নতুবা RNA হতে পারে। কোনো ভাইরাসেই DNA এবং RNA উভয়ই এক সাথে থাকে না। ভাইরাস একটি নিউক্লিও প্রোটিন যৌগ এবং এর জিনগত বস্তুটি সংক্রমণ হয়।

সাধারণত উদ্ভিদ দেহে সংক্রমণকারী ভাইরাসগুলো একতন্ত্রী বা দ্বিতন্ত্রী RNA বিশিষ্ট অথবা দ্বিতন্ত্রী DNA বিশিষ্ট হয়। ব্যাকটেরিওফাজ (ব্যাকটিরিয়ার দেহের সংক্রমণকারী ভাইরাস চিত্র 2.6 খ)। ভাইরাসের প্রোটিন আবরণীকে ক্যাপসিড বলে এবং এটি কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধঃএককের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এই অধঃএককগুলোকে ক্যাপসোমিয়ার বলে। ক্যাপসোমিয়ারগুলো হেলিক্যাল (Helical) বা পলিহেড্রাল (Polyhedral) জ্যামিতিক গঠনরূপে সজ্জিত থাকে। ভাইরাস মাম্পস, গুটি বসন্ত, হারপিস্ এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগ সৃষ্টি করে। মানবদেহে AIDS রোগটি একটি ভাইরাসের সংক্রমণে ঘটে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ভাইরাস ঘটিত রোগের সম্ভাব্য লক্ষণগুলো যা যা হতে পারে— মোজাইক সৃষ্টি হওয়া, পাতা গুটিয়ে এবং কুঁকড়ে যাওয়া, পাতার বর্ণ হলদে হয়ে যাওয়া এবং এর শিরাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠা এবং উদ্ভিদের খর্বাকৃতি হওয়া এবং এর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হওয়া।

ভাইরয়েড (VIROIDS)

1971 সালে T.O. Diener ভাইরাসের চেয়েও ক্ষুদ্রতর নতুন এক ধরনের সংক্রামক বস্তু আবিষ্কার করেন, যা পটেটো স্পিনডল্ টিউবার রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। এটি একটি মুক্ত RNA। ভাইরাসের ক্ষেত্রে নিউক্লিক অ্যাসিডকে ঘিরে যে প্রোটিন আবরণী থাকে, এক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। এই কারণে এদের এই নামকরণ হয়েছে। ভাইরয়েড RNA কম আণবিক ওজন বিশিষ্ট হয়।

প্রিয়নস (PRIONS)

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে দেখা গেছে যে কিছু সংক্রামক স্নায়ুরোগ অস্বাভাবিকভাবে ভাঁজযুক্ত প্রোটিন দ্বারা গঠিত কোনো একটি বাহক দ্বারা বাহিত হয়। এই বাহকটির আকার ভাইরাসের মতো হয়। এই বাহকদের প্রিয়নস বলে। প্রিয়নস ঘটিত খুবই উল্লেখযোগ্য রোগগুলোর মধ্যে রয়েছে বোভাইন স্পঞ্জিফর্ম এনসেফালোপ্যাথি (BSE)। এই রোগটিকে সচরাচর গোবাদি পশুর ম্যাডকাউ ডিসিজ (Mad cow disease) বলে এবং এই রোগটির সমগোত্রীয় প্রকার ভেদটি হল মানবদেহে সৃষ্ট ক্রুজফেল্ট- জেকব ডিসিজ (Cr-Jacob disease) বা CJD।

লাইকেন (LICHENS)

লাইকেন হলো শৈবাল এবং ছত্রাকের মিথোজীবীয় সহাবস্থান যেখানে শৈবাল ও ছত্রাক উভয়েই একে অপরের সহযোগিতায় উপকৃত হয়। লাইকেন এর শৈবাল অংশটিকে বলা হয় ফাইকোবায়ন্ট (Phycobiont) এবং ছত্রাক অংশটি হল মাইকোবায়ন্ট (Mycobiont) যারা যথাক্রমে স্বভোজী এবং পরভোজী হয়। লাইকেনের শৈবাল অংশটি ছত্রাককে খাদ্যের যোগান দেয়। বিনিময়ে ছত্রাক শৈবালকে বাসস্থানের সুবিধা প্রদান করে এবং খাদ্য প্রস্তুতির জন্য খনিজ পরিপোষক এবং জলের যোগান দেয়। তাদের পারস্পরিক সহাবস্থান এতটাই নিবিড় যে যদি প্রাকৃতিক পরিবেশে লাইকেন পর্যবেক্ষণ করা যায় তবে কল্পনা করা কঠিন হয়ে পড়ে যে একটি লাইকেন দুইটি পৃথক জীবের সমন্বয়ে গঠিত। লাইকেন দূষিত অঞ্চলে জন্মাতে বা টিকে থাকতে পারে না। তাই লাইকেন খুবই ভাল দূষণ নির্দেশক হিসাবে কাজ করে।

সারাংশ (SUMMARY)

বিজ্ঞানী অ্যারিস্টটল সর্বপ্রথম সরল অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদকুল ও প্রাণীকুলের বায়োলজিক্যাল শ্রেণিবিন্যাস প্রবর্তন করেন। পরবর্তী সময়ে লিনিয়াস সব সজীব বস্তুকে দুইটি রাজ্যে ভাগ করেন— উদ্ভিদ রাজ্য ও প্রাণীরাজ্য। Whittaker একটি সুবিস্তৃত পঞ্চরাজ্য শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। এই পাঁচটি রাজ্য হল — মনেরা, প্রোটিস্টা, ছত্রাক, উদ্ভিদরাজ্য ও প্রাণীরাজ্য। এই পঞ্চরাজ্য শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির মূল মানদণ্ডগুলো ছিল কোষের গঠন, দেহ সংগঠন, পুষ্টি এবং জনন পদ্ধতি এবং বিবর্তনগত সম্পর্ক।

পঞ্চরাজ্য শ্রেণিবিন্যাসে ব্যাকটিরিয়াগোষ্ঠী রাজ্য মনেরার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্যাকটিরিয়ার বিস্তার সর্বত্র। এই অণুজীবদের বিপাকক্রিয়ায় সর্বাপেক্ষা বেশি বৈচিত্র লক্ষ করা যায়। পুষ্টি পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যাকটিরিয়া স্বভোজী অথবা পরভোজী প্রকৃতির হতে পারে। সব এককোশী ইউক্যারিওটিক জীব যেমন, ক্রাইসোফাইট, ডায়ানোফ্লাজেলেট, ইউগ্লিনয়েড, স্লাইমমোল্ড এবং প্রোটোজোয়া গোষ্ঠীভুক্ত জীবরা প্রোটিস্টা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রোটিস্টদের মধ্যে সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস ও অন্যান্য পর্দাবৃত কোশীয় অঙ্গাণু লক্ষ করা যায়। এরা অযৌন এবং যৌন উভয় প্রক্রিয়ায় জননক্রিয়া সম্পন্ন করে। ছত্রাক রাজ্যের অন্তর্গত জীবদের দেহ গঠন এবং বাসস্থানে ব্যাপক বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত চারটি শ্রেণি হল ফাইকোমাইসেটিস, অ্যাসকোমাইসেটিস, ব্যাসিডিওমাইসেটিস এবং ডিউটারোমাইসেটিস। সব ক্লোরোফিলযুক্ত ইউক্যারিওটিক জীবদের নিয়ে উদ্ভিদরাজ্য গঠিত। শৈবাল, ব্রায়োফাইটা, টেরিডোফাইটা, গুপ্তবীজী এবং ব্যক্তবীজী — এরা সবাই এই গোষ্ঠীভুক্ত। উদ্ভিদের জীবনচক্রে জনুক্রম দেখা যায় অর্থাৎ এদের জীবনচক্রে লিঙ্গধর জনু এবং রেণুধর জনুর আবর্তন ঘটে। ইউক্যারিওটিক, পরভোজী, বহুকোশী জীব যাদের মধ্যে কোশ প্রাচীর অনুপস্থিত, এরা প্রাণীরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এদের পুষ্টি পদ্ধতি পরভোজী প্রকৃতির হয়। এরা প্রধানত যৌন জননের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। ভাইরাস ও ভাইরয়েডের মতো কিছু অকোশীয় জীব এবং এর পাশাপাশি লাইকেনও পঞ্চরাজ্য শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

অনুশীলনী (EXERCISES)

1. সময়ের সাথে সাথে কীভাবে শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিগুলোর বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা বিবৃত করো।
2. নিম্নলিখিতগুলোর দুইটি করে প্রধান অর্থনৈতিক গুরুত্ব লিখো।
   ক) পরভোজী ব্যাকটিরিয়া
   খ) আর্কি ব্যাকটিরিয়া
3. ডায়াটমের কোষপ্রাচীরের প্রকৃতি কীরূপ?
4. 'Algal bloom' এবং 'Red--tides' এর গুরুত্ব কী তা খুঁজে বের করো।
5. ভাইরয়েড কীভাবে ভাইরাস থেকে পৃথক হয়?
6. সংক্ষেপে প্রোটোজোয়ার চারটি প্রধান গোষ্ঠীর বিবরণ দাও।
7. উদ্ভিদরা স্বভোজী। তুমি কি এমন কিছু উদ্ভিদের নাম উল্লেখ করতে পার, যারা আংশিক পরভোজী?
8. 'ফাইকোবায়ন্ট এবং মাইকোবায়ন্ট এই দুইটি পরিভাষার গুরুত্ব কী?'
9. নীচে দেওয়া দুইটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ছত্রাক রাজ্যের বিভিন্ন শ্রেণিগুলোর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো।
   (i) পুষ্টি পদ্ধতি।
   (ii) জনন পদ্ধতি
10. 'ইউগ্লিনয়েডদের' চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
11. দেহ গঠন ও জিনগত বস্তুর প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে ভাইরাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো। চারটি পরিচিত ভাইরাস ঘটিত রোগের নামও লেখো।
12. ভাইরাসরা সজীব না জড় — তোমাদের শ্রেণিতে এই বিষয়টির ওপর একটি আলোচনাচক্র সংগঠিত করো।

অধ্যায়-3 (CHAPTER 3)

উদ্ভিদরাজ্য (PLANT KINGDOM)

3.1 শৈবাল

3.2 ব্রায়োফাইটা

3.3 টেরিডোফাইটা

3.4 ব্যক্তবীজী

3.5 গুপ্তবীজী

3.6 উদ্ভিদের জীবনচক্র ও জনুক্রম

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা হুইট্টেকার (Whittaker, 1969) প্রবর্তিত পঞ্চরাজ্য শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে সজীব বস্তুর শ্রেণিবিন্যাস দেখেছি সেখানে মনেরা, প্রোটিস্টা, ছত্রাক, প্ল্যান্টি, অ্যানিমেলিয়া এই পাঁচটি রাজ্যের উল্লেখ ছিল। এই অধ্যায়ে আমরা আরও বিশদ ভাবে রাজ্য- প্ল্যান্টি (kingdom- plantae) নিয়ে আলোচনা করব, যেটি উদ্ভিদরাজ্য নামে বহুল প্রচলিত।

সময়ের সাথে সাথে উদ্ভিদরাজ্যে যে সমস্ত পরিবতর্ন এসেছে, এই গুলোকে আমরা অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব। ছত্রাক মনেরা ও প্রোটিস্টা রাজ্যের সদস্য যারা কোশপ্রাচীর বিশিষ্ট জীব, এদেরকে উদ্ভিদরাজ্য থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। যদিও পূবের্র শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি অনুযায়ী এরা একই রাজ্য উদ্ভিদরাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং সায়ানো ব্যাকটিরিয়া যারা নীলাভ সবুজ শৈবাল নামে পরিচিত এরা আর শৈবাল হিসাবে গণ্য হবে না। এই অধ্যায়ে, আমরা উদ্ভিদ রাজ্যের অর্ন্তগত জীবগোষ্ঠী হিসাবে শৈবাল, ব্রায়োফাইটা, টেরিডোফাইটা ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদদের নিয়ে আলোচনা করব।

চলো শ্রেণিবিন্যাসকে প্রভাবিত করে, এমন কিছু বিষয় জানতে, গুপ্তবীজী উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাসটি লক্ষ করি। প্রাচীনতম শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি কেবলমাত্র জীবের দৃশ্যমান স্থূল অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যাবলি যেমন জীবের স্বভাব, রং, পাতার সংখ্যা এবং আকৃতি ইত্যাদিকে শ্রেণিবিন্যাসকরণের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করত। এগুলো প্রধানত উদ্ভিদের অঙ্গজ বৈশিষ্ট্য বা উদ্ভিদের পুংস্তবকের গঠন বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। এই পদ্ধতি লিনিয়াস প্রবর্তিত এ ধরনের শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিগুলো ছিল কৃত্রিম পদ্ধতি। এই পদ্ধতিগুলোতে মাত্র কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে নিকট সম্পর্কিত প্রজাতিগুলোকে পরস্পর থেকে আলাদা করা হয়। কৃত্রিম শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি অঙ্গজ বৈশিষ্ট্য এবং জননগত বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর সমান গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু উদ্ভিদের অঙ্গজ বৈশিষ্ট্যগুলো খুব সহজেই পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় এই পদ্ধতিগুলো গ্রহণযোগ্য হয়নি। এ হেন পরিস্থিতিতে এই পদ্ধতির বিপরীত পদ্ধতি হিসাবে স্বাভাবিক শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন জীবের মধ্যকার স্বাভাবিক সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে জীবদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়। এক্ষেত্রে কেবল মাত্র বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য নয়, পাশাপাশি জীবের অভ্যন্তরীণব বৈশিষ্ট্যাবলি,

যেমন দেহগঠনকারী কোশের আণুবীক্ষণিক গঠন, শারীরস্থানিক গঠন, ভ্রূণ বিদ্যা এবং উদ্ভিদ রসায়নবিদ্যার মতো বিষয়কেও বিবেচনা করা হয়। সপুষ্পক উদ্ভিদের এধরনের শ্রেণিবিন্যাস করেছিলেন জর্জ বেন্থাম এবং জোসেফ ডালটন হুকার।

বিভিন্ন জীবের মধ্যে বিবর্তনগত বা জাতিজনিগত সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে বিবর্তন জনিত শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিগুলো বর্তমানে গ্রহণযোগ্য। এই বিন্যাস পদ্ধতি এটাই নির্দেশ করে যে একই ট্যাক্সা (Taxa) তে বর্তমান জীবদের পূর্বপুরুষ একই। শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা বা জটিলতাগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা বর্তমানে অন্যান্য আরও বহু উৎস থেকে তথ্যাবলি সংগ্রহ করতে পারি। যখন কোনো জীবের শ্রেণিবিন্যাসকরণের ক্ষেত্রে এর কোনো জীবাশ্মঘটিত প্রমাণ পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে এই সংগৃহীত তথ্যগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

সংখ্যাতত্ত্বজনিত ট্যাক্সোনমি যা বর্তমানে কম্পিউটারের সাহায্যে করা যায়, তা জীবের সব দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য এর উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতিতে সব বৈশিষ্ট্যগুলোকেই নির্দিষ্ট সংখ্যা এবং কোডের সাহায্যে চিহ্নিত করা হয় এবং এই তথ্যাবলির প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি বৈশিষ্ট্য সমান গুরুত্ব পায় এবং এইভাবে একইসাথে শতাধিক বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা করা যেতে পারে । কোশভিত্তিক ট্যাক্সোনোমি বা cytotaxonomy ক্রোমোজোমের সংখ্যা, গঠন ও আচরণের মতো কোশীয় তথ্যাবলির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে কেমোট্যাক্সোনমি বা Chemotaxonamy বিভিন্ন দ্বন্দ্ব দূর করতে উদ্ভিদের রাসায়নিক উপাদানগুলোকে ব্যবহার করে। বিন্যাসবিদ্রা বর্তমানে শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে এই দুটি পদ্ধতিই অর্থাৎ Cytotaxomoumy এবং Chemotaxonomy ব্যবহার করেন।

3.1 শৈবাল (Algae)

শৈবাল হল ক্লোরোফিল যুক্ত সরল ও থ্যালাস জাতীয় গঠন বিশিষ্ট স্বভোজী এবং প্রধানত জলজ (স্বাদু জল ও সমুদ্র উভয় পরিবেশেই বর্তমান) জীব। এরা ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ যেমন স্যাঁতস্যাতে পাথর , মাটি এবং কাঠের ওপর জন্মায়, এদের মধ্যে কেউ কেউ ছত্রাকের সাথে সহাবস্থানে (লাইকেন) থাকে এবং কেউ কেউ আবার প্রাণীদের সাথেও সহাবস্থানে থাকে। উদাহরণস্বরূপ স্লথবিয়ারের গাত্রে শৈবালের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় ।

শৈবালের দেহ গঠনের প্রকৃতি ও আকার অত্যন্ত বৈচিত্রপূর্ণ হয় (চিত্র-3.1) এদের আকার - ক্ল্যামাইডোমোনাসের মতো এককোশী আণুবীক্ষণিক যেমন হয়, তেমনি এদের ভলভক্সের মত কলোনীয় গঠন এবং ইউলোথ্রিক্স ও স্পাইরোগাইরার মত সূত্রাকার গঠনও দেখা যায়।

কেলপের মতো অল্প কিছু দৈত্যাকার সামুদ্রিক শৈবাল বৃহদাকার উদ্ভিদ দেহ গঠন করে। শৈবাল অঙ্গজ, অযৌন এবং যৌন জনন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করে। অঙ্গজ জননে খণ্ডীভবন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট প্রতিটি খণ্ডক এক একটি থ্যালাস বা অবিভেদিত দেহ সংগঠনে পরিণত হয়। এদের ক্ষেত্রে অযৌন জনন প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন ধরনের রেণু তৈরির মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এর মধ্যে জু-স্পোরই সর্বাধিক পরিচিত। ফ্ল্যাজেলাযুক্ত সচল জুস্পোরগুলো অঙ্কুরিত হয়ে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। শৈবালে দুটি গ্যামেটের মিলনের মাধ্যমে যৌন জনন সংঘটিত হয়। এই গ্যামেট দুটি ফ্ল্যাজেলাযুক্ত, সমআকৃতির (ক্ল্যামাইডোমোনাস) অথবা ফ্ল্যাজেলাবিহীন (নিঃশ্চল) কিন্তু সম আকারের (স্পাইরোগাইরা) হতে পারে। এ ধরনের গ্যামেটদ্বয়ের মিলনের ফলে সংঘটিত যৌন জননকে আইসোগ্যামী বলে। অপরদিকে অ্যানাইসোগ্যামীতে দুইটি ভিন্ন আকারের গ্যামেটের মিলন ঘটে। ক্ল্যামাইডোমোনাসের কিছু প্রজাতির মধ্যে এই ধরনের যৌন জনন দেখা যায়। আবার একটি বড় নিঃশ্চল স্ত্রী গ্যামেটের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ছোট সচল পুংগ্যামেটের মিলনকে উগ্যামী বলে। উদাহরণস্বরূপ ভলভক্স, ফিউকাস।

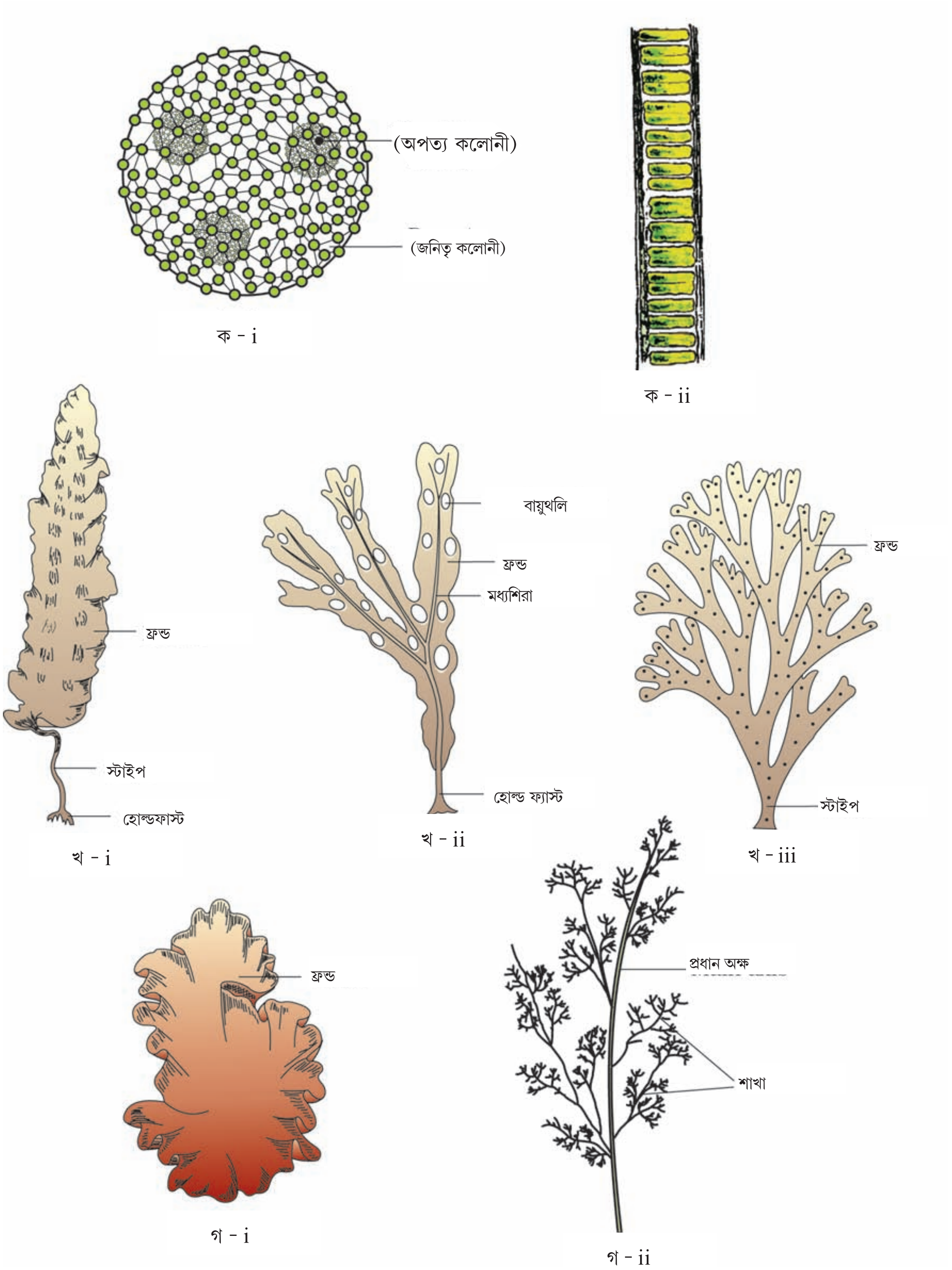

চিত্র 3.1 শৈবাল : (ক) সবুজ শৈবাল (i) ভলভক্স (ii) ইউলোথ্রিক্স
(খ) বাদামি শৈবাল (i) ল্যামিনারিয়া (ii) ফিউকাস (iii) ডিকটিওটা
(গ) লোহিত শৈবাল (i) পোরফাইরা (ii) পলিসাইফোনিয়া

শৈবাল বিভিন্নভাবে মানুষের কাজে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর অন্তত শতকরা ৫০ ভাগ কার্বন ডাই অক্সাইড শৈবাল সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতির মাধ্যমে শোষণ করে। সালোকসংশ্লেষকারী জীব হওয়ায় এরা নিকটবর্তী পরিবেশে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি করে। পরিপোষকচক্রে (food cycle) প্রাথমিক উৎপাদক হিসেবে শৈবালের সর্বাধিক গুরুত্ব রয়েছে। শক্তি সমৃদ্ধ যৌগের প্রাথমিক উৎপাদক হিসেবে এদের গুরুত্ব অপরিসীম এবং এই যৌগ সব জলজ প্রাণীদের খাদ্য চক্রের ভিত্তি গঠন করে। 70টি সামুদ্রিক শৈবাল প্রজাতির মধ্যে পরফাইরা, ল্যামিনারিয়া এবং সারগ্যামাসের অনেক প্রজাতি খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিছু সামুদ্রিক বাদামি এবং লোহিত শৈবাল প্রচুর পরিমাণে জল ধারক বস্তু হাইড্রোকলয়েড উৎপন্ন করে, উদাহরণ Algin (বাদামি শৈবাল) এবং Carrageen (লোহিত শৈবাল)। যেগুলোর বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যবহার রয়েছে। জিলেডিয়াম ***(Gelidium)*** এবং গ্র্যাসিলারিয়া ***(Gracilaria)*** নামক শৈবাল থেকে প্রাপ্ত বাণিজ্যিক পদার্থ 'আগর' অনুজীবের বৃদ্ধির এবং আইসক্রিম, জেলি ইত্যাদি তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। প্রোটিন সমৃদ্ধ এককোশী শৈবাল ক্লোরেল্লা খাদ্য সম্পূরক (Food suppliment) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মহাকাশচারীরাও খাদ্য হিসেবে ক্লোরেল্লা ব্যবহার করে থাকে। শৈবাল গোষ্ঠীকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। ক্লোরোফাইসি, (Chlorophyceae), ফিওফাইসি (Phaeophyceae) রোডোফাইসি (Rhodophyceae)।

3.1.1 ক্লোরোফাইসি (Chlorophyceae)

এই শ্রেণির শৈবাল 'সবুজ শৈবাল' নামে পরিচিত। এদের দেহ এককোশী, কলোনী সৃষ্টিকারী বা সূত্রবৎ হতে পারে। ক্লোরোফিল a এবং ক্লোরোফিল b রঞ্জকের আধিক্যের জন্য এরা ঘাসের মতো সবুজ বর্ণের হয় এবং এই রঞ্জকগুলো নির্দিষ্ট ক্লোরোপ্লাস্টে অবস্থান করে। প্রজাতিভেদে ক্লোরোপ্লাস্টের আকৃতি বা গঠন চাকতির মতো, প্লেটের মতো, জালকাকার, কাপ আকৃতি বিশিষ্ট, সর্পিলাকার বা ফিতার মতো হতে পারে। এদের বেশির ভাগ শৈবালের ক্লোরোপ্লাস্টে এক বা একাধিক সঞ্চয়কারী গঠন বর্তমান, এদের পাইরিনয়েড বলে। এই পাইরিনয়েডগুলো শ্বেতসার ছাড়া প্রোটিনও হয়েছে। কিছু শৈবাল তৈলবিন্দু হিসাবেও খাদ্য সঞ্চয় করে রাখতে পারে। সবুজ শৈবালে সাধারণত একটি দৃঢ় কোশপ্রাচীর কোশকে আবৃত করে রাখে। এর ভেতরের স্তরটি সেলুলোজ এবং বাইরের স্তরটি পেকটোজ নির্মিত হয়।

এরা সাধারণত খণ্ডীভবন অথবা বিভিন্ন প্রকার রেণু উৎপাদনের মাধ্যমে অঙ্গজ জনন সম্পন্ন করে। আবার জুস্পোরেনজিয়াতে উৎপন্ন ফ্ল্যাজেলাযুক্ত জুস্পোর দ্বারাও এদের অযৌন জনন সংঘটিত হয়। যৌন জননের জনন কোশের ধরন এবং জনন কোশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই এরা আইসোগ্যামাস, অ্যানাইসোগ্যামাস ও উগ্যামাস প্রকৃতির হতে পারে। সচরাচর দেখা যায় এমন কিছু সবুজ শৈবাল হল ক্ল্যামাইডোমোনাস, ভলভক্স, ইউলোথিক্স , স্পাইরোগাইরা এবং কারা [চিত্র 3.1 (ক) দেখ]

3.1.2 ফিওফাইসি (Phaeophyceae)

এই শ্রেণির শৈবাল অথাৎ বাদামি শৈবালেরা প্রধানত সামুদ্রিক পরিবেশ জন্মায় । আকার এবং গঠনগত দিক থেকে এদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । এরা সরল শাখান্বিত, সূত্রাকার দেহগঠন বিশিষ্ট অথবা কেল্প (যার উচ্চতা ১০০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে) -এর মতো প্রচুর শাখা -প্রশাখা বিশিষ্ট ও হতে পারে । এই শ্রেণির শৈবালে রঞ্জক হিসাবে ক্লোরোফিল a অথবা ক্লোরোফিল c , ক্যারোটিনয়েড এবং জ্যান্থোফিল বর্তমান । দেহে উপস্থিত জ্যান্থোফিল এবং ফুকোজ্যান্থিন রঞ্জকের পরিমাণের ওপর ভিত্তি

করে এদের রঙ জলপাই সবুজ থেকে শুরু করে বাদামি বর্ণের বিভিন্ন শেডের হয়ে থাকে। সঞ্চিত খাদ্য হিসাবে এদের দেহে ল্যামিনারিন অথবা ম্যানিটল রূপে জটিল শর্করা সঞ্চিত থাকে। এদের অঙ্গাজ কোশগুলোতে সেলুলোজ নির্মিত কোশপ্রাচীর বর্তমান এবং এটি সাধারণত বাইরের দিকে অ্যালজিন (Algin) এর জিলাটিন আরবণী দ্বারা আবৃত থাকে। প্লাস্টিড ছাড়াও এদের কোশের প্রোটোপ্লাস্টে একটি কেন্দ্রীয় কোশগহ্বর ও নিউক্লিয়াস বর্তমান। উদ্ভিদ দেহটি কোন শক্ত স্থায়ী গঠনের সঙ্গো হোল্ডফাস্ট নামক দেহ গঠনের দ্বারা নিজেকে আটকে রাখে। এছাড়া এদের দেহে একটি বৃন্ত বা স্টাইপ (stip) রয়েছে। দেহে সালোকসংশ্লেষকারী অঙ্গা হিসাবে ফ্রন্ড (Frond) নামক পাতার মতো অঙ্গা থাকে। খণ্ডীভবন পদ্ধতিতে অঙ্গাজ জনন সম্পন্ন হয়। বেশিরভাগ বাদামি শৈবালে দুইটি ফ্ল্যাজেলা সমন্বিত জুস্পোর দ্বারা অযৌন জনন সম্পন্ন হয়। জুস্পোরগুলো পার্শ্বীয়ভাবে অবস্থানরত দুইটি অসমান ফ্ল্যাজেলোযুক্ত এবং ন্যাসপাতির আকৃতিবিশিষ্ট হয়। এদের ক্ষেত্রে যৌন জনন আইসোগ্যামী, অ্যানাসোগ্যামী অথবা উগ্যামী প্রকৃতির হতে পারে। দুইটি গ্যামেটের মিলন জলে অথবা উগোনিয়ামে (উগ্যামাস প্রজাতির ক্ষেত্রে) ঘটতে পারে। গ্যামেটগুলো পাইরিফর্ম (ন্যাসপাতির আকৃতি) এবং দুইটি পার্শ্বীয় ফ্ল্যাজেলা যুক্ত হয়। সচরাচর দেখা যায় এই শ্রেণির শৈবালগুলো হল: এক্টোকারপাস ***(Ectocarpus)***, ডিকটিওটা ***(Dictiota)***, ল্যামিনারিয়া ***(Laminaria)***, সারগাসাম ***(Sargassum)*** এবং ফিউকাস ***(Fucus)*** [চিত্র 3.1 খ দেখ]

3.1.3 রোডোফাইসি (Rhodophyceae)

এদেরকে সাধারণত ‘ লোহিত শৈবাল’ বলা হয়। দেহে r ফাইকোএরিথ্রিন নামক রঞ্জকের প্রাধান্যের কারণেই এদের বর্ণ লাল বা লোহিত হয়। বেশিরভাগ লোহিত শৈবালই সামুদ্রিক এবং তুলনামূলকভাবে সমুদ্রের উষ্ণ অঞ্চলে এদের ঘনবসতি লক্ষ করা যায়। সমুদ্রের উপরিতল থেকে কিছু গভীরতা পর্যন্ত যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছুতে পারে সেখানে এবং গভীর সমুদ্র যেখানে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ আলো প্রবেশ করে, এই উভয় অঞ্চলেই এদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ লোহিত শৈবালের ক্ষেত্রে লাল বর্ণের থ্যালাস বা অবিভেদিত দেহ সংগঠনটি বহুকোশী হয়। আবার কিছু সংখ্যকের ক্ষেত্রে জটিল দেহ সংগঠন, পরিলক্ষিত হয়। এদের দেহে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে ফ্লোরিডিয়ান স্টার্চ নামক এক ধরনের শ্বেতসার জমা থাকে।

সারণি 3.1 শৈবালের বিভাগসমূহ এবং তাদের মুখ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি

শ্রেণি	সাধারণ নাম	প্রধান রঞ্জক সমূহ	সঞ্চিত খাদ্য	কোশপ্রাচীর	ফ্ল্যাজেলার সংখ্যা এবং এদের সন্নিবিষ্ট হওয়ার স্থান	বাসস্থান
ক্লোরোফাইসি	সবুজ শৈবাল	ক্লোরোফিল a, b	শ্বেতসার	সেলুলোজ	2-8, সমদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট, অগ্রস্থ	স্বাদুজল, ইষৎ নোনা জল, নোনা জল
ফিওফাইসি	বাদামি	ক্লোরোফিল a, c ফোকোজ্যানথিন	ম্যানিটল, ল্যামিনারিন	সেলুলোজ এবং অ্যালগিন	২, অসম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট পার্শ্বীয়	স্বাদু জল (কদাচিৎ) ইষৎ নোনা জল, নোনা জল
রোডোফাইসি	লোহিত শৈবাল	ক্লোরোফিল a, d ফাইকোএরিথ্রিন	ফ্লোরিডিয়ান স্টার্চ	সেলুলোজ, পেকটিন এবং পলি সালফেট এস্টার	অনুপস্থিত	স্বাদু জল (কিছু প্রজাতি) ইষৎ নোনা জল, নোনাজল (বেশির ভাগ প্রভাবিত)

এই শ্বেতসারটি অ্যামাইলোপেপটিন এবং গ্লাইকোজেনের মতো রাসায়নিক গঠন বিশিষ্ট হয়। লোহিত শৈবাল সাধারণত খণ্ডীভবন প্রক্রিয়ায় অঙ্গজ জনন করে। এরা অচল রেণুর সাহায্যে অযৌন জনন এবং অচল গ্যামেট দ্বারা যৌন জনন সম্পন্ন করে। যৌন জনন উগ্যামাস প্রকৃতির এবং নিষেকোত্তর পরিস্ফুরণ জটিল প্রকৃতির হয়। এই শ্রেণির শৈবাল যাদের সাধারণত দেখা যায় এরা হল— পলিসাইফোনিয়া, পোরফাইরা, [চিত্র 3.1 (গ) দেখো], গ্রাসিলিয়া এবং জেলিডিয়াম।

3.2 ব্রায়োফাইটা (Bryophyta)

এই শ্রেণিতে বিভিন্ন ধরনের মস্ এবং লিভারওয়র্ট রয়েছে। এরা সচরাচর স্যাঁতস্যাঁতে ছায়াচ্ছন্ন পাহাড়ি অঞ্চলে জন্মায় (চিত্র 3.2 দেখ)।

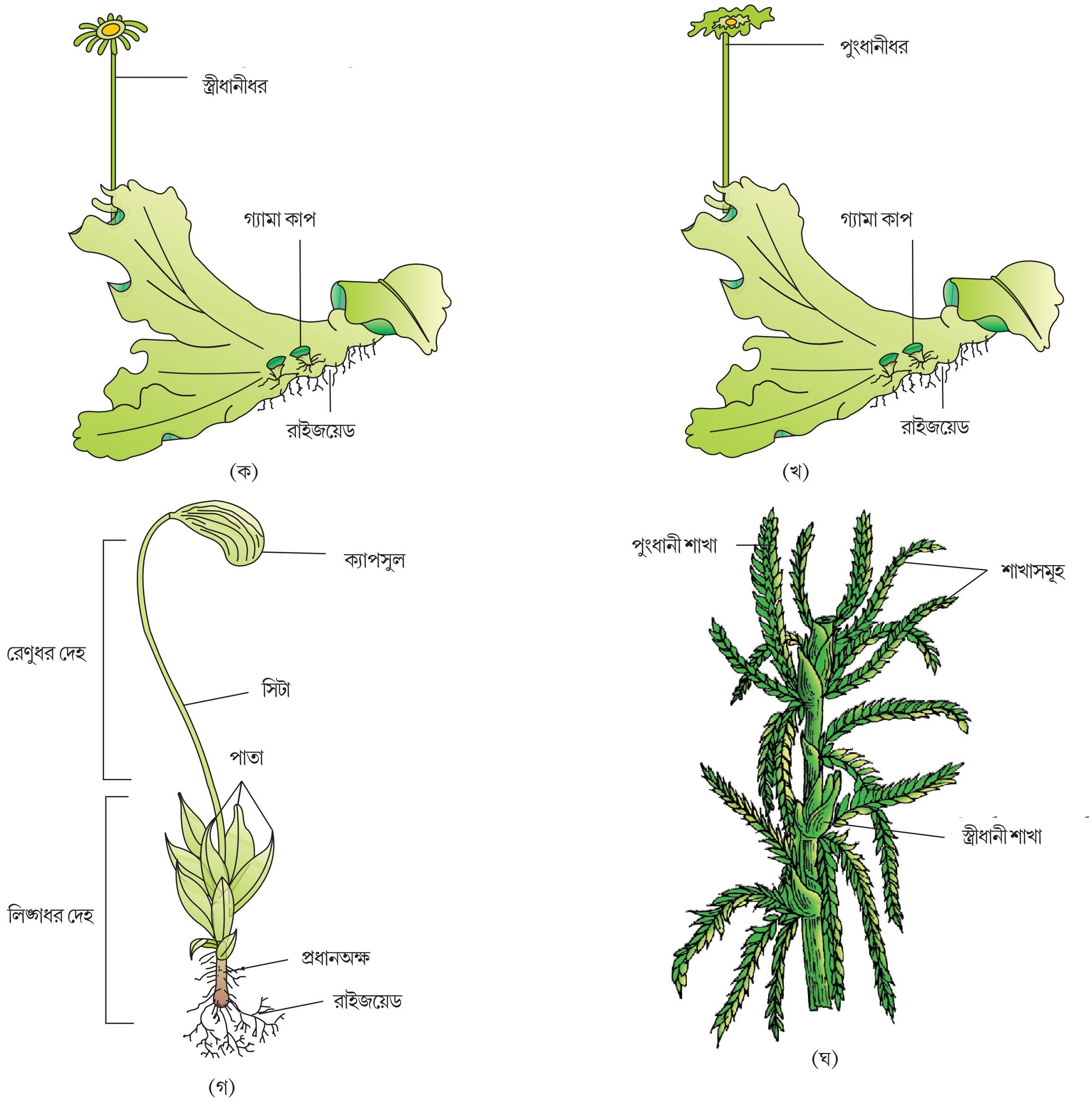

চিত্র 3.2 ব্রায়োফাইটা : লিভারওয়র্ট - মার্কেনসিয়া ক) স্ত্রী থ্যালাস খ) পুং থ্যালাস মস্ - গ) ফিউনারিয়ার রেণুধর এবং লিঙ্গাধর ঘ) স্ফ্যাগনামের — লিঙ্গাধর উদ্ভিদ

ব্রায়োফাইটা গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদদের উদ্ভিদরাজ্যে 'উভচর' বলা হয় কারণ এসব উদ্ভিদ স্থলে বাস করলেও যৌনজননের জন্য জলজ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। সাধারণত: এদেরকে ভেজা, স্যাঁতস্যাঁতে, আর্দ্র এবং ছায়াচ্ছন্ন অঞ্চলে জন্মাতে দেখা যায়। নগ্ন পাথরে বা মাটিতে উদ্ভিদের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনে (Succession) এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শৈবালের তুলনায় ব্রায়োফাইটদের উদ্ভিদদেহ অনেক বেশি বিভেদিত থাকে। এটি থ্যালাস সদৃশ, খাড়া এবং এককোশী বা বহুকোশী রাইজয়েড দ্বারা কোন শক্ত স্থির অংশের সাথে যুক্ত থাকে। এদের দেহে প্রকৃত মূল, কাণ্ড বা পাতা অনুপস্থিত। তবে এদের দেহে মূলের মতো, পাতার মতো বা কাণ্ডের মতো গঠন থাকতে পারে। ব্রায়োফাইটদের প্রধান উদ্ভিদদেহটি হ্যাপ্লয়েড হয়, এটি জননকোশ তৈরি করে বলে একে লিঙ্গধর বা গ্যামেটোফাইট বলে। এদের জনন অঙ্গ বহুকোশী হয়। পুংজননঅঙ্গাকে পুংধানী বলে। এতে দুইটি ফ্ল্যাজেলাবিশিষ্ট শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। স্ত্রী জনন অঙ্গাকে স্ত্রীধানী বলে। এটি ফ্লাস্কের আকৃতিবিশিষ্ট হয় এবং এটি একটি মাত্র ডিম্বাণু উৎপন্ন করে। শুক্রাণুগুলো জলে মুক্ত হয়ে স্ত্রীধানীর সংস্পর্শে আসে। একটি শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে জাইগোট সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গোই জাইগোটে হ্রাসবিভাজন ঘটে না। জাইগোট থেকে একটি বহুকোশী দেহ গঠিত হয়, যাকে রেণুধর উদ্ভিদ বলে। রেণুধর উদ্ভিদটি স্বাধীনজীবী নয় এবং এটি সালোকসংশ্লেষে সক্ষম লিঙ্গাধর উদ্ভিদের সাথে যুক্ত থেকে, তার থেকে পুষ্টিরস শোষণ করে। রেণুধর উদ্ভিদের কিছু কোশ হ্রাস বিভাজন (মিয়োসিস) এর মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড রেণু গঠন করে। এই রেণুগুলো অঙ্কুরিত হয়ে লিঙ্গধর উদ্ভিদ গঠন করে।

সব ব্রায়োফাইটদেরই কিছু না কিছু অর্থকরী গুরুত্ব রয়েছে। আবার কিছু মস্ শাকাশী স্তন্যপায়ী, পাখি এবং অন্যান্য প্রাণীদের খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। স্ফ্যাগনাম প্রজাতির মস্ থেকে প্রাপ্ত পীট দীর্ঘদিন যাবৎ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং জল ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ায় সজীব বস্তু পরিবহণের সময় প্যাকিং-এর কাজে এর ব্যবহার রয়েছে।

মস্ এবং লাইকেনই হচ্ছে প্রথম জীবগোষ্ঠী যারা নগ্ন পাথুরে স্থানে প্রথম বসতি স্থাপন করেছে। তাই এদের বাস্তুতান্ত্রিক গুরুত্ব অপরিসীম। এরা পাথরের বিয়োজন ঘটায় এবং উন্নত উদ্ভিদের বৃদ্ধির উপযোগী পদার্থ তৈরি করে। তাই মাটির উপরিভাগে মসের পুরু আস্তরণ মাটিকে বৃষ্টিপাতের প্রভাব ও ভূমিক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। ব্রায়োফাইটাদের দুটি ভাগে ভাগ করা যায়— লিভারওয়র্ট ও মস।

3.2.1 লিভারওয়র্টস (Liverworts)

এই ধরনের ব্রায়োফাইটারা সাধারণত স্যাঁতস্যাঁতে ছায়াচ্ছন্ন অঞ্চল যেমন ঝরনার তীরবর্তী অঞ্চল, ধাপা অঞ্চল, গাছের ছাল এবং গভীর অরণ্যে জন্মায়। এদের দেহ থ্যালয়েড জাতীয়, যেমন মার্কেনসিয়া। থ্যালাস বিষপৃষ্ঠ হয় এবং ভূমিস্তরের সাথে দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে। পত্রসমন্বিত সদস্যদের মধ্যে কাণ্ড সদৃশ গঠনের ওপর দুই সারি পত্রসদৃশ অংশ দেখা যায়।

এদের ক্ষেত্রে থ্যালাই এর খণ্ডীভবন দ্বারা অযৌন জনন সংঘটিত হয়, অথবা গ্যামা নামক বিশেষ গঠন তৈরির মাধ্যমেও অযৌন জনন ঘটে। গ্যামাগুলো সবুজ ও বহুকোশী হয়। এই অযৌন কুঁড়িগুলো থ্যালাই-এর উপরিস্থিত কাপ আকৃতির ছোট ছোট ধারক গ্যামা কাপে উৎপন্ন হয়। এই গ্যামাগুলো

মাতৃদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ও বিভেদিত হয়ে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। যৌন জননের সময় একই বা ভিন্ন ভিন্ন থ্যালাই-এ পুং ও স্ত্রী জনন অঙ্গ সৃষ্টি হয়। ক্যাপসুলের ভিতর মিয়োসিস পদ্ধতিতে রেণু সৃষ্টি হয়। এই রেণুগুলো অঙ্কুরিত হয়ে স্বাধীনজীবী লিঙ্গাধর উদ্ভিদ গঠন করে।

3.2.2 মস্ (Mosses)

মস্রে জীবনচক্রের প্রধান দশাটি হচ্ছে লিঙ্গাধর দশা যেখানে দুটি দশা দেখা যায়— প্রোটোনিমা এবং পত্রল দশা। প্রথম দশা প্রোটোনিমা দশাটি সরাসরি রেণু থেকে সৃষ্টি হয়। এই দশাটি একটি সবুজ, শায়িত, শাখান্বিত এবং প্রায়শই সূত্রবৎ হয়। দ্বিতীয় দশা অর্থাৎ পত্রবৎ দশাটি গৌণ প্রোটোনিমার থেকে পার্শ্বীয় কুঁড়ি হিসেবে সৃষ্টি হয়। এটিতে খাড়া, সরু দণ্ড থাকে যাতে প্যাঁচানো পত্রসজ্জা পরিলক্ষিত হয়। এরা বহুকোশী, শাখান্বিত রাইজয়েড-এর সাহায্যে মাটির সাথে আটকে থাকে। এই দশাটিই মসের যৌন অঙ্গাগুলো বহন করে থাকে। মসের ক্ষেত্রে গৌণ প্রোটোনিমাতে খণ্ডীভবন এবং কুঁড়ি উৎপাদন পদ্ধতিতে অঙ্গজ জনন ঘটে। যৌন জননের ক্ষেত্রে পুংকেশর এবং গর্ভকেশবর পত্রমুকুলের অগ্রভাগ থেকে উৎপন্ন হয়। নিষেকের পর জাইগোট রেণুধর উদ্ভিদে পরিণত হয়, যাতে ফুট, সিটা এবং ক্যাপসুল দেখা যায়। এক্ষেত্রে এর রেণুধর দশাটি লিভারওয়র্টের রেণুধর দশার চাইতে অনেক বেশি বিস্তৃত হয়। ক্যাপসুল রেণুগুলো ধারণ করে। মিয়োসিস্ বিভাজনের ফলে রেণু উৎপন্ন হয়। মসের ক্ষেত্রে রেণু বিস্তারের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এদের কয়েকটি পরিচিত উদাহরণ হল— ফিউনারিয়া ***(Funaria)***, পলিট্রিকাম ***(Polytrichum)***, স্ফ্যাগনাম ***(Sphagnum)*** [চিত্র 3.2 দেখো]

3.3 টেরিডোফাইটা (Pteridophytes)

হর্সটেইল (Horsetail) এবং ফার্ণজাতীয় উদ্ভিদগুলো টেরিডোফাইটা গোষ্ঠীভুক্ত হয়। টেরিডোফাইটাদের সাধারণত ঔষধি এববং মৃত্তিকাবন্ধনী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শোভাবর্ধনকারী উদ্ভিদ হিসেবেও এদের বেশি মাত্রায় জন্মাতে দেখা যায়। বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী টেরিডোফাইট হল প্রথম স্থলজ উদ্ভিদ, যাদের মধ্যে সংবহনকলা হিসাবে জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলা বর্তমান। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই কলাগুলো সম্পর্কে তোমরা আরও বিশদভাবে জানবে। এই শ্রেণির উদ্ভিদের বেশিরভাগই শীতল, স্যাঁতস্যাঁতে, ছায়াচ্ছন্ন অঞ্চলে জন্মায়। যদিও কিছু কিছু উদ্ভিদ আবার বেলে মাটিতেও বেশ ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে।

মনে করে দেখ, ব্রায়োফাইটার ক্ষেত্রে জীবনচক্রের প্রধান দশাটি ছিল লিঙ্গাধর দশা কিন্তু টেরিডোফাইটার ক্ষেত্রে প্রধান দেহটি হচ্ছে রেণুধর উদ্ভিদ, — যা প্রকৃত মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভেদিত থাকে [চিত্র 3.3 দেখো]। অর্থাৎ এই সমস্ত অঙ্গাসমূহে সুবিভেদিত সংবহন কলা পরিলক্ষিত হয়। এদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাইক্রোফাইলস্ বা ছোট ছোট পাতা দেখা যায়, যেমন সেলাজিনেল্লা ***(selaginella)***। আবার কোথাও বা দেখা যায় ম্যাক্রোফাইলাস বা বড় পাতা যেমন ফার্ণ (Fern)। এদের রেণুধর দেহটি রেণুস্থলী ধারণ করে যা পাতার মতো উপবৃদ্ধি বা রেণুপত্রে নিহিত থাকে। কিছু ক্ষেত্রে রেণুপত্র আবার সুস্পষ্ট এবং ঠাসা গঠন তৈরি করতে পারে, যাকে স্ট্রোবাইলা বা কোণ বলে (সেলাজিনেল্লা, ইক্যুইজিটাম)। রেণুস্থলীর ভেতরের রেণুমাতৃকোশ সমুহ মিয়োসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে রেণু বা স্পোর সৃষ্টি করে। এই রেণুগুলো থেকে অস্পষ্ট, বহুকোশী, ক্ষুদ্র, স্বাধীনজীবী প্রধানত সালোকসংশ্লেষকারী থ্যালাসযুক্ত লিঙ্গাধর দশা সৃষ্টি হয়।

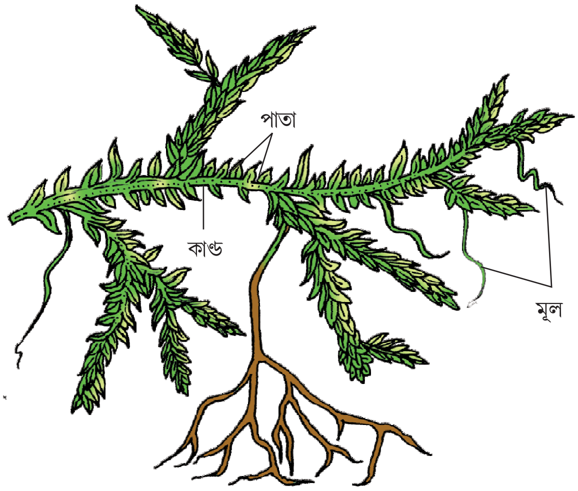

(ক)

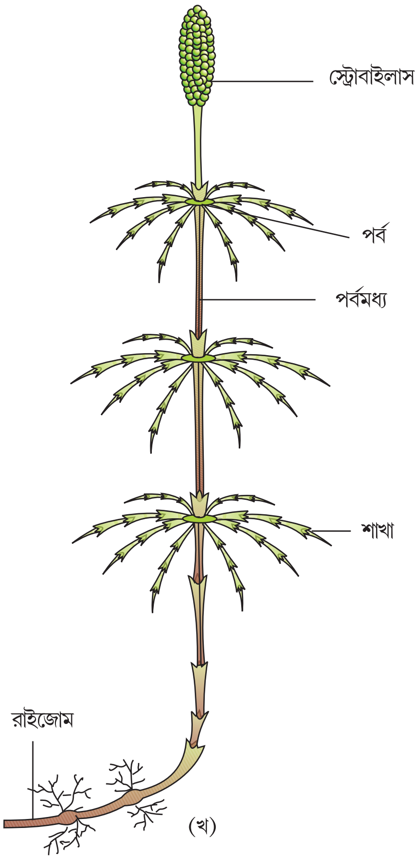

(খ)

(গ)

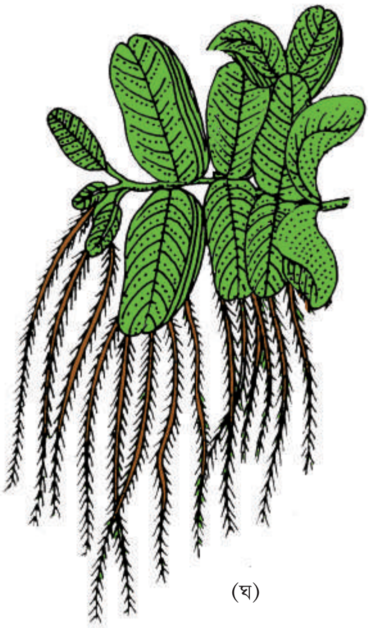

(ঘ)

চিত্র 3.3. টেরিটোফাইটস ক) সেলিজিনেল্লা খ) ইকুইজিটাম গ) ফার্ণ ঘ) সেলভিনিয়া

এই লিঙ্গাধর দেহটিকে প্রোথ্যালাস বলে। বৃদ্ধির জন্য লিঙ্গাধর উদ্ভিদের শীতল, স্যাঁতস্যাঁতে এবং ছায়াচ্ছন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন। এদের নির্দিষ্ট বিশেষ কিছু চাহিদা এবং নিষেকের প্রয়োজন জলের চাহিদার কারণেই জীবিত টেরিডোফাইটার বিস্তৃতি অত্যন্ত সীমিত এবং খুব সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক অঞ্চলে এদের উপস্থিতি সীমাবদ্ধ। লিঙ্গাধর দশাটি পুংজনন অঙ্গ পুংকেশর এবং স্ত্রী জনন অঙ্গ গর্ভকেশর ধারণ করে। পুংধানী থেকে নির্গত পুংজনন কোশ (Antherozoid) বা পুংগ্যামেটের স্ত্রীধানীর প্রবেশপথে বা মুখে স্থানান্তরণের জন্য জলের প্রয়োজন হয়। স্ত্রীধানীস্থিত ডিম্বাণুর সাথে পুংগ্যামেটের মিলনের ফলে জাইগোট সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময় জাইগোটটি একটি বহুকোশীয় সুস্পষ্ট ভাবে বিভেদিত স্পোরোফাইট বা রেণুধর উদ্ভিদ গঠন করে। এই রেণুধর দশাটিই টেরিডোফাইটের প্রধান দশা। অধিকাংশ টেরিডোফাইটে সব রেণুগুলো একই ধরনের হয়, তাই এদের সমরেণুপ্রসূ (Homosporous) বলে। সেলজিনেলা এবং সেলভানিয়া গণভুক্ত টেরিডোফাইটে দুই ধরনের রেণু উৎপন্ন হয়, মেগাস্পোর ও মাইক্রোস্পোর। এ কারণে এদের বিষমরেণুপ্রসূ বলে। এই মেগাস্পোর এবং মাইক্রোস্পোরগুলো পরিস্ফুরণের মাধ্যমে যথাক্রমে স্ত্রীলিঙ্গাধর উদ্ভিদ এবং পুংলিঙ্গাধর উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। এই উদ্ভিদদের ক্ষেত্রে লিঙ্গাধর উদ্ভিদটি জনিতৃ রেণুধর উদ্ভিদের দেহে থেকে যায় এবং এই স্থিতিকালটি পরিবর্তনশীল। জাইগোটের বিকাশ এবং এর থেকে অপত্যভ্রূণ সৃষ্টির ঘটনাটি স্ত্রী লিঙ্গাধর উদ্ভিদের দেহেই ঘটে। এই ঘটনাটি বীজ গঠনের পূর্বাবস্থাকে নির্দেশ করে, যা কিনা বিবর্তনের ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

টেরিডোফাইটাদের চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়— সিলোপসিডা (***Psilotum***); (লাইকোপসিডা) ***(Selaginella, Lycopodium)***; স্ফেনোপসিডা ***(Equisitum)*** এবং টেরোপসিডা ***(Dryopteris Pteris, Adiantum)***

3.4 ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ (Gymnosperm)

(Gymnos: naked, Sperma: Seeds; অর্থাৎ অনাবৃত বীজ) ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের ডিম্বকগুলো নিষেকের পূর্বে এবং পরে কোন ডিম্বাশয় প্রাকার দ্বারা আবৃত থাকে না, এবং তাই এরা উন্মুক্ত থাকে। নিষেকের পরে সৃষ্ট বীজগুলো অনাবৃত অর্থাৎ নগ্ন থাকে। ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে মাঝারি আকারের বৃক্ষ বা সুউচ্চ বৃক্ষ এবং গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। (চিত্র 3.4 দেখ)। দৈত্যাকার রেডউড বৃক্ষ সিকুওইয়া (Sequaia) হল এমন একটি ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ যা সুউচ্চতম বৃক্ষ প্রজাতিদের মধ্যে একটি। এদের মূলগুলো সাধারণত স্থানিক মূল হয়। ব্যক্তবীজীদের কোনও কোনও গণের মূলে ছত্রাকের সহাবস্থান দেখা যায়, যাকে বলে মাইকোরাইজা (mycorhyiza) যেমন পাইনাস। আবার সাইকাসের মতো ব্যক্তবীজীতে ক্ষুদ্র বিশেষ গঠনবিশিষ্ট মূল রয়েছে— যাদের বলা হয় কোরালয়েড মূল (Coralloid root)। এই ধরনের মূলে নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী সায়ানোব্যাকটিরিয়া বাস করে। এদের কাণ্ড শাখা বিহীন (সাইকাস) অথবা শাখা যুক্ত (পাইনাস, সিড্রাস) হয়। পাতাগুলো সরল অথবা যৌগিক প্রকৃতির হয়। সাইকাসে পক্ষল পত্রগুলো মাত্র কয়েক বছর স্থায়ী হয়। ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের পাতাগুলো এমনভাবে সুঅভিযোজিত যে, এরা অত্যধিক তাপমাত্রা আর্দ্রতা এবং বায়ুপ্রবাহ সহ্য করতে পারে। কনিফার (Conifer) জাতীয় ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের পাতাগুলো সূঁচালো হয়। যার ফলে পাতার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল হ্রাস পায়। এছাড়া পাতার পুরু কিউটিকল এবং নিবেশিত পত্ররন্ধ্র জলমোচন হ্রাসে সাহায্য করে।

ব্যক্তবীজী উদ্ভিদরা অসমরেণুপ্রসূ হয় এবং এরা হ্যাপ্লয়েড মাইক্রোস্পোর বা পুংরেণু এবং মেগাস্পোর বা স্ত্রীরেণু সৃষ্টি করে। এই দুই ধরনের রেণুই রেণুপত্রের উপর জন্মানো রেণুস্থলীতে উৎপন্ন হয়। রেণুপত্রগুলো একটি অক্ষ বরাবর সর্পিলাকারে সজ্জিত হয়ে ঠাসা স্ট্রোবাইলা বা কোণ গঠন করে। পুংরেণুপত্র এবং পুংরেণুস্থলী বহনকারী স্ট্রোবাইলাকে পুংস্ট্রোবাইলা বা পুং রেণুপত্রমঞ্জরী বলে। পুং রেণুগুলো বৃদ্ধি পেয়ে পুংলিঙ্গাধর জনু গঠন করে, যা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং কেবলমাত্র কয়েকটি কোশ সমন্বিত হয়। এই সংক্ষিপ্ত লিঙ্গাধর উদ্ভিদটিকে পরাগরেণু বলে। পরাগরেণুর বৃদ্ধি পুং রেণুস্থলীর অভ্যন্তরে ঘটে। যে কোণগুলো ডিম্বকসহ স্ত্রী রেণুস্থলী বহন করে তাদের স্ত্রীরেণুপত্রমঞ্জরী বা স্ত্রীস্ট্রোবাইলা বলে। এই পুং এবং স্ত্রী পত্রমঞ্জরী কখনো কখনো একই উদ্ভিদ হতে পারে; যেমন পাইনাস। আবার সাইকাসের ক্ষেত্রে পুং রেণুপত্রমঞ্জরী এবং স্ত্রীরেণুপত্রগুলো ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদে উৎপন্ন হয়। ভ্রূণপোষক কলার একটি কোশ বিভেদিত হয়ে স্ত্রী রেণু মাতৃকোশ তৈরি করে। ভ্রূপোষক কলাটি একটি আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে এবং এই সম্মিলিত গঠনটিকে ডিম্বক বলে। ডিম্বকগুলো স্ত্রী রেণুপত্রের ওপর জন্মায় এবং এই স্ত্রী রেণুপত্রগুলো গুচ্ছাকারে থেকে স্ত্রী রেণুপত্রমঞ্জরী গঠন করতে পারে। স্ত্রী রেণু মাতৃকোষ মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে চারটি স্ত্রী রেণু সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে একটি স্ত্রীরেণুস্থলীতে আবদ্ধ থাকে এবং পরবর্তী সময় বহুকোশী স্ত্রী লিঙ্গাধর উদ্ভিদে পরিণত হয়, যা দুই বা ততোধিক স্ত্রী জনন অঙ্গ বা স্ত্রীধানী বহন করে। বহুকোশী স্ত্রী লিঙ্গাধর উদ্ভিদটিও স্ত্রীরেণুস্থলীর অভ্যন্তরে থেকে যায়।

ব্যক্তবীজীতে ব্রায়োফাইট ও টেরিডোফাইটের মতো পুং ও স্ত্রী লিঙ্গাধর উদ্ভিদদের স্বনির্ভর ও স্বাধীনজীবী কোন অস্তিত্ব থাকে না। এরা রেণুধর উদ্ভিদ দেহে রেণুস্থলীর অভ্যন্তরে অবস্থান করে। পুং রেণুস্থলী থেকে পরাগরেণু নির্গত হয়। পরাগরেণুগুলো বায়ুপ্রবাহ দ্বারা বাহিত হয়ে স্ত্রীরেণুপত্রে উৎপন্ন ডিম্বকগুলোর ছিদ্রপথের সংস্পর্শে আসে। পুংগ্যামেট বহনকারী পরাগনালিকা ডিম্বক মধ্যস্থ স্ত্রীধানীর অভিমুখে বৃদ্ধি পায়। নিষেকের পর জাইগোট বৃদ্ধি পেয়ে ভ্রূণ গঠন করে, ডিম্বক বীজে পরিণত হয় এবং এই বীজগুলো অনাবৃত থাকে।

3.5 গুপ্তবীজী উদ্ভিদ (Angiosperms)

যেখানে ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের ডিম্বকগুলো নগ্ন থাকে সেখানে গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ডিম্বকগুলো নগ্ন না থেকে আবৃত থাকে। গুপ্তবীজী বা সপুষ্পক উদ্ভিদের পরাগ রেণু এবং ডিম্বকগুলো একটি বিশেষ গঠনে উৎপন্ন হয় এবং এই বিশেষ গঠনটিকে ফুল বলে।

(ক)

(খ)

(গ)

চিত্র 3.4 ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ ক) সাইকাস খ) পাইনাস গ) গিঙ্গো

গুপ্তবীজীদের ক্ষেত্রে বীজগুলো ফলের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। গুপ্তবীজীরা উদ্ভিদের ব্যতিক্রমধর্মী একটি বিশাল গোষ্ঠী যাদেরকে বিভিন্ন পরিবেশে জন্মাতে দেখা যায়। এদের আকার অতি ক্ষুদ্র, প্রায় আণুবীক্ষণিক যেমন ওল্‌ফিয়া ***(Wolfia)*** থেকে শুরু করে 100 মিটারেরও বেশি দৈর্ঘ্যের ইউক্যালিপটাস্ গাছ পর্যন্ত হয়। এরা আমাদের খাদ্য, পশুখাদ্য, জ্বালানি, ওষুধ এবং অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পণ্যের যোগান দেয় যেখানে গুপ্তবীজী উদ্ভিদদের দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় যেমন দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ এবং একবীজপত্রী উদ্ভিদ (চিত্র 3.5 দেখ) যেখানে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বীজে দুইটি বীজপত্র থাকে, সেখানে একবীজপত্রী উদ্ভিদের বীজে একটি মাত্র বীজপত্র রয়েছে। ফুলে পুংজনন অঙ্গ হিসাবে পুংকেশর বা Stamen থাকে। প্রতিটি পুংকেশরে একটি দণ্ডাকার পুংদণ্ড বা ফিলামেন্ট রয়েছে। পুংদণ্ডের অগ্রভাগে পরাগধানী বর্তমান। পরাগধানীতে মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় পরাগ রেণু সৃষ্টি হয়। ফুলে স্ত্রীজনন অঙ্গ হিসেবে গর্ভকেশর থাকে। গর্ভকেশরে একটি ডিম্বাশয় বর্তমান। ডিম্বাশয়ের ভেতরে এক বা একাধিক ডিম্বক থাকে। ডিম্বকের ভেতরে খুবই সংক্ষিপ্ত অবস্থায় স্ত্রী লিঙ্গাধর উদ্ভিদটি অবস্থান করে, তাকে ভ্রূণস্থলী বলে। মিয়োসিস প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে ভ্রূণস্থলী উৎপন্ন হয়। তাই ভ্রূণস্থলীর প্রতিটি কোশই হ্যাপ্লয়েড। প্রতিটি ভ্রূণস্থলী তিন কোশ বিশিষ্ট একটি গর্ভযন্ত্র (Egg apparatus), একটি ডিম্বাণু এবং দুটি সহকারী কোশ), তিনটি প্রতিপাদ কোশ সমষ্টি এবং দুটি পোলার নিউক্লিয়াস সমন্বিত হয়। পোলার নিউক্লিয়াস দুটি মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড গৌণ বা নির্ণীত নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। পরাগধানী থেকে নির্গত হওয়ার পর পরাগরেণু বায়ু অথবা অন্যান্য বাহকের মাধ্যমে গর্ভকেশরের গর্ভমুণ্ডে এসে পৌঁছায়, এই ঘটনাটিকে পরাগযোগ বলে। পরাগ রেণুগুলো গর্ভমুণ্ডের ওপরে অঙ্কুরিত হয় এবং পরাগনালিকা সৃষ্টি হয়। এই পরাগনালিকা গর্ভমুণ্ড এবং গর্ভদণ্ডস্থিত কলার মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ডিম্বকে এসে পৌঁছায়। পরাগনালিকা ভ্রূণস্থলীতে প্রবেশ করে এবং সেখানে দুটি পুংগ্যামেটকে নিক্ষেপ করে।

(ক)

(খ)

চিত্র 3.5. গুপ্তবীজী : ক) একটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ খ) একটি একবীজপত্রী উদ্ভিদ

এদের মধ্যে একটি পুংগ্যামেট ডিম্বাণুর সাথে মিলিত (নিষিক্ত) হয়ে জাইগোট সৃষ্টি করে (Syngamy) এবং অপর পুংজননকোষটি ডিপ্লয়েড গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়ে ট্রিপ্লয়েড (3n) প্রাথমিক সস্য নিউক্লিয়াস গঠন করে। এখানে দুইবার নিষেক ঘটে বলে এই ঘটনাটিকে দ্বিনিষেক বা Double fertilization বলে। এই দ্বিনিষেক প্রক্রিয়াটি গুপ্তবীজী উদ্ভিদের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীতে জাইগোটটি ভ্রূণে (একটি বা দুটি বীজপত্র সহ) এবং প্রাথমিক সস্য নিউক্লিয়াসটি সস্যে পরিণত হয়, যা বর্ধনশীল ভ্রূণটিকে পুষ্টি সরবরাহ করে। নিষেকের পরপরই সহকারী কোশ এবং প্রতিবাদ কোশগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই ঘটনাবলির সময়েই ডিম্বক বীজে এবং ডিম্বাশয় ফলে পরিণত হয়। গুপ্তবীজী উদ্ভিদের জীবনচক্রটি চিত্র - 3.6 এ দেখানো হল।

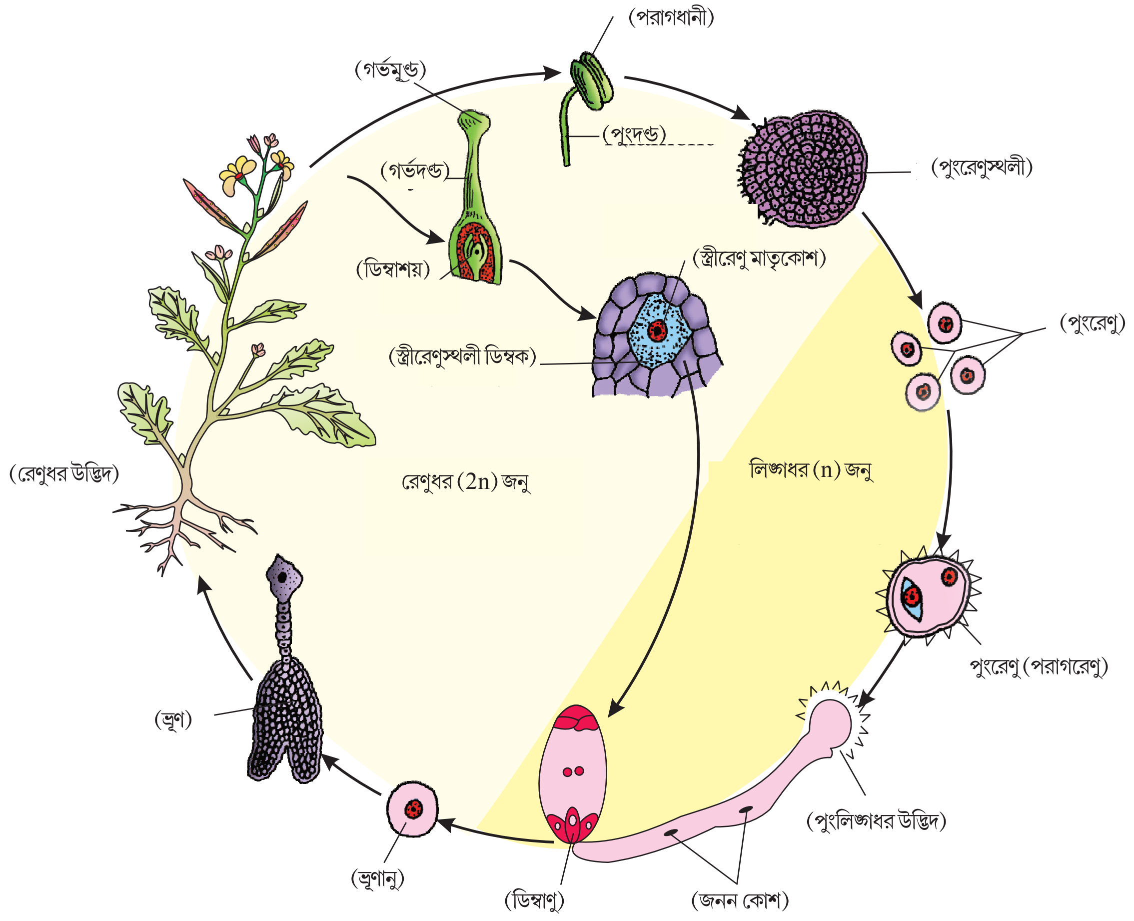

চিত্র 3.6. গুপ্তবীজী উদ্ভিদের জীবনচক্র

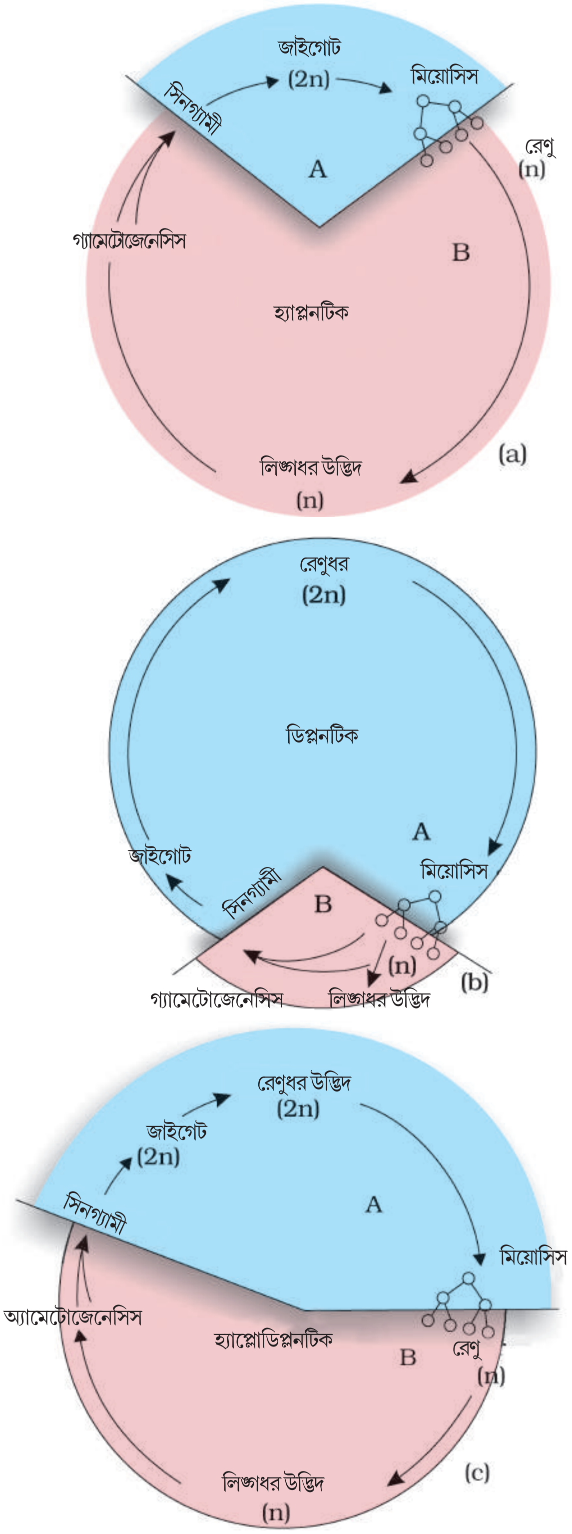

চিত্র 3.7. জীবনচক্রের ধরন : ক) হ্যাপ্লনটিক খ) ডিপ্লনটিক গ) হ্যাপ্লো-ডিপ্লনটিক

3.6 উদ্ভিদের জীবনচক্র এবং জনুক্রম (Plant life cycle and alternation of generation)

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হ্যাপ্লয়েড এবং ডিপ্লয়েড উভয় প্রকার কোশই মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হতে পারে। এই ক্ষমতার জন্যই হ্যাপ্লয়েড এবং ডিপ্লয়েড উদ্ভিদের বিভিন্ন দেহাংশ তৈরি হয়। হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ দেহ, মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় গ্যামেট বা জনন কোশ তৈরি করে। এই উদ্ভিদদেহটি লিঙ্গাধর উদ্ভিদ। নিষেকের পর, জাইগোটটিও মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয় এবং ডিপ্লয়েড রেণুধর উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়। এই রেণুধর উদ্ভিদ মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় হ্যাপ্লয়েড রেণু তৈরি করে। পরবর্তী সময় এই রেণু মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে আবার হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদদেহ বা রেণুধর উদ্ভিদ গঠন করে। তাই, যে কোন যৌন জননকারী উদ্ভিদের জীবনচক্রকালে গ্যামেট উৎপাদনকারী হ্যাপ্লয়েড লিঙ্গাধর উদ্ভিদ এবং রেণু উৎপাদনকারী ডিপ্লয়েড রেণুধর উদ্ভিদের মধ্যে জনুক্রম পরিলক্ষিত হয়।

তথাপি বিভিন্ন উদ্ভিদগোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীভুক্ত একক উদ্ভিদেরা নিম্নলিখিতভাবে পৃথক হয়:

1. রেণুধর জনুর একমাত্র প্রতিনিধি হল এককোশী জাইগোট। এখানে কোনো স্বাধীনজীবী রেণুধর দেহ দেখা যায় না। মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে জাইগোট হ্যাপ্লয়েড রেণু সৃষ্টি করে। আবার হ্যাপ্লয়েড রেণুগুলো মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে লিঙ্গাধর উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। এইসব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রধান সালোকসংশ্লেষকারী দশাটি স্বাধীন লিঙ্গাধর উদ্ভিদ। এই ধরনের জীবনচক্রকে হ্যাপ্লনটিক জীবনচক্র বলে। কিছু শৈবাল যেমন ভলভক্স, স্পাইরোজাইরা এবং ক্ল্যামাইডোমোনাসের কিছু প্রজাতির ক্ষেত্রে এই ধরনের অর্থাৎ হ্যাপ্লনটিক জীবনচক্র লক্ষ করা যায়। (চিত্র 3.7 ক দেখ)।

2. অন্যদিকে কিছু উদ্ভিদে জীবনচক্রের এমন ধরন রয়েছে, যেখানে ডিপ্লয়েড রেণুধর উদ্ভিদটি প্রধান সালোকসংশ্লেষকারী স্বাধীনদশা। এক্ষেত্রে লিঙ্গাধর দশাটি হল এক বা একাধিক কোশ বিশিষ্ট হ্যাপ্লয়েড লিঙ্গাধর উদ্ভিদ দেহ। এই ধরনের জীবনচক্রকে ডিপ্লনটিক জীবনচক্র বলা হয়। সমস্ত বীজ ধারণকারী উদ্ভিদ অর্থাৎ ব্যক্তজীবী এবং গুপ্তবীজী উদ্ভিদ উভয়ক্ষেত্রে এই ধরনের জীবনচক্র দেখা যায়। (চিত্র 3.7 খ)

3. মজার বিষয় হল, ব্রায়োফাইটা এবং টেরিডোফাইটাদের ক্ষেত্রে হ্যাপ্লন্টিক এবং ডিপ্লন্টিক জীবনচক্রের মধ্যবর্তী একটি পর্যায়ের জীবনচক্র দেখা যায়, যাকে বলা হয় হ্যাপ্লো ডিপ্লনটিক জীবনচক্র। এখানে জীবনচক্রের দুটি দশাই বহুকোশী, যদিও তাদের প্রধান দশাগুলোতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ব্রায়োফাইটা গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদে হ্যাপ্লয়েড লিঙ্গাধর দশাটি প্রধান, স্বাধীনজীবী, সালোক সংশ্লেষকারী থ্যালাস জাতীয় বা খাড়া বায়ব অংশ সমন্বিত হয় এবং এটি স্বল্পজীবী, বহুকোশী রেণুধর উদ্ভিদের সাথে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়। রেণুধর উদ্ভিদটি পুষ্টির জন্য এবং মাটির সাথে আবদ্ধ থাকার জন্য সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে লিঙ্গাধর উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। টেরিডোফাইটা গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদে ডিপ্লয়েড রেণুধর উদ্ভিদটি প্রধান এটি স্বাধীনজীবী, সালোকসংশ্লেষকারী ও সংবহনকলা বিশিষ্ট হয়।

এদের রেণুধর জনুটি বহুকোশী, স্বভোজী, স্বাধীনজীবী কিন্তু স্বল্প স্থায়ী হ্যাপ্লয়েড লিঙ্গাধর জনুর সহিত পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়। এ ধরনের জীবনচক্রকে হ্যাপ্লোডিপ্লন্‌টিক জীবনচক্র বলে। সব টেরিডোফাইটে এ ধরনের জীবনচক্র দেখা যায় (চিত্র 3.7 দেখ)।

আশ্চর্যজনকভাবে যখন বেশির ভাগ শৈবাল 'গণ' গুলো হ্যাপ্লনটিক তখন কিছু কিছু যেমন এক্টোকারপাস, পলিসাইফোনিয়া, কেল্‌প শৈবাল হ্যাপ্লোডিপ্লনটিক এবং ফিউকাস ডিপ্লন্‌টিক শৈবাল হয়।

সারসংক্ষেপ (Summary)

শৈবাল, ব্রায়োফাইটা, টেরিডোফাইটা, গুপ্তবীজী ও ব্যক্তবীজী শ্রেণিগুলো নিয়ে উদ্ভিদরাজ্য গঠিত। শৈবাল হচ্ছে ক্লোরোফিলযুক্ত, সালোকসংশ্লেষে সক্ষম, অবিভেদিত দেহ সংগঠনবিশিষ্ট জীব, যাদের বেশির ভাগই জলজ। দেহে উপস্থিত রঞ্জক এবং সঞ্চিত খাদ্যের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে শৈবালকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন ক্লোরোফাইসি, ফিওফাইসি, এবং রোডোফাইসি। শৈবাল সাধারণত খণ্ডীভবন প্রক্রিয়ায় অঙ্গজ জনন, বিভিন্ন ধরনের রেণু উৎপাদনের মাধ্যমে অযৌন জনন এবং আইসোগ্যামী, অ্যানাইসোগ্যামী অথবা ঊগ্যামী যে কোন ধরনের জনন কোশ বা গ্যামেট সৃষ্টির মাধ্যমে যৌন জনন সম্পন্ন করে।

ব্রায়োফাইটা এমন এক উদ্ভিদগোষ্ঠী যারা মাটিতে বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু যৌন জননের সময় এদের জলের প্রয়োজন হয়। শৈবালের তুলনায় এদের দেহ অনেক বেশি বিভেদিত হয়। এরা থ্যালাসের মত দেহ গঠন বিশিষ্ট যা রাইজয়েড দ্বারা কোন স্থির কঠিন বস্তুর সাথে খাড়াভাবে আটকে থাকে। এদের দেহে মূলের মত, কাণ্ডের মতো এবং পাতার মতো গঠন পরিলক্ষিত হয়। ব্রায়োফাইটাদের দুইভাগে ভাগ করা যায়— লিভারওয়র্ট এবং মস্‌। লিভারওয়র্টের দেহ থ্যালাস যুক্ত হয়। ব্রায়োফাইটার প্রধান দেহ গঠনটি হচ্ছে গ্যামেট উৎপাদনকারী লিঙ্গাধর উদ্ভিদ। এটি পুংধানী এবং স্ত্রীধানী ধারণ করে। পুংগ্যামেট এবং স্ত্রী গ্যামেটের মিলনের ফলে জাইগোট বা ভ্রূণ গঠিত হয়, এই ভ্রূণ বা জাইগোট থেকেই বহুকোশী রেণুধর উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়। এই রেণুধর উদ্ভিদ দেহ হ্যাপ্লয়েড রেণু উৎপাদন করে। রেণু অঙ্কুরিত হয়ে লিঙ্গাধর উদ্ভিদ গঠন করে।

টেরিডোফাইটা গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদের প্রধান উদ্ভিদদেহটি হল রেণুধর জনু। এটি মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভেদিত। এই দেহাংশগুলোতে সুস্পষ্ট সংবহন কলা বর্তমান। রেণুধর উদ্ভিদে উপস্থিত রেণুস্থলীগুলো রেণু সৃষ্টি করে। এই রেণুগুলোই অঙ্কুরিত হয়ে লিঙ্গাধর উদ্ভিদে পরিণত হয়। এরা শীতল, স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে জন্মায়। লিঙ্গাধর উদ্ভিদটি পুংজনন অঙ্গ পুংধানী এবং স্ত্রী জননঅঙ্গ স্ত্রীধানী ধারণ করে। পুংজনন কোশ জলের মাধ্যমে স্ত্রী জননঅঙ্গ স্ত্রীধানীতে এসে পৌঁছায়। সেখানে নিষেক সম্পন্ন হয় এবং নিষেকের পর জাইগোট সৃষ্টি হয়। এই জাইগোটটি রেণুধর উদ্ভিদ গঠন করে।

ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ডিম্বকগুলো কোন ডিম্বাশয়ের প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকে না। নিষেকের পর বীজগুলো ফলের বাইরের দিকে উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং একারণেই এরা ব্যক্তবীজী বা নগ্নবীজী উদ্ভিদ। ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের রেণুপত্রে সৃষ্ট পুংরেণুস্থলী এবং স্ত্রী রেণুস্থলীতে যথাক্রমে পুংরেণু এবং স্ত্রীরেণু উৎপন্ন হয়। রেণুপত্রগুলো দুই ধরনের হয়— পুংরেণুপত্র এবং স্ত্রীরেণুপত্র। এরা রেণুপত্রমঞ্জরীর অক্ষের উপর সর্পিলাকারে সজ্জিত হয়ে যথাক্রমে পুংরেণু পত্রমঞ্জরী ও স্ত্রীরেণুপত্রমঞ্জরী গঠন করে। পরাগরেণু অঙ্কুরিত হয় এবং পরাগনালীর মাধ্যমে পুংগ্যামেটটি গর্ভাশয়ে অবস্থিত ডিম্বকের সান্নিধ্যে চলে আসে। দুটি একসাথে মিলিত হয় এবং নিষেক সংঘটিত হয়। নিষেকের পর জাইগোটটি ভ্রূণে এবং ডিম্বক বীজে পরিণত হয়।
গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ফুলের মধ্যেই পুংজননঅঙ্গা পুংকেশর এবং স্ত্রীজননঅঙ্গা গর্ভকেশর থাকে। প্রতিটি পুংকেশর একটি পুংদণ্ড এবং পরাগধানী নিয়ে গঠিত। এই পরাগধানী মিয়োসিস পদ্ধতিতে পুংজনন কোশ পরাগরেণু সৃষ্টি করে। এদিকে গর্ভকেশরের গর্ভাশয়ে এক বা একাধিক ডিম্বক থাকে। ডিম্বকের মধ্যে রয়েছে ভ্রূণস্থলী, যা ডিম্বাণুকে ধারণ করে রাখে। পরাগনালী ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে ভ্রূণস্থলীর ভিতরে প্রবেশ করে এবং এখানে দুটি পুংগ্যামেটকে নিক্ষেপ করে। এদের মধ্যে একটি পুংগ্যামেট ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় এবং অপরটি ডিপ্লয়েড নির্ণীত নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়। এখানে দুইবার মিলন বা নিষেক ঘটার এই ঘটনাটিকে দ্বিনিষেক বলে। দ্বিনিষেক গুপ্তবীজী উদ্ভিদের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। গুপ্তবীজী উদ্ভিদের আবার দুটো শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে— একবীজপত্রী উদ্ভিদ ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ।

যে কোনো যৌনজননকারী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে গ্যামেট উৎপাদনকারী হ্যাপ্লয়েড লিঙ্গাধর উদ্ভিদ এবং রেণু উৎপাদনকারী ডিপ্লয়েড রেণুধর উদ্ভিদের মধ্যে জনুক্রম পরিলক্ষিত হয়। তথাপি বিভিন্ন উদ্ভিদ গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠীভুক্ত একক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের জীবনচক্র — হ্যাপ্লন্টিক, ডিপ্লন্টিক অথবা এ দুটির মধ্যবর্তী অর্থাৎ হ্যাপ্লডিপ্লন্টিক জীবনচক্র দেখা যায়।

অনুশীলনী (Exercise)

1. শৈবালের শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি কী?
2. একটি লিভারওয়র্ট, একটি মস্, একটি ফার্ণ, একটি ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ ও একটি গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কখন এবং কোথায় হ্রাস বিভাজন ঘটে?
3. এমন তিনটি উদ্ভিদগোষ্ঠীর নাম করো যাদের গর্ভাশয় রয়েছে। এদের মধ্যে যে কোন একটির জীবনচক্র বর্ণনা করো।
4. নিম্নলিখিতগুলোর প্লয়ডি উল্লেখ করো। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রাথমিক এন্ডোস্পার্ম নিউক্লিয়াস, মসের পাতার কোশ, ফার্ণের প্রোথ্যালাসের কোশ, মার্কেনসিয়ার গেমা কোশ, একবীজপত্রী উদ্ভিদের ভাজক কলার কোশ, লিভার ওয়ার্টের ডিম্বাণু এবং ফার্ণের জাইগোট।
5. শৈবাল এবং ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।
6. ব্যক্তবীজী এবং গুপ্তবীজী উদ্ভিদ উভয়েই বীজ ধারণ করে, তবে কেন এদেরকে পৃথক পৃথক শ্রেণিতে রাখা হয়?
7. অসমরেণুপ্রসূতা কী? এর তাৎপর্য সম্পর্কে মন্তব্য করো। এ ধরনের ঘটনা ঘটে এমন দুটি উদ্ভিদের উদাহরণ দাও।

8. উপযুক্ত উদাহরণসহ নিম্নলিখিতগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করো:
   ক) প্রোটোনিমা
   খ) অ্যান্থেরিডিয়াম বা পুংধানী
   গ) অ্যার্কিগোনিয়াম বা স্ত্রীধানী
   ঘ) ডিপ্লনটিক
   ঙ) স্পোরোফিল বা রেণুপত্র
   চ) আইসোগ্যামী।
9. নিম্নলিখিতগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো।
   ক) লোহিত শৈবাল এবং বাদামি শৈবাল
   খ) লিভারওয়র্ট এবং মস
   গ) সমরেণুপ্রসূ এবং অসমরেণুপ্রসূ টেরিডোফাইটা
   ঘ) সিনগ্যামী এবং ট্রিপল্ ফিউশন
10. কীভাবে তুমি একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রীর মধ্যে তুলনা করবে।
11. স্তম্ভ মেলাও (স্তম্ভ I এর সঙ্গে স্তম্ভ II)

স্তম্ভ I	স্তম্ভ II
ক) ক্ল্যামাইডোমোনাস	ক) মস
খ) সাইকাস	খ) টেরিডোফাইটা
গ) সেলাজিনেলা	গ) ব্যক্তবীজী
ঘ) স্ফ্যাগনাম	ঘ) শৈবাল

11. ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করো।

অধ্যায় -4 (Chapter 4)

প্রাণী-রাজ্য (Animal Kingdom)

4.1 শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি
4.2 প্রাণীদের শ্রেণিবিন্যাস

তোমরা যখন তোমাদের চারপাশে লক্ষ করবে তখন ভিন্ন ভিন্ন ধরন ও গঠন বিশিষ্ট বিভিন্ন প্রাণী দেখতে পাবে। যেহেতু এখন পর্যন্ত লক্ষাধিক প্রাণী প্রজাতির বর্ণনা করা হয়েছে তাই এইসব প্রাণীদের শ্রেণিবিন্যাসকরণের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই শ্রেণিবিন্যাস নতুনভাবে বর্ণিত প্রজাতিগুলোকে সঠিক শ্রেণিগত স্থানে বিন্যস্ত করতেও সাহায্য করে।

4.1 শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি (Basis of Classification)

বিভিন্ন প্রাণীদের গঠন ও ধরনে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন একক প্রাণীদের মধ্যে কতকগুলো সাধারণ মৌলিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যে যে বিষয়ের সঙ্গে এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কিত সেগুলো হল কোশের সজ্জারীতি, দেহের প্রতিসাম্য, সিলোমের প্রকৃতি এবং পৌষ্টিকতন্ত্র অথবা জননতন্ত্রের ধরন। এই বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রাণীদের শ্রেণিবিন্যাসকরণের মূল ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এখানে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

4.1.1 সংগঠনের স্তর সমূহ (Levels of Organisation)

যদিও প্রাণীরাজ্যের সব প্রাণীই বহুকোশী, তথাপি সবার দেহে কোশের সজ্জারীতি বা কোশীয় সংগঠন একই ধরনের হয় না। যেমন স্পঞ্জে কোশগুচ্ছ শিথিলভাবে সজ্জিত থাকে, অর্থাৎ এদের দেহে কোশস্তরীয় সংগঠন পরিলক্ষিত হয়। কোশগুলোতে কিছুটা শ্রমবিভাজন লক্ষ করা যায়। একনালীদেহী বা সিলেনটারেটা-এর ক্ষেত্রে কোশের সজ্জারীতি অধিকতর জটিল হয়। এক্ষেত্রে কার্যগত দিক থেকে একই প্রকারের কোশগুলো সজ্জিত হয়ে কলা গঠন করে। তাই একে কলাস্তরীয় সংগঠন বলা হয়। এর থেকেও উচ্চস্তরীয় সংগঠন অর্থাৎ অঙ্গাস্তরীয় সংগঠন দেখা যায় চ্যাপ্টাকৃমি বা প্লাটিহেলমিনথেস এবং অন্যান্য উচ্চপর্বের প্রাণীদের দেহে, যেখানে কলাগুলো একত্রিত হয়ে অঙ্গ গঠন করে এবং প্রতিটি অঙ্গ এক একটি নির্দিষ্ট কাজের

উপযোগী হয়। আবার কিছু প্রাণী যেমন অঙ্গুরীমাল, সন্ধিপদী, শম্বুক, কণ্টকত্বক এবং কর্ডাটার মতো পর্বে প্রাণীদের অঙ্গগুলো সংগঠিত হয়ে এক একটি কার্যকরী তন্ত্র গঠন করে। এইরূপ প্রতিটি তন্ত্র সুনির্দিষ্ট শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলির সাথে যুক্ত থাকে। এই ধরনের সংগঠনকে অঙ্গাতন্ত্রস্তরীয় সংগঠন বলে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রাণীদের অঙ্গাতন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের গঠনগত জটিলতা দেখা যায়। উদাহরণ হিসাবে প্লাটিহেলমিনথেসের পৌষ্টিকতন্ত্র একটি মাত্র ছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে উন্মুক্ত থাকে। এই ছিদ্রটিই মুখছিদ্র এবং পায়ুছিদ্র হিসাবে কাজ করে। এই কারণেই এদের পৌষ্টিকতন্ত্রকে অসম্পূর্ণ পৌষ্টিকতন্ত্র বলা হয়। একটি সম্পূর্ণ পৌষ্টিকতন্ত্রে দুটি ছিদ্রপথ থাকে— মুখছিদ্র এবং পায়ুছিদ্র। একইভাবে সংবহনতন্ত্রও দুই ধরনের হতে পারে মুক্ত সংবহনতন্ত্র ও বদ্ধ সংবহনতন্ত্র।

মুক্ত সংবহনতন্ত্র : এক্ষেত্রে হৃৎপিন্ড থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত সরাসরি কোশ এবং কলার সংস্পর্শে আসে।

বদ্ধ সংবহনতন্ত্র : এক্ষেত্রে রক্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যসবিশিষ্ট একের পর এক রক্তবাহের (ধমনী, শিরা এবং রক্ত জালক) মধ্য দিয়ে সংবাহিত হয় চিত্র **4.1** খ দেখো)।

4.1.2 প্রতিসাম্য (Symmetry)

দেহের প্রতিসাম্যের ওপর ভিত্তি করে প্রাণীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিন্যস্ত করা যায়। স্পঞ্জের দেহ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অপ্রতিসম। অর্থাৎ এদের দেহকে কেন্দ্র বরাবর যে-কোনো তলেই কাটা হোক না কেন, দেহকে সমান দুইটি অংশে বিভক্ত করা যায় না। কোনো প্রাণীর দেহকে কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর যে-কোনো তলে কাটা হলে যদি দেহটি দুইটি সমান অংশে বিভক্ত হয়, তবে এই ধরনের প্রতিসাম্যকে অরীর প্রতিসাম্য বলে। সিলেনটারেটা, টিনোফোরা এবং একাইনোডার্মাটা পর্বভুক্ত প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিসাম্য লক্ষ করা যায় (চিত্র 4.1 (ক) দেখ)। আবার অ্যানিলিডা এবং আর্থ্রোপোডা ইত্যাদি পর্বভুক্ত প্রাণীদের দেহকে কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর একটি তলে কাটলে ডান ও বাম সমান দুটি অংশে বিভক্ত করা যায়। এই ধরনের প্রতিসাম্যকে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য বলে।

4.1.3 দ্বিস্তরীয় এবং ত্রিস্তরীয় দেহ সংগঠন (Diplobastic and Triplobastic Organisation)

যে সমস্ত প্রাণীদের ক্ষেত্রে ভ্রূণাবস্থায়, সব কোশগুলো বহিঃস্থ এক্টোডার্ম এবং অন্তঃস্থ এন্ডোডার্ম এই দুটি ভ্রূণস্তরে সজ্জিত থাকে, তাদের দ্বিস্তরী প্রাণী বলে। যেমন সিলেনটারেটা বা একনালীদেহী।

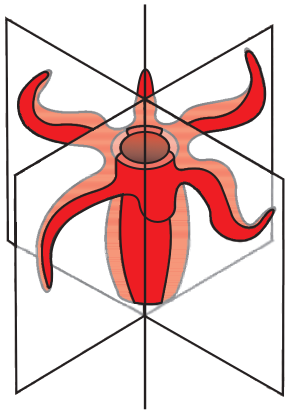

চিত্র **4.1** (ক) অরীয় প্রতিসাম্য

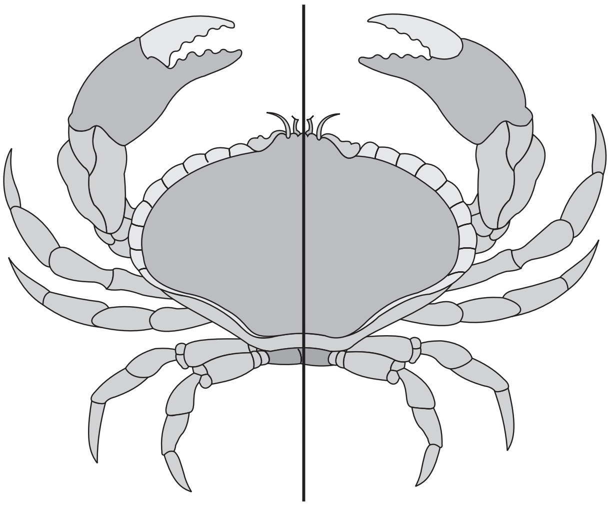

চিত্র **4.1** (খ) দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য

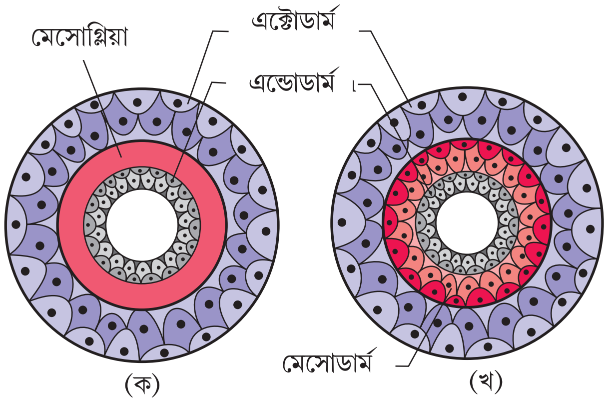

চিত্র **4.2** ভ্রূণস্তরের দৃশ্য : ক) দ্বিস্তরীয় খ) ত্রিস্তরীয়

এক্টোডার্ম এবং এন্ডোডার্মের মধ্যবর্তী অঞ্চলে মেসোগ্লিয়া নামক একটি অবিভেদিত স্তর পরিলক্ষিত হয় (চিত্র 4.2 (ক) দেখো)। যে সব প্রাণীদের ক্ষেত্রে এক্টোডার্ম এবং এন্ডোডার্ম ছাড়াও বর্দ্ধনশীল ভ্রূণে মেসোডার্ম নামক আরও একটি তৃতীয় ভ্রূণস্তর থাকে তাদের ত্রিস্তরীয় প্রাণী বলে (চ্যাপ্টা কৃমি থেকে শুরু করে কর্ডাটা পর্যন্ত সব পর্বের প্রাণী (চিত্র 4.2 খ দেখ)।

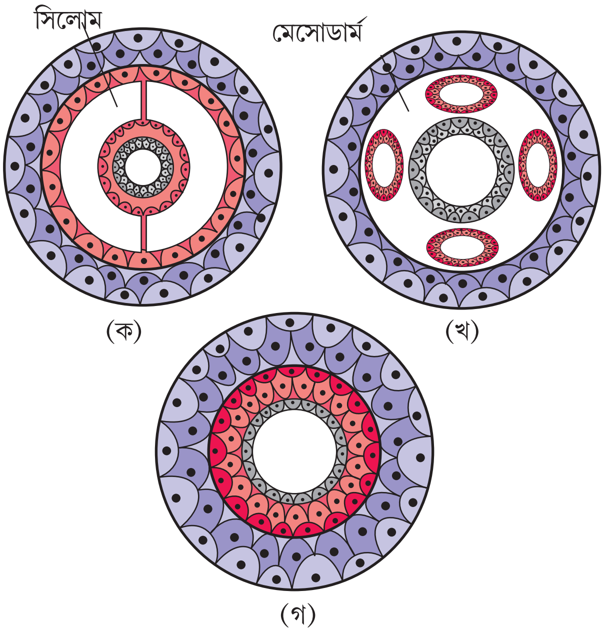

চিত্র 4.3 ছেদদৃশ্যের চিত্র রূপ
(ক) সিলোম বিশিষ্ট (খ) ছদ্ম সিলোম বিশিষ্ট
(গ) সিলোম বিহীন

4.1.4 দেহগহ্বর (Coelom)

শ্রেণি বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রাণীদের দেহের প্রাকার এবং পৌষ্টিক নালির প্রকারের মধ্যবর্তী গহ্বরের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেসোডার্ম দ্বারা আবৃত এই দেহ গহ্বরকে সিলোম বলে। সিলোমযুক্ত প্রাণীদের সিলোমেট (Coelomate) বলে। যেমন অঙ্গুরীমাল বা অ্যানিলিডা (Annelida) কম্বোজ বা মোলাস্কা (Mollusca), সন্ধিপদী বা আর্থ্রোপোডা (Arthropoda), কন্টকত্বক বা একাইনোডারমাটা (Echinodermata), হেমিকর্ডাটা (Hemichordata) এবং কর্ডাটা (Chordata) পর্বের প্রাণীরা (চিত্র 4.3 (ক) দেখ) কিছু কিছু প্রাণীতে দেহগহ্বর মেসোডার্ম দ্বারা আবৃত থাকে না পরিবর্তে মেসোডার্ম স্তরটি এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্মের মধ্যবর্তী স্থানে থলির মত অংশ হিসেবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। এই ধরনের দেহগহ্বরকে ছদ্ম-সিলোম (Pseudocoelome)বলে। যেমন অ্যাস্কেলমিনথেস (Aschelminthes) (চিত্র 4.3 খ দেখ)। আবার যেসব প্রাণীদেহে দেহগহ্বর পুরোপুরি অনুপস্থিত তাদের সিলোমবিহীন (Acoelomate) বলে, যেমন প্ল্যাটিহেলমিনথেস, (Platy-helminthes) (চিত্র 4.1 গ দেখ)।

4.1.5 খণ্ডীভবন (Segmentation)

কিছু প্রাণীর ক্ষেত্রে এদের দেহ বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকেই অন্ততঃ কিছু অঙ্গের ক্রমিক পুনরাবৃত্তি সহ খণ্ডকে বিভক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ কেঁচো এই ধরনের খণ্ডীভবন লক্ষ করা যায় এবং এই ঘটনাটিকে বলা হয় মেটামেরিজম (metamerism)

4.1.6 নোটোকর্ড (Notochord)

কিছু প্রাণীতে ভ্রূণের বৃদ্ধিকালে পৃষ্ঠদেশ বরাবর মেসোডার্ম-স্তর থেকে উৎপন্ন দণ্ডের মতো গঠন বিশিষ্ট নোটোকর্ড গঠিত হয়। নোটোকর্ড বিশিষ্ট প্রাণীদের কর্ডাটা (Chordates) এবং নোটোকর্ড বিহীন প্রাণীদের নন কর্ডাটা (Non-chordates) বলে। যেমন পরিফেরা থেকে একাইনোডারমাটা পর্বের প্রাণীরা।

4.2 প্রাণীদের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Animals)

সাধারণ মৌলিক বৈশিষ্টাবলির উপর ভিত্তি করে পূর্ববর্তী অংশে বর্ণিত প্রাণীদের বিশদ শ্রেণি বিন্যাসটি চিত্র 4.4 এ দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন পর্বের প্রাণীদের গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা হল।

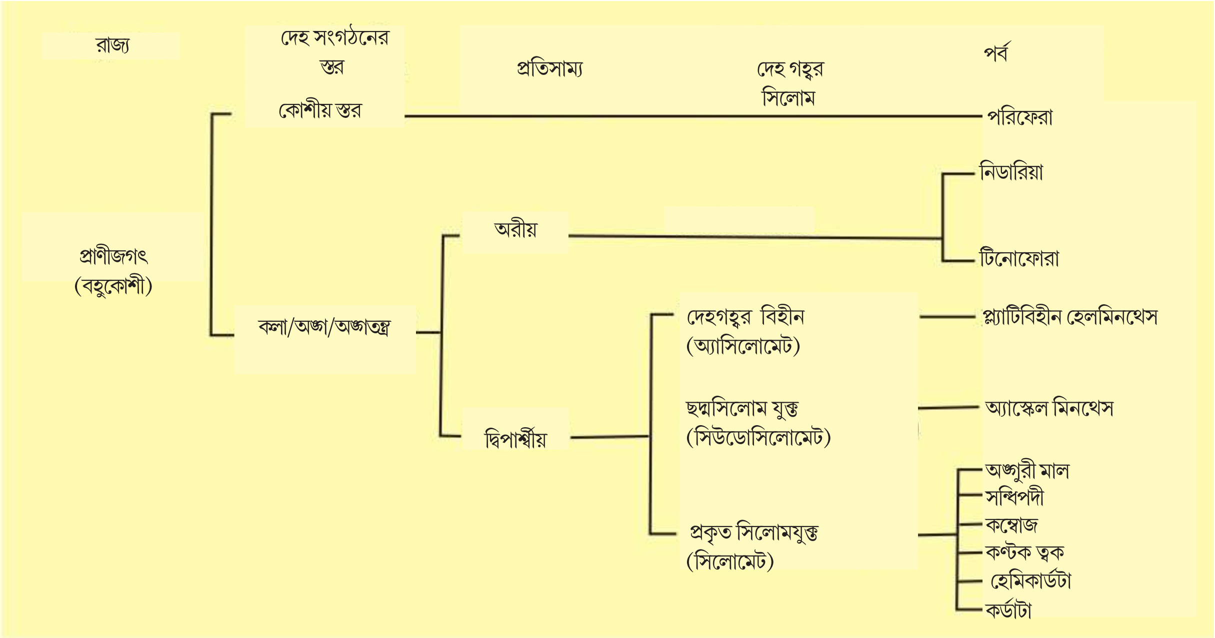

* বিভিন্ন দশার সাপেক্ষে কন্টকত্বক প্রাণীতে অরীয় অথবা দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য পরিলক্ষিত হয়

চিত্র 4.4 সাধারণ মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলির উপর ভিত্তি করে প্রাণীরাজ্যের বিশদ শ্রেণিবিন্যাস।

4.2.1 পর্ব — পরিফেরাা (Porifera)

এই পর্বভুক্ত প্রাণীরা সচরাচর স্পঞ্জ নামে পরিচিত। সাধারণত এরা সামুদ্রিক। এদের বেশিরভাগই অপ্রতিসম দেহ গঠন বিশিষ্ট হয় (চিত্র 4.5 এ দেখ) এরা আদি বহুকোশী প্রাণী এবং এদের দেহে কোশস্তরীয় সংগঠন পরিলক্ষিত হয়। স্পঞ্জের দেহে জল পরিবহণকারী নালিকাতন্ত্র বর্তমান। এদের দেহ প্রাচীরে উপস্থিত অস্টিয়া নামক সূক্ষ্মছিদ্রের মাধ্যমে দেহের কেন্দ্রীয় গহ্বরে জল প্রবেশ করে। এই কেন্দ্রীয় গহ্বরটিকে স্পঞ্জোসিল বলে। স্পঞ্জোসিল থেকে জল আবার অপেক্ষাকৃত বড়ো ছিদ্র অসকিউলামের মাধ্যমে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়। নালিকাতন্ত্রের মাধ্যমে জলের এই পরিবহণ পথটি স্পঞ্জকে খাদ্য সংগ্রহ, গ্যাসীয় বিনিময় এবং দেহ থেকে বর্জ্য নিষ্কাশনে সহায়তা করে। কোয়েনোসাইট বা কলার কোশ (callar cell) নামক কিছু কোশ স্পঞ্জোসিল এবং নালিকাতন্ত্রের নালিকাগাত্রকে আবৃত করে রাখে। এদের ক্ষেত্রে অন্তঃকোশীয় পরিপাক পরিলক্ষিত হয়। দেহে স্পিকিউল বা স্পনজিন তন্তুনির্মিত কঙ্কাল বর্তমান। এই পর্বের প্রাণীদের মধ্যে লিঙ্গভেদ অনুপস্থিত, অর্থাৎ এরা উভলিঙ্গ প্রাণী এবং একই প্রাণীতে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু উভয়ই সৃষ্টি হয়। স্পঞ্জ খণ্ডীভবন প্রক্রিয়ায় অযৌন জনন সম্পাদন করে এবং গ্যামেট উৎপাদনের মাধ্যমে যৌন জনন সম্পন্ন করে। এদের ক্ষেত্রে অন্ত:নিষেক ও পরোক্ষ পরিস্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়। তাই এদের ক্ষেত্রে লার্ভা দশা দেখা যায় এবং লার্ভা অঙ্গসংস্থানিক দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী থেকে একেবারে স্বতন্ত্র হয়।

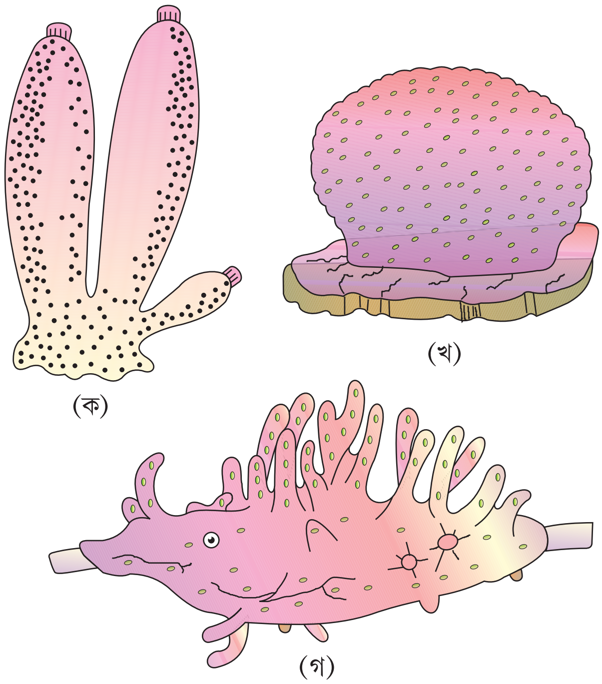

চিত্র 4.5 পরিফেরা পর্বভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ : (ক) সাইকন (খ) ইউস্পঞ্জিয়া (গ) স্পঞ্জিলা

উদাহরণ : ***Sycon*** (স্কাইফা), ***Spongilla*** (স্বাদু জলের স্পঞ্জ) এবং ***Euspongia*** (বাথ স্পঞ্জ)।

4.2.2 পর্ব— সিলেনটারেটা / নিডারিয়া (Coelenterata / Cnidaria)

এই পর্বভুক্ত প্রাণীরা জলজ এবং বেশির ভাগই সামুদ্রিক একই জায়গায় আবদ্ধ থাকে অথবা সঞ্চরণশীল হয়। এদের দেহ অরীয়ভাবে প্রতিসম (চিত্র 4.6) । নিডোব্লাস্ট (Cnidoblasts) অথবা নিডোসাইট (Cnidocytes) শব্দটি থেকে 'নিডারিয়া' নামটি এসেছে।

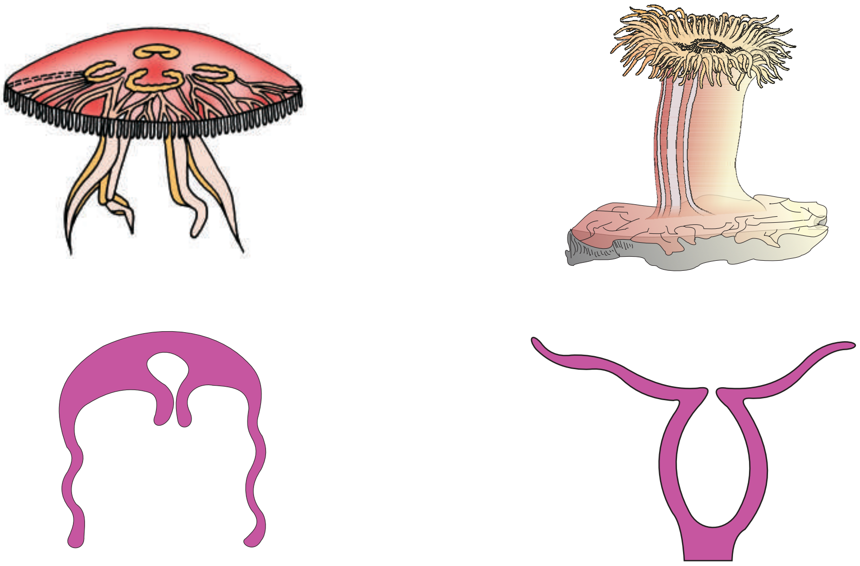

(ক) Aurelia (মেডুসা) (খ) Adamsia (পলিপ)

চিত্র 4.3 সিলেনটারেটা পর্বভুক্ত কিছু প্রাণীতে তাদের দেহ গঠনের রূপরেখা দেখানো হয়েছে।

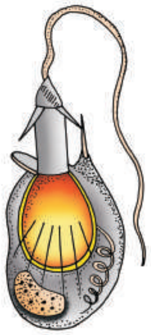

চিত্র 4.7 নিডোব্লাস্টের চিত্ররূপ

নিডোব্লাস্টের ভেতরে দংশক থলি (Stinging Capsule) থাকে। নিডোব্লাস্টগুলো এই পর্বের প্রাণীদের কর্ষিকায় এবং দেহে উপস্থিত থাকে। নিডোব্লাস্টগুলো কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরতে আত্মরক্ষার্থে এবং খাদ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হয় (চিত্র 4.7 দেখো)। এই পর্বভুক্ত প্রাণীর মধ্যে কলাস্তরীয় সংগঠন লক্ষ করা যায় এবং এরা দ্বিস্তরীয় হয়। এদের একটি মাত্র ছিদ্র-মুখছিদ্র, বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় গ্যাসট্রোভাসকুলার গহ্বর (Gastrovascular Cavity) বর্তমান হাইপোস্টোম নামক অংশটিতে মুখছিদ্রটি বর্তমান। পরিপাক অন্তঃকোশীয় বা বহিঃকোশীয় উভয় প্রকার হতে পারে। কোরাল বা প্রবালের মতো কিছু নিডারিয়ার দেহে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দ্বারা গঠিত কঙ্কাল বর্তমান। নিডারিয়া পর্বভুক্ত প্রাণীদের দেহে দুটি মূল দেহ গঠন পরিলক্ষিত হয়— পলিপ (Polyp) এবং মেডুসা (Medusa) চিত্র 4.6 এ দেখ)। পলিপটি নিশ্চল এবং নলাকার (যেমন হাইড্রা, ***Adamsia*** বা সি অ্যানিমোন) অন্যদিকে মেডুসা ছত্রাকার হয় এবং ***Aurelia*** বা জেলিফিসের মত স্বাধীন সঞ্চরণশীল হয়। নিডারিয়া পর্বভুক্ত যেসব প্রাণীদেহে পলিপ ও মেডুসা উভয় দশাই দেখা যায়, তাদের ক্ষেত্রে জনুদ্বয়ের আবর্তন (Metagenelis) পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ পলিপ্ অযৌন জনন প্রক্রিয়ায় মেডুসা গঠন করে এবং মেডুসা যৌন জননের মাধ্যমে পলিপস দশা গঠন করে (যেমন- ওবেলিয়া)।

উদাহরণ: ***Physalia*** (পর্তুগিজ ম্যান অব ওয়ার), ***Adamsia*** (সি অ্যানিমোন) ***Pennatula*** (সি পেন), ***Gorgonia*** (সি ফ্যান) এবং ***Meandrina*** (ব্রেইন্ কোরাল) টিনোফোরা সচরাচর

4.2.3 পর্ব— টিনোফোরা (Ctenophora)

টিনোফোরা পর্বের প্রাণীরা সচরাচর সি-ওয়ালনাট (সমুদ্র আখরোট) বা কুম্বজেলি নামে পরিচিত। এরা সম্পূর্ণভাবে সামুদ্রিক। দেহ অরীয় প্রতিসম, দ্বিস্তরীয় এবং কলাস্তরীয় সংগঠন বিশিষ্ট হয়। দেহের বাইরের দিকে সিলিয়াযুক্ত কোম্বপ্লেটের আটটি সারি রয়েছে, এগুলো এদের চলনের সহায়ক। (চিত্র 4.8 এ দেখ)। বহিঃকোশীয় এবং আন্তঃকোশীয় উভয়প্রকার পরিপাক পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয় টিনোফোরা পর্বের প্রাণীদের মধ্যে জৈবজ্যোতি বিচ্ছুরণ (Bioluminescence) (কোন সজীব বস্তুর আলো বিচ্ছুরণের ক্ষমতা) জনিত ধর্মটি সুস্পষ্ট। এদের ক্ষেত্রে লিঙ্গাভেদ অনুপস্থিত। কেবলমাত্র যৌনজনন পদ্ধতিতেই জননক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে বহিঃনিষেক এবং পরোক্ষ পরিস্ফুরণ হয়। উদাহরণ (***Pleurobrachia*** (প্লিউরোব্রাকিয়া এবং ***Ctenoplana*** (টিনোপ্ল্যানা)।

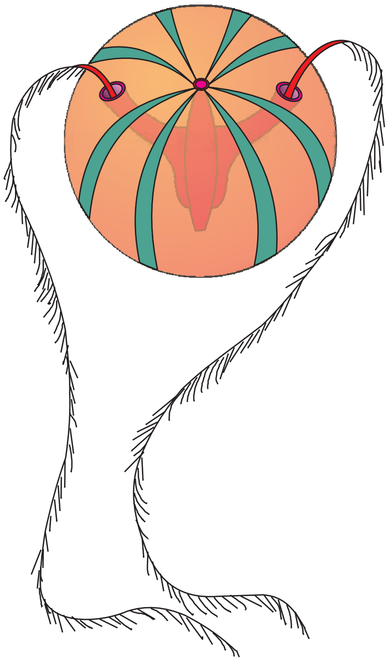

চিত্র **4.8** টিনোফোরার উদাহরণ ঃ (প্লিউরোব্রাকিয়া)

4.2.4 পর্ব- প্লাটিহেলমিনথেস (Platehelminthes)

এই পর্বভুক্ত প্রাণীদের দেহ পৃষ্ঠীয় এবং অঙ্কীয় উভয়দিক থেকে চ্যাপ্টা হয়। তাই এদেরকে চ্যাপ্টাকৃমি বলে (চিত্র 4.9 এ দেখো)। এদের বেশিরভাগই অন্ত:পরজীবী। মানুষ সহ অন্যান্য প্রাণীদেহে পরজীবীরূপে এদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। চ্যাপ্টাকৃমিরা দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম, ত্রিস্তরীয় এবং সিলোমবিহীন হয়। এদের ক্ষেত্রে অঙ্গাস্তরীয় সংগঠন (organ level organization) দেখা যায়। এই পর্বের পরজীবীদের দেহে হুক এবং চোষক বর্তমান। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রাণী দেহতল দ্বারা পোষকের দেহ থেকে সরাসরি পুষ্টিরস শোষণ করে। এদের দেহে উপস্থিত শিখাকোশ বা ফ্লেমকোশ নামের কিছু বিশেষিত কোশ অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ এবং রেচনে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে লিঙ্গাভেদ দেখা যায় না। এদের অন্ত: নিষেক হয় এবং পরিস্ফুরণ অনেকগুলো লার্ভা-দশার মধ্য দিয়ে ঘটে। প্লানেরিয়ার মতো এই পর্বের কিছু প্রাণীর, উচ্চ পুনরুৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে।

উদাহরণ: ***Taenia*** (ফিতাকৃমি), ***Fasciola*** (যকৃৎ কৃমি)

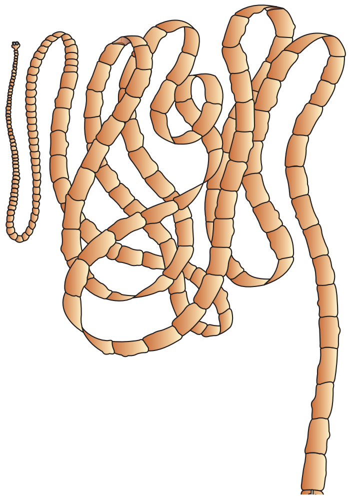

(a)

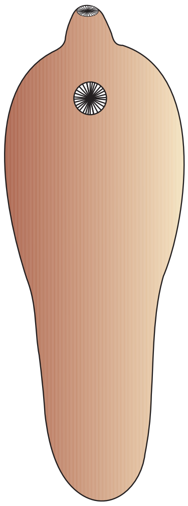

(b)

চিত্র **4.9** প্ল্যাটিহেল্‌মিনথেসের উদাহরণ (ক) Taenia ফিতা কৃমি (খ) Fasciola যকৃৎ কৃমি

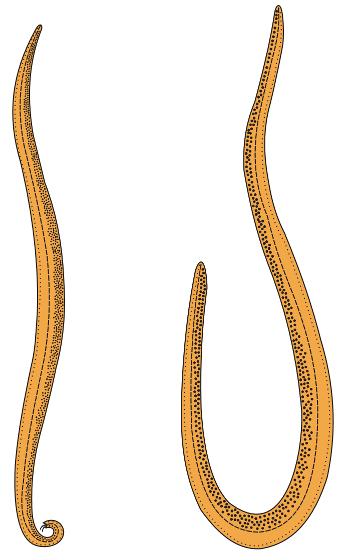

চিত্র 4.10 অ্যাস্কেলমিনথেস - গোলকৃমি

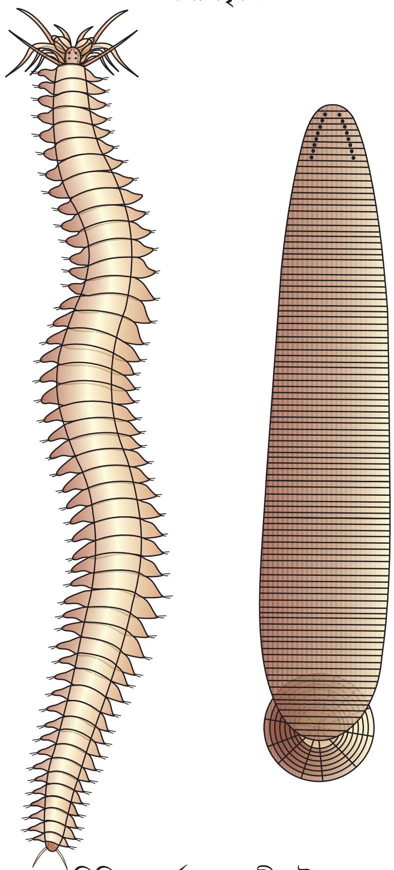

চিত্র 4.11 অ্যানিলিডা পর্ব ভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ (ক) নেরিস (খ) হিরুডিনারিয়া

4.2.5 পর্ব অ্যাস্কেলমিনথেস (Ascheleminthes)

প্রস্থচ্ছেদে এই পর্বভুক্ত প্রাণীর দেহ গোলাকার দেখায় বলে এদের গোলকৃমি বলা হয় (চিত্র 4.10 এ দেখো)। এরা স্বাধীনজীবী, জলজ, স্থলজ হয় অথবা বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে পরজীবী হিসাবে বাস করতে পারে। এদের অঙ্গাতন্ত্রীয় দেহ সংগঠন থাকে। এই পর্বের প্রাণীরা দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম, ত্রিস্তরীয় এববং ছদ্ম সিলোমবিশিষ্ট। একটি সুগঠিত পেশিবহুল গলবিল সহ সম্পূর্ণ পৌষ্টিক নালি বর্তমান। রেচনছিদ্রের মাধ্যমে একটি রেচননালি দেহগহ্বর থেকে দেহজ বর্জ্য পরিত্যাগ করে। এদের মধ্যে লিঙ্গাভেদ বর্তমান (একলিঙ্গা প্রাণী) অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। প্রায়শই স্ত্রী প্রাণীরা পুরুষ প্রাণীদের তুলনায় অধিকতর লম্বা হয়। অন্তঃনিষেক দেখা যায়, পরিস্ফুরণ প্রত্যক্ষ (শিশু প্রাণীটিকে দেখতে পূর্ণাঙ্গা প্রাণীর মতো হয়) বা পরোক্ষ প্রকৃতির হতে পারে। উদাহরণ: ***Ascaris*** (গোলকৃমি), ***Wuchereria*** (ফাইলেরিয়া ওয়ার্ম) ***Ancylostoma*** (হুক ওয়ার্ম)।

4.2.6 অঙ্গুরীমাল বা অ্যানেলিডা (Annelida)

এই পর্বভুক্ত প্রাণীরা জলজ (সামুদ্রিক বা স্বাদুজলের) অথবা স্থলজ হতে পারে। এরা স্বাধীনজীবী, কখনও বা পরজীবীও হয়। এদের ক্ষেত্রে অঙ্গাতন্ত্রস্তরীয় সংগঠন এবং দ্বিপার্শীয় প্রতিসাম্য লক্ষ করা যায়। এরা ত্রিস্ত্ররীয় এবং দেহ বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকেই খণ্ডকে বিভক্ত থাকে, যাকে বলা হয় মেটামেরিক খণ্ডীভবন। এই পর্বের প্রাণীরা সিলোমযুক্ত। দেহতল সুস্পষ্ট **খন্ডক** বা **মেটামিয়ারে** বিভক্ত, তাই এই পর্বটি অ্যানিলিডা বা অঙ্গুরীমাল পর্ব নামে পরিচিত। (Annelida ল্যাটিন annulus ছোটো ছোটো আংটি (চিত্র 4.11 এ দেখ)। দেহে বর্তমান অনুদৈর্ঘ্য এবং বৃত্তাকার পেশি এদেরকে চলনে সহায়তা করে। নেরিসের মত অন্যান্য জলজ অঙ্গুরীমাল প্রাণীদের দেহে পার্শ্বীয় উপাঙ্গা বর্তমান, এগুলোকে **প্যারাপোডিয়া** বলে। এই উপাঙ্গা এদেরকে সন্তরণে সাহায্য করে। সংবহনতন্ত্র বন্ধ প্রকৃতির হয়। **নেফ্রিডিয়া** (একবচন নেফ্রিডিয়াম) নামক অঙ্গাগুলো এদের দেহে অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং রেচনে সহায়তা করে। স্নায়ুতন্ত্রটি, দুটি অঙ্কীয় স্নায়রজ্জুর উপরে অবস্থিত যুগ্ম গ্যাংলিয়ার সমন্বয়ে গঠিত। এই গ্যাংলিয়াগুলোর সাথে পার্শ্বীয় স্নায়গুলো যুক্ত থাকে। জলজ **নেরিস** ভিন্নবাসী একলিঙ্গা প্রাণী। কিন্তু কেঁচো এবং জোঁক উভলিঙ্গা/সহবাসী হয়। জননক্রিয়া যৌন জননের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। উদাহরণ: ***Neris, Pheretima*** (কেঁচো) এবং ***Hirudinaria*** (রক্ত চোষক জোঁক)।

4.2.7 পর্ব সন্ধিপপদী বা আর্থ্রোপোডা (Arthropoda)

পতঙ্গাদের নিয়ে গঠিত এই পর্বটি হল প্রাণী জগতের সর্ববৃহৎ পর্ব। পৃথিবীতে আমাদের জানা যত প্রজাতির প্রাণী রয়েছে, তার দুই তৃতীয়াংশের বেশি প্রাণীরাই সন্ধিপদী প্রাণী (চিত্র 4.12 এ দেখো)। এদের দেহে অঙ্গাতন্ত্রস্তরীয় দেহ সংগঠন রয়েছে। এরা দ্বিপার্শ্বীয় ভাবে প্রতিসম, ত্রিস্তরীয় এবং দেহ খণ্ডক সমান্বিত সিলোম যুক্ত প্রাণী। সন্ধিপদী প্রাণীদের দেহ কাইটিন নির্মিত বহিঃকঙ্কাল দ্বারা আবৃত থাকে। দেহ **মস্তক, গ্রীবা ও উদর** এই তিনটি অংশে বিভক্ত। এদের **সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ** বর্তমান। (arthros-joint, সন্ধি, Poda-appendages উপাঙ্গাসমূহ)। শ্বাসঅঙ্গা হিসেবে রয়েছে ফুলকা, বই ফুলকা, বই ফুসফুস বা ট্রাকিয়াতন্ত্র। মুক্ত সংবহনতন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় (Sensory organ) হিসেবে এদের শুঙ্গা, চক্ষু (পুঞ্জাক্ষি এবং সরলাক্ষি) এবং স্ট্যাটোসিস্ট অথবা ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গা বর্তমান। **ম্যালপিজিয়ান নালিকা** (Malpigian Tubules) এর মাধ্যমে রেচনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিন্নবাসী হয়। এদের সাধারণত অন্ত:নিষেক ঘটে। বেশিরভাগই অন্ডজ অর্থাৎ ডিম পাড়ে। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ পরিস্ফুরণ দেখা যায়। উদাহরণ : অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পতঙ্গা : Apis (মৌমাছি) ***Bombyx*** (রেশমমথ), ***Lacifer*** (লাক্ষা পতঙ্গা)। বাহক সন্ধীপদী — ***Anopheles, Culex,*** এবং ***Aedes*** (মশক গোষ্ঠী) যূথচর পেস্ট (Gregarians)- ***Locusta*** (লোকাস্ট) জীবন্ত জীবাশ্ম - ***Limulus*** (রাজ কাঁকড়া)।

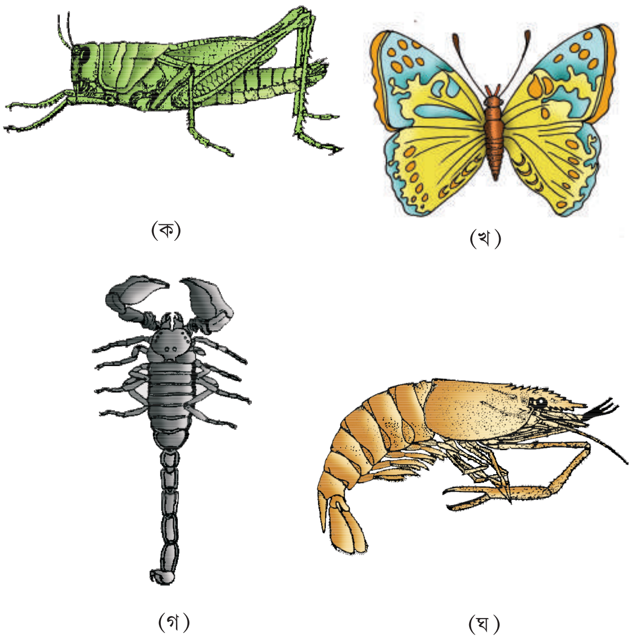

চিত্র 4.12 সন্ধিপদী পর্বের প্রাণীর উদাহরণ
(ক) লোকাস্ট (খ) প্রজাপতি (গ) কাঁকড়াবিছা (ঘ) চিংড়ি

4.2.8 পর্ব কম্বোজ বা মোলাস্কা (Mollusca)

এটি হল দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাণী পর্ব (চিত্র 4.13 এ দেখ) এই পর্বের প্রাণীরা স্থলজ অথবা জলজ (সামুদ্রিক / স্বাদুজল) হতে পারে। দেহ সংগঠন অঙ্গাতন্ত্রস্তরীয় হয়। এরা দ্বিপার্শ্বীয় ভাবে প্রতিসম, ত্রিস্তরীয় এবং সিলোমযুক্ত প্রাণী। দেহ ক্যালসিয়াম নির্মিত খোলকে আবৃত এবং অখন্ডিত। **মস্তক, মাংসলপদ ও আন্তরযন্ত্রীয়** কুঁজ (Visceral) নিয়ে দেহটি গঠিত। একটি নরম এবং স্পঞ্জী চামড়া স্তর আন্তরযন্ত্রীয় কুঁজের ওপর একটি ম্যান্টেল গঠন করে। ম্যান্টেল এবং কুঁজের মধ্যবর্তী স্থানকে **ম্যানটেল গহ্বর** (Mantle Cavity) বলে যার মধ্যে পালকের মতো দেখতে ফুলকাগুলো উপস্থিত থাকে। এগুলো শ্বসন এবং রেচন কার্যে অংশ নেয়। মস্তকের সম্মুখভাগে সংবেদী শুঙ্গা (Sensory tentacles) বর্তমান।

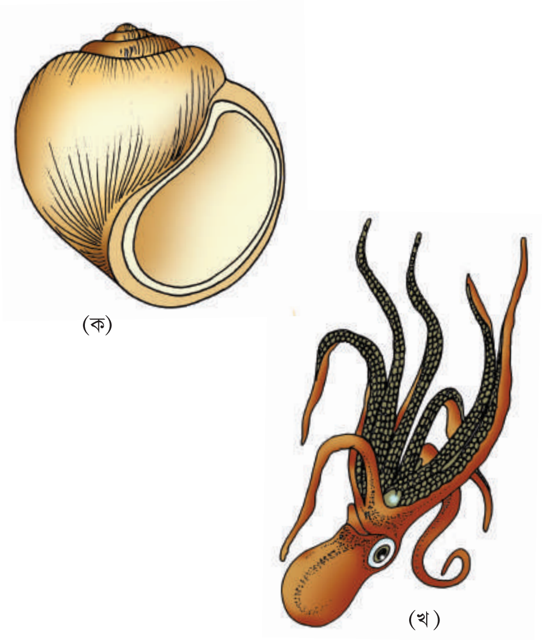

চিত্র 4.13 শম্বুক জাতীয় প্রাণীর উদাহরণ
(ক) শামুক (***Pila***) (খ) অক্টোপাস (***Octopus***)

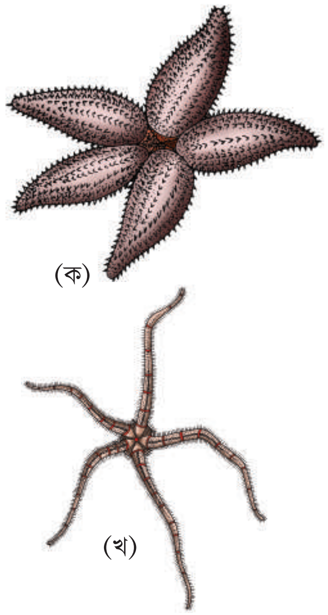

চিত্র 4.14 কন্টকত্বক প্রাণীর উদাহরণ: (ক) তারামাছ (*Astemias*) (খ) ওফিউরা (*Ophiura*)

মুখগহ্বরে খাদ্য সংগ্রহের জন্য দাঁতের মতো খাদ্য সংগ্রহকারী (Rasping Organ) অঙ্গ থাকে। একে **র‍্যাডুলা** বলে। এরা সাধারণত ভিন্নবাসী এবং অন্ডজ প্রাণী। এদের ক্ষেত্রে পরোক্ষ পরিস্ফুরণ ঘটে। উদাহরণ : *Pila* (অ্যাপেল শামুক) *Pinctada* (মুক্তা ঝিনুক), *Sepia* (কাটলফিশ), *Loligo* (স্কুইড), *Octopus* (ডেভিল ফিশ), *Aplysia* (সমুদ্র শশক), *Dentalium* (টাস্ক শেল্) এবং *Chaetopleura* (কাইটন)।

4.2.9 পর্ব— কন্টকত্বক বা একাইনোডার্মাটা (Echinodermata)

এই পর্বভুক্ত প্রাণীদের চুন নির্মিত কাঁটা দ্বারা তৈরি অন্তঃকঙ্কাল বর্তমান। তাই এদের কন্টকত্বক প্রাণী বলা হয় কাঁটাযুক্ত দেহ (চিত্র 4.14 এ দেখ)। এরা সবাই সামুদ্রিক এবং এদের মধ্যে অঙ্গাতন্ত্রস্তরীয় দেহ সংগঠন দেখা যায়। একটি পরিণত কন্টকত্বক প্রাণী অরীয়ভাবে প্রতিসম হয়, কিন্তু এদের লার্ভায় দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য দেখা যায়। এরা ত্রিস্তরীয় এবং সিলোমযুক্ত প্রাণী। এদের পৃষ্ঠদেশে অর্থাৎ দেহের উপর দিকে পায়ু এবং অঙ্কদেশ অর্থাৎ নীচের দিকে মুখছিদ্র বিশিষ্ট সম্পূর্ণ পৌষ্টিকনালী বর্তমান। কন্টকত্বক প্রাণীর সবচাইতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যটি হল, দেহে **জল সংবহণতন্ত্রের** উপস্থিতি, যা এদেরকে চলনে, খাদ্য সংগ্রহে, পরিবহণে এবং শ্বসনে সহায়তা করে। রেচনতন্ত্র অনুপস্থিত। লিঙ্গাভেদ বর্তমান। সাধারণত বহিঃনিষেক ঘটে এবং যৌনজনন সম্পন্ন হয়। পরোক্ষ পরিস্ফুটন হয় এবং স্বাধীন সঞ্চরণশীল লার্ভার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। উদাহরণ : *Asterias* (তারা মাছ), *Echinus* (সমুদ্র সজারু) *Antedon* (সমুদ্র লিলি), *Cucumaria* (সমুদ্র শশা) এবং *Ophiura* (ব্রিটেল্ স্টার)

4.2.10 পর্ব- হেমিকর্ডাটা (Hemichordata)

পূর্বে হেমিকর্ডাটাকে কর্ডাটা পর্বের অন্তর্গত একটি উপপর্ব হিসেবে গণ্য করা হত। কিন্তু এখন হেমিকর্ডাটা নন-কর্ডাটার অন্তর্ভুক্ত একটি পৃথক পর্ব হিসেবে পরিগণিত হয়।

কৃমির মত দেখতে অল্প কিছু সংখ্যক সামুদ্রিক প্রাণী নিয়ে এই পর্বটি গঠিত। এদের মধ্যে অঙ্গাতন্ত্রস্তরীয় দেহ সংগঠন দেখা যায়। এরা ত্রিস্তরীয়, দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম, সিলোমযুক্ত প্রাণী, দেহ বেলানাকৃতি হয় এবং এটি অগ্রস্থ **প্রবোসিস,**একটি **কলার** এবং একটি লম্বাকৃতি **দেহকাণ্ডে** বিভক্ত (চিত্র 4.15 এ দেখ)। এদের ক্ষেত্রে মুক্ত সংবহনতন্ত্র দেখা যায়। এরা ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। রেচন অঙ্গ হিসাবে রয়েছে প্রবোসিস গ্রন্থি। লিঙ্গ ভেদ বর্তমান। বহিঃনিষেক এববং পরোক্ষ পরিস্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ *Balanoglossus* (ব্যালানোগ্লসাস) এবং *Saccoglossus* (স্যাক্কোগ্লসাস)।

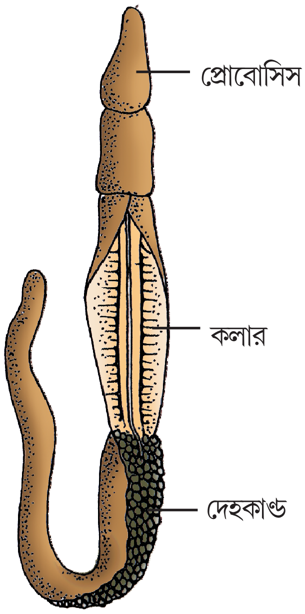

চিত্র 4.15 ব্যালানোগ্লসাস

4.2.11 পর্ব— কর্ডাটা (Chordata)

এই পর্বভুক্ত প্রাণীদের ক্ষেত্রে তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান— এগুলো হল জীবনের যে কোন পর্যায়ে **নোটোকর্ডের** উপস্থিতি এবং **পৃষ্ঠীয় ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু ও যুগ্ম গলবিলীয় ফুলকা** ছিদ্র এর উপস্থিতি (চিত্র 4.16 দেখো)। এরা দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম, ত্রিস্তরীয়,

সিলোমযুক্ত এবং অঙ্গাতন্ত্র স্তরীয় দেহ সংগঠন বিশিষ্ট প্রাণী। এদের পায়ু-পরবর্তী অংশে একটি লেজ থাকে। এক্ষেত্রে বন্ধ রক্ত সংবহনতন্ত্র বর্তমান।

সারণি 4.1 তে কর্ডাটা এবং নন কর্ডাটা পর্বভুক্ত প্রাণীদের প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলির একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

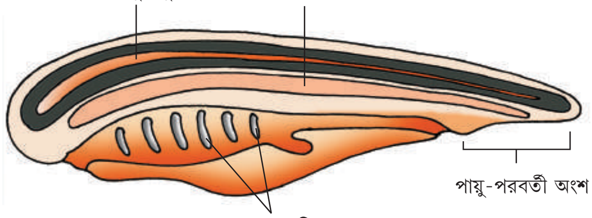

চিত্র **4.16** কর্ডাটার বৈশিষ্ট্য সমূহ

সারণি 4.1 কর্ডাটা এবং নন কর্ডাটাদের মধ্যে তুলনা

ক্রমিক সংখ্যা	কর্ডাটা	**নন-কর্ডাটা**
1.	নোটোকর্ড উপস্থিত	নোটোকর্ড অনুপস্থিত
2.	কেন্দ্রীয় স্নায়তন্ত্রটি দেহের পৃষ্ঠদেশে থাকে। এটি ফাঁপা ও সংখ্যায় একটি হয়।	কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র দেহের অঙ্কদেশে থাকে। এটি নিরেট ও সংখ্যায় দুটি হয়.
3.	গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্র বর্তমান	গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্র অনুপস্থিত
4.	হৃৎপিন্ডটি অঙ্কদেশীয় হয়	হৃৎপিন্ড পৃষ্ঠদেশীয় (যদি থাকে)
5.	পায়ু পরবর্তী অংশ (লেজ) বর্তমান	পায়ু পরবর্তী লেজ অনুপস্থিত

পর্ব কর্ডাটা তিনটি উপপর্বে বিভক্ত **ইউরোকর্ডাটা** অথবা **টিউনিকেটা, সেফালো কর্ডাটা** এবং **ভার্টিব্রাটা**।

উপপর্ব ইউরোকর্ডাটা এবং সেফালোকর্ডাটাকে কখনো কখনো প্রোটোকর্ডেটসও বলা হয়। (চিত্র 4.17) এরা পুরোপুরিভাবে সামুদ্রিক প্রাণী। ইউরোকর্ডাটার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র লার্ভা দশায় এদের ল্যাজে নোটোকর্ড থাকে। অপর পক্ষে সেফালো কর্ডাটায় নোটোকর্ডটি মস্তক থেকে ল্যাজ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং তা পুরো জীবন ধরে দেহে অবস্থান করে।

উদাহরণ: ইউরোকর্ডাটা-*(Ascidia)*, সালপা *(Salpa)*, ডোলিওলাম, *(Odiolum)* সেফালোকর্ডাটা- *(Branchiostoma)* (অ্যাম্ফিওক্সাস অথবা ল্যানসিলেট)।

উপপর্ব ভার্টিব্রাটার অন্তর্গত প্রাণীদের দেহে ভ্রূণাবস্থায় নোটোকর্ড থাকে। পরিণত অবস্থায় নোটোকর্ডাটি তরুণাস্থি বা অস্থি নির্মিত মেরুদণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। তাই সব মেরুদণ্ডী বা ভার্টিব্রাটাই কর্ডাটা কিন্তু সব কর্ডাটাই মেরুদণ্ডী বা ভাটিব্রাটা নয়। কর্ডাটার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও মেরুদন্ডী প্রাণীদের দুই, তিন বা চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট অঙ্কদেশীয় পেশিবহুল হৃৎপিন্ড এবং রেচন ও অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বৃক্ক এবং যুগ্ম উপাঙ্গা হিসাবে পাখনা, প্রত্যঙ্গা রয়েছে।

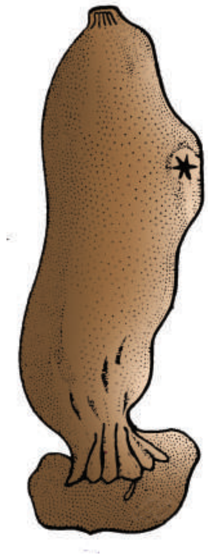

চিত্র **4.17** অ্যাসিডিয়া *(Ascidia)*

উপপর্ব ভার্টিব্রাটা আবার নিম্নরূপে বিভক্ত হয় :

মেরুদণ্ডী
- বিভাগ
  - আগনাথা (চোয়ালবিহীন)
    - শ্রেণি সাইক্লোস্টোমাটা
  - ন্যাথোস্টোমাটা (চোয়ালযুক্ত)
    - অধিশ্রেণি
      - মৎস (পাখনাযুক্ত)
        - শ্রেণি
          1. কন্‌ড্রিকথিস
          2. অস্‌টিকথিস্
      - চতুষ্পদী (উপাঙ্গাযুক্ত)
        - শ্রেণি
          1. উভচর
          2. সরীসৃপ
          1. পক্ষী
          2. স্তন্যপায়ী

4.2.11.1 শ্রেণি- সাইক্লোস্টোমাটা (Cyclostomata)

এই শ্রেণিভুক্ত সব প্রাণীই অন্য কিছু মাছের দেহে বহি:পরজীবী হিসেবে বাস করে। এদের দেহটি লম্বাটে হয় এবং শ্বাসকার্যের জন্য দেহে 6-15 জোড়া ফুলকাছিদ্র রয়েছে। এই শ্রেণির প্রাণীদের মুখ চোয়ালবিহীন, গোলাকার এবং শোষণ উপযোগী হয়। দেহে আঁশ এবং যুগ্ম পাখনা অনুপস্থিত। ক্রেনিয়াম এবং মেরুদণ্ডটি তরুণাস্থিনির্মিত হয়। সংবহন বদ্ধ সংবহন প্রকৃতির। এরা সামুদ্রিক, কিন্তু ডিম পাড়ার সময়কালে স্বাদুজলে চলে আসে এবং ডিম পাড়ার পরই মারা যায়। এদের লার্ভা রূপান্তরিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং সমুদ্রে ফিরে যায়। উদাহরণ: *Petromyzon* (ল্যাম্প্রে) এবং *Myxine* (হ্যাগফিস)।

চিত্র **4.18** একটি চোয়ালবিহীন মেরুদণ্ডী পেট্রোমাইজোন (petromyzon)

4.2.11.2 শ্রেণি - কন্‌ড্রিকথিস্ (Chondrichthes)

এরা সামুদ্রিক প্রাণী। এই শ্রেণির মাছেরদেহ মাকু আকৃতির হয় এবং এদের দেহে তরুণাস্থিনির্মিত অন্ত:কঙ্কাল বর্তমান। মুখছিদ্রটি দেহের অঙ্কদেশে অবস্থিত। **নোটোকর্ডটি** সারাজীবন ধরে দেহে উপস্থিত থাকে। **কানকোবিহীন** ফুলকাছিদ্রগুলো পৃথকভাবে অবস্থান করে। এদের ত্বক শক্ত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **প্ল্যাকয়েড আঁইশযুক্ত** হয়। প্ল্যাকয়েড আঁইশ পরিবর্তিত হয়ে দাঁতে রূপান্তিত হয়। দাঁতগুলো পশ্চাৎ-অভিমুখী অর্থাৎ পেছনের দিকে বাঁকানো থাকে। এদের চোয়াল খুবই শক্তিশালী এবং এরা শিকারি হয়। দেহে পটকা না থাকার কারণে, জলে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এদেরকে নিরন্তর জলে সাঁতার কাটতে হয়।

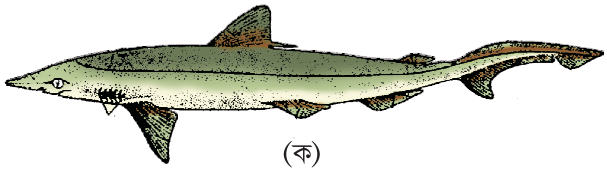

(ক)

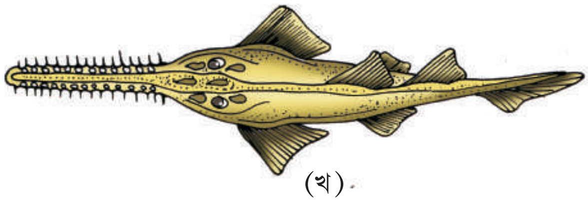

(খ)

চিত্র **4.19** তরুণাস্থিময় মাছের উদাহরণ
(ক) স্কোলিওডন *(Scoliodon)*
(খ) প্রিস্টিস *(Pristis)*

হৃৎপিন্ড দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট (একটি অলিন্দ ও একটি নিলয়)। এদের কিছু সংখ্যক প্রাণীতে **তড়িৎ উৎপাদনকারী অঙ্গ** (উদাহরণ: টর্পেডো) এবং কিছু সংখ্যকের **বিষ নিঃসরণকারী হুল** উদাহরণ ঃ ট্রাইগন বর্তমান। এরা **অনুষ্ণশোণিত** (Poikilothermous) প্রাণী অর্থাৎ এরা দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে অক্ষম। এদের মধ্যে লিঙ্গাভেদ বর্তমান। পুরুষ মাছের শ্রোণি পাখনায় যৌন মিলনে সাহায্যকারী উপাঙ্গ ক্লাস্পার বিদ্যমান। এদের ক্ষেত্রে অন্তঃনিষেক ঘটে এবং অনেকেই জরায়ুজ, অর্থাৎ সন্তান প্রসব করে। উদাহরণ : *(Scoliodon)* ডগফিস (Pristis), স-ফিস, Carcharodon (Great white shark), *(Trygon* (Sting ray)।

4.2.11.3 শ্রেণি- অস্টিক্থিস (Osteichthyes)

এরা সামুদ্রিক অথবা স্বাদুজলের বাসিন্দা উভয়ই হতে পারে। এদের দেহে অস্থিনির্মিত কঙ্কাল রয়েছে। মাকুর মতো দেহ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রান্তীয় মুখছিদ্রবিশিষ্ট (চিত্র 4.20)। এই শ্রেণির মাছের চার জোড়া ফুলকা রয়েছে। যেগুলো উভয়দিকেই **কানকুয়া** বা ওপারকুলাম দ্বারা ঢাকা থাকে। দেহের ত্বক **সাইক্লয়েড** অথবা **টিনয়েড** আঁইশ দ্বারা আবৃত থাকে। দেহে উপস্থিত পটকা জলে প্লবতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। দেহে দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হৃৎপিন্ড বর্তমান। এরা অনুষ্ণশোণিত প্রাণী। লিঙ্গাভেদ এবং বহিঃনিষেক পরিলক্ষিত হয়। এদের অধিকাংশই অন্ডজ অর্থাৎ ডিম পাড়ে এবং প্রত্যক্ষ পরিস্ফুটনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়।

উদাহরণ : সামুদ্রিক প্রজাতি — *Exocoetus* (উড়ুক্কু মাছ), *Hippocampus* (সমুদ্র অশ্ব), স্বাদুজলের প্রজাতি; *Labeo* (রুই মাছ), *Catla* (কাতলা), *Clarias* (মাগুর); অ্যাকুরিয়ামে রাখার উপযুক্ত প্রজাতি: *Betta* (ফাইটিং ফিশ), *Pterophyllum* (অ্যাঞ্জেল ফিশ)।

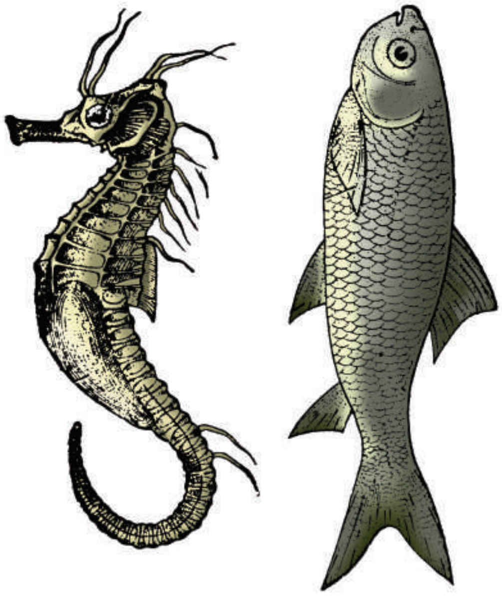

(ক) (খ)

চিত্র 4.20 অস্থিযুক্ত মাছের উদাহরণ
(ক) হিপ্পোক্যাম্পাস্
(খ) কাতলা

4.2.11.4 শ্রেণি - উভচর (Amphibia)

অ্যাম্ফিবিয়া (Amphibia) এই নামটি থেকেই বোঝা যায় যে এই শ্রেণিভুক্ত প্রাণীরা জল এবং স্থল উভয় পরিবেশেই বাস করতে পারে (গ্রিক্ Amphi:dual উভয়, bios, life - জীবন) (চিত্র 4.21)। এদের বেশিরভাগেরই দুই জোড়া উপাঙ্গ থাকে। **দেহ মস্তক** এবং **দেহকাণ্ডে** বিভক্ত। এই শ্রেণির কিছু কিছু প্রাণীতে লেজ বর্তমান। উভচরদের ত্বক সিক্ত থাকে (আঁশ অনুপস্থিত)। চোখে **চক্ষুপল্লব** বর্তমান। একটি কর্ণপটহ (Tympanum) কর্ণের অবস্থান বুঝায়। পৌষ্টিকনালী, মূত্রনালী এবং জননালি একটি সাধারণ প্রকোষ্ঠ ক্লোয়াকাবা অবসারণীতে মুক্ত হয়, যা আবার ক্লোয়াকা ছিদ্র বা অবসারণি ছিদ্র পথে বাইরে উন্মুক্ত হয়। ফুলকা, ফুসফুস এবং ত্বকের মাধ্যমে এরা শ্বাসকার্য চালায়। হৃৎপিণ্ডটি তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট (দুইটি অলিন্দ এবং একটি নিলয়)। এরা অনুষ্ণশোণিত প্রাণী। এদের মধ্যে লিঙ্গাভেদ উপস্থিত। এক্ষেত্রে বহিঃনিষেক ঘটে। এরা অন্ডজ এবং এক্ষেত্রে পরোক্ষ পরিস্ফুরণ লক্ষ করা যায়। উদাহরণ: *Bufo* (কুনোব্যাঙ), *Rana* (কোলাব্যাঙ), *Hyla* (গেছো ব্যাঙ), *Salamander* (স্যালাম্যান্ডার) *Ichthyophis* (উপাঙ্গবিহীন উভচর)।

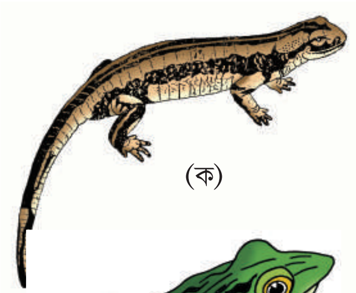

(ক)

(খ)

চিত্র 4.21 উভচর এর উদাহরণ
(ক) স্যালাম্যান্ডার
(খ) কোলা ব্যাঙ

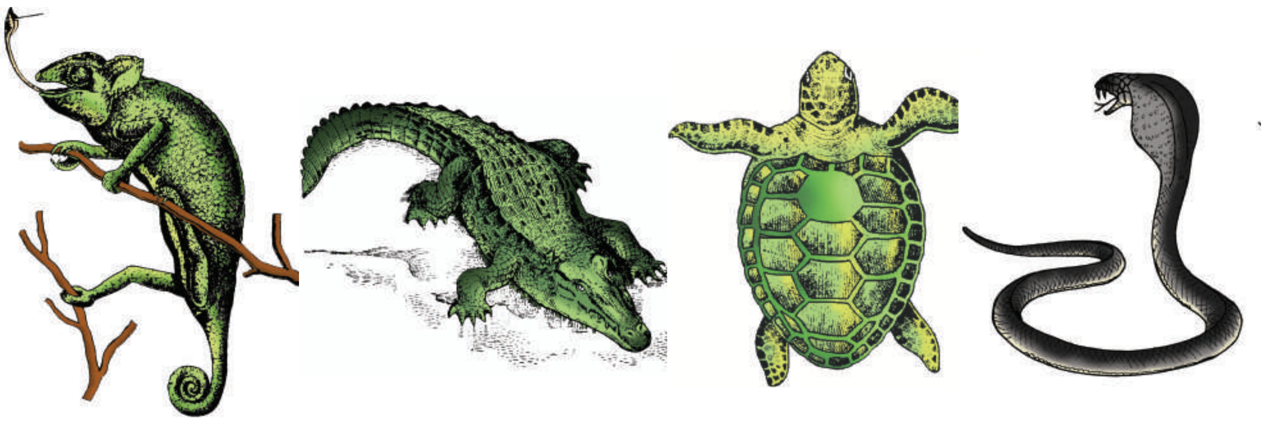

(ক) (খ) (গ) (ঘ)

চিত্র 4.22 সরীসৃপ : (ক) গিরগিটি (খ) কুমির (গ) কচ্ছপ (ঘ) কোবরা

4.2.11.5 শ্রেণি সরীসৃপ (Reptilia)

এদের শ্রেণির নামটি-ই ইঙ্গিত করে যে, এই শ্রেণিভুক্ত প্রাণীদের গমন পদ্ধতি হবে বুকে ভর দিয়ে চলা অথবা হামাগুড়ি দিয়ে চলা। ল্যাটিন শব্দ repere অথবা reptum মানে creep অর্থাৎ বুকে ভর দিয়ে চলা, অথবা crawl অর্থাৎ হামাগুড়ি দিয়ে চলা। এদের বেশির ভাগই স্থলজ প্রাণী। দেহ, শুষ্ক এবং ক্যারাটিনযুক্ত ত্বক। বহিঃত্বকীয় **আঁশ** অথবা স্কুটস দ্বারা আবৃত থাকে (চিত্র 4.22 এ দেখ)। এদের বহিঃকর্ণ ছিদ্র অনুপস্থিত, বহিঃকর্ণ হিসেবে কেবলমাত্র **কর্ণপটহ** বা Tympanum অংশটি-ই বিদ্যমান। যদি গমন অঙ্গা থাকে তবে দুই জোড়া গমন অঙ্গা লক্ষ করা যায়। হৃৎপিণ্ড, সাধারণত তিনপ্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। কিন্তু কুমীরের ক্ষেত্রে এটি চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হয়। সরীসৃপেরা অনুষ্ণশোণিত প্রাণী। সাপ এবং টিকটিকি বা গিরগিটি খোলস হিসাবে দেহের আঁইশ পরিত্যাগ করে। এদের মধ্যে লিঙ্গাভেদ বর্তমান। অন্তঃনিষেক ঘটে। এরা অন্ডজ অর্থাৎ ডিম পাড়ে এবং এদের প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরন ঘটে। উদাহরণ : *Chelone* (কাছিম), *Testudo* (কচ্ছপ), *Chameleon* (গিরগিটি), *Calotes* (উদ্যান টিকটিকি), *Crocodilus* (কুমীর), *Alligator* (ঘড়িয়াল), *Hemidactylus* (দেয়াল টিকটিকি)। বিষধর সাপ— *Naja* (কোবরা/গোখরা), *Bangarus* (ক্রেইট), *Viper* (ভাইপার)

4.2.11.5 শ্রেণি পক্ষী (Aves)

পাখিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল দেহে **পালকের** উপস্থিতি। উড্ডয়নে অক্ষম পাখি (উটপাখি) ছাড়া বেশিরভাগ পাখিই উড়তে পারে। এদের **চঞ্চু** থাকে (চিত্র 4.2.3এ দেখো)। এদের ক্ষেত্রে অগ্রপদ **ডানায়** রূপান্তরিত হয়েছে। পশ্চাদপদ সাধারণত: আঁইশযুক্ত হয় এবং হাঁটা, সাঁতার কাটা অথবা গাছের ডাল আঁকড়ে ধরতে সাহায্য করে। লেজের গোড়ায় বর্তমান তৈল গ্রন্থি ছাড়া, এদের শুষ্ক ত্বকে কোন গ্রন্থি থাকে না। অন্তঃকঙ্কাল সম্পূর্ণভাবে অস্থিনির্মিত। লম্বা বা দীর্ঘ অস্থি বা হাড়গুলো ফাঁপা এবং **বায়ুগহ্বরযুক্ত** (Pneumatic) হয়। পাখির পৌষ্টিক নালিতে ক্রপ (Crop) এবং গিজার্ড (Gizzard) নামে দুইটি অতিরিক্ত প্রকোষ্ঠ থাকে। হৃৎপিণ্ড সম্পূর্ণভাবে চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হয়। এরা **উষ্ণশোণিত** (homoiothermous) প্রাণী, অর্থাৎ এরা দেহের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখতে সক্ষম।

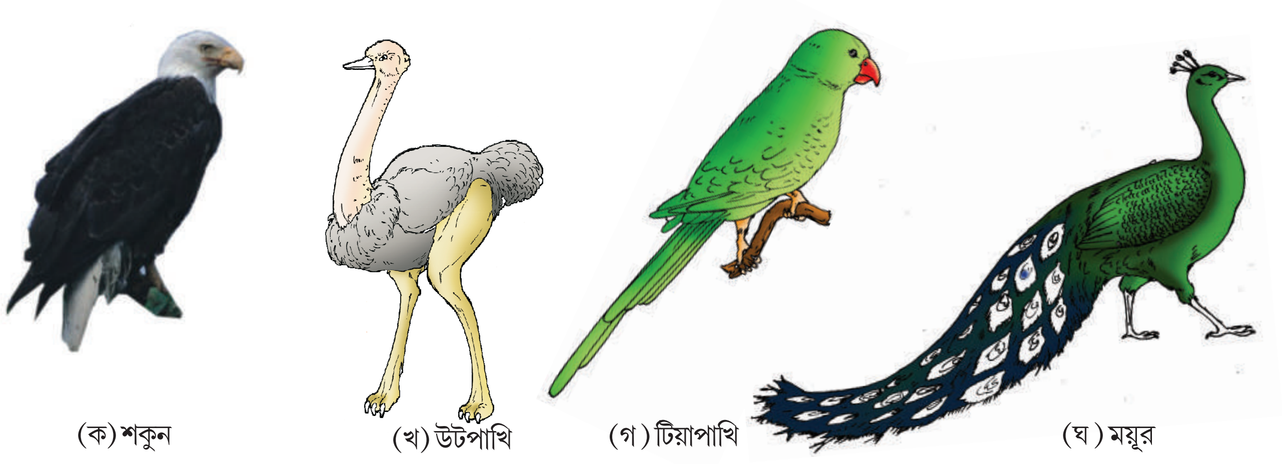

চিত্র **4.23** কিছু পাখি

পাখি ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। ফুসফুসের সাথে যুক্ত বায়ুথলি (air sac)গুলো শ্বাসকার্যে বিশেষ সহায়তা করে। লিঙ্গভেদ বর্তমান। অন্তঃনিষেক ঘটে। এরা অন্ডজ, অর্থাৎ ডিম পাড়ে এবং এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ: *Corvus* (কাক), *Culumba* (পায়রা), *Psittacula* (টিয়া পাখি), *Struthio* (উটপাখি), *Pavo* (ময়ূর), *Aptenodytes* (পেঙ্গুইন), *Neophron* (শকুন)।

4.2.11.6 শ্রেণি স্তন্যপায়ী (Mammalia)

স্তন্যপায়ীদের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশে দেখা যায়। যেমন: বরফ-ঢাকা মেরু অঞ্চল, মরুভূমি, পর্বত, বনভূমি, তৃণভূমি এবং অন্ধকার গুহা। এদের মধ্যে কেউ কেউ ওড়ার জন্য এবং কেউ কেউ জলে বসবাস করার জন্য অভিযোজিত হয়েছে। স্তন্যপায়ীদের একেবারে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যটি হল দেহে দুগ্ধ উৎপাদনকারী **স্তনগ্রন্থির** উপস্থিতি, যার মাধ্যমে শিশুপ্রাণী পুষ্টি লাভ করে। এদের দুই জোড়া জননাঙ্গা বর্তমান যেগুলো হাঁটা, দৌড়োনো, গাছে চড়া, গর্ত খোড়া, সাঁতার কাটা অথবা ওড়ার জন্য অভিযোজিত হয়েছে (চিত্র 4.24 এ দেখ)

চিত্র **4.24** কয়েকটি স্তন্যপায়ী প্রাণী

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দেহ **লোমে ঢাকা** থাকে। এটি এদের একটি বৈশিষ্ট্য। বহিঃকর্ণ অথবা **কর্ণছিদ্র** উপস্থিত থাকে। স্তন্যপায়ীদের চোয়ালে বিভিন্ন ধরনের দাঁত রয়েছে। হৃৎপিণ্ডটি চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট। এরা উষ্ণ শোণিত প্রাণী। ফুসফুসের দ্বারা শ্বাসক্রিয়া চালায়। এদের ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদ পরিলক্ষিত হয় এবং অন্তঃ নিষেক ঘটে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এরা সবাই **জরায়ুজ** প্রাণী। এদের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পরিস্ফুন ঘটে।

উদাহরণ : অন্ডজ প্রাণী— *Ornithorhynchus* (প্লাটিপাস্), জরায়ুজ প্রাণী *Macropus* (ক্যাঙ্গারু) *Pteropus* (উড়ন্ত শেয়াল), *Camelus* (উট) *Macaca* (বাঁদর), *Rattus* (ইঁদুর), *Canis* (কুকুর), *Felis* (বিড়াল), *Elephas* (হাতি), *Equus* (ঘোড়া), *Delphinus* (ডলফিন), *Balaenoptera* (নীল তিমি), *Panthera tigris* (বাঘ), *Panthera leo* (সিংহ).

প্রাণীরাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পর্বের প্রাণীদের প্রধান সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি 4.2 তে সংক্ষিপ্ত আকারে দেয়া হল:

চিত্র 4.2 প্রাণীরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পর্বগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলি

পর্ব	সংগঠনস্তর	প্রতিসাম্য	সিলোম	খন্ডায়ন	পরিপাকতন্ত্র	সংবহনতন্ত্র	শ্বাসতন্ত্র	স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যাবলি
পরিফেরা	কোশীয়	বিভিন্ন	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত	দেহ ছিদ্রবিশিষ্ট এবং দেহ প্রাচীরে নালিকা বর্তমান
সিলেনটারেটা (নিডারিয়া)	কলা	অরীয়	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত	অসম্পূর্ণ	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত	নিডোব্লাস্ট উপস্থিত
টিনোফোরা	কলা	অরীয়	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত	অসম্পূর্ণ	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত	গমনাঙ্গ হিসেবে কুম্বল্টে উপস্থিত
প্ল্যাটিহেলমিনথেস	অঙ্গ ও অঙ্গাতন্ত্র	দ্বিপার্শ্বীয়	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত	অসম্পূর্ণ	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত	চ্যাপ্টা দেহ, চোষক বর্তমান
অ্যাস্কেলমিনথেস	অঙ্গাতন্ত্র	দ্বিপার্শ্বীয়	ছদ্ম সিলোম	অনুপস্থিত	সম্পূর্ণ	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত	প্রায়শই কৃমির আকৃতি বিশিষ্ট লম্বাকৃতি হয়।
অ্যানিলিডা	অঙ্গাতন্ত্র	দ্বিপার্শ্বীয়	সিলোমযুক্ত	উপস্থিত	সম্পূর্ণ	উপস্থিত	অনুপস্থিত	দেহ আংটির ন্যায় খন্ডক বিশিষ্ট
আর্থ্রোপোডা	অঙ্গাতন্ত্র	দ্বিপার্শ্বীয়	সিলোমযুক্ত	উপস্থিত	সম্পূর্ণ	উপস্থিত	উপস্থিত	কিউটিলকল নির্মিত বহি: কঙ্কাল সন্ধিল উপাঙ্গ
মোলাস্ক	অঙ্গাতন্ত্র	দ্বিপার্শ্বীয়	সিলোমযুক্ত	অনুপস্থিত	সম্পূর্ণ	উপস্থিত	উপস্থিত	সাধারণত: খোলাকাবৃত বহিঃকঙ্কাল উপস্থিত
একাইনোডারমাটা	অঙ্গাতন্ত্র	অরীয়	সিলোমযুক্ত	অনুপস্থিত	সম্পূর্ণ	উপস্থিত	উপস্থিত	জলসংবহনতন্ত্রের উপস্থিতি, দেহ অরীয়ভাবে প্রতিসম
হেমিকর্ডাটা	অঙ্গাতন্ত্র	দ্বিপার্শ্বীয়	সিলোমযুক্ত	অনুপস্থিত	সম্পূর্ণ	উপস্থিত	উপস্থিত	দেহ কৃমির মতো, প্রবোসিস, কলার এবং দেহকাণ্ডে বিভক্ত
কর্ডাটা	অঙ্গাতন্ত্র	দ্বিপার্শ্বীয়	সিলোমযুক্ত	উপস্থিত	সম্পূর্ণ	উপস্থিত	উপস্থিত	নোটোকর্ড, পৃষ্ঠায় ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু, ফুলকাছিদ্র এবং উপাঙ্গা বা পাখনা

সারসংক্ষেপ

দেহ সংগঠন, প্রতিসাম্য, কোশ সংগঠন, সিলোম, খণ্ডীভবন নোটোকর্ড ইত্যাদি, প্রাণীদের এই প্রধান মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদেরকে প্রাণীরাজ্যের বিশদ শ্রেণিবিন্যাসকরণে সমর্থ করেছে। এসব মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর পাশাপাশি আরও অনেক সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র রয়েছে যেগুলো প্রতিটি শ্রেণি বা পর্বের জন্য নির্দিষ্ট।

পরিফেরা পর্বভুক্ত প্রাণীরা বহুকোশী। এদের দেহে কোশস্তরীয় সংগঠন এবং ফ্লাজেলাযুক্ত কোয়ানো সাইট কোশ বর্তমান। সিলেনটারেটা বা একনালিদেহী প্রাণীদের টেনটাকল রয়েছে, যেগুলোতে নিডোব্লাস্ট বর্তমান। এদের বেশিরভাগই কোন স্থির কঠিন বস্তুর সঙ্গে নিজেদের আটকে রাখে। অথবা স্বাধীনভাবে ভাসমান থাকে। জলজ টিনোফোরা সামুদ্রিক এবং দেহে কোম্বপ্লেট বর্তমান। প্লাটিহেলমিনথেস বা চ্যাপ্টা কৃমিদের দেহ দ্বিপার্শ্বীয় ভাবে প্রতিসম এবং চ্যাপ্টা হয়। এদের মধ্যে যারা পরজীবী প্রকৃতির, তাদের দেহে সুস্পষ্ট চোষক এবং হুক দেখা যায়। অ্যাস্কেলমিনথেস পর্বভুক্ত প্রাণীরা বা গোল কৃমিরা ছদ্মসিলোমবিশিষ্ট এবং এরা পরজীবী বা অপরজীবী উভয় প্রকারেরই হতে পারে।

অঙ্গুরীমাল পর্বের প্রাণীদের দেহ আংটির মতো অসংখ্য খণ্ডক বা মেটামিয়ার নিয়ে গঠিত এবং এরা প্রকৃত সিলোমবিশিষ্ট হয়। এই খণ্ডকগুলো দেহের বাইরের দিক এবং ভিতরের দিক, উভয়দিকেই সুস্পষ্ট থাকে। প্রাণী জগতে সন্ধিপদী প্রাণীদের সংখ্যা সবচাইতে বেশি। মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে এদের দেহে সন্ধিল উপাঙ্গ বর্তমান। মোলাস্কা বা কম্বোজ পর্বের প্রাণীদের নরম দেহটি চুননির্মিত বহিঃখোলকে আবৃত থাকে। দেহ কাইটিন নির্মিত বহি:আরবণীতে ঢাকা থাকে। একাইনোডার্ম বা কন্টকত্বক প্রাণীদের দেহত্বক কন্টকযুক্ত হয়। উভচর প্রাণীরা জল ও স্থল উভয় পরিবেশেই অভিযোজিত হয়। শুষ্ক ও কাঁটাযুক্ত ত্বকের উপস্থিতি সরীসৃপদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সাপ উপাঙ্গবিহীন হয়। মৎস্য, উভচর ও সরীসৃপ শ্রেণির প্রাণীরা পয়কিলোথার্মাস বা অনুষ্ণশোণিত হয়। পক্ষী শ্রেণির প্রাণীরা উষ্ণশোণিত হয়, দেহ পালকে ঢাকা থাকে এবং এদের অগ্রপদ উড্ডয়ণের জন্য ডানায় রূপান্তরিত হয়। পক্ষীশ্রেণির প্রাণীদের পশ্চাৎপদ হাঁটা, সন্তরণ, শিকার ধরা ও ঝাপটে ধরার জন্য অভিযোজিত হয়। স্তনগ্রন্থি ও ত্বকে লোমের উপস্থিতি স্তন্যপায়ী শ্রেণির প্রাণীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এরা সচরাচর জরায়ুজ হয়।

অনুশীলনী

1. যদি প্রাণীদের সাধারণ মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলিকে বিচার্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা না করা হয় তবে প্রাণীদের শ্রেণি বিন্যাসকরণের ক্ষেত্রে তুমি কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হবে?
2. যদি তোমাকে একটি নমুনা প্রাণী দেওয়া হয় তবে এই প্রাণীটির শ্রেণি বিন্যাস করতে গিয়ে তুমি কি কী ধাপ অনুসরণ করবে?
3. প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করতে গিয়ে দেহগহ্বর এবং সিলোমের প্রকৃতি অধ্যয়ণ কতটা প্রয়োজন?
4. অন্ত:কোশীয় এবং বহিঃকোশীয় পরিপাকের মধ্যে তুলনা করো।
5. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিস্ফুরণের মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে।
6. পরজীবী চ্যাপ্টাকৃমিদের মধ্যে উপস্থিত বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
7. প্রাণীজগতে সন্ধিপদীরা সবচেয়ে বড়ো গোষ্ঠী গঠন করার ক্ষেত্রে কী কী কারণ রয়েছে বলে তুমি মনে কর।
8. জল সংবহনতন্ত্র নীচের কোন্ গোষ্ঠীর প্রাণীর বৈশিষ্ট্য:-
   ক) পরিফেরা (খ) টিনোফোরা (গ) কন্টকত্বক (ঘ) কর্ডাটা।
9. "সব মেরুদণ্ডীই কর্ডাটা, কিন্তু সব কর্ডাটা মেরুদণ্ডী নয়"— বিবৃতিটির যথার্থতা বিচার করো।
10. মাছের দেহে উপস্থিত পটকা কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
11. পাখির দেহে উড্ডয়ণ সহায়ক হিসেবে কি কি পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।
12. অন্ডজ ও জরায়ুজ প্রাণী সমসংখ্যক ডিম বা অপত্যজীব সৃষ্টি করতে পারে কি, কারণ দর্শাও।
13. নিম্নলিখিত কোনো গোষ্ঠীতে সর্বপ্রথম খণ্ডীভবন পরিলক্ষিত হয়।
    ক) প্লাটিহেল্মিনথেস
    খ) অ্যাস্কেলমিনথেস
    গ) অ্যানিলিডা
    ঘ) আরথ্রোপোডা
14. নীচের গুলো মেলাও :

ক) ওপারকিউলাম/কানকুয়া	i) টিনোফোরা
খ) প্যারাপোডিয়া	ii) মোলাস্কা
গ) আঁশ	iii) পরিফেরা
ঘ) কোম্ব প্লেট	iv) রেপিটিলিয়া
ঙ) রেডুলা	v) অ্যানেলিডা
চ) চুন	vi) সাইক্লোস্টোমাটা ও কন্ড্রিকথিস
ছ) কোয়ানোসাইট্	vii) ম্যামালিয়া
জ) ফুলকাছিদ্র	viii) অস্টিকথিস্

15. মানুষের দেহে পরজীবী হিসাবে বসবাস করে এমন কয়েকটি প্রাণীর একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

একক -2 (UNIT 2)

উদ্ভিদ ও প্রাণীর গাঠনিক সংগঠন (STRUCTURAL ORGANISATION IN PLANTS AND ANIMALS)

অধ্যায় -5
সপুষ্পক উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান

অধ্যায় - 6
সপুষ্পক উদ্ভিদের শারীরস্থানিক গঠন

অধ্যায় - 7
প্রাণীদের গাঠনিক সংগঠন

প্রথমদিকে খালি চোখে ও পরবর্তী সময়ে বিবর্ধক কাঁচ এবং অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই শুধুমাত্র পৃথিবীতে উপস্থিত বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন ধরনের জীবের বর্ণনা করা হয়েছিল। এটা ছিল মূলত জীবের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ স্থূল গঠনের বর্ণনা। এছাড়া পর্যবেক্ষণমূলক এবং উপলব্ধিমূলক জীবজ ঘটনাগুলোও এই বর্ণনার অংশ হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। পরীক্ষামূলক জীববিদ্যা (Experimental Biology) বা আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে শারীরবিদ্যা জীববিদ্যার অংশ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার আগে প্রকৃতিবিদরা শুধুমাত্র জীববিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাই দীর্ঘকাল ধরে জীববিদ্যা প্রাকৃতিক ইতিহাস (Natural History) হিসাবে পরিচিত ছিল। জীবের গঠন সংক্রান্ত যে কোনো বিস্তৃত বর্ণনাই চমকপ্রদ ছিল। যদিও এই বিস্তৃত আলোচনা প্রথমদিকে শিক্ষার্থীদের একঘেয়ে লাগতে পারে, তবে এটাও মনে রাখা দরকার যে পরবর্তী সময়ের রিডাকশনিষ্ট বায়োলজি (Reductionist Biology) তে এই বিস্তৃত আলোচনাটি সেখানেই ব্যবহৃত হয়েছিল যেখানে বিভিন্ন জীবের বর্ণনা ও গঠনের তুলনায় জীবন প্রক্রিয়াগুলো বিজ্ঞানীদের অধিকমাত্রায় মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। সুতরাং জীবের এই গঠনসংক্রান্ত বর্ণনা শারীরবিদ্যা ও বিবর্তনমূলক জীববিদ্যার গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়ক ও অর্থবহ। এই এককের অন্তর্গত অধ্যায়গুলোতে শারীরবৃত্তীয় ও আচরণগত ঘটমান বিষয়ের গঠনগত ভিত্তিসহ উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাংগঠনিক অঙ্গ সংস্থান বর্ণনা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের যাতে বুঝতে সুবিধা হয় সেজন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর অঙ্গসংস্থানিক ও শারীরস্থানিক বৈশিষ্ট্যসমূহ পৃথকভাবে আলোচনা করা হল।

Katherine Esau
(1898 – 1997)

ক্যাথেরিন অ্যাসু (Katherine Esau) 1898 সালে ইউক্রেন-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাশিয়া ও জার্মানিতে কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করেন এবং 1931 সালে আমেরিকায় তিনি তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি তাঁর জীবনের প্রথমদিকে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছিলেন যে কার্লি টপ ভাইরাস উদ্ভিদদেহে খাদ্য সংবহনকলা বা ফ্লোয়েম কলার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। Dr. Esau এর লেখা 'Plant Anatomy' 1954 সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পুস্তকটিতে বিষয়বস্তু এমন গতিশীল ও ক্রমবর্ধমান পর্যায়ে সাজানো হয়েছিল যাতে উদ্ভিদের গঠন বৈশিষ্ট্যগুলো সহজেই বোঝা যায়। সারা পৃথিবীতে এই পুস্তকটি বিপুল সাড়া ফেলেছিল এবং এর ফলেই উদ্ভিদবিদ্যার এই শাখাটির পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। ক্যাথেরিন অ্যাসু-এর লেখা 'Anatomy of seed Plants' পুস্তকটি 1960 সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পুস্তকটি Webster- উদ্ভিদ জীববিদ্যার (Plant Biology) বিশ্বকোশ হিসাবে পরিগণিত হয়। 1957 সালে তিনি ন্যাশনেল একাডেমি অব সায়েন্স (National Academy of Science)-এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনিই ষষ্ঠ মহিলা যিনি এই সম্মান পেয়েছিলেন এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার ছাড়াও তিনি 1989 সালে আমেরিকার তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের কাছ থেকে ন্যাশনেল মেডেল অব্ সায়েন্স (National Medal of Science) পুরস্কারটি গ্রহণ করেন।

1997 সালে ক্যাথেরিন অ্যাসু-এর মৃত্যুর পর মিসৌরী উদ্ভিদ উদ্যানের (Missouri Botanical Garden) শারীরস্থান ও অঙ্গসংস্থান বিভাগের অধিকর্তা পিটার র‍্যাভেন (Peter Raven) বলেছিলেন যে 99 বছর বয়সেও উদ্ভিদ জীববিদ্যার উপর তার সম্পূর্ণ আধিপত্য ছিল।

অধ্যায় - 5 (CHAPTER 5)

সম্পুষ্পক উদ্ভিদের অঙ্গাসংস্থান (MORPHOLOGY OF FLOWERING PLANTS)

5.1 মূল

5.2 কাণ্ড

5.3 পাতা

5.4 পুষ্পবিন্যাস

5.5 ফুল

5.6 ফল

5.7 বীজ

5.8 একটি আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদের অর্ধ-প্রায়োগিক (Semi-technical) বর্ণনা

5.9 কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ গোত্রের বিবরণ।

উন্নত উদ্ভিদের গঠনে ব্যাপক বৈচিত্র থাকলেও এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিতভাবে জানার আগ্রহ আমাদের বিন্দুমাত্রও কমেনি। গুপ্তবীজী উদ্ভিদের বাহ্যিক গঠন বা অঙ্গাসংস্থানে বিশাল বৈচিত্র্য থাকলেও এদের সকলেরই দেহে মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, বীজ রয়েছে।

২য় ও ৩য় অধ্যায়ে অঙ্গা সংস্থানিক ও অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদের শ্রেণি বিন্যাস সম্পর্কিত আলোচনা করেছি। উন্নত উদ্ভিদদের সার্থকভাবে শ্রেণি বিন্যাস করার জন্য এবং তাদের গঠন ভালোভাবে উপলব্ধি করার জন্য (অথবা এই ব্যাপারে যে কোনো সজীব বস্তুর ক্ষেত্রে) আমাদের আদর্শ প্রায়োগিক শব্দ এবং আদর্শ সংজ্ঞা জানার প্রয়োজন রয়েছে। পরিবেশের সঙ্গো অভিযোজিত হওয়ার জন্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গো যে সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলো ঘটে সে সম্পর্কেও আমাদের জানার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই অভিযোজনগুলোর মধ্যে রয়েছে- বিভিন্ন পরিবেশে বসবাস করার জন্য, আত্মরক্ষার জন্য, আরোহণের জন্য এবং খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য অভিযোজন।

একটি আগাছাকে তুলে নিয়ে দেখলে এতে তুমি মূল, কাণ্ড ও পাতা দেখতে পাবে। এছাড়া এই উদ্ভিদগুলোতে ফুল ও ফল থাকতে পারে। সপুষ্পক উদ্ভিদের ভূনিম্নস্থ অংশ মূলতন্ত্র এবং বায়ব অংশ বিটপতন্ত্র গঠন করে (চিত্র 5.1)।

5.1 মূল (THE ROOT)

বেশিরভাগ দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে অঙ্কুরিত বীজের ভ্রূণমূল অংশ সরাসরি বেড়ে গিয়ে **প্রাথমিক মূল** গঠন করে এবং এটি মাটির ভেতরে বাড়তে থাকে। এই মূল থেকে ভিন্ন ভিন্ন ক্রমে পার্শ্বীয় মূল বের হয় এবং এদের **গৌণ মূল, প্রগৌণ মূল** ইত্যাদি বলে। প্রাথমিক মূল এবং এর শাখা-প্রশাখা মিলে গঠিত হয় প্রধান

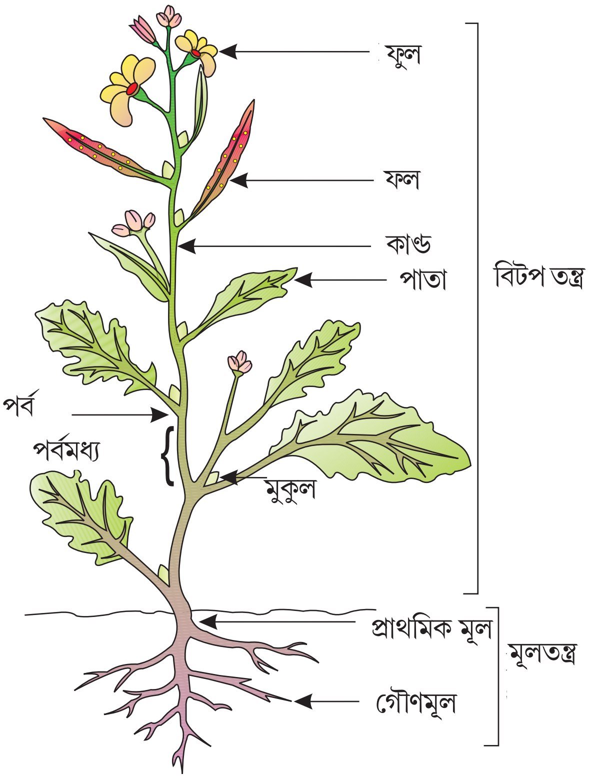

চিত্র 5.1 একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ

মূলতন্ত্র (চিত্র 5.2 ক তে সরিষা উদ্ভিদের **প্রধানমূলতন্ত্র** দেখানো হয়েছে)। একবীজপত্রী উদ্ভিদে প্রাথমিক মূল ক্ষণজীবী হয় এবং এটি অসংখ্য সূত্রাকার মূল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এই মূলগুলো কাণ্ডের গোড়া থেকে উৎপন্ন হয় এবং এরা একত্রিত হয়ে গুচ্ছমূলতন্ত্র গঠন করে। (চিত্র 5.2 খ তে গম গাছের **গুচ্ছমূলতন্ত্র** দেখানো হয়েছে)। ঘাস, মনস্টেরা *(Monstera)*, বট জাতীয় কিছু উদ্ভিদের ভ্রূণমূল ব্যতীত অন্য অংশ থেকেও মূল বের হতে দেখা যায়। এদের **অস্থানিক মূল** বলে (চিত্র 5.2 গ দেখো)। মূলতন্ত্রের প্রধান কাজগুলো হল মাটি থেকে জল ও খনিজ লবণ শোষণ করা মাটির সহিত উদ্ভিদকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করা, খাদ্য সঞ্চয় করা এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পদার্থ সংশ্লেষ করা।

চিত্র 5.2 বিভিন্ন ধরনের মূল (ক) স্থানিক মূল (খ) গুচ্ছ মূল (গ) অস্থানিক মূল

5.1.1 মূলের বিভিন্ন অঞ্চল (Regions of the Root)

মূলের অগ্রভাগ একটি টুপির মত অংশ দ্বারা আবৃত থাকে। একে **মূলত্র বলে** (চিত্র 5.3 দেখো)। মাটির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় এটি মূলের নরম অগ্রভাগকে রক্ষা করে। মূলত্রের কয়েক মিলিমিটার উপরে থাকে **বিভাজনক্ষম অঞ্চল**। এই অঞ্চলের কোশগুলো আকারে খুবই ছোটো, পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট এবং ঘন সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ হয়। এই কোশগুলো বারবার বিভাজিত হয়। বিভাজনক্ষম অঞ্চলের ঠিক উপরের স্তরের কোশগুলোর দ্রুত দীর্ঘায়তকরণ ও পরিবর্ধন ঘটে এবং এই স্তরটি মূলের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির জন্য দায়ী। এই অঞ্চলটিকে **বর্ধনশীল অঞ্চল** বলে। বর্ধনশীল অঞ্চলের কোশগুলো ক্রমশ: বিভেদিত ও পরিণত হয়। এই কারণে বর্ধনশীল অঞ্চলের উপরের অঞ্চলটিকে **স্থায়ী অঞ্চল** বলে। এই অঞ্চলের কিছু বহি:ত্বকীয় কোশ থেকে খুবই সূক্ষ্ম, নরম ও সূত্রাকার গঠন তৈরি হয়। এদের মূলরোম বলে। এই মূলরোমগুলো মাটি থেকে জল ও খনিজ লবণ শোষণ করে।

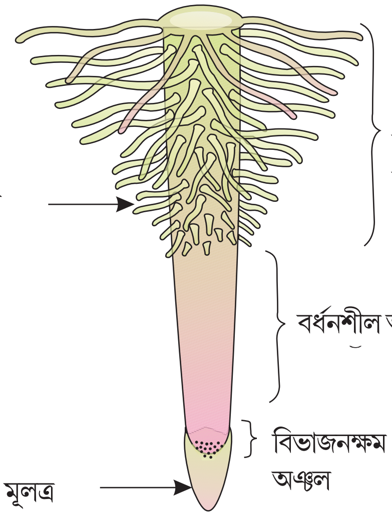

চিত্র 5.3 মূলাগ্রের বিভিন্ন অঞ্চল

5.1.2 মূলের পরিবর্তন বা রূপান্তর (Modification of Root)

কিছু কিছু উদ্ভিদের মূল তাদের আকৃতি ও গঠনের পরিবর্তন ঘটায় এবং জল ও খনিজ লবণের শোষণ ও পরিবহণ ব্যতীত অন্য কাজের উপযোগী গঠনে রূপান্তরিত হয়। এরা যান্ত্রিক সহায়তাদান, খাদ্য সঞ্চয় এবং শ্বসনকার্যের জন্য পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয় (চিত্র 5.4 ও 5.5 দেখো)। গাজর ও শালগমের প্রধান মূল এবং মিষ্টি আলুর অস্থানিক মূল খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে স্ফীত হয়। তুমি এ ধরনের আরো কিছু উদাহরণ দিতে পার? তুমি কখনো বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ভেবেছ কি যে বট গাছকে সহায়তা প্রদানকারী ওই ঝুলন্ত গঠনগুলো আসলে কী? এই ঝুলন্ত গঠনগুলোকে স্তম্ভমূল বলে। একইভাবে ভুট্টা এবং আখের কাণ্ডের নিম্নাঞ্চলের পর্ব থেকে কতকগুলো সহায়তা প্রদানকারী মূল বেরিয়ে আসে। এদের **ঠেসমূল** বলে। লবণাক্ত জলাভূমিতে জন্মানো রাইজোফোরা সদৃশ উদ্ভিদ থেকে অসংখ্য মূল উলম্বভাবে উপরের দিকে বৃদ্ধি পেয়ে মাটির উপরে উঠে আসে। এ ধরনের মূলকে **শ্বাসমূল** (Pneumatophore) বলে এবং এই মূল বায়ুমণ্ডল থেকে শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্রহণে সাহায্য করে।

চিত্র 5.4 যান্ত্রিক কার্যের জন্য পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত মূল : বটগাছ

শতমূলী

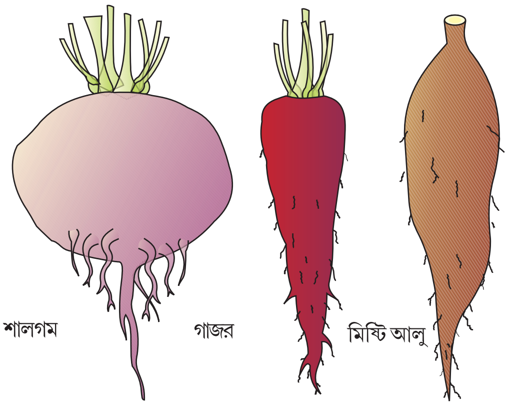

(ক)

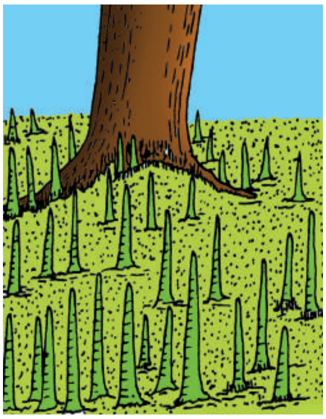

(খ)
রাইজোফোরা
উদ্ভিদের শ্বাসমূল

চিত্র 5.4 মূলের পরিবর্তন (ক) খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য (গ) শ্বসনের জন্য

কান্ড (Stem)

কী কী বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে কান্ড মূল থেকে আলাদা? শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল এবং ফল ধারণকারী বিটপ অক্ষের উর্ধ্বমুখী অংশ হল কান্ড। অঙ্কুরিত বীজস্থিত ভ্রুণের ভ্রুণমুকুল থেকে কান্ড গঠিত হয়। কান্ডে **পর্ব ও পর্বমধ্য** রয়েছে। কান্ডের যে অংশ থেকে পাতা নির্গত হয় তাকে পর্ব এবং দুটি পর্বের মধ্যবর্তী অংশকে পর্বমধ্য বলে। কান্ডে মুকুল থাকে। এরা অগ্রমুকুল বা কাক্ষিক মুকুল— এই দুই ধরনের হতে পারে। তরুণ অবস্থায় কান্ড সবুজ বর্ণের হয় এবং পরে প্রায়শই কাষ্ঠল ও গাঢ় বাদামী বর্ণের হয়ে যায়।

কান্ডের প্রধান কাজ হল শাখা প্রশাখা সৃষ্টি করা। এই শাখা প্রশাখাগুলো পাতা, ফুল ও ফল ধারণ করে। কান্ড, জল, খনিজ লবণ এবং সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন খাদ্য পরিবহণ করে। কিছু কিছু কান্ড খাদ্য সঞ্চয়, আরোহণ, আত্মরক্ষা এবং অঙ্গজ জননে সাহায্য করে।

5.2.1 কাণ্ডের পরিবর্তন বা রূপান্তর (Modification of Stem)

উদ্ভিদের কাণ্ডের গঠন যেরকম হবে বলে আমরা ভাবি সবসময় কাণ্ডের গঠন সেরকম হয় না। এরা বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য পরিবর্তিত হয়। আলু, আদা, হলুদ, ওল, কচু গাছের ভূনিম্নস্থ কাণ্ড এদের মধ্যে খাদ্য সঞ্চয় করে রাখার জন্য পরিবর্তিত হয়। এরা প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সহায়ক অঙ্গ হিসেবেও কাজ করে এবং তাই এদের সাহায্যে উদ্ভিদ তার বৃদ্ধির পক্ষে প্রতিকূল পরিবেশও কাটিয়ে উঠতে পারে। কাক্ষিক মুকুল থেকে গঠিত কাণ্ড আকর্ষ সরু ও সর্পিলাকারে প্যাঁচানো হয় এবং এর সাহায্যে উদ্ভিদ কোনো অবলম্বনের সাহায্যে আরোহণ করতে পারে। শশা, কুমড়ো, তরমুজ, আঙুর-এ কাণ্ড **আকর্ষ** দেখা যায়। কাণ্ড থেকে উৎপন্ন কাক্ষিক মুকুল পরিবর্তিত হয়ে কাষ্ঠল, সোজা এবং ছুঁচোলো শাখাকন্টক গঠন করে। লেবু, কাগজ ফুলের গাছ (*Bougainvillea*) এর মতো বহু উদ্ভিদে শাখাকন্টক বা কাণ্ড **কন্টক** দেখা যায়। এই ধরনের গঠন উদ্ভিদদের ঘাস, লতা, পাতা খায় এমন পশুদের হাত থেকে রক্ষা করে। শুষ্ক অঞ্চলে জন্মানো কিছু কিছু উদ্ভিদের কাণ্ড পরিবর্তিত হয়ে চ্যাপ্টা (ফণীমনসা) বা রসালো, নলাকার (ইউফরবিয়া) গঠন সৃষ্টি

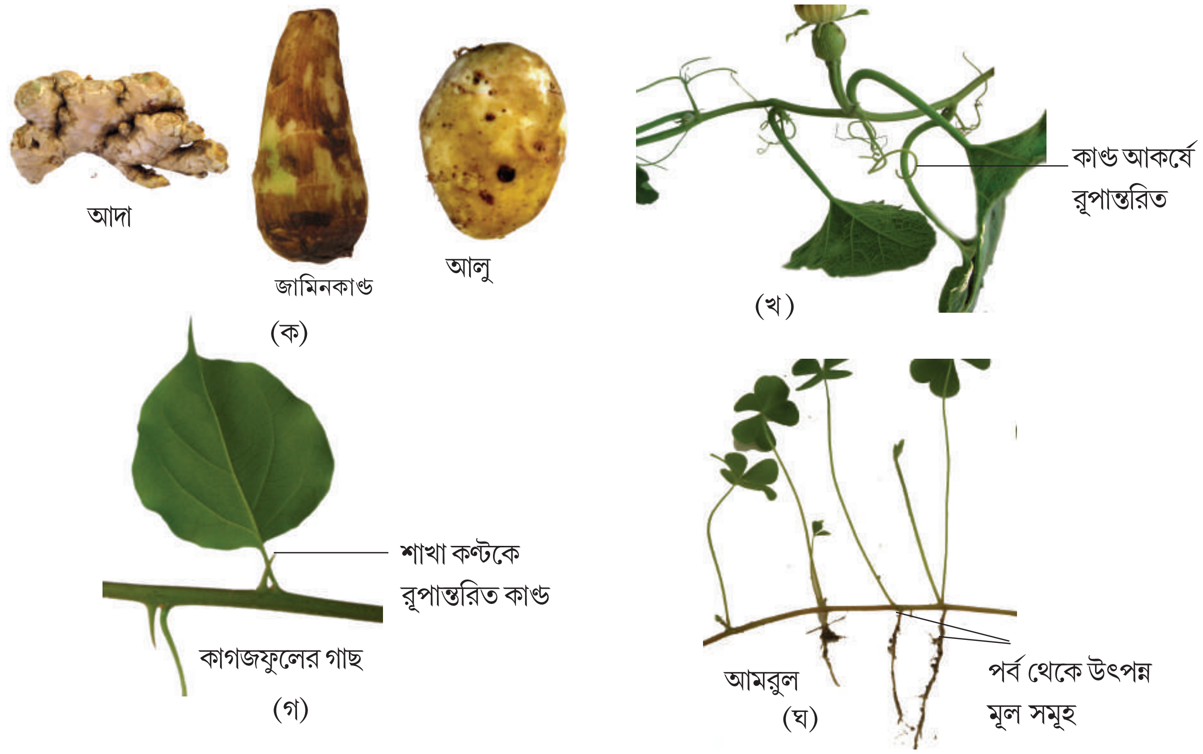

চিত্র 5.6 রূপান্তরিত কাণ্ড : (ক) খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য (খ) আরোহণের জন্য (গ) আত্মরক্ষার জন্য (ঘ) ছড়িয়ে পড়া এবং অঙ্গজ জননের জন্য

করে। এ ধরনের কাণ্ড ক্লোরোফিল যুক্ত হয় এবং সালোকসংশ্লেষ করতে পারে। ঘাস, স্ট্রবেরী ইত্যাদির মতো কিছু উদ্ভিদের ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড নতুন নতুন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং উদ্ভিদের পুরাতন অংশ নষ্ট হয়ে গেলে নতুন উদ্ভিদ গঠিত হয়। মেন্থা, জুঁই এর মতো উদ্ভিদের কাণ্ডের প্রধান অক্ষের গোড়া থেকে উৎপন্ন সরু পার্শ্বীয় শাখা কিছুটা সময় ধরে উপরের দিকে বৃদ্ধি পাওয়ার পর ধনুকের মতো নিচের দিকে বেঁকে গিয়ে মাটি স্পর্শ করে। টোপা পানা, কচুরি পানার মতো জলজ উদ্ভিদে ছোটো পর্বমধ্য বিশিষ্ট একটি পার্শ্বীয় শাখা দেখা যায় এবং প্রতিটি পর্ব থেকে গোলাপের আকারে সজ্জিত কতকগুলো পাতা এবং একগুচ্ছ মূল উৎপন্ন হয়। কলা, আনারস, চন্দ্রমল্লিকার মতো উদ্ভিদে প্রধান কাণ্ডের গোড়া এবং ভূনিম্নস্থ অংশ থেকে বেশ কিছু পার্শ্বীয় শাখা উৎপন্ন হয় এবং এর মাটির নিচে সমান্তরালে বৃদ্ধি পায় এবং এরপর তির্যকভাবে মাটির উপরে উঠে এসে পত্রজ বিটপ গঠন করে।

5.3 পাতা (Leaf)

কাণ্ড থেকে সৃষ্ট পার্শ্বীয়, সাধারণত চ্যাপ্টা গঠনই হল পাতা। এটি কাণ্ডের পর্ব থেকে উৎপন্ন হয় এবং এর কক্ষে একটি মুকুল থাকে। কাণ্ডের কক্ষে উৎপন্ন মুকুল অর্থাৎ **কাক্ষিক মুকুল** পরে বৃদ্ধি পেয়ে শাখা গঠন করে। উদ্ভিদের বিটপ অংশের অগ্রস্থ ভাজক কলা থেকে পাতাগুলো উৎপন্ন হয় এবং এরা অগ্রোন্মুখভাবে সজ্জিত থাকে। সালোকসংশ্লেষে সহায়ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাতা একটি অঙ্গজ গঠন। একটি আদর্শ পাতা তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত : **পত্রমূল, পত্রবৃন্ত ও পত্রফলক** (চিত্র 5.7 ক দেখো)।

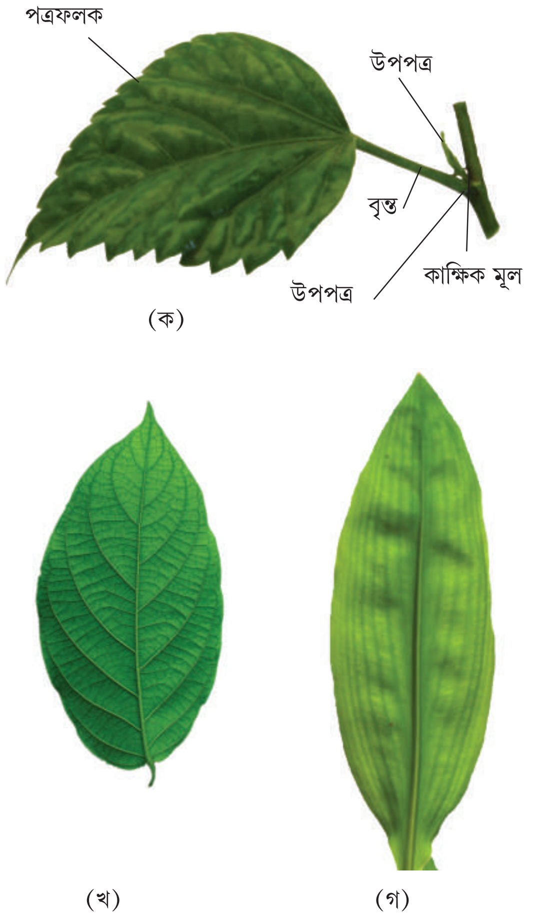

চিত্র 5.7 একটি পাতার গঠন
(ক) একটি পাতার বিভিন্ন অংশ
(খ) জালিকাকার শিরাবিন্যাস
(গ) সমান্তরাল শিরাবিন্যাস

চিত্র 5.8 যৌগিক পত্র
(ক) পক্ষল যৌগিক পত্র
(খ) করতলাকার যৌগিক পত্র

পাতা পত্রমূলের সাহায্যে কাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে এবং দুটি পার্শ্বীয় ছোটো পাতার মতো গঠন ধারণ করতে পারে। এদের উপপত্র বলে। একবীজপত্রী উদ্ভিদে পত্রমূল প্রসারিত হয়ে একটি আবরণী গঠন করে যা কাণ্ডকে আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে বেষ্টন করে থাকে। কিছু কিছু শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদে পত্রমূল স্ফীত হয় এবং একে **উপাধান** বা পালভিনাস (Pulvinus) বলে। **পত্রবৃন্ত** পত্রফলককে এমনভাবে ধারণ করতে সাহায্য করে যাতে ফলক সূর্যালোক পায়। সরু, লম্বা ও নমনীয় পত্রবৃন্ত পত্রফলককে বাতাসে আন্দোলিত হতে সাহায্য করে এবং এইভাবে পাতাকে ঠান্ডা রাখতে ও পত্রতলে টাটকা বায়ু প্রবাহিত হতে সাহায্য করে। ল্যামিনা বা **পত্রফলক** হল পাতার সবুজ ও প্রসারিত অংশ। এতে বহু শিরা ও উপশিরা থাকে। সাধারণত পত্রফলকের মাঝ বরাবর একটি সুস্পষ্ট শিরা থাকে এবং একে মধ্যশিরা (midrib) বলে। এই শিরাগুলো ফলককে দৃঢ়তা প্রদান করে এবং এদের মধ্য দিয়েই জল, খনিজলবণ ও খাদ্যবস্তুর সংববহন ঘটে। পত্রফলকের আকৃতি, পত্রকিনারা, পত্রাগ্র, পত্রতল এবং খণ্ডণপ্রণালীর গভীরতার বিস্তৃতি পত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

5.3.1 শিরাবিন্যাস (Venation)

পাতার ফলকের উপর শিরা উপশিরাগুলোর সজ্জারীতিকে শিরাবিন্যাস বলে। যখন শিরা উপশিরাগুলো জালকের সৃষ্টি করে, তখন সেই শিরাবিন্যাসকে জালিকাকার **শিরাবিন্যাস** বলে (চিত্র 5.7 খ দেখো)। অপরদিকে, যখন শিরা-উপশিরাগুলো পরস্পর সমান্তরালভাবে ফলকে বিন্যস্ত থাকে তখন সেই শিরাবিন্যাসকে **সমান্তরাল** শিরাবিন্যাস বলে (চিত্র 5.7 গ দেখো)। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতায় সাধারণত জালিকাকার শিরা বিন্যাস এবং বেশিরভাগ একবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতায় সমান্তরাল শিরাবিন্যাস দেখা যায়।

5.3.2 পাতার প্রকারভেদ (Types of Leaves)

একটি পাতাকে তখনই **সরলপত্র** বলা হবে, যখন পত্রফলকটি অখণ্ডিত থাকবে এবং খণ্ডিত হলেও ফলকের খণ্ডণপ্রণালী মধ্যশিরার স্পর্শ করবে না। যখন ফলকের খণ্ডণপ্রণালী মধ্যশিরা স্পর্শ করে তখন ফলকটি বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রকে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ ধরনের পাতাকে **যৌগিকপত্র** বলে। সরল ও যৌগিক উভয় ধরনের পত্রের পত্রবৃন্তের কক্ষে একটি মুকুল গঠিত হয়, কিন্তু যৌগিকপত্রের পত্রকের কক্ষে কোনো মুকুল থাকে না।

যৌগিক পত্র দুই ধরনের হতে পারে (চিত্র 5.8 দেখো)। **পক্ষল যৌগিকপত্রে** বেশ কিছু পত্রক একটি সাধারণ অক্ষ বা পত্রক অক্ষের উপর সজ্জিত থাকে এবং এটি হল পাতার মধ্যশিরা (যেমন-নিম পাতা)

5.3.3 পত্রবিন্যাস (Phyllotaxy)

কাণ্ড বা তার শাখার উপর পাতার সজ্জারীতিই হল পত্রবিন্যাস। পত্রবিন্যাস সাধারণত তিন প্রকারের হয়--- **একান্তর**, (Alternate), **অভিমুখ** (Opposite) এবং **আবর্ত** (Whorled) (চিত্র 5.9 দেখো)। একান্তর পত্রবিন্যাসে, প্রতিটি পর্ব থেকে একটি করে পাতা একান্তরভাবে (পর্বের ডান ও বামদিক থেকে পর্যায়ক্রমে) উৎপন্ন হয়। জবা, সরিষা এবং সূর্যমুখী উদ্ভিদের পাতায় একান্তর পত্রবিন্যাস দেখা যায়। অভিমুখ পত্রবিন্যাসে, প্রতিটি পর্ব থেকে একজোড়া পাতা উৎপন্ন হয় এবং এরা পরস্পরের বিপরীত মুখে অবস্থান করে। আকন্দ ও পেয়ারা উদ্ভিদের পাতায় এ ধরনের পত্রবিন্যাস দেখা যায়। যখন একটি পর্ব থেকে দুইটির বেশি পাতা উৎপন্ন হয়ে একটি আবর্ত গঠন করে তখন তাকে আবর্ত পত্রবিন্যাস বলে। ছাতিম গাছের পাতায় আবর্ত পত্রবিন্যাস দেখা যায়।

চিত্র 5.9 বিভিন্ন ধরনের পত্রবিন্যাস : (ক) একান্তর (খ) অভিমুখ (গ) আবর্ত

5.3.4 পাতার রূপান্তর (Modification of Leaves)

পাতা প্রায়শই সালোকসংশ্লেষ ব্যতীত অন্য ধরনের কাজ করার জন্য রূপান্তরিত হয়। এরা আরোহণের জন্য **আকর্ষে** রূপান্তরিত হয় (যেমন মটর গাছের পাতা) বা আত্মরক্ষার জন্য **কাঁটায়** রূপান্তরিত হয় (যেমন ক্যাক্টাস উদ্ভিদের পাতা) (চিত্র 5.10 ক, খ দেখো) পেঁয়াজ ও রসুনের রসাল পাতা খাদ্য সঞ্চয় করে। আবার কিছু কিছু উদ্ভিদ যেমন অস্ট্রেলীয় অ্যাকাশিয়ার পাতা ছোটো ও ক্ষণজীবী হয়। এই সব উদ্ভিদের পত্রবৃন্ত প্রসারিত হয় ও সবুজ বর্ণ ধারণ করে এবং সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে। কলসপত্রী, ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ এর মতো কিছু পতঙ্গভুক উদ্ভিদের পাতাও এক ধরনের রূপান্তরিত পাতা।

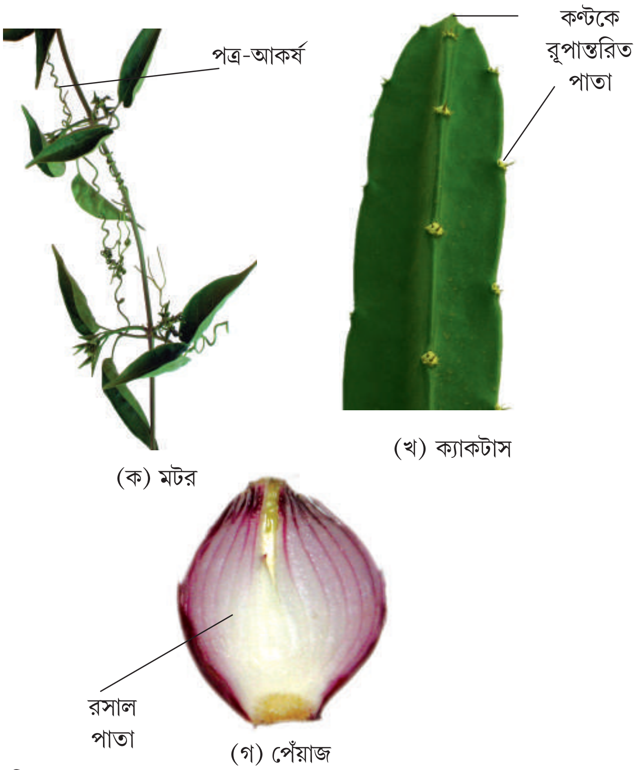

চিত্র 5.10 পাতার রূপান্তর
(ক) আরোহণের জন্য আকর্ষ (খ) আত্মরক্ষার জন্য কাঁটা
(গ) খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য রসাল পাতা

5.4 পুষ্প বিন্যাস (The inflorescence)

পুষ্প একটি পরিবর্তিত বিটপ— যেখানে বিটপের অগ্রস্থ ভাজককলা পুষ্প সৃষ্টিকারী ভাজক কলায় পরিবর্তিত হয়। পর্বমধ্যগুলো সম্প্রসারিত হয় না এবং এর অক্ষ সংকুচিত হয়ে যায়। পুষ্পাক্ষের শীর্ষভাগ থেকে বিভিন্ন ধরনের পুষ্পপত্রগুলো ক্রমানুযায়ী সজ্জিত পর্বে পাতার পরিবর্তে পার্শ্বীয়ভাবে উৎপন্ন হয়। যখন একটি বিটপের অগ্রভাগ ফুলে রূপান্তরিত হয় তখন

চিত্র 5.11 অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস

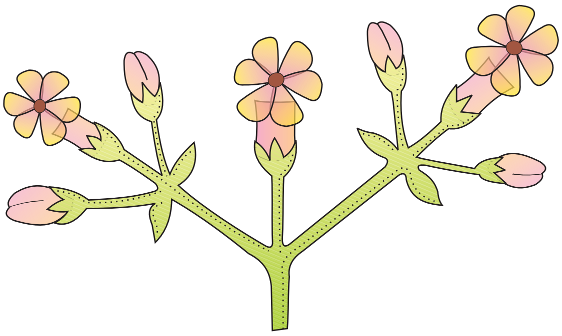

চিত্র 5.12 নিয়ত পুষ্পবিন্যাস

এটি সর্বদা একককপুষ্পী হয়। মঞ্জুরীদণ্ডের উপর ফুলের সজ্জারীতিকে **পুষ্পবিন্যাস** বলে। মঞ্জুরীদণ্ডের শীর্ষভাগ ফুলে পরিণত হয়েছে কিনা বা মঞ্জুরীদণ্ড অবিরত বেড়ে চলছে কিনা তার উপর ভিত্তি করে পুষ্পবিন্যাস দুই ধরনের হয় — **অনিয়ত** ও **নিয়ত** পুষ্পবিন্যাস। অনিয়ত পুষ্পবিন্যাসে মঞ্জুরীদণ্ড অবিরত বৃদ্ধি পায় এবং ফুলগুলো পার্শ্বীয়ভাবে উৎপন্ন হয় ও অগ্রোন্মুখভাবে সজ্জিত থাকে (চিত্র 5.11 দেখো)।

নিয়ত পুষ্পবিন্যাসে মঞ্জুরী দণ্ডের শীর্ষভাগ ফুলে পরিণত হয়। তাই এক্ষেত্রে মঞ্জুরীদণ্ডের বৃদ্ধি সীমিত। ফুলগুলো নিম্নোন্মুখভাবে উৎপন্ন হয় (চিত্র 5.12দেখো)

5.5 ফুল (The flower)

গুপ্তবীজী উদ্ভিদের জননগত একক হল ফুল। এটি উদ্ভিদের যৌন জননে সাহায্য করে। একটি আদর্শ ফুলের চারটি ভিন্ন ভিন্ন স্তবক থাকে এবং এরা পুষ্পবৃন্ত বা পেডিসেল এর স্ফীত শীর্ষভাগের উপর ক্রমানুসারে সজ্জিত থাকে। পুষ্পবৃন্তের এই স্ফীত অংশটিকে **পুষ্পাক্ষ বা থ্যালামাস** বলে। এই স্তবকগুলো হল- বৃতি, দলমণ্ডল, পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক। বৃতি ও দলমণ্ডলকে সাহায্যকারী স্তবক এবং পুংস্তবক ও স্ত্রী স্তবককে জনন স্তবক বা জনন অঙ্গারূপে গণ্য করা হয়। লিলি ফুলের মতো কিছু কিছু ফুলে, বৃতি ও দলমণ্ডল সুস্পষ্ট নয় এবং এদের পুষ্পপুট (Perianth) বলে। যখন কোনো ফুলে পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক উভয়ই থাকে তখন তাকে **উভলিঙ্গ** ফুল বলে। অপরদিকে, কোনো ফুলে কেবলমাত্র পুংকেশর বা কেবলমাত্র গর্ভকেশর থাকলে তাকে **একলিঙ্গ** ফুল বলে।

প্রতিসাম্যের ভিত্তিতে ফুল দুই ধরনের হতে পারে— **বহু প্রতিসম** (অরীয়ভাবে প্রতিসম) বা **এক প্রতিসম** (দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম)। যে ফুলকে তার কেন্দ্র বরাবর যে কোনো অরীয় তলে ভাগ করলেই সমান দুটি অরীয় খণ্ডক পাওয়া যায় তাকে বহু প্রতিসম ফুল বলে। উদাহরণ — সরিষা, ধুতুরা, লঙ্কা। যে ফুলকে তার কেন্দ্র বরাবর কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট উলম্বতলে ভাগ করলেই সমান দুটি খণ্ডক পাওয়া যেতে পারে তাকে এক প্রতিসম ফুল বলে। উদাহরণ—মটর, গুলমোহর, সীম, ক্যাসিয়া। কোনো ফুলকে তার কেন্দ্র বরাবর যে কোনো উলম্বতলে ভাগ করলেও যখন সমান দুটি অংশে ভাগ করা যায় না তখন তাকে **অপ্রতিসম ফুল** বলে। উদাহরণ— কলাবতী।

একটি ফুল ত্র্যংশক, চতুর্থাংশক বা পঞ্চাংশক হতে পারে যখন পুষ্পপত্রগুলো যথাক্রমে 3, 4 বা 5 এর গুণীতকে থাকে। যে সব ফুলের পুষ্পবৃন্তের গোড়ায় সংক্ষিপ্ত পাতার মতো অংশ অর্থাৎ মঞ্জুরিপত্র দেখা যায় তাদের **মঞ্জুরিপত্রক পুষ্প** (Bracteate flower) বলে এবং মঞ্জুরিপত্রবিহীন ফুলকে **অমঞ্জুরিপত্রক পুষ্প** (Ebracteate flower) বলে।

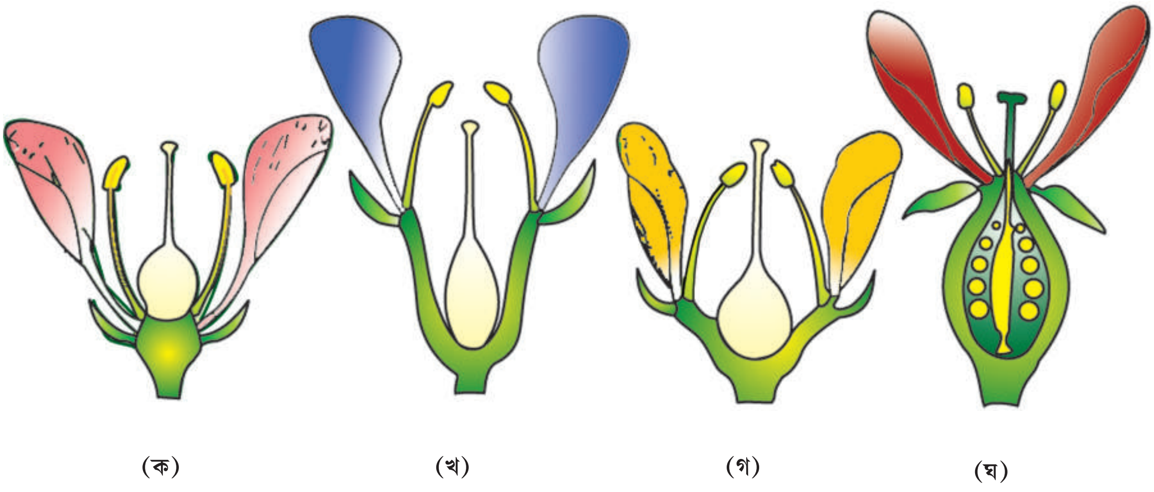

চিত্র 5.13 পুষ্পাক্ষের উপর পুষ্পপত্রের অবস্থান : (ক) গর্ভপাদ পুষ্প (খ) ও (গ) গর্ভকটি পুষ্প (ঘ) গর্ভশীর্ষ পুষ্প

পুষ্পাক্ষের উপর গর্ভাশয়ের অবস্থানের সাপেক্ষে বৃতি, দলমণ্ডল এবং পুংস্তবকের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ফুলগুলোকে **গর্ভপাদ, গর্ভকটি ও গর্ভশীর্ষ** পুষ্প হিসেবে বর্ণনা করা যায়। গর্ভপাদ পুষ্পে গর্ভপত্র শীর্ষে অবস্থান করে এবং অন্য পুষ্পপত্রগুলো তার নিচের দিকে সজ্জিত থাকে। এ ধরনের ফুলের গর্ভাশয়কে **অধিগর্ভ** গর্ভাশয় বলে। উদাহরণ — সরিষা, জবা, বেগুন। যে ফুলে গর্ভপত্র কেন্দ্রে অবস্থান করে এবং অন্য পুষ্পপত্রগুলো পুষ্পাক্ষের কিনারায় প্রায় একই তলে সজ্জিত থাকে তাকে **গর্ভকটি** পুষ্প বলে। এক্ষেত্রে ফুলের গর্ভাশয়টি অর্ধ অধোগর্ভ প্রকৃতির। উদাহরণ — খুবানি বা এপ্রিকট, গোলাপ, পীচ। গর্ভশীর্ষ পুষ্পে পুষ্পাক্ষের কিনারা গর্ভাশয়কে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে উপরদিকে বৃদ্ধি পায় এবং এটি গর্ভাশয় প্রাচীরের সাথে মিলে যায়। ফুলের অন্য স্তবকগুলো গর্ভাশয়ের শীর্ষ ভাগ থেকে উৎপন্ন হয়। তাই এ ধরনের গর্ভাশয়কে **অধোগর্ভ** গর্ভাশয় বলে। পেয়ারা ও শশার ফুলে এবং সূর্যমুখীর প্রান্তপুষ্পিকায় গর্ভাশয় অধোগর্ভ প্রকৃতির হয়।

5.5.1 ফুলের বিভিন্ন অংশ (Parts of a flower)

স্বাভাবিকভাবে প্রতিটি ফুলে সাধারণত চারটি স্তবক থাকে। এগুলো হল বৃতি, দলমণ্ডল, পুং স্তবক ও স্ত্রী স্তবক— (চিত্র 5.14 দেখ)

5.5.1.1 বৃতি (Calyx)

বৃতি হল ফুলের সবচেয়ে বাইরের স্তবক এবং এর অংশগুলোকে বৃত্যাংশ বলে। সাধারণত বৃত্যাংশগুলো সবুজ, পাতার মতো হয় এবং কুঁড়ি অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে ফুলকে সুরক্ষা প্রদান করে। বৃতি **যুক্তবৃতি** (বৃত্যাংশগুলো পরস্পর যুক্ত) বা মুক্ত বৃতি (বৃত্যাংশগুলো মুক্ত) প্রকৃতির হতে পারে।

5.5.1.2 দলমণ্ডল (Corolla)

দলাংশগুলোর সমন্বয়ে দলমণ্ডল গঠিত হয়। পরাগযোগের জন্য পতঙ্গগুলোকে আকর্ষণ করতে দলাংশগুলো সাধারণত উজ্জ্বল বর্ণের হয়। বৃতির মতো দলমণ্ডলও যুক্ত দল (দলাংশগুলো পরস্পর যুক্ত) বা মুক্তদল

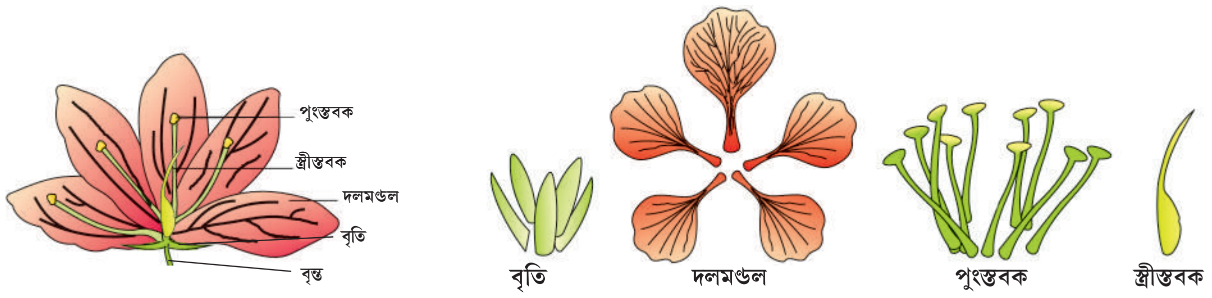

চিত্র 5.14 একটি ফুলের বিভিন্ন অংশ

(দলাংশগুলো মুক্ত) প্রকৃতির হতে পারে। দলমণ্ডলের আকৃতি ও বর্ণ উদ্ভিদ ভেদে অনেকটাই ভিন্ন ভিন্ন হয়। দলমণ্ডল নলাকৃতি, ঘণ্টাকৃতি, চোঙাকৃতি বা চাকার মতো আকৃতি বিশিষ্ট হতে পারে।

পুষ্পপত্রবিন্যাস (Aestivation):

পুষ্প মুকুলে বৃত্যাংশ বা দলাংশগুলোর একই আবর্তে উপস্থিত অন্য সদস্যদের সাপেক্ষে সজ্জারীতিকে পুষ্পপত্রবিন্যাস বলে। পুষ্পপত্রবিন্যাসের প্রধান প্রকারগুলো হল— প্রান্তস্পর্শী বা ভ্যালভেট, পাকানো বা টুইস্টেড, ইমব্রিকেট এবং ধ্বজক বা ভ্যাক্সিলারী (চিত্র 5.15 দেখো)। যখন একটি আবর্তের বৃত্যাংশ বা দলাংশগুলো প্রান্ত দ্বারা একে অপরকে শুধুমাত্র স্পর্শ করে, অধিক্রম করে না তাকে **প্রান্তস্পর্শী** বা ভ্যালভেট বলে। উদাহরণ আকন্দ ফুলের বৃতি। যখন বৃত্যাংশ বা দলাংশের একপ্রান্ত পাশের বৃত্যাংশ বা দলাংশের এক প্রান্তকে অধিক্রম করে এবং এইভাবে সংলগ্ন বৃত্যাংশ বা দলাংশের মধ্যে অধিক্রমণ ঘটে তখন তাকে **পাকানো** বা টুইস্টেড পুষ্পবিন্যাস বলে। উদাহরণ — জবা, ঢেঁড়স ও তুলা ফুলের পাপড়ি যা দলাংশ। যখন বৃত্যাংশ বা দলাংশের প্রান্তগুলো একটি অপরটিকে অধিক্রম করে কিন্তু এই অধিক্রমণ কোনো নির্দিষ্ট অভিমুখে ঘটে না, তাকে **ইমব্রিকেট** পুষ্পপত্রবিন্যাস বলে। উদাহরণ— ক্যাসিয়া, গুলমোহর। মটর এবং সীম-এর ফুলে পাঁচটি দলাংশ বা পাপড়ি থাকে। সবচেয়ে বড়ো দলাংশটি (ধ্বজা) দুটি পার্শ্বস্থ দলাংশকে (পক্ষ) অধিক্রম করে। এই দলাংশ দুটি আবার ভেতরের দিকের ক্ষুদ্রতম দলাংশদ্বয় (নৌকা)কে অধিক্রম করে। এই ধরনের পুষ্পপত্রবিন্যাসকে **ধ্বজক** বা ভ্যাক্সিলারি পুষ্পপত্রবিন্যাস বলে।

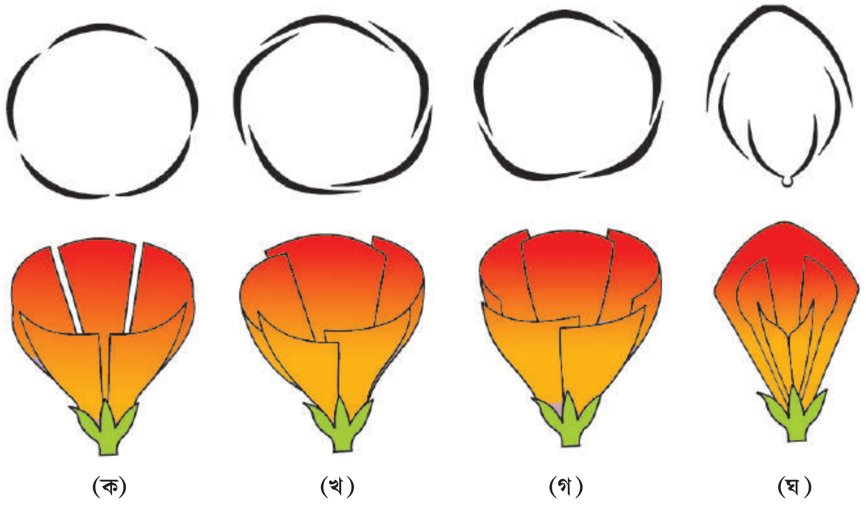

চিত্র 5.15 দলমণ্ডলে পুষ্পপত্রবিন্যাসের ধরন: (ক) প্রান্তস্পর্শী বা ভ্যালভেট (খ) পাকানো বা টুইস্টেড (গ) ইমব্রিকেট (ঘ) ধ্বজক বা ভ্যাক্সিলারি

5.5.1.3 পুংস্তবক (Androecium)

পুংকেশরের সমন্বয়ে পুংস্তবক গঠিত। পুংকেশর ফুলের পুংজনন অঙ্গা হিসাবে থাকে। প্রতিটি পুংকেশর একটি পুংদণ্ড ও একটি পরাগধানীর সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি পরাগধানী সাধারণত দুই খন্ডক বিশিষ্ট এবং প্রতিটি খন্ডক দুই প্রকোষ্টযুক্ত হয়। এই প্রকোষ্টগুলোকে পরাগথলি বলে। পরাগরেণুগুলো পরাগথলিতে উৎপন্ন হয়। **স্ট্যামিনোড** বলতে একটি বন্ধ্যা পুংকেশরকে বোঝায়।

ফুলের পুংকেশর নিজেদের মধ্যে বা অন্যান্য স্তবেকর সদস্যদের সাথে (যেমন দলাংশ বা পাপড়ি) যুক্ত থাকতে পারে। যখন পুংকেশরগুলো পাপড়ি বা দলাংশের সাথে যুক্ত থাকে তখন তাদের **দললগ্ন পুংকেশর** (epipetalous) বলে। উদাহরণ— বেগুন, ধুতুরা। আবার যখন পুংকেশরগুলো পুষ্পপটের সাথে যুক্ত থাকে তখন তাদের **পুষ্পপুটসংলগ্ন** পুংকেশর (epiphyllous) বলে। উদাহরণ— লিলি ফুলের পুংকেশর। ফুলে পুংকেশরগুলো পরস্পর থেকে আলাদা বা মুক্ত থাকতে পারে (মুক্ত পুংকেশর) বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যুক্ত থাকতে পারে। পুংকেশরের পুংদণ্ডগুলো একটি গুচ্ছ (**একগুচ্ছ** পুংকেশর) যেমন— জবা বা দুইটি গুচ্ছ (দ্বিগুচ্ছ পুংকেশর) যেমন— মটর বা দুই এর বেশি গুচ্ছ (**বহুগুচ্ছ** পুংকেশর) যেমন— লেবু, গঠন করতে পারে। স্যালভিয়া এবং সরিষা ফুলে পুংকেশরে ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট পুংদণ্ড থাকতে পারে।

5.5.1.4 স্ত্রীস্তবক (Gyynoecium)

ফুলের স্ত্রী স্তবকটি স্ত্রী জনন অঙ্গা রূপে থাকে এবং এটি এক বা একাধিক গর্ভপত্রের সমন্বয়ে গঠিত। একটি **গর্ভপত্র গর্ভমুন্ড, গর্ভদণ্ড ও গর্ভাশয়** এই তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। গর্ভপত্রের গোড়ার দিকের স্ফীত অংশটি হল গর্ভাশয় এবং এর সাথে যুক্ত লম্বা নলাকার অংশটিকে গর্ভদণ্ড বলে। গর্ভদণ্ড গর্ভাশয়ের সাথে গর্ভমুণ্ডকে যুক্ত করে। সাধারণত গর্ভদণ্ডের শীর্ষে গর্ভমুণ্ড অবস্থান করে এবং এটি পরাগরেণু গ্রহণকারী তল হিসেবে কাজ করে। প্রতিটি গর্ভাশয়ে এক বা একাধিক ডিম্বক থাকে এবং এরা চ্যাপ্টা, কুশন সদৃশ অমরার সাথে যুক্ত থাকে। যখন স্ত্রীস্তবকে একাধিক গর্ভপত্র থাকে তখন তারা মুক্ত অবস্থায় বা পরস্পরের সঙ্গো যুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে এবং এদের যথাক্রমে **মুক্ত গর্ভপত্রী** (যেমন- পদ্ম, গোলাপ) ও **যুক্ত গর্ভপত্রী** (যেমন-সরিষা, টমেটো) বলে। নিষেকের পর ডিম্বকগুলো বীজে এবং গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয়।

অমরা বিন্যাস : গর্ভাশয়ের ভেতরে ডিম্বকের সজ্জারীতিকে অমরাবিন্যাস বলে। অমরাবিন্যাস বিভিন্ন ধরনের হয়। যথা — **প্রান্তীয়, অক্ষীয়, বহুপ্রান্তীয়, মূলীয়, কেন্দ্রীয়** এবং **মুক্ত কেন্দ্রীয়** (চিত্র 5.16 দেখো)। প্রান্তীয় অমরাবিন্যাসে অমরা গর্ভাশয়ের অঙ্কীয় সন্ধি বরাবর একটি উঁচু স্থান গঠন করে এবং ডিম্বকগুলো এই উঁচু স্থানের উপর দুটি সারিতে সজ্জিত থাকে। উদাহরণ — মটর একটি বহু প্রকোষ্টযুক্ত গর্ভাশয়ে যখন অমরাটি অক্ষীয় হয় এবং ডিম্বকগুলো সেই অক্ষের সাথে যুক্ত থাকে তখন তাকে অক্ষীয় অমরাবিন্যাস বলে। উদাহরণ — জবা, টমেটো ও লেবু। বহু প্রান্তীয় অমরাবিন্যাসে ডিম্বকগুলো গর্ভাশয়ের ভেতরের প্রাচীর থেকে বা প্রান্তীয় অংশ থেকে উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে গর্ভাশয় এক প্রকোষ্টবিশিষ্ট কিন্তু একটি ভ্রান্ত প্রাচীর গঠনের জন্য একে দুই

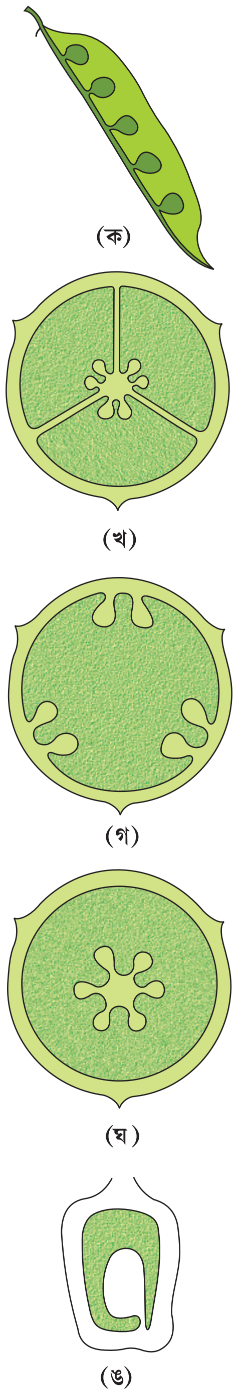

চিত্র 5.16 বিভিন্ন ধরনের অমরাবিন্যাসের
(ক) প্রান্তীয়
(খ) অক্ষীয়
(গ) বহু প্রান্তীয়
(ঘ) মুক্ত কেন্দ্রীয়
(ঙ) মূলীয়

প্রকোষ্টবিশিষ্ট মনে হয়। উদাহরণ — সরিষা, আর্জিমোন। যখন ডিম্বকগুলো গর্ভাশয়ের কেন্দ্রীয় অক্ষের উপর জন্মায় এবং কোনো প্রাকার গঠিত হয় না তখন তাকে মুক্ত কেন্দ্রীয় অমরাবিন্যাস বলে। উদাহরণ— ডায়েন্থাস (Dianthus), প্রিমরোজ (Primrose) ।মূলীয় অমরাবিন্যাসে, অমরা গর্ভাশয়ের মূল দেশ থেকে উৎপন্ন হয় এবং এর সাথে একটি ডিম্বক যুক্ত থাকে। উদাহরণ — সূর্যমুখী, গাঁদা।

5.6 ফল (Fruit)

সপুষ্পক উদ্ভিদের একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল ফল। এটি নিষেকের পর গঠিত একটি পরিণত বা পরিপক্ব গর্ভাশয়। নিষেক ছাড়াই গর্ভাশয় ফলে পরিণত হলে সেই ফলকে **পার্থেনোকার্পিক** ফল বলে। সাধারণত ফল পেরিকার্প বা ফলত্বক এবং বীজ নিয়ে গঠিত। ফলত্বক শুষ্ক বা মাংসল হতে পারে। ফলত্বক পুরু ও মাংসল হলে এটি বহি:ত্বক বা এপিকার্প (ফলত্বকের বাইরের অংশ) মধ্যত্বক বা মেসোকার্প (ফলত্বকের

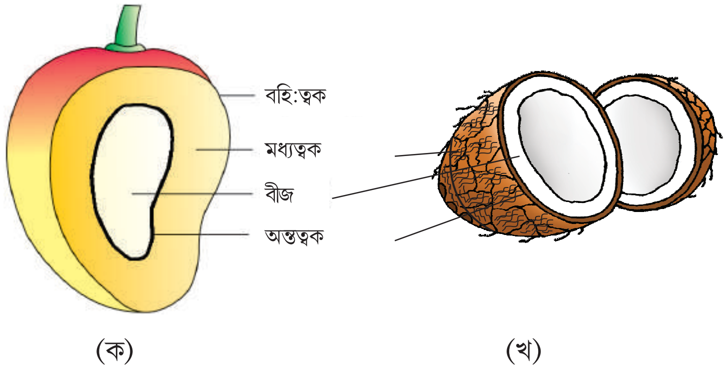

চিত্র 5.17 একটি ফলের বিভিন্ন অংশ (ক) আম (খ) নারিকেল

মাঝের অংশ) এবং অন্ত:ত্বক বা এন্ডোকার্প (ফলত্বকের ভেতরের অংশ) এ বিভেদিত হয়।

আম ও নারিকেলের ক্ষেত্রে এদের ফলকে ড্রুপ বলে। (চিত্র 5.17 দেখো)। এরা এক গর্ভপত্রী অধিগর্ভ গর্ভাশয় থেকে উৎপন্ন হয় ও এক বীজ বিশিষ্ট হয়। আম্রফলে পেরিকার্প বা ফলত্বক সুস্পষ্টভাবে বাইরের পাতলা এপিকার্প বা বহি:ত্বক। মাঝের রসাল খাদ্যপোযোগী মেসোকার্প বা মধ্যত্বক এবং ভেতরের অত্যন্ত শক্ত, কঠিন এন্ডোকার্প বা অন্ত:স্তক এ বিভেদিত হয়। নারিকেলও একটি ড্রুপজাতীয় ফল এবং এর মেসোকার্প বা মধ্যত্বক তন্তুময় হয়।

5.7 বীজ (Seed)

নিষেকের পর ডিম্বক বীজে পরিণত হয়। একটি বীজ বীজত্বক ও ভ্রূণ নিয়ে গঠিত। ভ্রূণ একটি ভ্রণমূল একটি ভ্রূণাক্ষ এবং একটি (যেমন গম, ভুট্টা) বা দুটি বীজপত্র (যেমন ছোলা, মটর নিয়ে গঠিত)।

5.7.1 একটি দ্বিবীজপত্রী বীজের গঠন

বীজের সবচেয়ে বাইরের আবরণীটিকে বীজত্বক বলে। বীজত্বক দ্বিস্তরী হয়, বাইরের স্তরটিকে বীজ **বহি:ত্বক** বা টেস্টা এবং ভেতরের স্তরটিকে বীজ **অন্ত:ত্বক** বা টেগমেন বলে। বীজত্বকের উপর যে ক্ষত চিহ্নটি থাকে সেটি **হাইলাম** বা ডিম্বকনাভি। এর সাহায্যে বর্ধনশীল বীজ ফলের সাথে যুক্ত থাকে। হাইলাম বা ডিম্বকনাভির

উপরের দিকে একটি ছোটো ছিদ্র থাকে, একে **ডিম্বকরন্ধ্র** বা মাইক্রোপাইল বলে। বীজত্বকের অভ্যন্তরে একটি ভ্রূণাক্ষ ও দুটি বীজপত্র সমন্বিত ভ্রূণ অবস্থান করে। বীজপত্রগুলো প্রায়শই মাংসল হয় এবং সঞ্চিত খাদ্যবস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। ভ্রূণাক্ষের দুই প্রান্তে ভ্রূণমূল এবং ভ্রূণমুকুল থাকে (চিত্র 5.18 দেখো)। রেড়ীর মতো কিছু কিছু বীজে দ্বি নিষেকের ফলে উৎপন্ন সস্য একটি খাদ্য সঞ্চয়কারী কলা হিসেবে থাকে। সীম, ছোলা এবং মটরের মতো উদ্ভিদের পরিণত বীজে সস্য থাকে না এবং এ ধরনের বীজদের অসস্যল বীজ বলে।

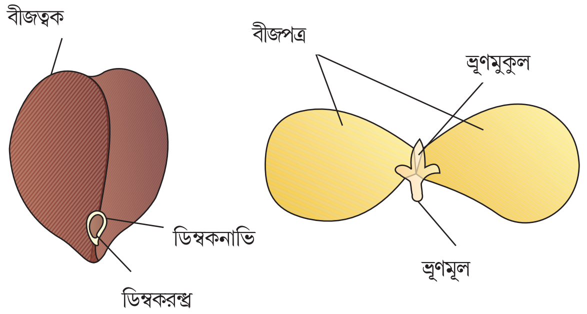

চিত্র 5.18 একটি দ্বিবীজপত্রী বীজের গঠন

5.7.2 একটি একবীজপত্রী বীজের গঠন

সাধারণত একবীজপত্রী উদ্ভিদের বীজগুলো সস্যল প্রকৃতির কিন্তু অর্কিডের মতো কিছু একবীজপত্রীর বীজ আবার অসস্যল প্রকৃতিরও হয়। ভুট্টার মতো কিছু দানাশস্যের বীজগুলোতে বীজত্বক পাতলা পর্দার মতো হয় এবং সাধারণত ফলত্বকের সাথে মিশে যায়। সস্য বৃহদাকার হয় এবং খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে। সস্যের বহি:আরবণী একটি প্রোটিন নির্মিত স্তরের সাহায্যে ভ্রূণ থেকে পৃথক থাকে। একে **অ্যালিউরোন** স্তর বলে। ভ্রূণটি ছোটো হয় এবং এটি সস্যের একপ্রান্তে উপস্থিত খাঁজের মধ্যে অবস্থান করে। এটি একটি বড়, বর্মাকৃতির বীজপত্র এবং ভ্রূণমুকুল ও ভ্রূণমূল সম্বলিত ছোটো অক্ষের সমন্বয়ে গঠিত। বর্মাকৃতির বীজপত্রটিকে **স্কুটেলাম** বলে। ভ্রূণমুকুল এবং ভ্রূণমূল যে আবরণীদ্বয় দ্বারা আবৃত থাকে তাদের যথাক্রমে **ভ্রূণ মুকুলাবরণী** ও **ভ্রূণমূলাবরণী** বলে।

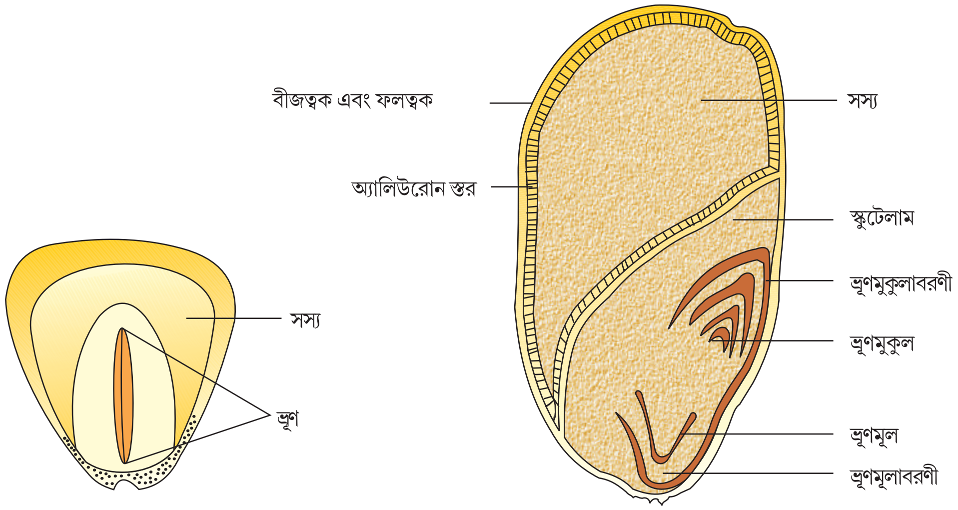

চিত্র 5.19 একটি একবীজপত্রী বীজের গঠন

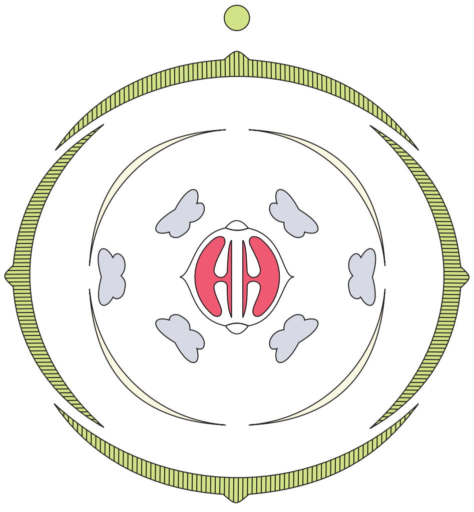

$\oplus$ ⚥ $K_{2+2}\,C_4\,A_{2+4}\,\underline{G}_{(2)}$

চিত্র 5.20 পুষ্পসংকেত সহ পুষ্পচিত্র

5.8 একটি আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদের অর্ধ— প্রায়োগিক বর্ণনা

বিভিন্ন অঙ্গাসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একটি সপুষ্পক উদ্ভিদকে বর্ণনা করা যায়। এই বর্ণনা হবে সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ ক্রম অনুসারে সরল ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বর্ণিত। উদ্ভিদটির বর্ণনা শুরু করতে হবে তার প্রকৃতি ও অঙ্গাজ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ মূল, কাণ্ড ও পাতার বৈশিষ্ট্য দিয়ে। এরপর আসবে তার পুষ্পসংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ পুষ্পবিন্যাস ও ফুলের বিভিন্ন অংশের বৈশিষ্ট্য। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করার পর একটি পুষ্পচিত্র এবং একটি পুষ্পসংকেত দেওয়া হয়। কিছু কিছু চিহ্নের সাহায্য পুষ্পসংকেত উপস্থাপন করা হয়। পুষ্পসংকেতে বিভিন্ন চিহ্নের ব্যবহার নিম্নলিখিতভাবে করা হয়। মঞ্জুরীপত্র বোঝাতে Br, বৃতি বোঝাতে K, দলমণ্ডলের জন্য C, পুষ্পপুট বোঝাতে P, পুংস্তবকের জন্য A এবং স্ত্রীস্তবকের জন্য G চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। আবার অধিগর্ভ গর্ভাশয় বোঝাতে G, অধোগর্ভ গর্ভাশয় বোঝাতে , পুরুষ ফুলের জন্য ♂, স্ত্রী ফুলের জন্য ♀, উভলিঙ্গা উদ্ভিদ বোঝাতে ⚥, বহু প্রতিসম ফুল বোঝাতে $\oplus$, এবং একপ্রতিসম ফুলের জন্য % চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। একই স্তবকের সদস্যদের মধ্যে সংযোগ অর্থাৎ সমসংযোগ বোঝাতে নির্দিষ্ট সংখ্যাটিকে বন্ধনীর ভেতর রাখা হয়। অপরদিকে একটি স্তবকের সদস্যদের সাথে অন্য স্তবকের সদস্যদের সংযোগ অর্থাৎ অসম সংযোগ বোঝাতে সংশ্লিষ্ট স্তবকদ্বয়ের চিহ্নগুলোর উপরে একটি রেখা টানতে হয়। একটি পুষ্পচিত্র থেকে আমরা একটি ফুলের অংশগুলোর সংখ্যা, তাদের সজ্জারীতি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে পারি। (চিত্র 5.20 দেখো)। পুষ্পের সাপেক্ষে জনিতৃ অক্ষের অবস্থানকে পুষ্পচিত্রের উপরে একটি বিন্দু এঁকে বোঝানো হয়। বৃতি, দলমণ্ডল, পুংস্তবক ও স্ত্রী স্তবককে বাইরের দিক থেকে কেন্দ্রের দিকে পর্যায়ক্রমে আঁকতে হয়। সবচেয়ে বাইরের স্তবকটি হল বৃতি এবং কেন্দ্রীয় স্তবকটি হল স্ত্রী স্তবক। পুষ্পসংকেতের সাহায্যেও একটি স্তবকের সদস্যদের মধ্যে এবং দুটি স্তবকের সদস্যদের মধ্যে যথাক্রমে সমসংযোগ ও অসমসংযোগ দেখানো যায়। চিত্র 5.20 তে সরিষা উদ্ভিদের (গোত্র- Brassicaceae) পুষ্পচিত্র ও পুষ্প সংকেত দেখানো হয়েছে।

5.9 কিছু গুরুত্বপূর্ণ গোত্রের বর্ণনা

5.9.1 Fabaceae

এই গোত্রটিকে আগে papilionaceae বলা হত। এটি leguminosae গোত্রের অন্তর্গত একটি উপগোত্র। এই উদ্ভিদ গোত্রের উদ্ভিদ সারা পৃথিবীতে ছড়ানো আছে। চিত্র 5.2 দেখো)।

অঙ্গাজ বৈশিষ্ট্য

বৃক্ষ, গুল্ম, বীরুৎ, অর্বুদযুক্তমূল

কাণ্ড : ঋজু কাণ্ড বা রোহিণী

পাতা: একান্তর, পক্ষল যৌগপত্র বা এককপত্র; পত্রমূল স্ফীত (Pulvinate). উপপত্র সম্বলিত, শিরাবিন্যাস- জালিকাকার

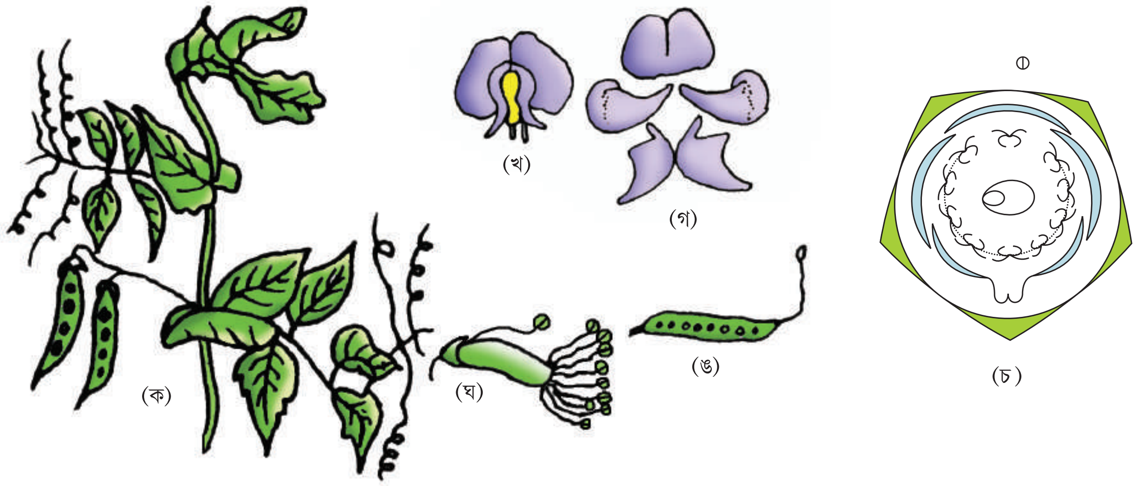

চিত্র 5.21 *Pisum sativum* (মটর গাছ) : (ক) পুষ্প ধারণকারী শাখা (খ) ফুল (গ) পাপড়িসমূহ (ঘ) জনন অঙ্গ (ঙ) গর্ভপত্রের লম্বচ্ছেদ (চ) পুষ্পচিত্র

পুষ্প সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ

পুষ্পবিন্যাস : অনিয়ত
ফুল : উভলিঙ্গ, একপ্রতিসম
বৃতি : বৃত্যাংশ 5টি, যুক্তবৃতি; ভ্যালভেট/ইমব্রিকেট পুষ্পপত্রবিন্যাস
দলমণ্ডল : দলাংশ 5টি, মুক্তদল, প্যাপিলিওনেসিয়াস, পশ্চাদদিকের একটি বড়ো দলাংশ (ধ্বজা), দুটি পার্শ্বীয় দলাংশ (পক্ষ), ভেতরের দিকের দুটি দলাংশ (ডানা) নিয়ে দলমণ্ডল গঠিত। ভেতরের দিকের দলাংশ দ্বয় পুংকেশর, গর্ভকেশর গুলোকে আবৃত করে রাখে। পুষ্পপত্রবিন্যাস—ভ্যাক্সিলারী।
পুংস্তবক : পুংকেশর 10 টি, দ্বিগুচ্ছ পুংকেশর, পরাগধানী দুটি কক্ষ বিশিষ্ট।
স্ত্রী স্তবক : অধিগর্ভ গর্ভাশয়, এক গর্ভপত্রী, এক প্রকোষ্ঠযুক্ত ও বহু ডিম্বক সমন্বিত, গর্ভদণ্ড একক।
ফল : লিগিউম; বীজ : এক বা একাধিক, অসস্যল
পুষ্পস্তবক : % ⚥ $K_{(5)}\ C_{1+2+(2)}\ A_{(9)+1}\ G_1$
অর্থনৈতিক গুরুত্ব
এই গোত্রের অন্তর্গত বহু উদ্ভিদ ডাল জাতীয় শস্য (ছোলা, অরহড়, সীম, মুগ, সয়াবিন); ভোজ্য তেল (সয়াবিন, বাদাম), রঞ্জক (ইন্ডিগোফেরা); তন্তু {(অতসী- (Sunhemp)} ; পশুখাদ্য (বক, ক্লোভার), শোভাবর্ধনকারী গাছ (লুপিন উদ্ভিদ), (মিষ্টি মটর) ওষধি উদ্ভিদ (মুলিয়াঠি উদ্ভিদ) এর উৎস।

5.9.2 Solanaceae

এটি একটি বড় গোত্র, সাধারণভাবে একে 'আলুর গোত্র' বলে। ক্রান্তীয়, উপক্রান্তীয়, এমনকি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এদের ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। (চিত্র 5.22 দেখো)
অঙ্গাজ বৈশিষ্ট্য
উদ্ভিদরা প্রধানত বীরুৎ, গুল্ম এবং কদাচিৎ ছোটো বৃক্ষ
কাণ্ড : বীরুৎ জাতীয় কদাচিৎ কাষ্ঠল, বায়ব, ঋজু, নলাকার, শাখান্বিত, নিরেট বা ফাঁপা, রোমশ বা মসৃণ, আলুতে (Solanum) কাণ্ড ভূনিম্নস্থ।

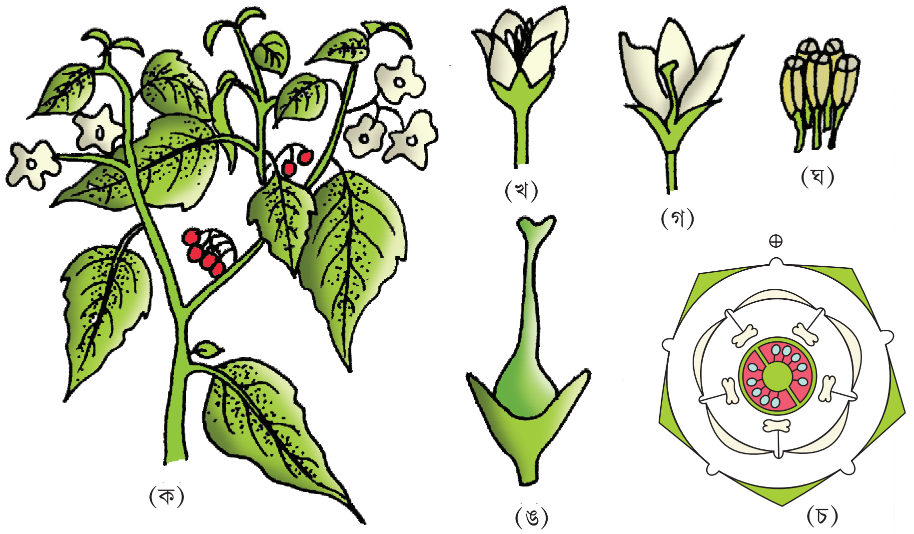

চিত্র 5.22 *Solanum nigrum* (কাকমাছি) উদ্ভিদ (ক) পুষ্পধারণকারী শাখা (খ) ফুল (গ) ফুলের লম্বচ্ছেদ (ঘ) পুংকেশর (ঙ) গর্ভকেশর (চ) পুষ্পচিত্র

পাতা : একান্তর, এককপত্র, কদাচিৎ পক্ষল যৌগিকপত্র, উপপত্রবিহীন; শিরাবিন্যাস— জালিকাকার।

পুষ্প সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য

পুষ্পবিন্যাস : এককপুষ্পী, কাক্ষিক বা সাইমোজ (যেমন- *Solanum*)

ফুল : উভলিঙ্গ, বহু প্রতিসম

বৃতি : বৃত্যাংশ 5টি, যুক্তবৃতি, স্থায়ী, পুষ্পপত্রবিন্যাস-ভ্যালভেট বা প্রান্তস্পর্শী

দলমণ্ডল : দলাংশ 5টি, যুক্তদল, পুষ্পপত্রবিন্যাস ভ্যালভেট বা প্রান্তস্পর্শী।

পুংস্তবক : পুংকেশর -5টি, দললগ্ন পুংকেশর

স্ত্রী স্তবক : দ্বিগর্ভপপত্রী, যুক্ত গর্ভপত্রী, অধিগর্ভ গর্ভাশয়, দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট, অমরা স্ফীত ও বহু ডিম্বক সমন্বিত।

ফল : বেরি বা ক্যাপসুল

বীজ : বহু বীজবিশিষ্ট, সস্যল।

পুষ্প সংকেত : $\oplus$ ⚥ $K_{(5)}\ \widehat{C_{(5)}\ A_5}\ \underline{G}_{(2)}$

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বহু উদ্ভিদ খাদ্য (টমেটো, বেগুন, আলু); মশলা (লঙ্কা), ওষধি উদ্ভিদ (বেলাডোনা, অশ্বগন্ধা) ধোঁয়া সৃষ্টিকারী (তামাক), শোভাবর্ধনকারী (পেটুনিয়া) উদ্ভিদ এর উৎস।

5.9.3 Liliaceae

এই উদ্ভিদ গোত্রটি 'লিলি গোত্র' নামে পরিচিত এবং এটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে একবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রতিনিধিত্ব করে। এই গোত্রের উদ্ভিদের পৃথিবী জুড়ে পাওয়া যায়। (চিত্র 5.23 দেখো)

অঙ্গজ বৈশিষ্ট্য সমূহ : বহুবর্ষজীবী বীরুৎ, কাণ্ড ভূনিম্নস্থ এবং তা কন্দ, গুড়িকন্দ বা গ্রন্থিকাণ্ড জাতীয়।

পাতা : বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কান্ডের গোড়া থেকে উৎপন্ন হয়, একান্তর রৈখিক উপপত্রবিহীন এবং সমান্তরাল শিরাবিন্যাসযুক্ত।

পুষ্পসংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ

পুষ্পবিন্যাস : এককপুষ্পী/সাইমোজ বা নিয়ত; প্রায়শই আম্বেলের গুচ্ছ

ফুল : উভলিঙ্গ, বহু প্রতিসম

পুষ্পপুট : টেপাল 6 টি (3+3), প্রায়শই পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি নালী গঠন করে; পুষ্পপত্রবিন্যাস প্রান্তস্পর্শী বা ভ্যালভেট

পুংস্তবক : পুংকেশর 6 টি (3+3), পুষ্পপুট সংলগ্ন

স্ত্রীস্তবক : তিনটি গর্ভপত্র বিশিষ্ট, যুক্ত গর্ভপত্রী, অধিগর্ভ গর্ভাশয়, গর্ভাশয় তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ও বহু ডিম্বক সমন্বিত, অমরাবিন্যাস অক্ষীয়

ফল : ক্যাপসুল, কদাচিৎ বেরি

বীজ : সস্যল

পুষ্প সংকেত : $Br \oplus ⚥ \overbrace{P_{(3+3)} A_{3+3}} G_{(3)}$

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

এইগোত্রের — অন্তর্ভুক্ত বহু উদ্ভিদ ভাল শোভাবর্ধনকারী (টিউলিপ, গ্লোরিওসা), ঔষধের উৎস (ঘৃত কুমারী), এছাড়া শাক সব্জি (শতমূলী) এবং কলসিচিন (*Colchicum autumnale*) ও এই গোত্রভুক্ত বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়।

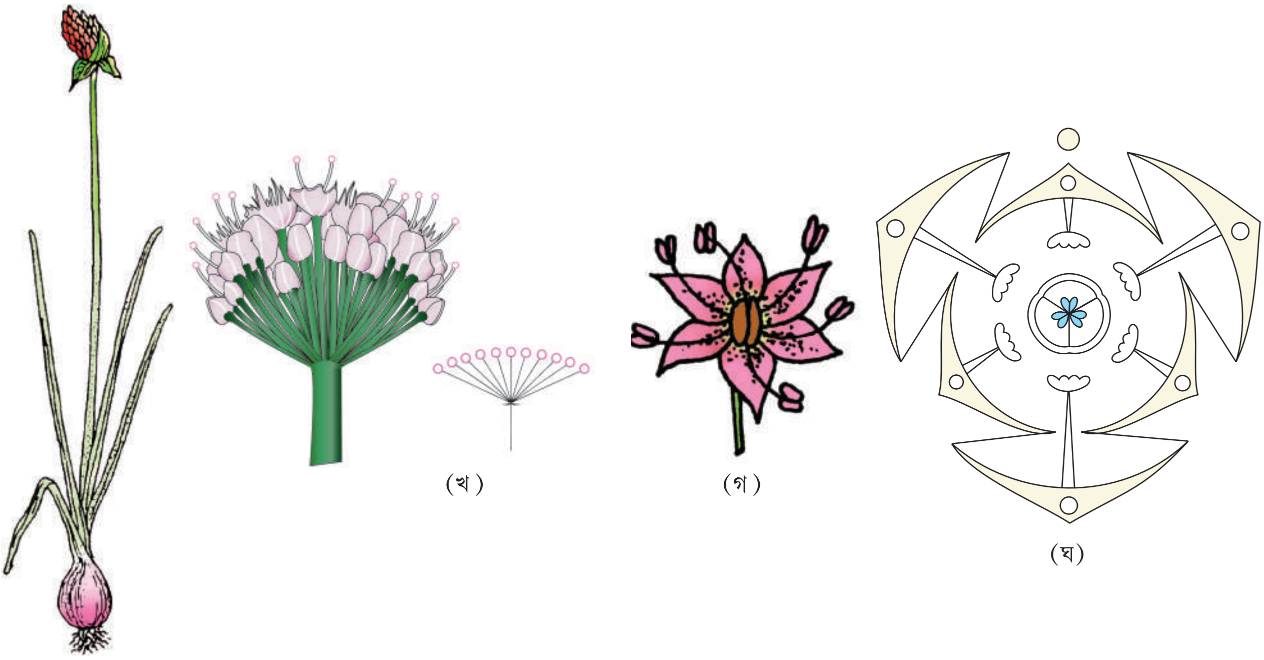

(ক) (খ) (গ) (ঘ)

চিত্র 5.23 *Allium cepa* (পেঁয়াজ) উদ্ভিদ (ক) সম্পূর্ণ উদ্ভিদ (খ) পুষ্পবিন্যাস (গ) ফুল (ঘ) পুষ্পচিত্র

সারসংক্ষেপ

সপুষ্পক উদ্ভিদে আকৃতি, আকার, গঠন, পুষ্টি পদ্ধতি, জীবনকাল, প্রকৃতি ও বাসস্থানগত দিক থেকে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। এদের দেহে সুগঠিত মূল ও বিটপতন্ত্র দেখা যায়। মূলতন্ত্র- প্রধান মূল বা গুচ্ছমূল প্রকৃতির হয়। সাধারণত দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে প্রধান মূল এবং একবীজপত্রী উদ্ভিদে গুচ্ছমূল থাকে। কিছু কিছু উদ্ভিদে মূল খাদ্য সঞ্চয়, যান্ত্রিক সুবিধা প্রদান ও শ্বসনে সহায়তা করার জন্য পরিবর্তিত হয়। বিটপতন্ত্র কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফলে বিভেদিত থাকে। কাণ্ডের অঙ্গ সংস্থানিক বৈশিষ্ট্য যেমন, পর্ব ও পর্বমধ্য বহুকোশী রোমের উপস্থিতি এবং অনুকূল আলোকবর্তী প্রকৃতি একে মূল থেকে আলাদা করতে সাহায্য করে। কান্ড ও খাদ্য সঞ্চয়, অঙ্গজ জনন এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সুরক্ষা লাভ-এর মতো বিচিত্র ধরনের কাজ সম্পাদনের জন্য পরিবর্তিত হয়। কাণ্ডের পর্ব থেকে বহির্জনিষ্ণুভাবে উৎপন্ন পার্শ্বীয় উপবৃদ্ধিই হল পাতা। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া চালাতে হয় বলে এরা সবুজ বর্ণের হয়। পাতার পত্রফলকের আকৃতি, আকার, পত্রকিনারা, পত্রাগ্র এবং খণ্ডনপ্রণালীর গভীরতায় সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উদ্ভিদের অন্যান্য অংশের মতো পাতাও ভিন্ন ধরনের গঠন যেমন আকর্ষ (আরোহণের জন্য) এবং কাঁটায় (আত্মরক্ষার জন্য) পরিবর্তিত হয়।

পুষ্প একটি পরিবর্তিত বিটপ। এটি যৌনজননের জন্য গঠিত হয়। ফুলগুলো বিভিন্ন ধরনের পুষ্পবিন্যাসে সজ্জিত থাকে। তাদের গঠন, প্রতিসাম্য, ফুলের অন্যান্য অংশের সাপেক্ষে গর্ভাশয়ের অবস্থান, দলাংশ, বৃত্যাংশ ও ডিম্বক ইত্যাদির সজ্জারীতিতে বিশাল পার্থক্য দেখা যায়। নিষেকের পর গর্ভাশয় ফলে এবং ডিম্বক বীজে পরিণত হয়। বীজগুলো একবীজপত্রী বা দ্বিবীজপত্রী হতে পারে। বিভিন্ন বীজের আকৃতি, আকার এবং অঙ্কুরোদ্গমক্ষম থাকার সময়কাল ভিন্ন ভিন্ন হয়। পুষ্প সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ সপুষ্পক উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস এবং নামকরণের ভিত্তি গঠন করে। একে উদ্ভিদগোত্রের অর্ধ-প্রয়োগিক বর্ণনার মাধ্যমে বিশদীকরণ করা যেতে পারে। তাই একটি সপুষ্পক উদ্ভিদকে একটি নির্দিষ্ট সজ্জাক্রমে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সাহায্যে বর্ণনা করা যেতে পারে। পুষ্প সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পুষ্পচিত্র এবং পুষ্প সংকেতের মাধ্যমে সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ করা যেতে পারে।

অনুশীলনী

1. মূলের পরিবর্তন বলতে কী বোঝ? নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মূলের কী ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়? (ক) বটবৃক্ষ (খ) শালগম (গ) লবনাম্বু উদ্ভিদ।

2. বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলোর যথার্থতা প্রমাণ করো:

   (ক) উদ্ভিদের ভূনিম্নস্থ অংশগুলো সবসময় মূল নাও হতে পারে।

   (খ) পুষ্প একটি পরিবর্তিত বিটপ।

3. একটি পক্ষল যৌগিকপত্র কীভাবে একটি করতলাকার যৌগিকপত্র থেকে পৃথক?

4. বিভিন্ন ধরনের পত্রবিন্যাস উপযুক্ত উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।

5. নিম্নলিখিত গুলোর সংজ্ঞা দাও

   (ক) পুষ্পপত্রবিন্যাস (খ) অমরাবিন্যাস (গ) বহু প্রতিসম

   (ঘ) এক প্রতিসম (ঙ) অধিগর্ভ (চ) গর্ভকটি পুষ্প

   (ছ) দললগ্ন পুংকেশর

6. পার্থক্য নির্দেশ করো :

   (ক) অনিয়ত এবং নিয়ত পুষ্পবিন্যাস

   (খ) গুচ্ছমূল এবং অস্থানিক মূল

   (গ) মুক্ত গর্ভপত্রী এবং যুক্ত গর্ভপত্রী গর্ভাশয়

7. নিম্নলিখিত উদ্ভিদ অংশগুলোর চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো:

   (ক) ছোলার বীজ (খ) ভুট্টা বীজের লম্বচ্ছেদ

8. কাণ্ডের পরিবর্তনগুলো উপযুক্ত উদাহরণসহ বর্ণনা করো।

9. Fabaceae ও Solanaceae গোত্রের একটি করে ফুল নাও এবং এদের অর্ধ-প্রায়োগিক বর্ণনা দাও। ফুলগুলোকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর এদের পুষ্পচিত্রও অঙ্কন করো।

10. সপুষ্পক উদ্ভিদে যে বিভিন্ন ধরনের অমরাবিন্যাস দেখা যায় তাদের বর্ণনা দাও।

11. ফুল কী? সপুষ্পক উদ্ভিদের একটি আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করো।

12. পাতার বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন উদ্ভিদকে কীভাবে সাহায্য করে?

13. পুষ্পবিন্যাসের সংজ্ঞা দাও। সপুষ্পক উদ্ভিদে বিভিন্ন ধরনের পুষ্পবিন্যাসের ভিত্তি ব্যাখ্যা করো।

14. একটি বহু প্রতিসম, উভলিঙ্গ, পাঁচটি যুক্ত বৃত্যাংশ সহ গর্ভপাদ পুষ্প, পাঁচটি মুক্ত দলাংশ, পাঁচটি মুক্ত পুংকেশর ও দুইটি যুক্ত গর্ভপত্র সহ অধিগর্ভ গর্ভাশয় এবং অক্ষীয় অমরাবিন্যাস বিশিষ্ট ফুলের পুষ্প সংকেত লেখো।

15. পুষ্পাক্ষের উপর অবস্থানের সাপেক্ষে ফুলের অংশগুলোর সজ্জারীতি বর্ণনা করো।

অধ্যায়-6 (Chapter-6)

সপুষ্পক উদ্ভিদের শারীরস্থান (Anatomy of Flowering Plants)

6.1 উদ্ভিদ কলা

6.2 কলাতন্ত্র

6.3 দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী উদ্ভিদদের শারীরস্থান

6.4 গৌণ বৃদ্ধি

উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় গোষ্ঠীর অপেক্ষাকৃত বড়ো জীবের বাহ্যিক অঙ্গাসংস্থানে গঠন সাদৃশ্য ও পার্থক্য তোমরা খুব সহজেই দেখতে পারবে। একইভাবে যদি আমরা অভ্যন্তরীণ গঠন অধ্যয়ন করি তবে এদের মধ্যে বহু সাদৃশ্য এবং পার্থক্য দেখতে পাওয়া যাবে। এই অধ্যায়ে উন্নত উদ্ভিদের অভ্যন্তরীণ গঠন এবং কার্যকরী সংগঠন নিয়ে আলোচনার সুত্রপাত করা হয়েছে। উদ্ভিদের অভ্যন্তরীণ গঠনের অধ্যয়নকে শারীরস্থান বলে। উদ্ভিদদেহের মৌলিক একক হল কোশ। কোশগুলো সংগঠিত হয়ে গঠন করে কলা এবং এই কলাগুলো আবার সংগঠিত হয়ে অঙ্গ গঠন করে । উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ অভ্যন্তরীণ গঠনে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে একবীজ এবং দ্বিবীজপত্রী-রাও শারীরস্থানিক দিক থেকে পৃথক হয় অভ্যন্তরীণ গঠন উদ্ভিদদের বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজিত হতে সাহায্য করে।

6.1 উদ্ভিদ কলা

কলা এমন একগুচ্ছ কোশকে বোঝায় যারা উৎপত্তিগত ভাবে এক এবং সাধারণত একই ধরনের কাজ করে। উদ্ভিদদেহ বিভিন্ন ধরনের কলা দ্বারা গঠিত । উদ্ভিদ দেহে সৃষ্ট কোশগুলি বিভাজনক্ষম কিনা তার উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদকলাকে দুটি প্রধান গোষ্ঠী, ভাজক কলা ও স্থায়ী কলায় শ্রেণিবিভক্ত করা হয়।

6.1.1 ভাজক কলা (Meristematic Tissues)

উদ্ভিদদেহে বৃদ্ধি প্রধানত সক্রিয় কোশ বিভাজনের জন্য বিশেষিত অঞ্চল, ভাজক কলা বা Meristem (Gk. meristos: divided অর্থাৎ বিভাজিত) এ সীমাবদ্ধ। উদ্ভিদদেহে বিভিন্ন ধরনের ভাজক কলা থাকে । যে ভাজক কলা উদ্ভিদদের মূল এবং বিটপের অগ্রভাগে অবস্থান করে এবং প্রাথমিক কলা উৎপন্ন করে তাকে অগ্রস্থ ভাজক কলা বলে (চিত্র 6.1 দেখো)।

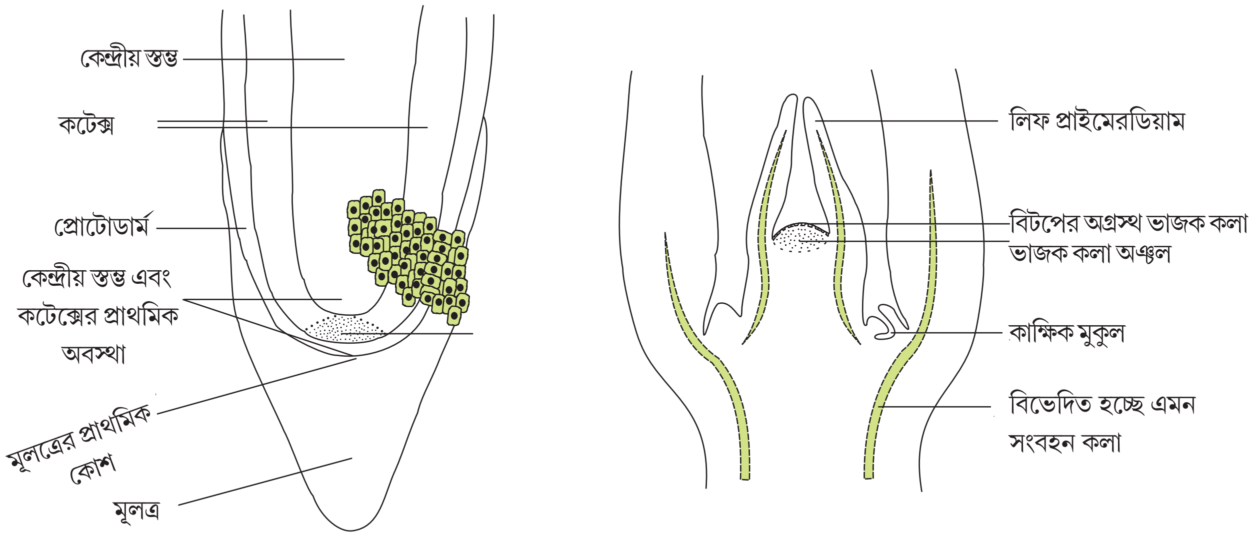

চিত্র 6.1 অগ্রস্থ ভাজক কলা: (ক) মূল (খ) বিটপ

মূলের অগ্রস্থ ভাজককলা মূলের অগ্রভাগে এবং বিটপের ভাজক কলা কাণ্ড অক্ষের সবচেয়ে দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করে। পাতা গঠন এবং কাণ্ডের দীর্ঘীকরণ কালে বিটপের অগ্রস্থ ভাজক কলার কিছু কোশ আলাদা হয়ে গিয়ে কাক্ষিক মুকুল গঠন করে ।এই ধরনের মুকুলগুলো পাতার কক্ষে অবস্থান করে এবং একটি শাখা বা ফুল সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। যে ভাজক কলা দুটি স্থায়ী কলা স্তরের মাঝে অবস্থান করে, তাকে নিবেশিত ভাজক কলা বলে। এদের ঘাস জাতীয় উদ্ভিদে দেখা যায় এবং এরা তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্য গ্রহণের ফলে উদ্ভিদদেহ থেকে অপসারিত অঙ্গের পুনরুৎপাদনে সাহায্য করে। অগ্রস্থ ভাজক কলা এবং নিবেশিত ভাজক কলা উভয়কে প্রাথমিক ভাজক কলা বলে কারণ এদের সৃষ্টি উদ্ভিদ জীবন শুরুর প্রথমদিকে হয় এবং প্রাথমিক উদ্ভিদদেহ গঠনে অংশগ্রহণ করে।

যে ভাজককলা বহু উদ্ভিদের, বিশেষত যে সব উদ্ভিদে কাষ্ঠল অক্ষ গঠিত হয়, মূল ও বিটপের স্থায়ী অঞ্চলে দেখা যায় এবং প্রাথমিক ভাজক কলার পরে গঠিত হয় তাকে গৌণ বা পার্শ্বস্থ ভাজক কলা বলে।এই ভাজক কলার কোশগুলো বেলনাকার হয়।ফ্যাসিকুলার ভাসকুলার ক্যাম্বিয়াম, ইন্টারফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম এবং কর্ক ক্যাম্বিয়াম হল পার্শ্বস্থ ভাজক কলার উদাহরণ। এই ভাজক কলাগুলোই গৌণ কলা তৈরি করে ।

প্রাথমিক ও গৌণ উভয় ভাজক কলার কোশগুলোর বিভাজনের ফলে উৎপন্ন নতুন কোশগুলো গঠনগত ও কার্যগতভাবে বিশেষিত হয় এবং বিভাজন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এ ধরনের কোশগুলোকে স্থায়ী বা পরিণত কোশ বলে এবং এরাই স্থায়ী কলা গঠন করে ।উদ্ভিদদের প্রাথমিক দেহ গঠনের সময় অগ্রস্থ ভাজক কলার নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে ত্বকীয় কলা, ভূমিকলা এবং সংবহন কলা গঠিত হয়।

6.1.2 স্থায়ীকলা (Permanent tissues)

স্থায়ীকলার কোশগুলো সাধারণত আর বিভাজিত হয় না। যে স্থায়ীকলার সব কোশ গঠনগত ও কার্যগতভাবে এক তাকে সরল স্থায়ীকলা বলে। অপরদিকে, যে স্থায়ীকলা বিভিন্ন ধরনের বহু কোশের সমন্বয়ে গঠিত হয়, তাকে জটিল স্থায়ীকলা বলে।

6.1.2.1 সরল স্থায়ীকলা (Simple tissue)

একটি সরল কলা কেবলমাত্র এক ধরনের অনেকগুলো কোশের সমন্বয়ে গঠিত হয়। উদ্ভিদের বিভিন্ন সরল কলাগুলো হল - প্যারেনকাইমা, কোলেনকাইমা,এবং স্ক্লেরেনকাইমা (চিত্র 6.2 দেখো)। প্যারেনকাইমা কলা অঙ্গ সমূহের প্রধান অংশ গঠন করে। প্যারেনকাইমা কলার কোশগুলো সাধারণত সমব্যাসসম্পন্ন হয়। এরা গোলকাকৃতির, ডিম্বাকৃতির, গোলাকৃতির বহুভুজাকৃতির বা লম্বাটে হতে পারে। এই কোশগুলোর কোশপ্রাচীর পাতলা এবং সেলুলোজ নির্মিত। এই কলার কোশগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট থাকতে পারে বা সংক্ষিপ্ত কোশান্তর স্থান বিশিষ্ট হতে পারে। প্যারেনকাইমা সালোকসংশ্লেষ, সঞ্চয়, ক্ষরণের মতে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে।

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে কোলেনকাইমা কলা এপিডারমিস বা বহিঃত্বকের নীচের কয়েকটি স্তরে অবস্থান করে। এটি একক স্তর হিসাবে বা টুকরো টুকরো স্তর হিসাবে থাকে । এই কলা এমন কোশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত যাদের কোশপ্রাচীরের কোশগুলো সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ এবং পেকটিন সঞ্চিত হওয়ার ফলে বেশ স্থূল হয়। কোলেনকাইমা কোশগুলো ডিম্বাকৃতির, গোলাকৃতির বা বহুভুজাকৃতির হতে পারে এবং প্রায়শই ক্লোরোপ্লাস্ট যুক্ত হয়। ক্লোরোপ্লাস্ট যুক্ত কোলেনকইমা কোশগুলো খাদ্য সংশ্লেষ করে। এই কলা সাধারণত কোশান্তরস্থান বিহীন হয়। এই কলা তরুণ কাণ্ড ও পত্রবৃন্তের মতো উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঙ্গাগুলোকে যান্ত্রিক সুবিধা প্রদান করে।

স্ক্লেরেনকাইমা কলা স্থূল এবং লিগনিনযুক্ত কোশপ্রাচীর বিশিষ্ট লম্বাটে সুরু কোশ সমুহের সমন্বয়ে গঠিত ।এই কোশগুলোর কোশপ্রাচীরে কয়েকটি বা অসংখ্য কূপ দেখা যায়। এরা সাধারণত মৃত এবং প্রোটোপ্লাস্টবিহীন হয়। কোশের বিন্যাস, গঠন, উৎপত্তি এবং বিকাশের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে স্ক্লেরেকাইমা কলা দুই প্রকারের হতে পারে - স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু ও স্ক্লেরাইড। স্থূল প্রাচীর বিশিষ্ট, লম্বাটে এবং ছুঁচোলো কোশগুলো হল স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু, এরা সাধারণত দলবদ্ধভাবে উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অংশে থাকে। স্ক্লেরাইডগুলো গোলকাকৃতির, ডিম্বাকৃতির বা বেলনাকৃতির অত্যাধিক স্থূল খুব সরু গহ্বর (Lumen) বিশিষ্ট মৃত কোশ।

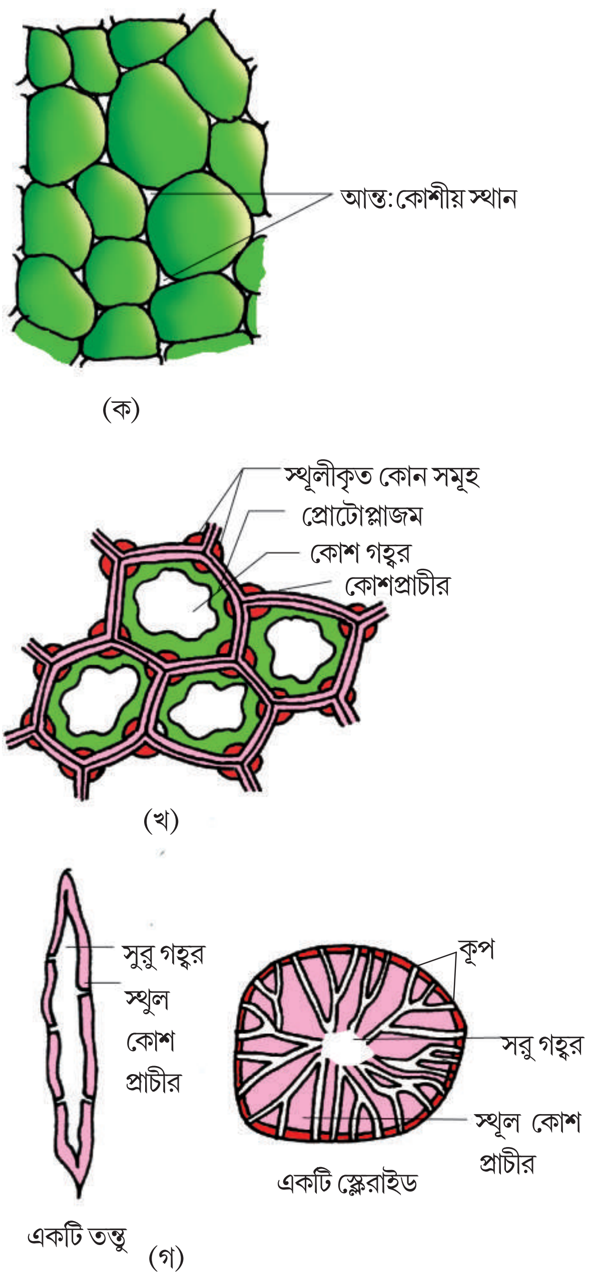

চিত্র 6.2 সরল কলা
(ক) প্যারেন কাইমা
(খ) কোলেন কাইমা
(গ) স্ক্লেরেন কাইমা

সচরাচর এই কোশগুলো নাট জাতীয় ফলের প্রাচীরে, পেয়ারা, ন্যাসপাতি ও সফেদা বা সবেদা-এর মতো ফলের শাঁসে, শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদের বীজত্বকে এবং চা পাতায় দেখা যায়। স্কেরেনকাইমা উদ্ভিদ অঙ্গালোকে যান্ত্রিক সুবিধা প্রদান করে।

6.1.2.2. জটিল কলা (Complex tissues)

জটিল কলা একাধিক ধরনের অনেকগুলো কোশের সমন্বয়ে গঠিত এবং এরা একসাথে একটি একক হিসেবে কাজ করে। জাইলেম এবং ফ্লোয়েম উদ্ভিদ দেহে জটিল কলা গঠন করে (চিত্র 6.3 দেখো)।

মুল থেকে কাণ্ড ও পাতায় জল ও খনিজ লবণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য জাইলেম সংবহন কলা হিসাবে কাজ করে। এটি উদ্ভিদ অঙ্গাকে যান্ত্রিক দৃঢ়তা প্রদান করে। এটি চারটি ভিন্ন ধরনের উপাদান দ্বারা গঠিত। এগুলো হল -ট্র্যাকিড, বাহিকা জাইলেম তন্তু এবং জাইলেম প্যারেনকাইমা ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের জাইলেম কলায় বাহিকা অনুপস্থিত। ট্র্যাকিডগুলো পুরু ও লিগনিনযুক্ত প্রাচীরবিশিষ্ট এবং ছুঁচোলো প্রান্তবিশিষ্ট লম্বাটে বা নলের মতো কোশ। এরা মৃত এবং প্রোটোপ্লাজমবিহীন। কোশপ্রাচীরের ভেতরের স্তরে বিভিন্ন ধরনের অলঙ্করণ দেখা যায়। সপুষ্পক উদ্ভিদে জলসংবহনে সাহায্যকারী প্রধান উপাদানগুলো হল ট্র্যাকিড এবং বাহিকা। বাহিকা বহুকোশের সমন্বয়ে গঠিত একটি লম্বা বেলনাকার, নলের মতো গঠন। এই কোশগুলোকে বাহিকা সদস্য (vessel member) বলে এবং প্রতিটি কোশ একটি বড়ো কেন্দ্রীয় গহ্বর ও লিগনিনযুক্ত প্রাচীর বিশিষ্ট হয়। বাহিকা কোশগুলোও প্রোটোপ্লাজম বিহীন হয়। বাহিকার কোশগুলো তাদের সাধারণ প্রাচীরস্থিত ছিদ্রের মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত থাকে। বাহিকার উপস্থিতি গুপ্তবীজী উদ্ভিদদের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। জাইলেম তন্তুগুলোর কোশপ্রাচীর অত্যন্ত স্থূল হয় এবং এদের কেন্দ্রীয় গহ্বর লোপ পায়। এরা প্রস্থপ্রাকার যুক্ত বা প্রস্থপ্রাকার বিহীন হতে পারে। জাইলেম প্যারেনকাইমা কোশগুলো সজীব। এদের কোশপ্রাচীর পাতলা এবং সেলুলোজ নির্মিত। এরা শ্বেতসার বা ফ্যাট রুপে খাদ্য এবং ট্যানিনের মতো অন্যান্য বস্তু সঞ্চয় করে রাখে। রশ্মিযুক্ত জাইলেম প্যারেনকাইমা জলের অরীয় সংবহনে সাহায্য করে।

প্রাথমিক জাইলেম দুই ধরনের হয় প্রোটোজাইলেম ও মেটাজাইলেম। প্রাথমিক জাইলেমের যে উপাদানগুলো প্রথমে গঠিত হয় তাদের প্রোটোজাইলেম এবং শেষের দিকে গঠিত প্রাথমিক জাইলেমগুলোকে মেটাজাইলেম বলে। কাণ্ডে প্রোটোজাইলেমগুলো কেন্দ্রের (মজ্জা)র দিকে এবং মেটাজাইলেমগুলো অঙ্গের পরিধির দিক বরাবর সজ্জিত থাকে। এই ধরনের প্রাথমিক জাইলেমকে এন্ডার্ক বলে। মূলে, প্রোটোজাইলেম পরিধির দিকে এবং মেটাজাইলেম কেন্দ্রের দিকে সজ্জিত থাকে। প্রাথমিক জাইলেম এর এরূপ সজ্জারীতিকে এক্সার্ক বলে।

ফ্লোয়েম কলা সাধারণত পাতা থেকে উদ্ভিদ দেহের অন্যান্য অংশে খাদ্যবস্তু পরিবহন করে। গুপ্তবীজী উদ্ভিদে ফ্লোয়েম কলা, সীভনলীয় উপাদান, সঙ্গী কোশ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা এবং ফ্লোয়েম তন্তু দ্বারা গঠিত।

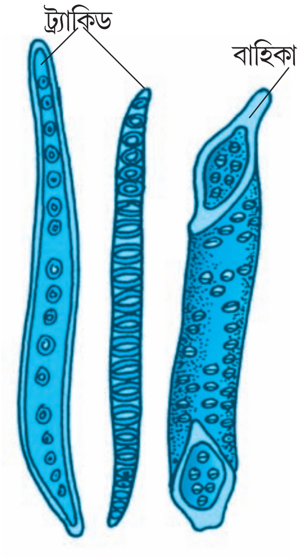

(ক)

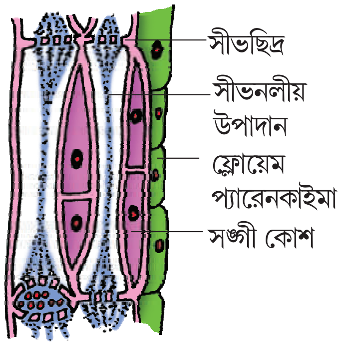

(খ)

চিত্র 6.3 (ক) জাইলেম
(খ) ফ্লোয়েম

ব্যক্তবীজী উদ্ভিদদের ফ্লোয়েম কলায় অ্যালবিউমিনাস কোশ ও সীভকোশ বর্তমান। এদের ফ্লোয়েম কলায় সীভনল এবং সঙ্গী কোশ থাকে না । সীভনলীয় উপাদানগুলোও লম্বা, নলের মতো গঠন বিশিষ্ট হয়, উল্লম্বভাবে সজ্জিত থাকে এবং সঙ্গী কোশের সাথে যুক্ত থাকে । এদের প্রান্ত প্রাচীরগুলো চালনীর মতো ছিদ্রযুক্ত হয়ে সীভপ্লেট গঠন করে। একটি পরিণত সীভনলে একটি বড় কোশ গহ্বর এবং প্রান্তীয় সাইটোপ্লাজম থাকে কিন্তু নিউক্লয়াস থাকে না। সঙ্গীকোশের নিউক্লিয়াস সীভনলের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। সঙ্গী কোশগুলো হল বিশেষিত প্যারেনকাইমা কোশ যারা সীভনলীয় উপাদানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে। সীভনলীয় উপাদান এবং সঙ্গী কোশগুলো তাদের সাধারণ উল্লম্বপ্রাচীরে উপস্থিত কূপক্ষেত্রের সাহায্যে যুক্ত থাকে। সঙ্গী কোশগুলো সীভনলের ভেতরে চাপের নতিমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা ঘন সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস সমন্বিত লম্বাটে, ছুঁচোলো প্রান্তবিশিষ্ট বেলনাকার কোশসমূহ নিয়ে গঠিত। এই কোশগুলোর কোশপ্রাচীর সেলুলোজ নির্মিত এবং কূপ সমন্বিত হয়। এই কূপগুলোর মাধ্যমে কোশগুলোর প্লাজমোডেসমাটাল সংযোগ স্থাপিত হয়। ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা খাদ্যবস্তু এবং রেজিন, তরুক্ষীর এবং মিউসিলেজ এর মতো অন্যান্য বস্তু সঞ্চয় করে। বেশিরভাগ একবীজপত্রী উদ্ভিদে ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা অনুপস্থিত থাকে। ফ্লোয়েম তন্তু (বাস্ট তন্তু) স্ক্লেরেনকাইমা কোশসমূহ দ্বারা গঠিত। এই তন্তুগুলো সাধারণত প্রাথমিক ফ্লোয়েম কলায় থাকে না কিন্তু গৌণ ফ্লোয়েম কলায় পাওয়া যায়। এরা অনেকটা লম্বাটে ও শাখাহীন এবং এদের শীর্ষভাগ ছুঁচোলো ও সূঁচের মতো হয়। ফ্লোয়েম তন্তুগুলোর কোশপ্রাচীর খুবই স্থূল হয়। পরিণত অবস্থায় এই তন্তুগুলোর প্রোটোপ্লাজম নিঃশেষ হয়ে যায় এবং মৃত কোশে পরিণত হয়। পাট, শণ ও হেম্প গাছের ফ্লোয়েম তন্তু বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয়। যে প্রাথমিক ফ্লোয়েম কলা প্রথমে গঠিত হয় তা সরু সীভনল দ্বারা গঠিত এবং একে প্রোটোফ্লোয়েম বলে। অপরদিকে পরবর্তীতে যে প্রাথমিক ফ্লোয়েম কলা গঠিত হয় সেটি বড়ো সীভনল বিশিষ্ট হয় এবং তাকে মেটাফ্লোয়েম বলে।

6.2. কলাতন্ত্র (The Tissue System)

উদ্ভিদ কলা গঠনকারী বিভিন্ন ধরনের কোশের উপর ভিত্তি করে গঠিত বিভিন্ন ধরনের কলা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আমরা এখন দেখব কীভাবে কলাসমূহ উদ্ভিদদেহে তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাদের গঠন এবং কাজও তাদের অবস্থানের উপর নির্ভর করে। তাদের গঠন ও অবস্থানের উপর ভিত্তি করে তিন ধরনের কলাতন্ত্র দেখা যায়। এগুলো হল ত্বক কলাতন্ত্র, ভূমি বা মৌলিক কলাতন্ত্র এবং সংবহন বা পরিবহণ কলাতন্ত্র।

6.2.1 ত্বক কলাতন্ত্র (Epidermal Tissue System)

ত্বক কলাতন্ত্র সম্পূর্ণ উদ্ভিদ দেহটির সবচেয়ে বাইরের আবরণী গঠন করে। এই তন্ত্র বহিঃত্বকীয় কোশসমূহ, পত্ররন্ধ্র এবং ট্রাইকোম ও রোম জাতীয় বহিঃত্বকীয় উপবৃদ্ধিগুলোর সমন্বয়ে গঠিত। এপিডারমিস বা বহিঃত্বক প্রাথমিক উদ্ভিদদেহের সবচেয়ে বাইরের স্তর।

এটি লম্বাটে, ঘনসন্নিবিষ্ট কোশসমূহ দ্বারা গঠিত। এই কোশগুলো একটি অবিচ্ছিন্ন স্তর গঠন করে। এপিডারমিস বা বহিঃত্বক সাধারণত একস্তরী হয়। এইকোশগুলো প্যারেনকাইমা জাতীয় এবং প্রতিটি কোশে কোশপ্রাচীরের ধার বরাবর সামান্য সাইটোপ্লাজম এবং একটি বড়ো কোশগহ্বর থাকে। এপিডারমিস বা বহিঃত্বকের বাইরের দিক প্রায়শই একটি মোমজাতীয় পুরুস্তর দ্বারা আবৃত থাকে একে কিউটিকল বলে এবং এটি উদ্ভিদদেহ থেকে জলের মোচন রোধ করে। মূলে কিউটিকল থাকে না। পাতার বহিঃত্বকে পত্ররন্ধ্র বর্তমান। পত্ররন্ধ্র বাষ্পমোচন প্রক্রিয়া ও গ্যাসীয় আদান প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিটি পত্ররন্ধ্র সীমের আকৃতি বিশিষ্ট দুটি রক্ষী কোশ নিয়ে গঠিত এবং এই রক্ষী কোশদ্বয় পত্ররন্ধ্র ছিদ্রকে ঘিরে অবস্থান করে। ঘাসজাতীয় উদ্ভিদে রক্ষী কোশগুলো ডাম্বেল এর আকৃতিবিশিষ্ট হয়। রক্ষী কোশগুলোর বাইরের প্রাচীর (পত্ররন্ধ্র ছিদ্র থেকে দূরবর্তী) পাতলা এবং ভেতরের প্রাচীর (পত্ররন্ধ্র ছিদ্রের নিকটবর্তী) অত্যন্ত পুরু হয়। রক্ষী কোশগুলো ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত হয় এবং পত্ররন্ধ্রের খোলা ও বন্ধ হওয়া নিয়ন্ত্রণ করে। মাঝে মাঝে, রক্ষী কোশগুলোর সান্নিধ্যে থাকা কিছু বহিঃত্বকীয় কোশ তাদের আকৃতি ও আকারগত দিক থেকে বিশেষিত হয় এবং এদের আনুষঙ্গিক কোশ বলে। পত্ররন্ধ্র ছিদ্র, রক্ষী কোশদ্বয় এবং আনুষঙ্গিক কোশগুলোকে একত্রে পত্ররন্ধ্রীয় সংগঠন (Stomatal apparatus) বলে (চিত্র 6.4 দেখো)।

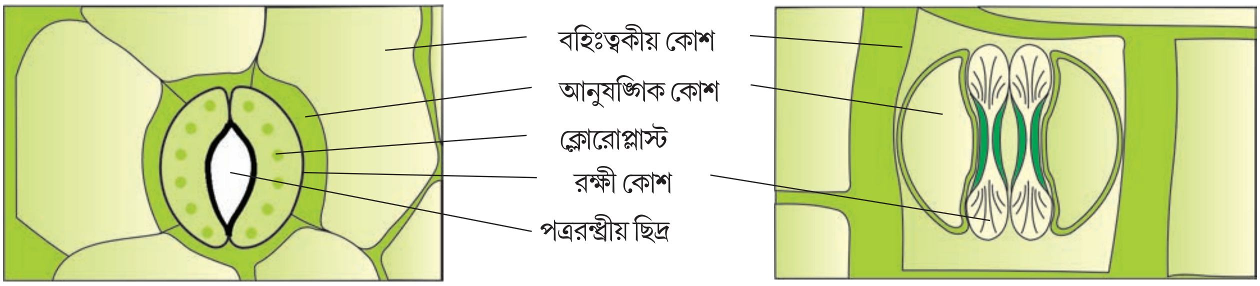

চিত্র 6.4 উপস্থাপন : (ক) সীমের আকৃতি বিশিষ্ট রক্ষীকোশদ্বয় সহ পত্ররন্ধ্র
(খ) ডাম্বেল আকৃতির রক্ষী কোশ সহ পত্ররন্ধ্র।

এপিডারমিস বা বহিঃত্বকের কোশগুলো থেকে অসংখ্য রোম উৎপন্ন হয়। মূলের বহি:ত্বকীয় কোশের এককোশী উপবৃদ্ধিগুলো হল মূলরোম এবং এরা মাটি থেকে জল ও খনিজ লবণ শোষণে সাহায্য করে। কাণ্ডের বহি:ত্বকীয় রোমগুলোকে ট্রাইকোম বলে। বিটপতন্ত্রে উপস্থিত ট্রাইকোমগুলো সাধারণত বহুকোশী হয়। এরা শাখান্বিত বা শাখাবিহীন এবং নরম বা অনমনীয় হতে পারে। এরা ক্ষরণকার্যের সাথেও যুক্ত থাকতে পারে। ট্রাইকোমগুলো বাষ্পমোচনজনিত জলের অপচয় রোধে সাহায্য করে।

6.2.2 ভূমি কলাতন্ত্র (The ground tissue system)

এপিডারমিস বা বহিঃত্বক এবং নালিকা বান্ডিলগুলো ছাড়া উদ্ভিদদেহের বাকি সব কলা ভূমি কলাতন্ত্র গঠন করে। এটি প্যারেনকাইমা, কোলেনকাইমা ও স্ক্লেরেনকাইমার মতো সরল কলা দ্বারা গঠিত। প্যারেনকাইমা কোশগুলো সাধারণত প্রাথমিক কাণ্ড ও মূলের কর্টেক্স বা বহিঃস্তর, পরিচক্র, মজ্জা, মজ্জারশ্মিগুলোতে উপস্থিত থাকে। পাতার ভূমিকলা পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট, ক্লোরোপ্লাস্ট সমন্বিত কোশগুলো নিয়ে গঠিত এবং এদের মেসোফিল কোশ বলে।

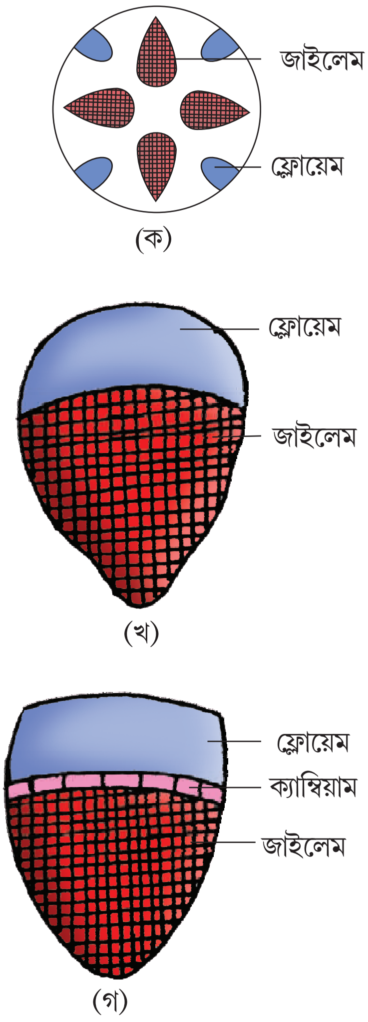

চিত্র 6.5: বিভিন্ন ধরনের নালিকাবান্ডিল:
(ক) অরীয়
(খ) সংযুক্ত বন্ধ
(গ) সংযুক্ত মুক্ত

6.2.3 সংবহন কলাতন্ত্র (The Vascular tissue system)

সংবহনকলাতন্ত্র, জাইলেম ও ফ্লোয়েম এই ধরনের জটিল কলা নিয়ে গঠিত। জাইলেম ও ফ্লোয়েম একত্রিত হয়ে নালিকাবান্ডিল গঠন করে। (চিত্র 6.5 দেখো) দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কান্ডে ফ্লোয়েম ও জাইলেম এবং মধ্যবর্তী স্থানে ক্যাম্বিয়াম থাকে। ক্যাম্বিয়ামের উপস্থিতির জন্য এই ধরনের নালিকাবান্ডিল গৌণজাইলেম ও ফ্লোয়েম কলা গঠন করতে পারে তাই এদের মুক্ত নালিকা বান্ডিল বলে। একবীজপত্রী উদ্ভিদের নালিকা বান্ডিলে ক্যাম্বিয়াম না থাকায় এরা গৌণ কলা তৈরি করতে পারে না এবং এদের বন্ধ নালিকাবান্ডিল বলে। যখন একটি নালিকাবান্ডিলে জাইলেম ও ফ্লোয়েম পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ব্যাসার্ধে সজ্জিত থাকে, তখন তাকে অরীয় নালিকাবান্ডিল বলে। মূলে এই ধরনের নালিকাবান্ডিল দেখা যায়। সংযুক্ত (conjoint type) নালিকাবান্ডিলে জাইলেম ও ফ্লোয়েম একই ব্যাসার্ধে অবস্থান করে। কাণ্ড ও পাতায় সচরাচর এ ধরনের নালিকাবান্ডিল দেখা যায়। সংযুক্ত নালিকাবান্ডিলে সাধারণত ফ্লোয়েম শুধুমাত্র জাইলেম এর বাইরের দিকে অবস্থান করে।

6.3. দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী উদ্ভিদের শারীরস্থান (Anantomy of Dicotyledonous and Monocotyledonous Plants)

মূল, কাণ্ড ও পাতায় কলা সংগঠন ভালভাবে বোঝার জন্য ওই সকল অঙ্গগুলোর পরিণত অঞ্চলের প্রস্থচ্ছেদের অধ্যয়ন অনেকটাই সুবিধাজনক।

6.3.1 দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল (Dicotyledonous Root)

চিত্র 6.6 (ক) তে সূর্যমুখী মূলের প্রস্থচ্ছেদ দেখানো হয়েছে। এই মূলের অভ্যন্তরীণ কলা সংগঠন নিম্নরূপ:

মূলের অন্তর্গঠনে সবচেয়ে বাইরের স্তরটি হল এপিডারমিস। অনেকগুলো বহিঃত্বকীয় কোশ— উদগত হয়ে এককোশী মূল রোম গঠন করে। কর্টেক্স বা বহিঃস্তর পাতলা প্রাচীর বিশিস্ট, আন্ত কোশীয় স্থান সমন্বিত প্যারেনকাইমা কোশের বেশ কয়েকটি স্তর নিয়ে গঠিত। কর্টেক্স বা বহিঃস্তরের সবচেয়ে ভেতরের স্তরটিকে এন্ডোডারমিস বা অন্তঃস্তক বলে।

এটি এক স্তর বিশিষ্ট পিপার আকৃতির কোশ সমন্বিত। এই স্তরটি কোশান্তর রন্ধ্রবিহীন হয়। অন্তঃস্তকীয় কোশগুলোর স্পর্শ প্রাচীর ও অরীয় প্রাচীরে জল অভেদ্য, মোম জাতীয় বস্তু সুবেরিন ক্যাসপেরিয়ান পট্টিরূপে জমা হয়। এন্ডোডারমিস এর ঠিক পরে ভেতরের দিকে পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট প্যারেনকাইমা কোশ দ্বারা গঠিত কয়েকটি স্তর থাকে এবং এদের পরিচক্র বলে। গৌণবৃদ্ধির সময় এই কোশগুলোতেই পার্শ্বীয় মূল এবং ভাসকুলার ক্যাম্বিয়াম গঠনের সূচনা হয়। মজ্জা ছোটো এবং অস্পষ্ট। জাইলেম ও ফ্লোয়েম-এর মাঝখানে অবস্থিত প্যারেনকাইমা কোশগুলোকে যোজক কলা বলে। এই মূলে সাধারণত দুই থেকে চারটি জাইলেম ও ফ্লোয়েম অংশ থাকে। পরবর্তী সময়ে জাইলেম ও ফ্লোয়েম-এর মাঝে একটি ক্যাম্বিয়াম বলয় গঠিত হয়। এন্ডোডারমিস বা অন্তঃস্তকের ভেতরের দিকের সব কলাগুলো অর্থাৎ পরিচক্র, নালিকাবাণ্ডিল এবং মজ্জা স্টিলি বা কেন্দ্রস্তম্ভ গঠন করে।

6.3.2 একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল (Monocotyledonous Root)

একবীজপত্রী মূলের শারীরস্থানিক গঠন অনেক দিক থেকে দ্বিবীজপত্রী মূলের মতো (চিত্র 6.6 (খ) দেখো)

এটি এপিডারমিস বা বহি:ত্বক, কর্টেক্স বা বহিস্তর এন্ডোডারমিস বা অন্ত:স্তক, পরিচক্র, নালিকাবাণ্ডিল ও মজ্জা নিয়ে গঠিত। দ্বিবীজপত্রী মূলে যেখানে অল্প কয়েকটি নালিকাবাণ্ডিল দেখা যায়, একবীজপত্রী মূলে সেখানে সাধারণ ছয় এর বেশি (Polyarch) নালিকাবাণ্ডিল দেখা যায়। মজ্জা সুবিস্তৃত এবং সুগঠিত। একবীজপত্রী মূলে গৌণবৃদ্ধি ঘটে না।

6.3.3 দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড (Dicotyledonous stem)

একটি আদর্শ তরুণ দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদে দেখা যায় যে এপিডারমিস বা বহি:ত্বক হল কাণ্ডের সবচেয়ে বাইরের রক্ষণাত্মক স্তর (চিত্র 6.7 (ক) দেখো)। এটি একটি পাতলা কিউটিকল স্তর দ্বারা আবৃত এবং এতে কিছু ট্রাইকোম এবং অল্প কয়েকটি পত্ররন্ধ্র থাকতে পারে।

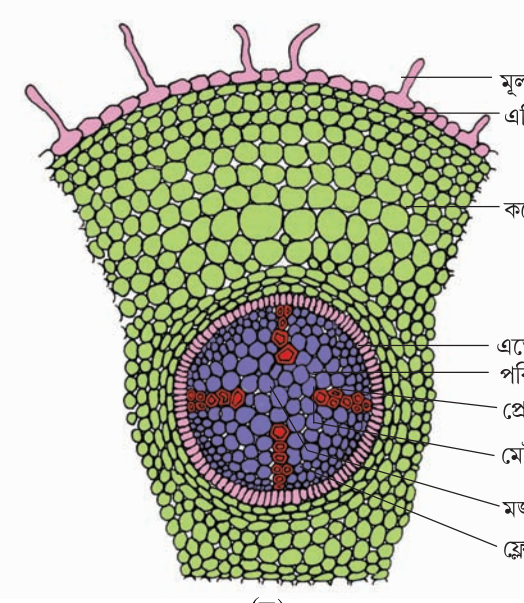

(ক)

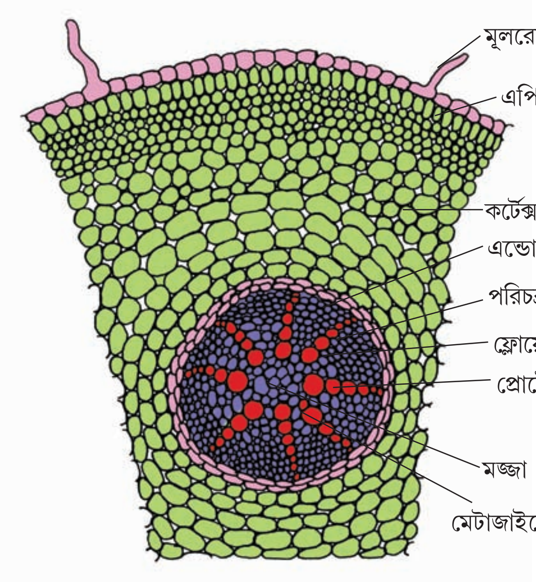

(খ)

চিত্র 6.6 প্রস্থচ্ছেদে (ক) দ্বিবীজপত্রী মূল (প্রাথমিক) (খ) একবীজপত্রী মূল

এপিডারমিস বা বহিঃত্বক এবং পরিচক্রের মধ্যবর্তী কোশগুলো বহুস্তরে বিন্যস্ত থেকে কর্টেক্স বা বহিঃস্তর গঠন করে। এই কর্টেক্স তিনটি উপ অঞ্চল নিয়ে গঠিত। এগুলো হল বাইরের দিকের হাইপোডারমিস বা অধঃস্তক-এটি এপিডারমিস বা বহিঃত্বকের ঠিক নিচে অবস্থিত, অল্প কয়েকটি কোলেনকাইমা কোশস্তর দ্বারা গঠিত যা উদ্ভিদের তরুণ কাণ্ডকে যান্ত্রিক দৃঢ়তা প্রদান করে। কর্টেক্স স্তর এটি হাইপোডারমিস বা অধঃ ত্বকের নিচে অবস্থিত। এই স্তরটি সুস্পষ্ট আন্তঃকোশীয় স্থান বিশিষ্ট, গোলাকার, পাতলা প্রাচীরযুক্ত প্যারেনকাইমা কোশ সমূহ দ্বারা গঠিত। কর্টেক্স বা বহিঃস্তরের সবচেয়ে ভেতরের স্তর— এই স্তরটিকে এন্ডোডারমিস বা অন্তঃত্বক বলে। এন্ডোডারমিস বা অন্তস্তকের কোশগুলো শ্বেতসার সমৃদ্ধ হয় এবং এই স্তরটিকে তাই শ্বেতসার আবরণীও বলে। পরিচক্র এন্ডোডারমিস বা অন্তঃস্তকের ভেতরের দিকে এবং ফ্লোয়েম এর বাইরের দিকে অর্ধচন্দ্রাকার স্ক্লেরেনকাইমা নির্মিত বিচ্ছিন্ন স্তর রূপে অবস্থান করে।

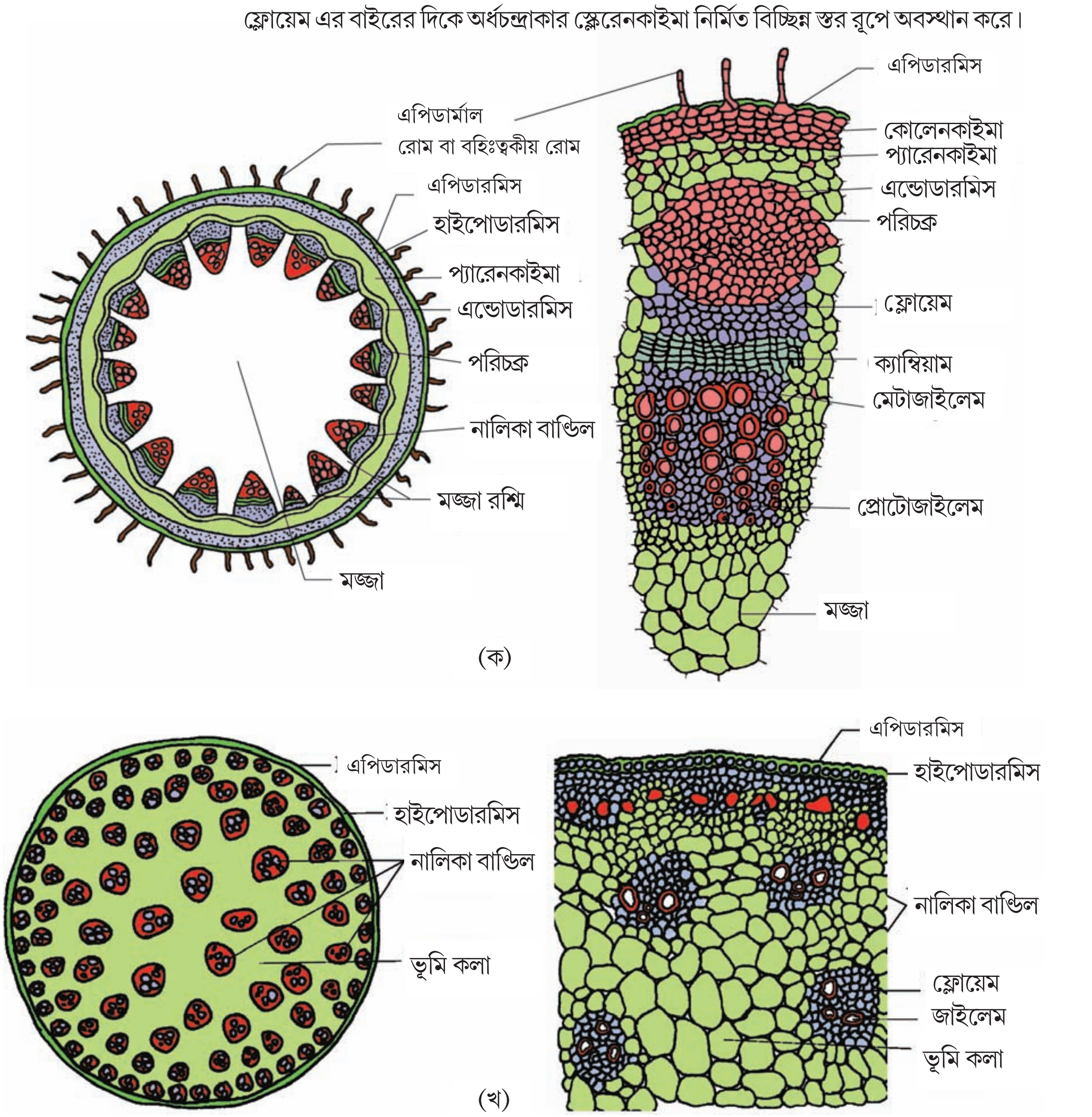

চিত্র 6.7 কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ : (ক) দ্বিবীজপত্রী (খ) একবীজপত্রী

নালিকাবান্ডিলগুলোর মাঝে অরীয়ভাবে সজ্জিত প্যারেনকাইমা কোশসমূহের অল্প কয়েকটি স্তর থাকে যেগুলো মজ্জারশ্মি গঠন করে। অনেকগুলো নালিকাবান্ডিল বলয়াকারে সজ্জিত থাকে। নালিকাবান্ডিলগুলোর বলয়াকার সজ্জারীতি দ্বিবীজপত্রী কান্ডের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি নালিকাবান্ডিল সংযুক্ত, মুক্ত এবং এন্ডার্ক প্রোটোজাইলেম বিশিষ্ট। অনেকগুলো গোলাকার, বৃহৎ কোশান্তর স্থান বিশিষ্ট প্যারেনকাইমা কোশ কান্ডের কেন্দ্রীয় অংশে থেকে মজ্জা গঠন করে।

6.3.4 একবীজপত্রী কান্ড (Monocotyledonons stem)

একবীজপত্রী স্ক্লেরেনকাইমা দ্বারা গঠিত একটি হাইপোডারমিস স্তর বা অধঃত্বক, অনেকগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো নালিকাবান্ডিল এবং একটি বড়ো, সুস্পষ্ট, প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত ভূমিকলা অঞ্চল থাকে। প্রতিটি নালিকাবান্ডিল স্ক্লেরেনকাইমা দ্বারা গঠিত একটি বান্ডিল শীথ দ্বারা আবৃত থাকে (চিত্র 6.7 খ দেখো)। নালিকাবান্ডিলগুলো সংযুক্ত ও বন্ধ। প্রান্তীয় নালিকা বান্ডিলগুলো সাধারণত কেন্দ্রীয় নালিকাবান্ডিলগুলোর তুলনায় ছোটো হয়। ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা থাকে না এবং জল ধারণকারী গহ্বরগুলো নালিকা- বান্ডিলের ভেতরে অবস্থান করে।

6.3.5 বিষমপৃষ্ঠ (দ্বিবীজপত্রী) পত্র (Dorsiventral (Dicotyledonov) leaf)

একটি বিষমপৃষ্ঠ পাতাকে পত্রফলকের মধ্য দিয়ে লম্বচ্ছেদ করলে এতে তিনটি প্রধান অংশ দেখা যায়। এগুলো হল এপিডারমিস বা বহিঃত্বক, মেসোফিল কলা এবং সংবহনতন্ত্র। এপিডারমিস বা বহিঃত্বক পাতার ঊর্ধ্বপৃষ্ঠ (adaxial epidermis) এবং নিম্নপৃষ্ঠে (abaxial epidermis) উভয়কেই ঢেকে রাখে এবং এটি সুস্পষ্ট কিউটিকলযুক্ত হয়। পাতার ঊর্ধ্বত্বকের (adaxial epidermis) তুলনায় নিম্নত্বকে (abaxial epidermis) সাধারণত বেশি সংখ্যক পত্ররন্ধ্র থাকে। আবার ঊর্ধ্বত্বকে পত্ররন্ধ্র নাও থাকতে পারে। পাতার ঊর্ধ্বত্বক ও নিম্নত্বকের মধ্যবর্তী কলাকে মেসোফিল কলা বলে। মেসোফিল কলা প্যারেনকাইমা কোশ দ্বারা গঠিত হয়। মেসোফিল কলার কোশগুলো ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত হয় এবং সালোকসংশ্লেষ করতে পারে। মেসোফিল কলায় দুই ধরনের কোশ থাকে — প্যালিসেড প্যারেনকাইমা ও স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা। প্যালিসেড প্যারেনকাইমা পাতার ঊর্ধ্বত্বকের দিকে থাকে এবং লম্বাটে কোশসমূহ দ্বারা গঠিত হয়। এই কোশগুলো লম্বালম্বিভাবে এবং পরস্পরের সহিত সমান্তরালে সজ্জিত থাকে। ডিম্বাকার বা গোলাকার শিথিলভাবে সজ্জিত স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা কোশগুলো প্যালিসেড প্যারেনকাইমা কোশগুলোর নীচে অবস্থান করে এবং নিম্নত্বক পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এই কোশগুলোর মাঝে অসংখ্য বৃহৎ কোশান্তর স্থান ও বায়ু গহ্বর রয়েছে। নালিকা বান্ডিলগুলো সংবহনতন্ত্রের অন্তর্গত এবং এদের শিরা-উপশিরা বা মধ্য শিরায় দেখা যায়। নালিকাবান্ডিলের আকার পাতার শিরার আকারের উপর নির্ভরশীল। দ্বিবীজপত্রী পাতার জালকাকার শিরাবিন্যাসে শিরাগুলোর স্থূলত্ব ভিন্ন হয়। নালিকাবান্ডিলগুলো পুরু, একস্তরী, বান্ডিল শীদ কোশসমূহ দ্বারা পরিবৃত থাকে চিত্র 6.8 (ক) দেখো এবং নালিকাবান্ডিলে জাইলেম এর অবস্থান বের করো।

6.3.6 একবীজপত্রী সমাঙ্কপৃষ্ঠপত্র (Isobilateral leaf) :

সমাঙ্কপৃষ্ঠ পাতার শারীরস্থানিক গঠন অনেক দিক থেকে বিষমপৃষ্ঠ পাতার মতো। এটি নিম্নে বর্ণিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য নির্দেশ করে।

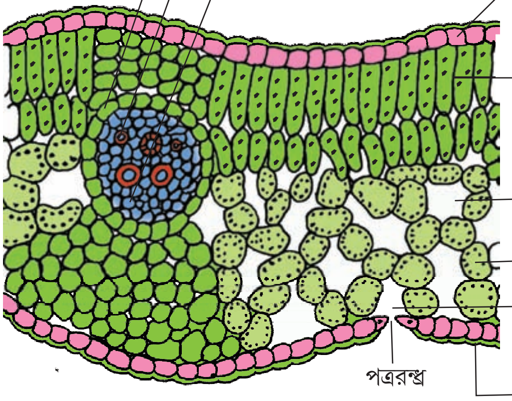

(ক)

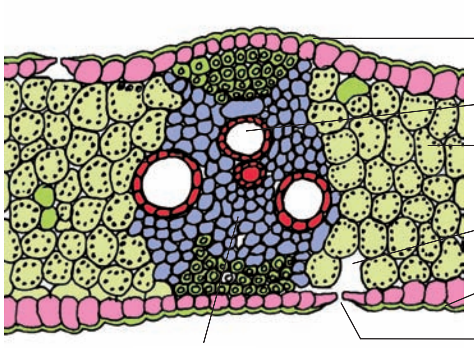

(খ)

চিত্র 6.8 : পাতার প্রস্থচ্ছেদ (ক) দ্বিবীজপত্রী (খ) একবীজপত্রী।

একটি সমাঙ্কপৃষ্ঠ পাতায় পত্ররন্ধ্র ঊর্ধ্ব ও নিম্ন উভয় পৃষ্ঠের বহি:ত্বক ত্বক বা এপিডারমিস থাকে এবং মেসোফিল কলা প্যালিসেড ও স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা কলায় বিভেদিত হয় না। (চিত্র 6.8 খ দেখো)।

ঘাস জাতীয় উদ্ভিদে, পত্রশিরা সহ ঊর্ধ্ব বহি:ত্বকের কিছু কিছু কোশ পরিবর্তিত হয়ে বৃহৎ ফাঁপা, বর্ণহীন কোশে পরিণত হয়। এই কোশগুলোকে বুলিফর্ম কোশ বলে। পাতার বুলিফর্ম কোশগুলো যখন জল শোষণ করে রসস্ফীত হয় তখন পত্রফলক উন্মীলিত হয়। জলের অভাবজনিত কারণে যখন এই কোশগুলো রসশিথিল হয় তখন জলের অপচয় রোধ করার জন্য পত্রফলক ভেতরের দিকে গুটিয়ে যায়।

একবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতায় উপস্থিত সমান্তরাল শিরাবিন্যাস পাতার লম্বচ্ছেদে যেরকম দেখা যায় সেরূপ প্রায় একই আকারের নালিকা বান্ডিলগুলোতে (প্রধান শিরা বা মধ্য শিরা ব্যতীত) প্রতিফলিত হয়।

6.4 গৌণবৃদ্ধি (Secondary Growth)

অগ্রস্থ ভাজক কলার ক্রিয়াশীলতার ফলে উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিকে প্রাথমিক বৃদ্ধি বলে। বেশিরভাগ দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে প্রাথমিক বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের পরিধিরও বৃদ্ধি ঘটে। এ ধরনের বৃদ্ধিকে গৌণ বৃদ্ধি বলে। গৌণ বৃদ্ধিতে সহায়ক কলাগুলো হল দুটি পার্শ্বীয় ভাজককলা ভাসকুলার ক্যাম্বিয়াম এবং কর্ক ক্যাম্বিয়াম।

6.4.1 ভাসকুলার ক্যাম্বিয়াম (Vascular Cambium)

যে ভাজককলা স্তরটি জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলাকে পরস্পর থেকে পৃথক রাখে তাকে ভাসকুলার ক্যাম্বিয়াম বলে। তরুণ কাণ্ডে এটি একটি এককস্তর হিসেবে জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যবর্তী স্থানে খণ্ডে খণ্ডে উপস্থিত থাকে। পরবর্তীতে এটি একটি সম্পূর্ণ ক্যাম্বিয়াম বলয় গঠন করে।

6.4.1.1 ক্যাম্বিয়াম বলয় তৈরি (Formation of Cambial ring)

দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডে, প্রাথমিক জাইলেম ও প্রাথমিক ফ্লোয়েম-এর মধ্যবর্তীস্থানে উপস্থিত ক্যাম্বিয়াম কোশগুলোকে ইন্ট্রা ফ্যাসিকিউলার ক্যাম্বিয়াম বলে।

ইন্ট্রাফ্যাসিকিউলার ক্যাম্বিয়াম সংলগ্ন মজ্জারশ্মির কোশগুলো ভাজককলায় রূপান্তরিত হয়ে ইন্টারফ্যাসিকিউলার ক্যাম্বিয়াম গঠন করে। এইভাবে একটি অবিচ্ছিন্ন ক্যাম্বিয়াম বলয় গঠিত হয়।

6.4.1.2 ক্যাম্বিয়াম বলয়ের কাজ

ক্যাম্বিয়াম বলয়টি সক্রিয় হওয়ার পর তার ভেতরের দিক ও বাইরের দিক উভয় দিকে নতুন কোশ তৈরি করতে শুরু করে। যে কোশগুলো মজ্জার দিকে গঠিত হয় সেগুলো পরিণত হয়ে গৌণ জাইলেম এবং যে কোশগুলো পরিধির দিকে অর্থাৎ পরিচক্রের দিকে গঠিত হয় সেগুলো পরিণত হয়ে গৌণ ফ্লোয়েম গঠন করে। ক্যাম্বিয়াম সাধারণত বাইরের দিক থেকে ভেতরের দিকে অধিক সক্রিয় থাকে। এর ফলে গৌণ ফ্লোয়েম এর তুলনায় গৌণ জাইলেম অধিক পরিমাণে তৈরি হয় এবং শীঘ্রই একটি সংহত কোশীয় অংশ (compact mass) গঠন করে। গৌণ জাইলেম এর নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন ও সঞ্চয়ের ফলে প্রাথমিক ও গৌণ ফ্লোয়েম স্তরগুলো ক্রমশ চূর্ণ হয়ে যায়। যদিও প্রাথমিক জাইলেম প্রায় অবিকৃতই থাকে এবং এটি কান্ডের কেন্দ্রে বা কেন্দ্রীয় অংশকে ঘিরে অবস্থান করে। কিছু কিছু স্থানে ক্যাম্বিয়াম, প্যারেনকাইমা কলার একটি সরু পট্টি গঠন করে যা গৌণ জাইলেম এবং গৌণ ফ্লোয়েম কলার মধ্য দিয়ে অরীয়ভাবে অগ্রসর হয়। এদের গৌণ মজ্জারশ্মি (Secondary medullary Rays) বলে (চিত্র 6.9 দেখো)।

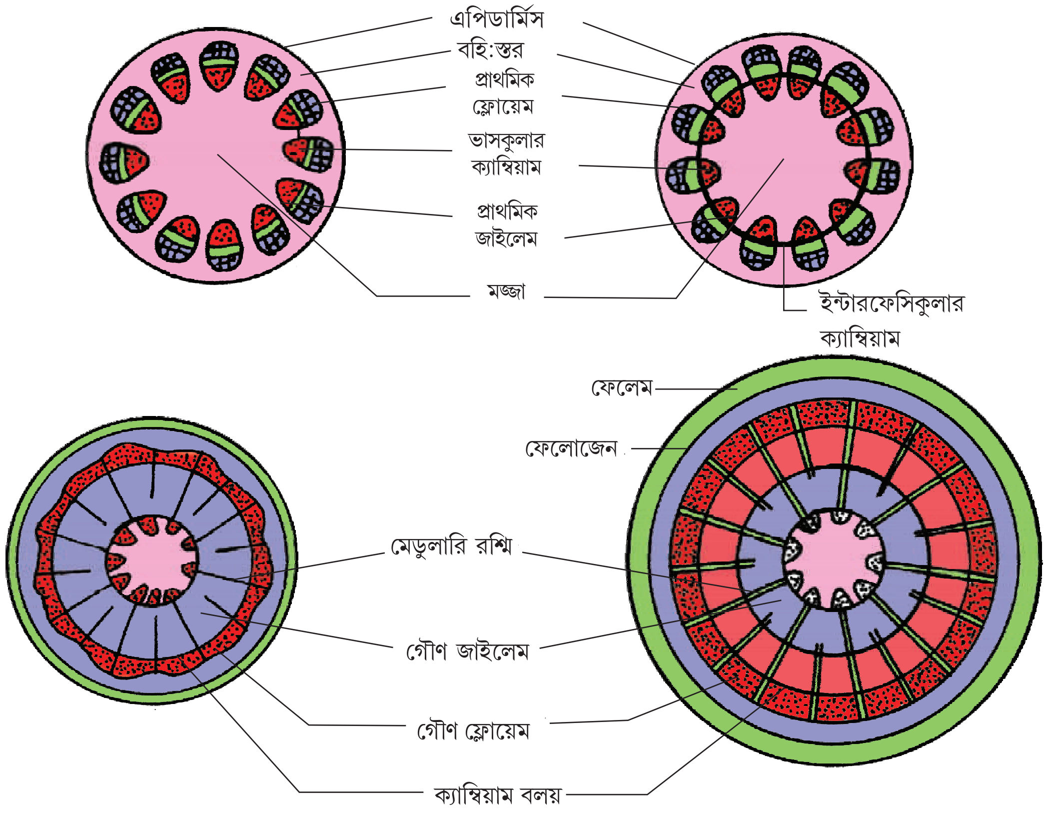

চিত্র **6.9:** দ্বিবীজপত্রী কান্ডে গৌণ বৃদ্ধির চিত্ররূপ—প্রস্থচ্ছেদে দৃশ্য বিভিন্ন দশা।

6.4.1.3 বসন্তকালীন কাঠ এবং শরৎকালীন কাঠ (Spring Wood and Autumn Wood)

ক্যাম্বিয়াম এর কাজ বহু শারীরবৃত্তীয় এবং পরিবেশীয় প্রভাবক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে, জলবায়ু সম্বন্ধীয় অবস্থা বছরের সবসময় একরকম থাকে না। বসন্ত ঋতুতে ক্যাম্বিয়াম অত্যন্ত সক্রিয় থাকে এবং প্রশস্থ গহ্বর বিশিষ্ট বাহিকা সমন্বিত অধিক সংখ্যক জাইলেম উপাদান তৈরি করে। এই ঋতুতে উৎপন্ন কাষ্ঠকে বসন্তকালীন কাষ্ঠ বা পূর্বকালীন কাষ্ঠ বলে (Spring Wood or early wood)। শীতকালে ক্যাম্বিয়াম কম সক্রিয় থাকে এবং অল্প কিছু সরু বাহিকা সমন্বিত জাইলেম উপাদান তৈরি করে এবং এই কাষ্ঠকে শরৎকালীন কাষ্ঠ বা বিলম্বিত কাষ্ঠ (Autumn wood or late wood) বলে।

বসন্তকালীন কাষ্ঠ হালকা রঙের এবং নিম্ন ঘনত্ব বিশিষ্ট হয়। অন্যদিকে, শরৎকালীন কাষ্ঠ গাঢ় রঙের এবং উচ্চ ঘনত্ববিশিষ্ট হয়। পর্যায়ক্রমিক সমকেন্দ্রীক বলয়রূপে সজ্জিত এই দুই ধরনের কাষ্ঠ বর্ষবলয় (Annual ring) গঠন করে। কর্তিত কাণ্ডে দৃশ্যমান বর্ষবলয় বৃক্ষের বয়স নির্ণয়ে সাহায্য করে।

6.4.1.4 নীরস কাষ্ঠ এবং সরস কাষ্ঠ (Heart wood and Sapwood)

প্রাচীন বৃক্ষে কাণ্ডের কেন্দ্রীয় অংশে বা সবচেয়ে ভেতরের স্তরে ট্যানিন, রেজিন তেল জাতীয় পদার্থ, আঠা, সুগন্ধি বস্তু এবং অপরিহার্য তেল-এর মতো জৈব পদার্থগুলো সঞ্চিত হওয়ার ফলে গৌণ জাইলেমের বেশিরভাগ অংশ গাঢ় বাদামি বর্ণের হয়। এই বস্তুগুলো কাষ্ঠকে শক্ত, টেকসই এবং অনুজীব ও পতঙ্গ প্রতিরোধী করে। কাণ্ডের যে অঞ্চলটি মৃত উপাদান দ্বারা গঠিত হয় এবং অত্যন্ত পুরু লিগনিনযুক্ত প্রাচীর বিশিষ্ট হয় তাকে নীরস কাষ্ঠ (Heart wood) বলে। নীরস কাষ্ঠ জল পরিবহণ করে না কিন্তু কাণ্ডকে যান্ত্রিক দৃঢ়তা প্রদান করে। গৌণ জাইলেমের প্রান্তীয় অঞ্চল হালকা রঙের হয় এবং একে সরস কাষ্ঠ (Sap wood) বলে। এটি মূল থেকে পাতায় জল ও খনিজ লবণ সংবহনে সাহায্য করে।

6.4.2 কর্ক ক্যাম্বিয়াম (Cork Cambium)

ভাসকুলার ক্যাম্বিয়াম এর ক্রিয়ার ফলে কাণ্ডের পরিধি অনবরত বাড়তে থাকায় বাইরের দিকের কর্টেক্স এবং এপিডারমিস স্তরগুলো ভেঙে যায় এবং নতুন রক্ষণাত্মক স্তর গঠনের জন্য এদের প্রতিস্থাপন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই আগে বা পরে কর্টেক্স অঞ্চলে অপর একটি ভাজক কলাস্তর গঠিত হয়। একে কর্ক ক্যাম্বিয়াম বা ফেলোজেন বলে। ফেলোজেন কয়েকটি স্তর পুরু হয়। এটি সরু, পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট এবং প্রায় আয়তাকার কোশের সমন্বয়ে গঠিত হয়। ফেলোজেন তার উভয় দিকেই কোশ সৃষ্টি করে। ফেলোজেনের বাইরের দিকে সৃষ্ট কোশগুলো বিভেদিত হয়ে কর্ক বা ফেলেম এবং ভেতরের দিকে সৃষ্ট কোশগুলো বিভেদিত হয়ে গৌণ কর্টেক্স বা ফেলোডার্ম গঠন করে। কোশপ্রাচীরে সুবেরিন সঞ্চিত হওয়ার ফলে কর্ক জল অভেদ্য হয়। গৌণ কর্টেক্স এর কোশগুলো প্যারেনকাইমা কোশ বিশিষ্ট। ফেলোজেন, ফেলেম এবং ফেলোডার্মকে একসাথে পেরিডার্ম বলে। কর্ক ক্যাম্বিয়ামের ক্রিয়ার ফলে

ফেলোজেনের বাইরের দিকের বাকি কোশস্তরগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি হয় এবং অবশেষে এই স্তরগুলোর মৃত্যু ঘটে এবং খসে পড়ে। বাকল বা বার্ক একটি অপ্রায়োগিক পরিভাষা। বাকল বা বার্ক বলতে ভাসকুলার ক্যাম্বিয়ামের বাইরের দিকের সব কলাগুলোকে বোঝায়। তাই গৌণ ফ্লোয়েম ও বাকল বা বার্ক এর অন্তর্গত। বেশ কয়েক ধরনের কলা মিলে বার্ক বা বাকল গঠিত হয়। যেমন পেরিডার্ম এবং গৌণ ফ্লোয়েম। যে বাকল বা বার্ক কোনো ঋতুর শুরুর দিকে তৈরি হয় তাকে পূর্বকালীন বা নরম বাকল (early or soft bark) বলে। কোনো ঋতুর শেষের দিকে গঠিত বাকলকে বিলম্বিত বা শক্ত বাকল (Late or hard bark) বলে। বাকল গঠনকারী বিভিন্ন ধরনের কোশস্তরগুলোর নাম লেখো।

ফেলোজেনের বাইরের দিকে কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলের কর্ক কোশের পরিবর্তে ঘন সন্নিবিষ্ট প্যারেনকাইমা কোশ থাকে। এই প্যারেনকাইমা কোশগুলো এপিডারমিস বা বহিঃত্বকের বিদারণ ঘটায় এবং এর ফলে লেন্স আকৃতির কতগুলো ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। এদের লেন্টিসেল বলে। লেন্টিসেল বহিঃপরিবেশে এবং কাণ্ডের অভ্যন্তরীণ কলাগুলোর মধ্যে গ্যাসীয় আদান প্রদান ঘটায়। বেশিরভাগ কাষ্ঠল বৃক্ষে লেন্টিসেল থাকে (চিত্র 6.10 দেখো)

6.4.3 মূলে গৌণ বৃদ্ধি

দ্বিবীজপত্রী মূলে ভাসকুলার ক্যাম্বিয়াম উৎপত্তিগতভাবে সম্পূর্ণরূপে গৌণ প্রকৃতির। এটি ফ্লোয়েম গুচ্ছের ঠিক নিচে উপস্থিত কলা, প্রোটোজাইলেমের উপরে অবস্থিত পরিচক্রের একটি অংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে একটি সম্পূর্ণ, অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গায়িত বলয় গঠন করে যা পরবর্তী সময়ে চক্রাকার হয়ে যায় (চিত্র 6.11 দেখো)। গৌণবৃদ্ধির অন্যান্য ঘটনাগুলো দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের মতো একইভাবে ঘটে। (দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের গৌণবৃদ্ধির পর্যায়গুলো উপরে বর্ণনা করা হয়েছে)।

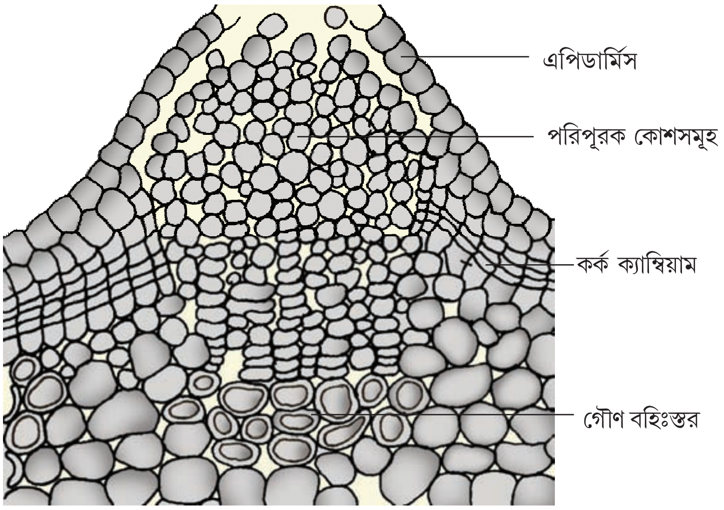

(ক)

(খ)

চিত্র 6.10 : (ক) লেন্টিসেল এবং (খ) বাকল

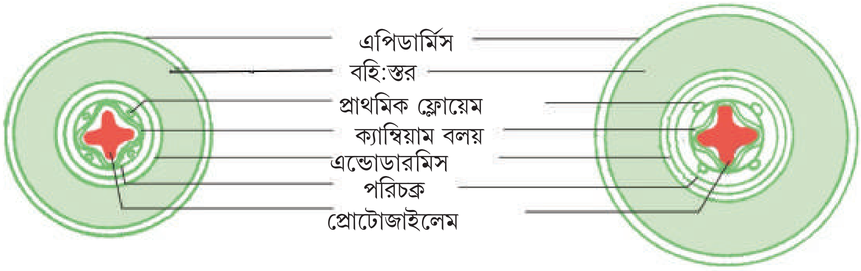

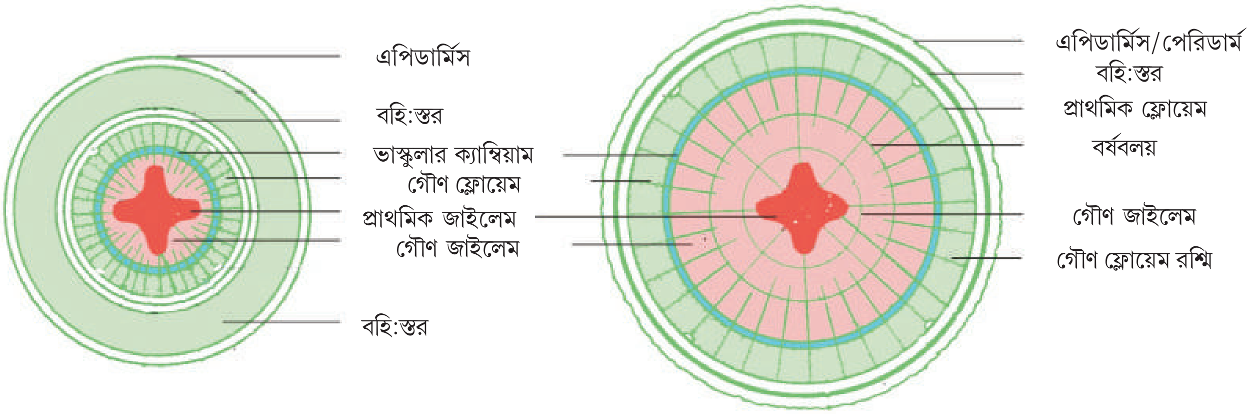

চিত্র 6.11 একটি আদর্শ দ্বিবীজপত্রী মূলে গৌণবৃদ্ধির বিভিন্ন দশা

ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের কাণ্ড এবং মূলেও গৌণবৃদ্ধি ঘটে। তবে একবীজপত্রী উদ্ভিদে গৌণ বৃদ্ধি ঘটে না।

সারসংক্ষেপ

শারীর স্থানিকভাবে, একটি উদ্ভিদ বিভিন্ন ধরনের কলা দ্বারা গঠিত। উদ্ভিদ কলাগুলোকে বিস্তৃতভাবে ভাজক কলা (অগ্রস্থ, পার্শ্বস্থ ও নিবেশিত) এবং স্থায়ী কলায় (সরল ও জটিল) ভাগ করা হয়। কলার প্রধান কাজগুলো হল খাদ্য সংশ্লেষ ও তার সঞ্চয়, জল, খণিজ লবণ এবং সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন খাদ্যের সংবহন এবং উদ্ভিদ দেহকে যান্ত্রিক সুবিধা প্রদান। উদ্ভিদদেহে তিন ধরনের কলাতন্ত্র রয়েছে ত্বক কলাতন্ত্র, ভূমি কলাতন্ত্র ও সংবহন কলাতন্ত্র। ত্বক কলাতন্ত্র ত্বকীয় কোশসমূহ, পত্ররন্ধ্র এবং ত্বকীয় উপবৃদ্ধি দ্বারা গঠিত হয়। ভূমি কলাতন্ত্র উদ্ভিদদেহের প্রধান বিশাল অংশটি গঠন করে। এটি তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত- কর্টেক্স বা বহিঃস্তর, পরিচক্র এবং মজ্জা। সংবহন কলাতন্ত্র জাইলেম ও ফ্লোয়েম দ্বারা গঠিত হয়। ভাসকুলার ক্যাম্বিয়াম-এর উপস্থিতি এবং জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলার অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নালিকাবাণ্ডিল বিভিন্ন ধরনের হয়। নালিকাবাণ্ডিলগুলো সংবহন কলা গঠন করে এবং জল, খণিজ লবণ এবং খাদ্যের স্থানান্তরণ ঘটায়।

একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের অভ্যন্তরীণ গঠনে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এরা নালিকা বান্ডিলের ধরন, সংখ্যা ও অবস্থানগত দিক থেকে পৃথক হয়। বেশির ভাগ দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড ও মূলে গৌণ বৃদ্ধি ঘটে। ভাসকুলার ক্যাম্বিয়াম ও কর্ক ক্যাম্বিয়ামের ক্রিয়ায় গৌণবৃদ্ধি হয় এবং এর ফলস্বরূপ উদ্ভিদের সংশ্লিষ্ট অঙ্গের পরিধির বৃদ্ধি ঘটে। কাষ্ঠ প্রকৃতপক্ষে গৌণ জাইলেম। কাষ্ঠের উৎপত্তি কাল ও গঠনের উপর ভিত্তি করে কাষ্ঠ বিভিন্ন ধরনের হয়।

অনুশীলনী

1. বিভিন্ন ধরনের ভাজক কলার অবস্থান ও কাজ লেখো।
2. কর্ক ক্যাম্বিয়াম থেকে সৃষ্ট কলা আবার কর্ক গঠন করে, তুমি কি এই বক্তব্যের সাথে সহমত পোষণ করো? ব্যাখ্যা করো।
3. কাষ্ঠল গুপ্তবীজী উদ্ভিদের কাণ্ডে গৌণ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। এর তাৎপর্য্য কী?
4. বিশদ চিত্র অঙ্কনের সাহায্যে নিম্নলিখিতগুলোর মধ্যে শারীরস্থানিক পার্থক্য নির্দেশ করো।

   (ক) একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল

   (খ) একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড
5. তোমাদের বিদ্যালয়ের বাগানের একটি গাছ থেকে তরুণ কাণ্ড নিয়ে তার প্রস্থচ্ছেদ করো এবং অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করো। তুমি কীভাবে নিশ্চিত হবে যে এটি একবীজপত্রী বা দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড? কারণ দর্শাও।
6. একটি উদ্ভিদ অঙ্গের প্রস্থচ্ছেদে নিম্নলিখিত শারীরস্থানিক বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায়—

   (ক) নালিকাবান্ডিলগুলো সংযুক্ত, ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো এবং স্ক্লেরেনকাইমা কলা নির্মিত বান্ডিল আবরণী দ্বারা আবৃত (খ) ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা অনুপস্থিত। এই উদ্ভিদ অঙ্গটিকে তুমি কী হিসেবে সনাক্ত করবে?
7. জাইলেম ও ফ্লোয়েমকে জটিল কলা বলে কেন?
8. পত্ররন্ধ্রীয় সংগঠন (Stomatal apparatus) কী? চিহ্নিত চিত্রের সাহায্যে পত্ররন্ধ্রের গঠন ব্যাখ্যা করো।
9. সপুষ্পক উদ্ভিদের তিনটি মৌলিক কলাতন্ত্রের নাম লেখো। প্রতিটি তন্ত্রের অন্তর্গত কলাগুলোর নাম উল্লেখ করো।
10. আমাদের কাছে উদ্ভিদের শারীরস্থানের অধ্যয়ন কীভাবে উপযোগী হবে?
11. পেরিডার্ম কী? দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে পেরিডার্ম কীভাবে তৈরি হয় লেখো।
12. চিহ্নিত চিত্রের সাহায্যে একটি বিষমপৃষ্ঠপাতার অন্তর্গঠন বর্ণনা করো।

অধ্যায় 7 (CHAPTER 7)

প্রাণীদের গঠনগত অঙ্গসংস্থান
(STRUCTURAL ORGANISATION IN ANIMALS)

7.1 প্রাণীকলা

7.2 অঙ্গ এবং অঙ্গতন্ত্র

7.3 কেঁচো

7.4 আরশোলা

7.5 ব্যাঙ

আগের অধ্যায়ে প্রাণীজগতের বিচিত্র ধরনের এককোশী এবং বহুকোশী জীব সম্বন্ধে তোমরা জেনেছ। এককোশী জীবে, একটিমাত্র কোশের মাধ্যমেই সমস্ত শারীরবৃত্তীয় কার্য যেমন, পাচন, শ্বসন এবং জনন সম্পন্ন হয়। জটিল দেহগঠন বিশিষ্ট প্রাণীতে এই মৌলিক কার্যসমূহ বিভিন্ন ধরনের কোশগুচ্ছের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়। হাইড্রার মতো সরল প্রাণীর দেহ বিভিন্ন প্রকারের কোশ নিয়ে গঠিত এবং প্রত্যেক প্রকারের কোশের সংখ্যা সহস্রাধিক হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদনের জন্য মানুষের দেহ কোটি কোটি কোশ নিয়ে গঠিত। দেহস্থিত এই কোশগুলো কাজ করে কীভাবে? বহুকোশী প্রাণীতে আন্তঃকোশীয় পদার্থ সহযোগে একই ধরনের কোশগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে। এই ধরনের কোশীয় সংগঠনকে কলা বলে।

তোমরা হয়তো বা জেনে অবাক হবে, সমস্ত জটিল দেহগঠন বিশিষ্ট প্রাণীদেহ কেবলমাত্র চার ধরনের মৌলিক কলার সমন্বয়ে গঠিত। এইসমস্ত কলাগুলো নির্দিষ্ট অনুপাতে এবং বিন্যাসে (Pattern) সংগঠিত হয়ে পাকস্থলী, ফুসফুস, হৃৎপিন্ড এবং বৃক্কের মতো অঙ্গগুলো গঠন করে। যখন দুই বা ততোধিক অঙ্গ তাদের ভৌত অথবা রাসায়নিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে একই ধরনের কার্য সম্পাদন করে। এরা একত্রীভূত হয়ে অঙ্গতন্ত্র গঠন করে। যেমন পাচনতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র ইত্যাদি। কোশ, কলা, অঙ্গ এবং অঙ্গতন্ত্র এমনভাবে কার্যসমূহ বণ্টন করে যে এদের মধ্যে শ্রমবিভাজন পরিলক্ষিত হয় এবং এটি প্রাণীটিকে সামগ্রিকভাবে বাঁচিয়ে রাখে।

7.1 প্রাণীকলা

কার্যানুসারে কোশের গঠন ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই কলা বিভিন্ন ধরনের হয় এবং এদের চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : (i) আবরণী কলা (ii) যোগ কলা (iii) পেশি কলা (iv) স্নায়ুকলা।

7.1.1 আবরণী কলা

সাধারণত আবরণী কলাকে এপিথেলিয়াম (বহুবচনে : এপিথেলিয়া) বলে। এই কলার মুক্ত তল রয়েছে, যা দেহতলের দিকে অথবা বাহ্যিক পরিবেশের দিকে উন্মুক্ত থাকে। এইভাবে থেকে আবরণী কলা দেহের অংশ বিশেষের আবরণ বা আচ্ছাদন গঠন করে। এই কলার কোশগুলো ঘনসন্নিবিষ্ট, সামান্য আন্ত:কোশীয় ধাত্র সমন্বিত হয়। দুই ধরনের আবরণী কলা রয়েছে। এগুলো হল সরল আবরণী কলা এবং যৌগিক বা স্তরীভূত আবরণী কলা।

সরল আবরণী কলা একস্তরবিশিষ্ট কোশ দ্বারা গঠিত এবং দেহগহ্বর, নালী ও নালীকার আবরণী গঠন করে। যৌগিক বা স্তরীভূত আবরণী কলা দুই বা ততোধিক কোশস্তর নিয়ে গঠিত। এটির সুরক্ষা প্রদানকারী ভূমিকা রয়েছে। যেমন এই আবরণী কলা ত্বককে সুরক্ষা প্রদান করে। সরল আবরণী কলাকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায় — (i) আঁইশাকার আবরণী কলা (ii) ঘনকাকার আবরণী কলা, (iii) স্তম্ভাকার আবরণী কলা (চিত্র 7.1 দেখো)

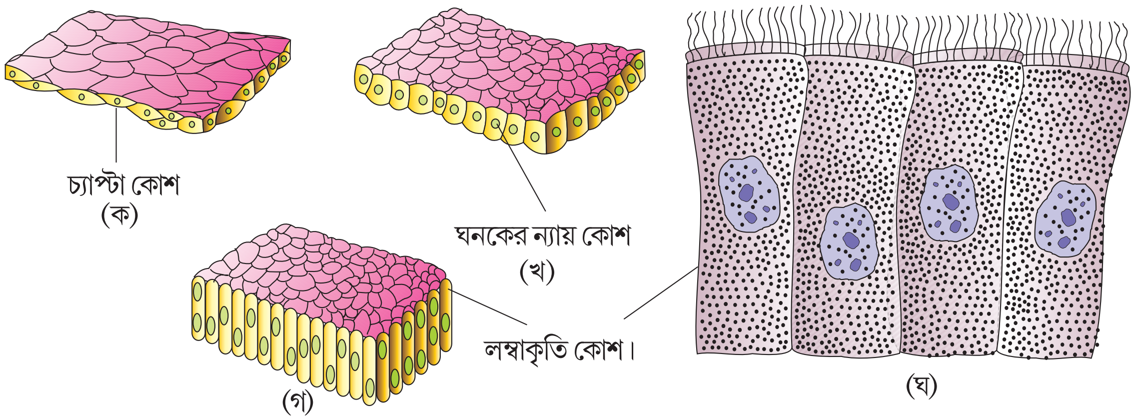

চিত্র 7.1 সরল আবরণী কলা ঃ (ক) আঁইশাকার (খ) ঘনকাকার (গ) স্তম্ভাকার কোশ সিলিয়া সমন্বিত (ঘ) সিলিয়াযুক্ত স্তম্ভাকার কোশ।

আঁইশাকার আবরণী কলা একটি পাতলাস্তর যা অনিয়মিত কোশপ্রাচীর সমন্বিত চ্যাপ্টা কোশ নিয়ে গঠিত হয়। এই কলা রক্তবাহের প্রাচীরে ও ফুসফুসের বায়ুথলিতে উপস্থিত থাকে এবং ব্যাপন সহায়ক আবরণী গঠনে অংশ নেয়। কতগুলো ঘনকের ন্যায় কোশ একটি স্তরে সজ্ঞিত হয়ে ঘনকাকার আবরণী কলা গঠন করে। এদেরকে সাধারণত গ্রন্থির নালীতে, বৃক্কস্থিত নেফ্রনের নলাকার অংশে দেখা যায়। এদের মুখ্য কাজ হল ক্ষরণ ও শোষণে সাহায্য করা। বৃক্কের নেফ্রনের পরাসংবর্ত নালীকার (PTC) আবরণী কোশে মাইক্রোভিলাই দেখা যায়। স্তম্ভাকার আবরণীকলা একস্তর বিশিষ্ট লম্বা, সরু কোশের সমন্বয়ে গঠিত। নিউক্লিয়াসটি কোশের পাদদেশে থাকে। কোশের মুক্তপ্রান্তে মাইক্রোভিলাই (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিক্ষেপের ন্যায় অংশ) থাকতে পারে। পাকস্থলী ও অন্ত্রের অন্তর্গাত্রে এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এরা ক্ষরণ ও শোষণে সহায়তা করে। যদি স্তম্ভাকার ও ঘনকাকার কলার মুক্তপ্রান্তে সিলিয়া থাকে, তবে তাদের সিলিয়েটেড আবরণী কলা বলা হয় (চিত্র 7.1 ঘ)। এদের কাজ আবরণী কলার উপর কণাসমূহ এবং শ্লেষ্মাকে একটি নির্দিষ্ট দিকে পরিচালিত করা। এরা প্রধানত ফাঁপা অঙ্গসমূহের অন্ত:গাত্রে যেমন উপক্লোমশাখা ও ফেলোপিয়ান নালীতে থাকে।

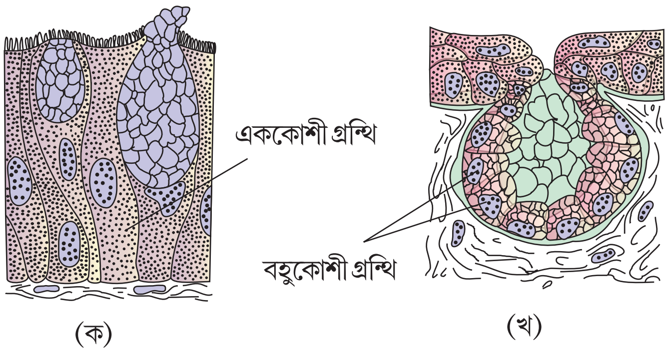

চিত্র **7.2** ঃ গ্রন্থিময় আবরণী কলা ঃ (ক) এককোশী (খ) বহুকোশী

কিছু স্তম্ভাকার অথবা ঘনকাকার কোশ ক্ষরণের জন্য বিশেষিত হয়ে গ্রন্থিময় আবরণী কলা গঠন করে (চিত্র 7.2 দেখো)। এরা প্রধানত দুই প্রকারের হয়। এককোশী গ্রন্থি পৃথকীকৃত গ্রন্থিময় এক একটি কোশ (পাচন নালিস্থিত গবলেট কোশসমষ্টি) এবং বহুকোশী গ্রন্থি - বহুকোশ সমন্বিত কোশগুচ্ছ দ্বারা গঠিত গ্রন্থি। গ্রন্থিগুলোকে এদের ক্ষরণ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে আবার দুইটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়, যথা বহিঃক্ষরা এবং অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি। বহি:ক্ষরা গ্রন্থি মিউকাস, লালারস, কর্ণমল, তৈল পদার্থ, দুগ্ধ, পাচক উৎসেচকসমূহ এবং অন্যান্য কোশীয় পদার্থ ক্ষরণ করে। এই পদার্থগুলো নালিকা বা নালির মাধ্যমে বেরিয়ে আসে। বিপরীতভাবে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলো নালিকাবিহীন হয় এবং গ্রন্থিসমূহ থেকে ক্ষরিত পদার্থ হল — হরমোন। এই হরমোনগুলো সরাসরি গ্রন্থি সংলগ্ন তরলে ক্ষরিত হয়।

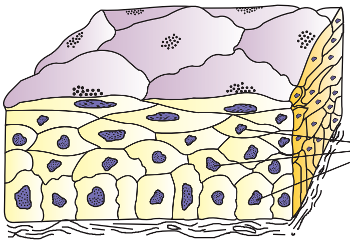

চিত্র 7.3 ঃ যৌগিক আবরণী কলা

যৌগিক আবরণী কলা একাধিক কোশস্তর (বহুস্তরীয়) নিয়ে গঠিত। তাই ক্ষরণে এবং শোষণে এদের ভূমিকা সীমিত (চিত্র 7.3 দেখো)। রাসায়নিক ও যান্ত্রিক আঘাত থেকে সুরক্ষা প্রদান করাই এই কলার প্রধান কাজ। এরা ত্বকের শুষ্ক আবরণ, মুখগহ্বরের আর্দ্র আবরণ, গলবিল এবং লালাগ্রন্থি ও অগ্ন্যাশয় নালিকার অভ্যন্তরীণ আবরণীকে আবৃত করে রাখে। আবরণীকলায় সবকোশ একত্রে অবস্থান করে এবং এতে খুব সামান্য পরিমাণ আন্তঃকোশীয় পদার্থ থাকে। প্রায় সব প্রাণীকলায় বিশেষ ধরনের সংযোগ স্থানগুলো এর প্রতিটি একক কোশের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে সাহায্য করে। আবরণী কলা এবং অন্যান্য প্রাণীকলায় তিন ধরনের কোশীয় সংযোগ (Cell Junction) দেখা যায়। এগুলো হল টাইট জাংশান (Tight Junction), অ্যাডহিয়ারিং জাংশান (Adhering Junction) এবং গ্যাপ জাংশান (Gap Junction), টাইট জাংশানগুলো একটি কলার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বস্তুর চুঁইয়ে পড়া রোধ করতে সাহায্য করে। অ্যাডহিয়ারিং জাংশান পারিপার্শ্বিক কোশ সমূহকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত রাখে। গ্যাপ জাংশন পার্শ্ববর্তী কোশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষায়, আয়ন সমূহ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু এবং বৃহদাকার অণুগুলোর দ্রুত স্থানান্তরণে সাহায্য করে।

7.1.2 যোগ কলা

জটিল দেহগঠন বিশিষ্ট প্রাণীদেহে সবচেয়ে বেশি এবং ব্যাপকভাবে বিস্তৃত কলা হল যোগকলা। এদের যোগকলা বলা হয় কারণ এদের প্রধান কাজ হল দেহের অন্যান্য কলা / অঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে সাহায্য করা। এরা কোমল যোগকলা থেকে শুরু করে বিশেষিত ধরনের যোগকলা পর্যন্ত হতে পারে, যেমন তরুণাস্থি, অস্থি, মেদ কলা এবং রক্ত। রক্ত ছাড়া সব যোগকলায় কোশগুলো

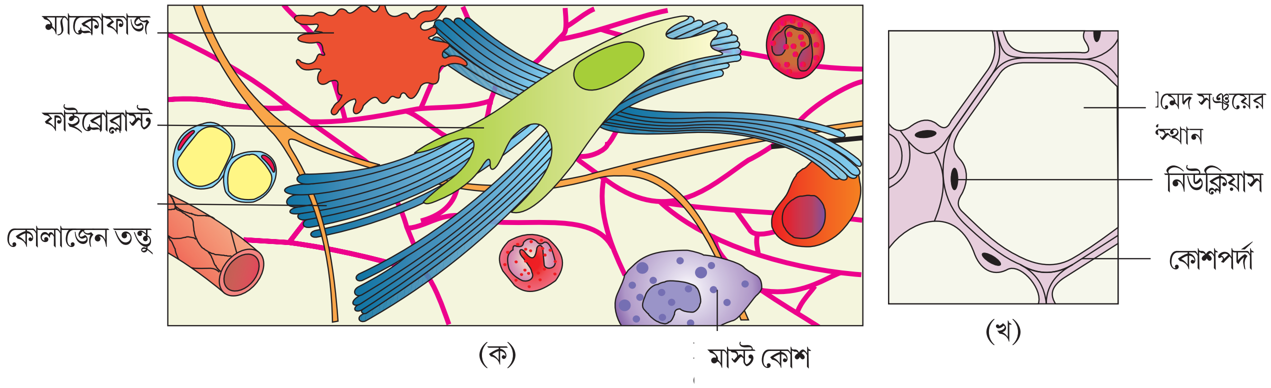

চিত্র 7.4 শিথিল যোগ কলা : (ক) অ্যারিওলার কলা (খ) মেদ কলা।

গাঠনিক প্রোটিনের তন্তুসমূহ ক্ষরণ করে, এদের কোলাজেন বা ইলাসটিন বলে। এই তন্তুগুলি কলাকে দৃঢ়তা, স্থিতিস্থাপকতা এবং নমনীয়তা প্রদান করে। এই কোশগুলো পরিবর্তিত পলিস্যাকারাইডও ক্ষরণ করে যা কোশ এবং তন্তুর মধ্যে জমা হয় এবং ধাত্র (ভিত্তি বস্তু) হিসাবে কাজ করে।

যোগকলা তিন প্রকার : (1) শিথিল যোগকলা (2) ঘন যোগকলা (3) বিশেষিত যোগকলা। শিথিল যোগকলায় কোশ ও তন্তুসমূহ অর্ধ তরল ভিত্তিবস্তুতে শিথিলভাবে বিন্যস্ত থাকে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ত্বকের নীচে অবস্থিত অ্যারিওলার কলা (চিত্র 7.4 দেখো)। প্রায়শই এটি আবরণী কলার সহায়ক কাঠামো হিসাবে কাজ করে। এতে ফাইব্রোব্লাস্ট (তন্তু উৎপাদন ও ক্ষরণকারী কোশসমূহ), ম্যাক্রোফাজ এবং মাস্ট কোশে থাকে। মেদকলা আরেক প্রকার শিথিল যোগকলা, যা প্রধানত ত্বকের নীচে থাকে। এই কলার কোশগুলো মেদ সঞ্চয় করার জন্য বিশেষিত হয়। তৎক্ষণাৎ ব্যবহৃত হয় না এমন অতিরিক্ত পুষ্টি দ্রব্যগুলো ফ্যাটে রূপান্তরিত হয় এবং এই কলায় সঞ্চিত থাকে। ঘন যোগকলায় তন্তুসমূহ এবং ফাইব্রোব্লাস্ট কোশগুলো ঘনসন্নিবিষ্ট থাকে। এই কলার তন্তুগুলো নিয়মিত এবং অনিয়মিত রীতিতে সজ্জিত থাকে এবং এদের যথাক্রমে ঘন নিয়মিত ও ঘন অনিয়মিত যোগ কলা বলা হয়।

ঘন নিয়মিত যোগকলায় কোলাজেন তন্তুগুলো বহু সমান্তরাল তন্তুগুচ্ছের মাঝে সারিবদ্ধভাবে থাকে। কঙ্কাল পেশি ও অস্থির মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী কন্ডরা (Tendon) এবং অস্থির সঙ্গে অস্থির সংযোগকারী অস্থিবন্ধনী (Ligament) এই কলার উদাহরণ। ঘন অনিয়মিত যোগ কলায় ফাইব্রোব্লাস্ট এবং বহুতন্তু সমূহ (প্রধানত কোলাজেন) অন্যরকমভাবে সজ্জিত থাকে। (চিত্র 7.5)। ত্বকে এই কলা বর্তমান। তরুণাস্থি, অস্থি এবং রক্ত হল বিভিন্ন প্রকারের বিশেষিত যোগ কলা।

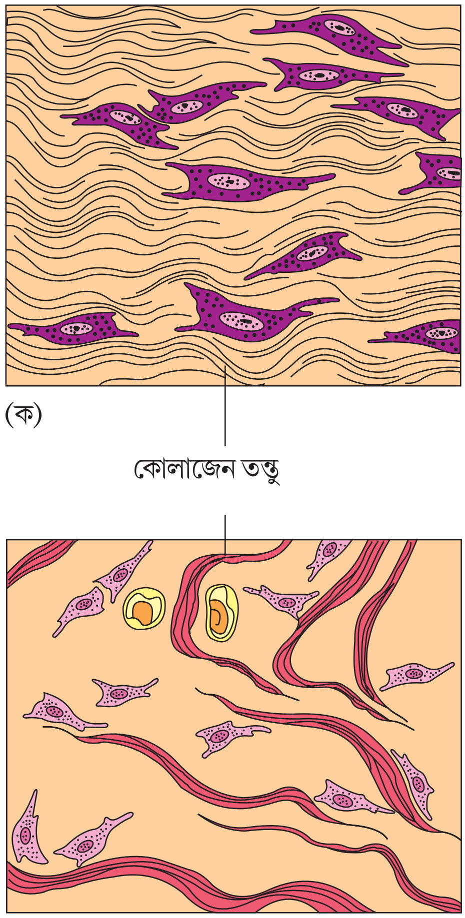

চিত্র 7.5 ঃ ঘন যোগকলা
(ক) ঘন নিয়মিত
(খ) ঘন অনিয়মিত

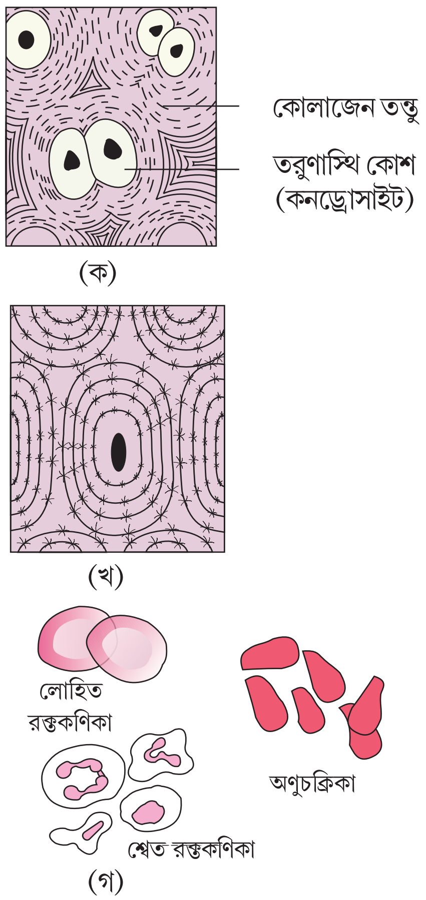

চিত্র 7.6 ঃ বিশেষিত যোগকলা
ক) তরুণাস্থি
খ) অস্থি
গ) রক্ত

তরুণাস্থির আন্ত:কোশীয় পদার্থ নিরেট, নমনীয় এবং চাপরোধে সক্ষম। এই কলার কোশগুলো (Chondrocytes) তাদের দ্বারা ক্ষরিত ধাত্রে উপস্থিত ক্ষুদ্র গহ্বরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে (চিত্র 7.6 ক দেখো)। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণে অধিকাংশ তরুণাস্থি সমূহ পরিণত প্রাণীতে অস্থি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। নাকের অগ্রভাগে, বহি:কর্ণের সন্ধিতে, মেরুদণ্ড সংলগ্ন কশেরুকাগুলোর মধ্যে এবং পরিণত প্রাণীর উপাঙ্গসমূহ ও হাতে তরুণাস্থি বর্তমান থাকে।

অস্থিগুলো শক্ত, অনমনীয় এবং ক্যালশিয়াম গঠিত লবণ ও কোলাজেন তন্তুসমৃদ্ধ ভিত্তিবস্তু সমন্বিত হয় যা অস্থিকে দৃঢ়তা প্রদান করে (চিত্র 7.6 খ দেখো)। প্রধানত এই কলাই দেহ-কাঠামো গঠন করে। অস্থি দেহের কোমলতর কলা ও অঙ্গ সমূহের ভার বহন করে এবং সুরক্ষা প্রদান করে। অস্থিকোশ সমূহ (Osteocytes) যে ফাঁকা স্থানে বর্তমান থাকে তাকে ল্যাকুনা বলে। পায়ের দীর্ঘ অস্থির মতো উপাঙ্গ-অস্থিগুলো ভার বহনের কাজে নিযুক্ত। চলনের জন্য এরা এদের সাথে যুক্ত অস্থি পেশির সাথেও পারস্পরিক ক্রিয়া করে। কিছু অস্থির অস্থিমজ্জা রক্ত কণিকার উৎপত্তি স্থল হিসাবে কাজ করে।

রক্ত হল রক্তরস, লোহিত রক্ত কণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা ও অনুচক্রিকার সমন্বয়ে গঠিত একটি তরল যোগ কলা (চিত্র 7.6 গ দেখো)। এটি প্রধান সংবহনকারী তরল যা বিভিন্ন বস্তুর পরিবহণে সাহায্য করে। তোমরা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে রক্ত সম্পর্কে আরও জানতে পারবে।

7.1.3 পেশিকলা :

প্রতিটি পেশি বহু সংখ্যক দীর্ঘ বেলনাকার সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত তন্তু দ্বারা গঠিত। এই তন্তুগুলো আবার অনেকগুলো সূক্ষ্ম তন্তুর সমন্বয়ে গঠিত, এদের বলে মায়োফাইব্রিল। উদ্দীপকের প্রভাবে পেশিতন্তুর সংকোচন ঘটে (দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়), এরপর পেশি শিথিল হয় (দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়) ও সমন্বয়ী ছন্দে (Coordinated fashion) এরা সংকোচনের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে আসে। পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য এবং দেহের বিভিন্ন অংশের সঠিক অবস্থান বজায় রাখার জন্য পেশি সংকুচিত ও শিথিল হয়ে দেহের চলন ঘটায়। সাধারণভাবে সব ধরনের চলনের জন্য পেশি একটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। পেশি তিন প্রকারের — অস্থি পেশি, মসৃণ পেশি ও হৃদপেশি।

অস্থিপেশি অস্থি কঙ্কালের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থাকে। একটি আদর্শ পেশি, যেমন-বাইসেপস্ সরেখ অস্থিপেশিতে পেশিগুলো একত্রে গুচ্ছবদ্ধ হয়ে সমান্তরালভাবে সজ্জিত থাকে (চিত্র 7.7 ক দেখো)। এমন অনেকগুলো পেশিতন্তু গুচ্ছ একটি অনমনীয় যোজককলার আচ্ছাদন দ্বারা আবৃত থাকে। (20তম অধ্যায়ে তোমরা এই সম্পর্কে আরও জানতে পারবে)।

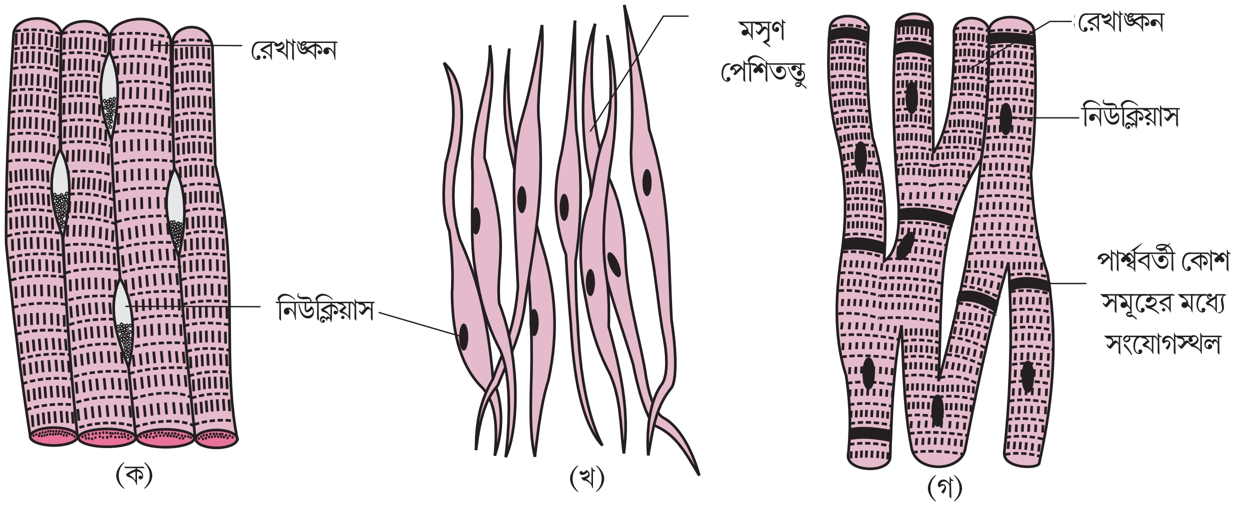

চিত্র 7.7 ঃ পেশিকলা ঃ (ক) অস্থি (সরেখ) পেশি কলা (খ) সমৃণ পেশিকলা (গ) হৃদপেশি কলা।

মসৃণ পেশিতন্তুগুলো উভয় প্রান্তে সূঁচালো হয় এবং তাতে কোনোরকম রেখাঙ্কন দেখা যায় না (চিত্র 7.7 খ দেখো)। কোশীয় সংযোগগুলো এই তন্তুগুলোকে একত্রিত অবস্থায় ধরে রাখে এবং এগুলো গুচ্ছ বন্ধ হয়ে যোজক কলার আচ্ছাদনে অবস্থান করে। রক্তবাহ, পাকস্থলী ও অন্ত্রের মতো অভ্যন্তরীণ অঙ্গাসমূহের প্রাকারে এই ধরনের পেশি কলা বর্তমান। মসৃণ পেশি অনৈচ্ছিক অর্থাৎ এদের কার্য প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। অস্থিপেশির সংকোচন যেমন আমাদের ইচ্ছাধীন সেইরূপ মসৃণ পেশির সংকোচন আমাদের ইচ্ছাধীন নয়।

হৃদপেশি কলা হল এক ধরনের সংকোচনশীল কলা যা কেবলমাত্র হৃৎপিণ্ডে বর্তমান। কোশীয় সংযোগগুলো হৃৎপেশি কোশের কোশপর্দাগুলোকে মিলিয়ে দেয় এবং তন্তুগুলোকে একসাথে যুক্ত রাখে (চিত্র 7.7 গ দেখো)। যোগাযোগ রক্ষাকারী সংযোগস্থলগুলো (ইন্টারকেলাটেড ডিস্ক) কিছু কিছু সংযোগস্থলে হৃৎপেশিকে এককভাবে সংকুচিত হতে সাহায্য করে। অর্থাৎ যখন একটি কোশ সংকুচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংকেত পায় তখন এর পার্শ্ববর্তী কোশগুলোও সংকোচনের জন্য উদ্দীপিত হয়।

7.1.4 স্নায়ুকলা :

পরিবর্তনশীল অবস্থায় দেহের সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে স্নায়ুকলা সবচেয়ে বড়ো নিয়ন্ত্রক রূপে কাজ করে। স্নায়ুতন্ত্রের একক নিউরোন বা স্নায়ুকোশগুলো একধরনের উত্তেজনক্ষম কোশ। স্নায়ুতন্ত্রের বাকি অংশ গঠনকারী নিউরোগ্লিয়া কোশ, নিউরোণগুলোকে সুরক্ষা ও সহায়তা প্রদান করে। আমাদের দেহের স্নায়ুকলার মোট আয়তনের অর্ধেকের বেশি অংশই নিউরোগ্লিয়া দখল করে থাকে চিত্র 7.8।

যখন একটি নিউরোণ যথাযথভাবে উদ্দীপিত হয় তখন একটি তড়িৎ বিশৃঙ্খলা বা বিসমবর্তনের সৃষ্টি হয় যা দ্রুত এর কোশপর্দা বরাবর পরিবাহিত হয়।

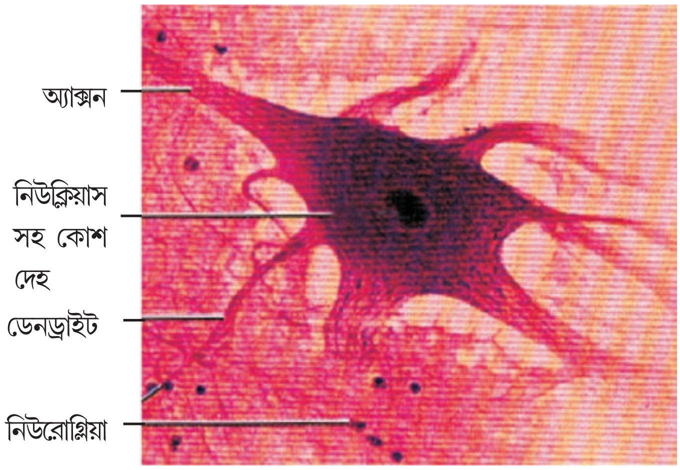

চিত্র 7.8 ঃ স্নায়ুকলা (নিউরোগ্লিয়া সহ নিউরোণ)

এই তড়িৎ বিশৃঙ্খলা বা বিসমবর্তন নিউরোণের শেষপ্রান্ত বা আউটপুট জোনে পৌঁছলে সেই ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করে যা সংলগ্ন নিউরোণ বা অন্যান্য কোশগুলোকে উদ্দীপিত বা অবদমিত করতে পারে (21 তম অধ্যায়ে তোমরা বিশদভাবে জানতে পারবে)।

7.2 অঙ্গ এবং অঙ্গতন্ত্র

উপরোক্ত মৌলিক কলাসমূহ সংঘবদ্ধ হয়ে অঙ্গ গঠন করে। বহুকোশী জীবে এরাই সম্মিলিত হয়ে অঙ্গতন্ত্র গঠন করে। জীবদেহে গঠনকারী লক্ষ লক্ষ কোশের আরও কার্যকরী এবং আরও উন্নত সমন্বায়িত কার্যাবলির জন্য এই ধরনের সংগঠন প্রয়োজন। আমাদের দেহের প্রতিটি অঙ্গ এক বা একাধিক কলা নিয়ে গঠিত। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় আমাদের হৃৎপিণ্ড চার প্রকার কলা নিয়ে গঠিত যথা আবরণী কলা, যোগ কলা, পেশি কলা ও স্নায়ুকলা। সযত্ন অধ্যয়নের পর আমরা এটাও লক্ষ করি যে অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্রগুলোর জটিলতার আপাত নির্দিষ্ট প্রবণতা দেখা যায়। এই আপাত নির্দিষ্ট প্রবণতাকে বিবর্তনজনিত প্রবণতা বলে (তোমরা দ্বাদশ শ্রেণিতে এটি বিশদভাবে পড়বে) অভিব্যক্তির তিনটি বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত জীবের সংগঠন ও কার্যকারীতা দেখানোর জন্য এদের অঙ্গসংস্থান ও শারীরস্থান সম্পর্কে তোমাদের পরিচিতি ঘটানো হচ্ছে। জীবের দৃশ্যমান বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বা গঠন সম্পর্কিত অধ্যয়নই হল অঙ্গ সংস্থান। উদ্ভিদ ও অনুজীবদের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে অঙ্গসংস্থান পরিভাষাটি শুধুমাত্র এটিকেই অর্থাৎ দৃশ্যমান বাহ্যিক গঠনকেই বোঝায়। প্রাণীদের ক্ষেত্রে এটি অঙ্গসমূহের বা দেহাংশের দৃশ্যমান বাহ্যিক রূপটিকে বোঝায়। সচরাচর প্রাণীদেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহের অধ্যয়নের জন্যও অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবে কেঁচো আরশোলা এবং ব্যাঙের অঙ্গ সংস্থান ও শারীরস্থান বিষয়ে তোমরা এখানে জানবে।

7.3 কেঁচো (Earth Worm)

কেঁচো ধূসর লাল বর্ণের একটি অমেরুদণ্ডী প্রাণী যা ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে মাটির উপরিস্তরে বসবাস করে। কেঁচো মাটি খুঁড়ে এবং মাটি গলাধ:করণ করে মাটিতে গর্ত সৃষ্টি করে। দিনের বেলায় এরা এই গর্তগুলোতেই বসবাস করে। এদের স্তূপীকৃত (Worm Casting) বিষ্ঠা দেখেই বাগানে কেঁচোর উপস্থিতি বোঝা যায়। ফেরিটিমা (*Pheretima*) এবং লুম্ব্রিকাস (*Lumbricus*) হল কেঁচোর সাধারণ ভারতীয় প্রজাতি।

7.3.1 বহিরাকৃতি (Morphology)

কেঁচোর দেহ লম্বা, নলাকার হয়। এদের দেহ শতাধিক ক্ষুদ্র, সদৃশ খণ্ডকে বিভক্ত (মেটামিয়ার বা খণ্ডক, যার সংখ্যা 100-120টি)। দেহের অনুদৈর্ঘ্য অক্ষবরাবর পৃষ্ঠতলটি একটি গাঢ় মধ্যপৃষ্ঠীয় রেখা (পৃষ্ঠীয় রক্তবাহ) দ্বারা চিহ্নিত থাকে। দেহের অঙ্কীয় তলে জননছিদ্রের উপস্থিতি এই তলকে পৃষ্ঠীয় তল থেকে পৃথক করে চিনতে সাহায্য করে। লাঙ্গালের ফলার মতো একটি মাংসল খণ্ডক যা এদের মুখছিদ্রকে ঢেকে রাখে তাকে প্রোস্টোমিয়াম বলে। এর সাহায্যে বল প্রয়োগের মাধ্যমে মাটির ফাটলগুলোতে এমন গর্ত তৈরি করে, যার মধ্য দিয়ে এরা চলাচল করতে পারে। প্রোস্টোমিয়াম সংজ্ঞাবহ অঙ্গরূপে কাজ করে। কেঁচোর দেহের প্রথম খণ্ডকটি হল প্রোস্টোমিয়াম, যা মুখছিদ্র সম্বলিত হয়।

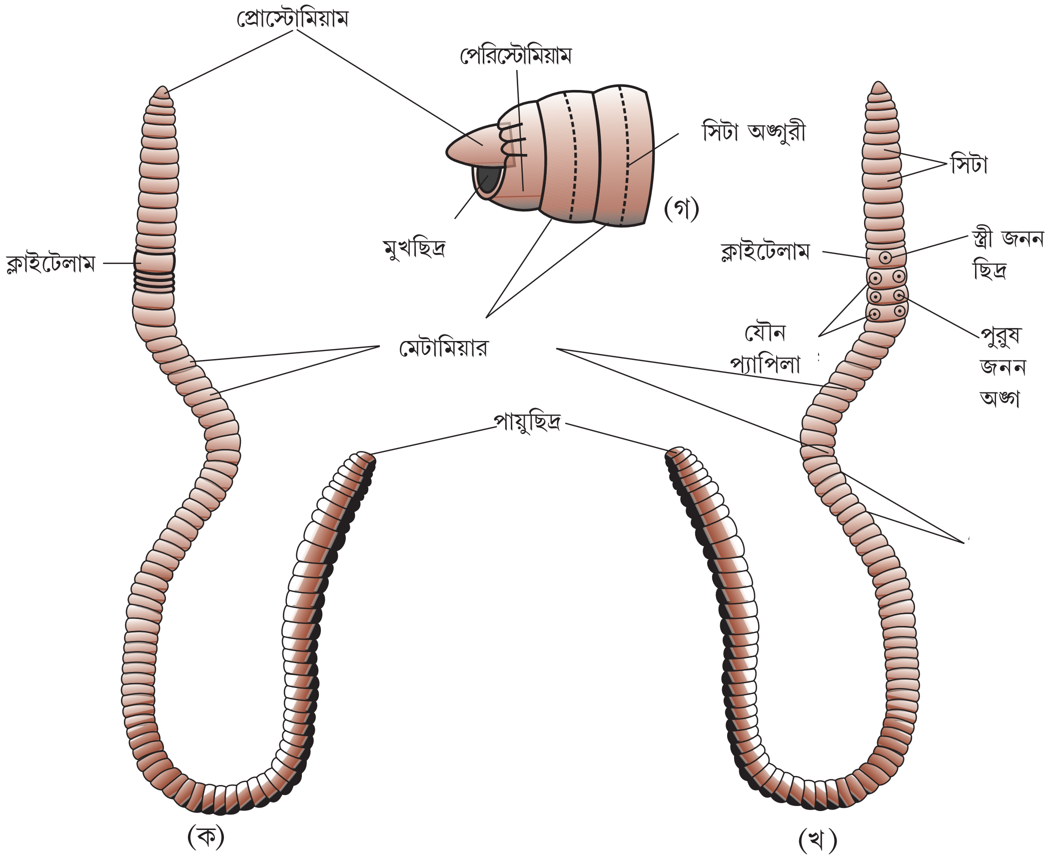

চিত্র 7.9 : কেঁচোর দেহ : (ক) পৃষ্ঠীয় দৃশ্য (খ) অঙ্কীয় দৃশ্য (গ) মুখছিদ্রের পার্শ্বীয় দৃশ্য।

একটি পরিণত কেঁচোর দেহের 14-16 তম খণ্ডকগুলো গ্রন্থিময় কলার একটি সুস্পষ্ট গাঢ় পট্টি দ্বারা আবৃত থাকে, তাকে ক্লাইটেলাম বলে। তাই কেঁচোর দেহ তিনটি সুস্পষ্ট অঞ্চলে বিভেদিত থাকে — প্রিক্লাইটেলার খণ্ড, ক্লাইটেলার খণ্ড এবং পোস্ট ক্লাইটেলার খণ্ড (চিত্র 7.9 দেখো)।

আন্তঃখণ্ডক খাঁজের (5ম - 9ম খণ্ডকের) অঙ্কীয় পার্শ্বদেশে চারজোড়া স্পার্মাথিকা ছিদ্র বর্তমান। চতুর্দশ দেহ খণ্ডকের মধ্যঅঙ্কীয় রেখায় একটি একক স্ত্রীজনন ছিদ্র উপস্থিত। অষ্টাদশ খণ্ডকের অঙ্কীয় পার্শ্বদেশে একজোড়া পুং জনন ছিদ্র বর্তমান। প্রচুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ছিদ্র বা নেফ্রিডিওপোর দেহতলে উন্মুক্ত হয়। প্রথম খণ্ডক এবং ক্লাইটেলাম অঞ্চল ব্যতীত দেহের অন্য প্রতিটি দেহখণ্ডকে কতগুলো 'S' আকৃতি বিশিষ্ট সিটার সারি দেখা যায়, যেগুলো প্রতিটি খণ্ডকের সাথে বহিঃত্বকীয় কূপে প্রোথিত থাকে। সিটা প্রসারিত বা প্রত্যাহৃত হতে পারে। এদের মুখ্য কাজ হল গমনে সহায়তা করা।

7.3.2 শারীরস্থান (Anatomy)

কেঁচোর দেহের দেহ আবরকের বাইরের দিক একটি পাতলা অকোশীয় আবরণী দ্বারা ঢাকা থাকে যার তলদেশে এপিডারমিস বিদ্যমান। এপিডারমিসের তলদেশে দুইটি পেশিস্তর (চক্রাকার এবং উল্লম্ব) থাকে এবং ভেতরের দিকে থাকে সিলোমিক এপিথিলিয়াম। এপিডারমিস একস্তর বিশিষ্ট স্তম্ভাকার এপিথিলিয়াম কোশস্তর দ্বারা গঠিত এবং এর মধ্যে ক্ষরণগ্রন্থি বিদ্যমান।

কেঁচোর পৌষ্টিক নালি একটি সোজা নলবিশেষ। এটি দেহের প্রথম খণ্ডক থেকে শেষ খণ্ডক পর্যন্ত বিস্তৃত (চিত্র 7.10)।

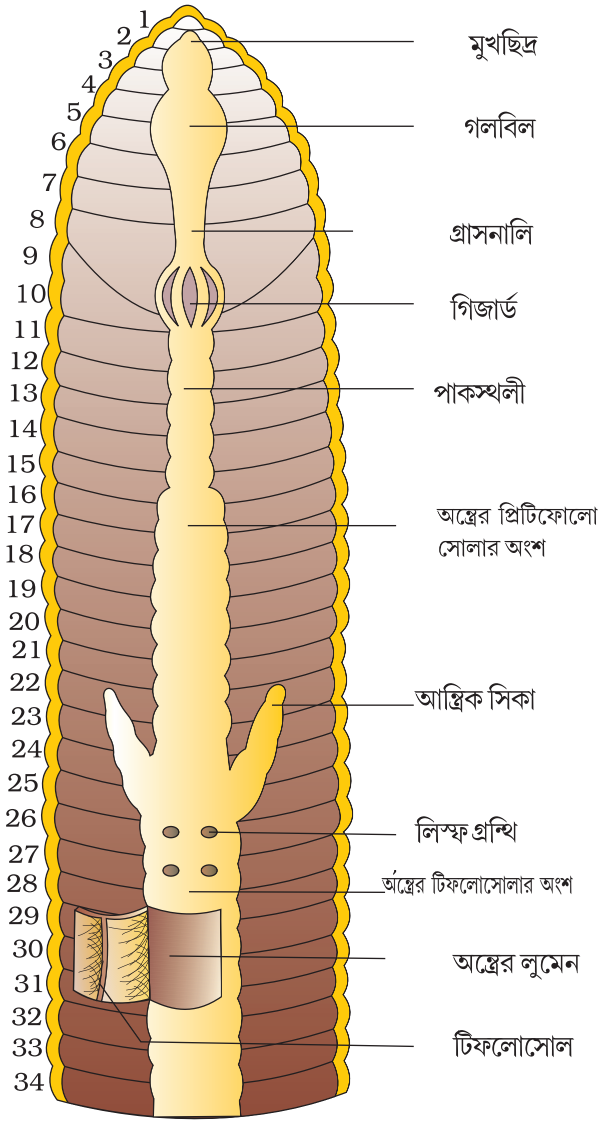

চিত্র : 7.10 ঃ কেঁচোর পৌষ্টিক নালি

মাটির সাথে মেশানো জৈববস্তু এবং পচাগলা লতাপাতাই কেঁচোর খাদ্যবস্তু। কেঁচোর পাকস্থলীর গাত্র থেকে নিঃসৃত ক্যালসিফেরাস গ্রন্থির ক্ষরণ হিউমাসে উপস্থিত হিউমিক অ্যাসিডকে প্রশমিত করে। অন্ত্র 15তম খণ্ডক থেকে শুরু হয় এবং শেষ খণ্ডক পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। দেহের 26 তম খণ্ডে একজোড়া ছোটো শাঙ্কবাকৃতি আন্ত্রিক সিকা অন্ত্রের গাত্র থেকে বেরিয়ে আসে। কেঁচোর শেষ দেহ খণ্ডকটি ছাড়া 26 তম খণ্ডকের পরবর্তী 23-25টি দেহখণ্ডক জুড়ে থাকা অন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল পৃষ্ঠ প্রাকারের মাঝ বরাবর অভ্যন্তরীণ ভাঁজের উপস্থিতি, এই ভাঁজটিকে টিফলোসোল বলে। এটি অন্ত্রের কার্যকরী শোষণ তল বাড়াতে সাহায্য করে। পৌষ্টিকনালি একটি ক্ষুদ্র গোলাকার পথে দেহের বাইরে উন্মুক্ত থাকে একে পায়ুছিদ্র বলে। কেঁচোর খাদ্যগ্রহণের পর জৈব পদার্থ মিশ্রিত মাটি যখন পৌষ্টিক নালিপথ অতিক্রম করে তখন পাচননালিতে উপস্থিত উৎসেচকগুলো জটিল জৈব বস্তুকে অপেক্ষাকৃত সরল শোষণক্ষম এককে পরিণত করে। এই সরল জৈব অণুগুলো অন্ত্রের পর্দা দ্বারা শোষিত হয় এবং জৈবনিক ক্রিয়াকলাপে ব্যবহৃত হয়।

ফেরিটিমার রক্ত সংবহন তন্ত্র বন্ধ প্রকৃতির। এটি হৃৎপিণ্ড, রক্তবাহ এবং রক্ত জালক নিয়ে গঠিত (চিত্র 7.11)। যেহেতু রক্ত সংবহনতন্ত্র বন্ধ প্রকৃতির তাই রক্ত হৃৎপিণ্ড এবং রক্তবাহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন রক্তকে একইদিকে প্রবাহিত করতে থাকে। ছোটো রক্তবাহগুলো রক্তকে পাকস্থলী, স্নায়ুরজ্জু এবং দেহ প্রাকারে প্রবাহিত করে। দেহের চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ খণ্ডকে রক্ত গ্রন্থি বর্তমান। এই গ্রন্থিগুলো রক্ত কণিকা এবং হিমোগ্লোবিন উৎপন্ন করে, যেগুলো প্লাজমায় বা রক্তরসে দ্রবীভূত থাকে। রক্ত কোশগুলো ফ্যাগোসাইটিক প্রকৃতির হয়। কেঁচোর দেহে কোনো সুনির্দিষ্ট শ্বসন অঙ্গ থাকে না। এদের দেহে গ্যাসীয় আদান প্রদান সাধারণত ভেজা দেহতল এবং রক্তের মাধ্যমে ঘটে। কেঁচোর রেচন অঙ্গ হল কতগুলো কুণ্ডলীকৃত নালিকা, একে নেফ্রিডিয়া (একবচন-নেফ্রিডিয়াম) বলে। এরা নির্দিষ্ট খণ্ডক অনুযায়ী সজ্জিত থাকে।

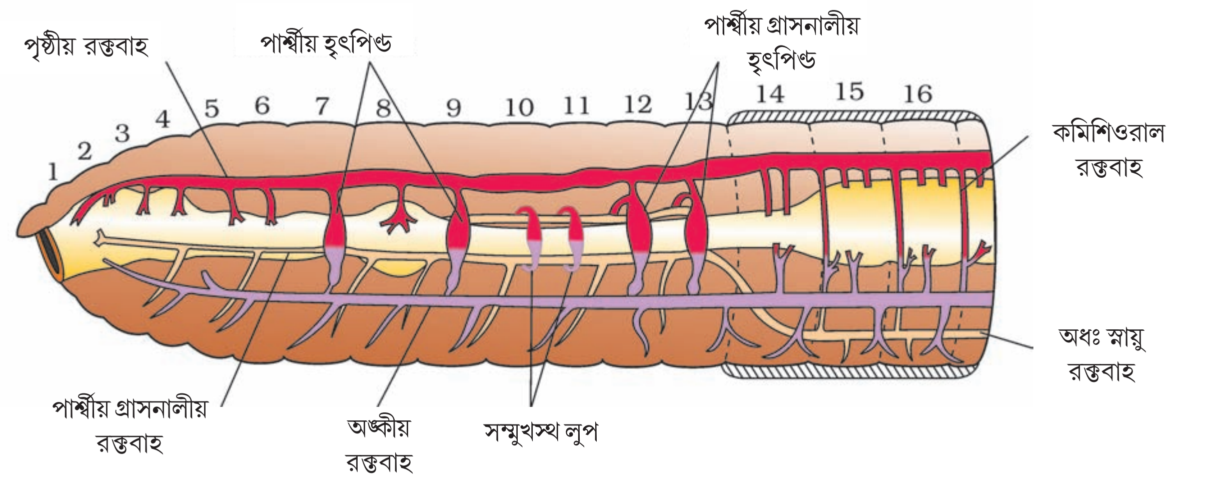

চিত্র 7.11 ঃ বদ্ধ রক্ত সংবহনতন্ত্র

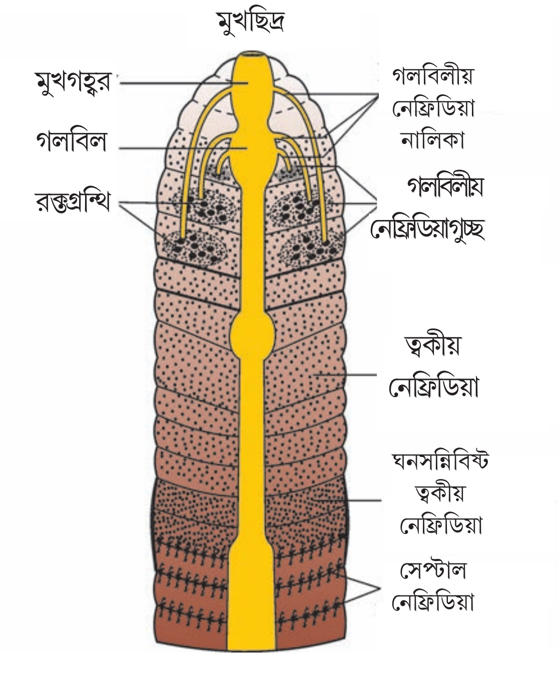

চিত্র 7.12 কেঁচোর নেফ্রিডিয়াতন্ত্র।

নেফ্রিডিয়া তিন ধরনের হয় — (i) সেপ্টাল নেফ্রিডিয়া (Septal Nephredia) ঃ এই নেফ্রিডিয়াগুলো কেঁচোর দেহের 15তম খণ্ডকের পরবর্তী খণ্ডক থেকে শুরু করে দেহের শেষ খণ্ডক পর্যন্ত আন্তঃখণ্ডক ব্যবধায়ক পর্দার উভয় পার্শ্বের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে এবং অন্ত্রে উন্মুক্ত হয়। (ii) ইন্টেগুমেন্টারি নেফ্রিডিয়া (Integumentary Nephiredia): এই প্রকার নেফ্রেডিয়া দেহের তৃতীয় খণ্ডক থেকে শুরু করে বাকি সমস্ত খণ্ডকের দেহপ্রাকারের ভেতরের দিকে যুক্ত থাকে এবং দেহপ্রাচীরে উন্মুক্ত থাকে। **(iii) ফেরিন্‌জিয়েল নেফ্রিডিয়া (Pharyngeal Nephedia)** : এই প্রকার তিনজোড়া নেফ্রিডিয়া চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দেহখণ্ডকে (চিত্র 7, 12) গ্রাসনালির দুই পাশে গুচ্ছাকারে অবস্থান করে। বিভিন্ন ধরনের নেফ্রিডিয়াগুলো সাধারণত গঠনগতভাবে একই প্রকারের। নেফ্রিডিয়াগুলো সাধারণত দেহ তরলে উপস্থিত বিভিন্ন উপাদান এবং এদের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। নেফ্রিডিয়াতে বর্তমান ফানেলাকৃতি অংশ সিলোমিক গহ্বর থেকে অতিরিক্ত তরল সংগ্রহ করে। নেফ্রিডিয়ার ফানেলাকৃতি অংশ একটি নালিকা অংশের সাথে যুক্ত থাকে যেখান থেকে বর্জ্য পদার্থযুক্ত তরল একটি ছিদ্রের মাধ্যমে দেহ প্রাকারের মাধ্যমে পৌষ্টিক নালির গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়।

কেঁচোর স্নায়ুতন্ত্র মূলত দেহের প্রতিটি খণ্ডকে অবস্থিত গ্যাংলিয়া যা অঙ্কীয় যুগ্ম স্নায়ুর উপর সজ্জিত থাকে। দেহের অঙ্কীয় অংশে (তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডক) স্নায়ুরজ্জুটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গলবিলকে পার্শ্বীয়ভাবে পরিবেষ্টন করে এবং পৃষ্ঠদেশে সেরিব্রাল গ্যাংলিয়নের সাথে যুক্ত হয়ে একটি স্নায়ুবলয় (nerve ring) গঠন করে। স্নায়ুবলয়ে উপস্থিত গ্যাংলিয়া এবং অন্যান্য স্নায়ু সম্মিলিতভাবে মস্তিষ্কে আগত সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনা পেশিতে সাড়া জাগানোর নির্দেশ দেয়।

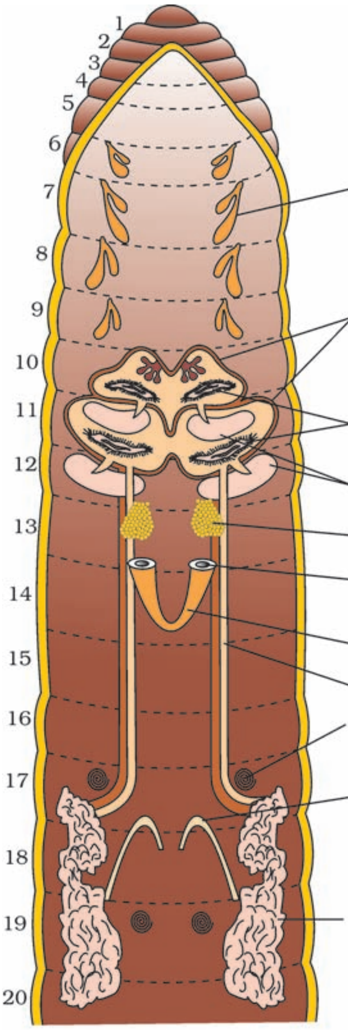

চিত্র 13.7 : কেঁচোর জননতন্ত্র।

কেঁচোর স্নায়ুতন্ত্রে চক্ষু অনুপস্থিত কিন্তু আলো এবং স্পর্শ সংবেদী অঙ্গা (গ্রাহক কোশ) বিদ্যমান যার দ্বারা এরা আলোর তীব্রতা এবং মাটির কম্পন অনুভব করে। এদের মধ্যে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক গ্রাহক বা (Chemoreceptor) স্বাদ গ্রাহক বিদ্যমান যা রাসায়নিক উদ্দীপকের প্রভাবে সাড়া দেয়। এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো দেহের সন্মুখ অংশে অবস্থান করে।

একই কেঁচোর দেহে শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয় উভয়ই উপস্থিত থাকায় এদের উভলিঙ্গা (Hermapholia) বলে (চিত্র 7.13)। এদের দেহের দশম এবং একাদশ খণ্ডকে একজোড়া শুক্রাশয় বিদ্যমান এবং এদের ভাস ডিফারেন্সিয়া দেহের অস্টাদশ খণ্ডক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে প্রোস্টেট গ্রন্থির নালির সাথে যুক্ত হয়। দুইজোড়া সাহায্যকারী গ্রন্থির (accessory glands) এক একটি জোড়া সতের এবং উনিশতম খণ্ডকে অবস্থান করে।

প্রোস্টেট গ্রন্থির নালি এবং স্পার্মাটিক নালি (ভাসডিফারেন্সিয়া) যা সাধারণ নালি হিসাবে কাজ করে এবং একজোড়া পুংজনন ছিদ্রের মাধ্যমে অস্টাদশ খণ্ডকের অঙ্কীয় পার্শ্বীয় তলে দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয়। চারজোড়া স্পার্মাথিকা দেহের ষষ্ঠ থেকে নবম খণ্ডকের, প্রতিটি খণ্ডকে একজোড়া করে অবস্থান করে। স্পার্মাথিকা, সঙ্গামকালে শুক্রাণু গ্রহণ করে এবং সঞ্চিত রাখে। দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ খণ্ডকের আন্ত খণ্ডক ব্যবধায়কের সাথে একজোড়া ডিম্বাশয় যুক্ত থাকে।

প্রতিটি ডিম্বাশয়ের নীচের দিকে ডিম্বচুঙ্গি (Ovarian faunels) বিদ্যমান এবং এরা বর্ধিত হয়ে ডিম্বনালি (Ovidnct) গঠন করে এবং ডিম্বনালি দুটি দেহের মাঝামাঝি স্থানে যুক্ত হয়ে একক নালি হিসেবে স্ত্রী জননছিদ্র মারফত দেহের চতুর্দশ খণ্ডকের অঙ্কীয় তলের বাইরের দিকে উন্মুক্ত হয়।

সঙ্গামকালে দুটি কেঁচোর মধ্যে শুক্রাণুর পারস্পরিক বিনিময় ঘটে। সঙ্গামের সময় দুটি কেঁচো পরস্পরের পাশাপাশি অবস্থান করে বিপরীত জনন ছিদ্র পথে একগুচ্ছ শুক্রাণু আদান প্রদান করে। এই জনন ছিদ্রগুলোকে স্পার্মাটোফোর (Spermatophores) বলে। ক্লাইটেলামস্থিত গ্রন্থিময় কোশগুলো থেকে কোকুন গঠিত হয় যার মধ্যে পরিণত শুক্রাণু, ডিম্বাণু এবং পুষ্টি তরল জমা থাকে। মাটিতে জমে থাকা কোকুনগুলোর মধ্যে নিষেক এবং পরিস্ফুরণ ঘটে। কোকুনের মধ্যে শুক্রাণুকোশগুলো ডিম্বাণুগুলোকে নিষিক্ত করার পর কেঁচোর দেহ থেকে বেরিয়ে এসে মাটিতে বা মাটির অভ্যন্তরে জমা হয়। কোকুনের ভেতর কেঁচোর ভ্রুণ বিদ্যমান। প্রায় তিন সপ্তাহ পর প্রতিটি কোকুন থেকে দুই থেকে কুড়িটি বাচ্চা কেঁচো (গড়পরতা ৪টি করে) নির্গত হয়। এদের দেহের বিকাশ কোন প্রকার লার্ভা দশা ছাড়াই সরাসরি ঘটে।

কেঁচোকে কৃষকের বন্ধু বলা হয় কারণ এরা মাটিতে গর্ত করে মাটিকে আলগা করে যা উদ্ভিদের বর্ধনশীল মূলকে শ্বসনে এবং মাটিতে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। যে পদ্ধতিতে কেঁচো দ্বারা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা হয় তাকে ভার্মিকম্পোস্টিং বলে। ছিপের সাহায্যে মাছ ধরার ক্ষেত্রে কেঁচোকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

7.4 আরশোলা (Cock Roach)

আরশোলা বাদামি বা কালো বর্ণের, আর্থ্রোপোডা পর্বের অন্তর্গত পতঙ্গা শ্রেণির প্রাণী। ক্রান্তীয় অঞ্চলসমূহে উজ্জ্বল হলুদ, লাল ও সবুজ বর্ণের আরশোলার সন্ধানও পাওয়া গেছে। এদের আকার এক ইঞ্চির চার ভাগের একভাগ থেকে শুরু করে তিন ইঞ্চি (0.6 – 7.6 cm) পর্যন্ত হয়। এদের দেহে রয়েছে দীর্ঘ শুঙ্গা, পা এবং দেহের প্রাকারের চ্যাপ্টা প্রসারিত অংশ যা মস্তককে ঢেকে রাখে। এরা নিশাচর, সর্বভুক এবং এরা সারা পৃথিবীতেই স্যাঁত স্যাঁতে স্থানে বাস করে। মানুষের বাড়ি ঘরেও এদের পাওয়া যায়। তাই এরা মারাত্মক পেস্ট এবং বিভিন্ন রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে।

7.4.1 অঙ্গাসংস্থান : Morphology

Periplaneta americana আরশোলার অতি পরিচিত প্রজাতি। ডানাসহ একটি পূর্ণাঙ্গ আরশোলা প্রায় 34-53mm লম্বা হয় এবং পুরুষ আরশোলার ক্ষেত্রে ডানাগুলো উদরের প্রান্ত দেশের পরেও প্রসারিত থাকে। আরশোলার দেহ খণ্ডক বিশিষ্ট এবং মস্তক, বক্ষ এবং উদর এই তিনটি সুস্পষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত থাকে (চিত্র 7.14 দেখো) এর সমগ্র দেহটি একটি শক্ত কাইটিন নির্মিত বহিঃকঙ্কাল (বাদামী বর্ণের) দ্বারা আবৃত থাকে। প্রতিটি খণ্ডকে বহিঃকঙ্কালটি শক্ত প্লেট নির্মিত একে স্ক্লেরাইট (পৃষ্ঠীয় স্ক্লেরাইটকে টারজাইটস এবং অঙ্কীয় স্ক্লেরাইটকে স্টার নাইটস) বলে। স্ক্লেরাইটগুলো একে অপরের সাথে একটি পাতলা নমনীয় আর্টিকুলার পর্দা (অর্থোডিয়াল পর্দা) দ্বারা যুক্ত থাকে।

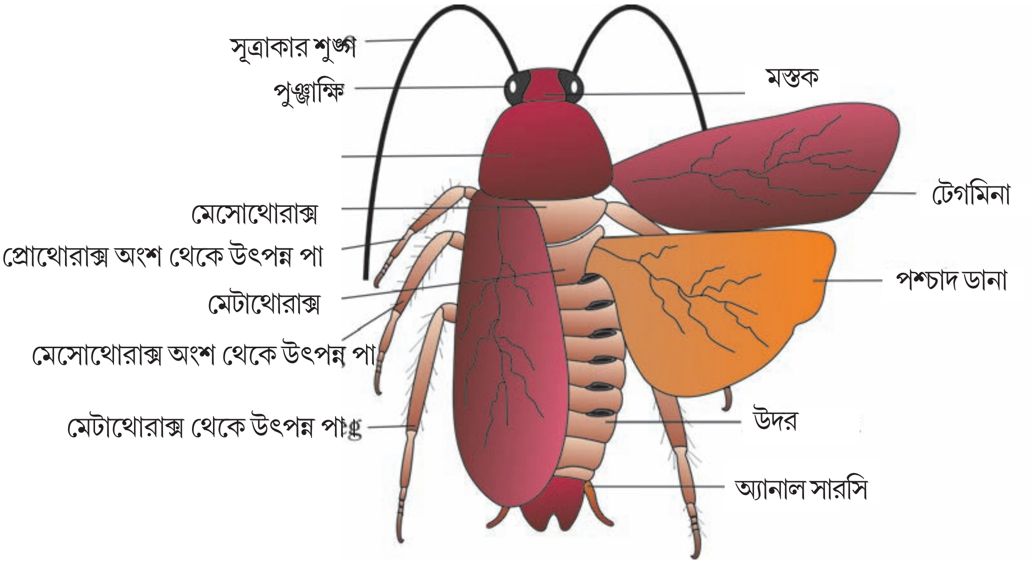

চিত্র 7.14 ঃ আরশোলার বহিরাকৃতির গঠন

মস্তক ত্রিকোণাকৃতির এবং এটি দেহের সম্মুখ ভাগে অনুদৈর্ঘ্য দেহঅক্ষের সাথে সমকোণে থাকে। ছয়টি খণ্ডক একত্রে মিলিত হয়ে মস্তক গঠন করে এবং গ্রীবাটি নমনীয় হওয়ায় এরা মস্তকটিকে সবদিকে সঞ্চালিত করতে পারে। মস্তক অংশে একজোড়া পুঞ্জাক্ষি থাকে। চক্ষুর সম্মুখভাগে অবস্থিত পর্দাবৃত সকেট থেকে একজোড়া সূত্রাকার শুঙ্গ উৎপন্ন হয়। শুঙ্গাগুলোতে বর্তমান সংবেদী গ্রাহক প্রাণীটিকে পরিবেশীয় অবস্থা আঁচ করতে সাহায্য করে। মস্তকের সম্মুখভাগে কিছু উপাঙ্গ থাকে যেগুলো খাদ্যকে আঁকড়ে ধরতে এবং চিবুতে বা চর্বণ করতে সহায়তা প্রদানকারী মুখ উপাঙ্গ গঠন করে। মুখ উপাঙ্গগুলো একটি ল্যাব্রাম (উপরের জন্য), একটি লেবিয়াম (নিম্ন ওষ্ঠ) একজোড়া ম্যান্ডিবলস্ ও একজোড়া ম্যাক্সিলা নিয়ে গঠিত। মুখ উপাঙ্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত গহ্বরের মধ্যে একটি মধ্যবর্তী নমনীয় খণ্ডক থাকে যা হাইপোফ্যারিংক্স হিসাবে কাজ করে (চিত্র 7.15 খ দেখো)। বক্ষদেশ তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত — অগ্রবক্ষ বা প্রোথোরাক্স, মধ্যবক্ষ বা মেসোথোরাক্স এবং পশ্চাদ্‌বক্ষ বা মেটাথোরাক্স। মস্তকটি প্রোথোরাক্সের একটি ক্ষুদ্র প্রলম্বিত অংশের সাহায্যে বক্ষ দেশের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং এই অংশটিকে গ্রীবা বলে। প্রতিটি বক্ষখণ্ডক হাঁটার সহায়ক একজোড়া পা ধারণ করে। প্রথমজোড়া ডানা মধ্যবক্ষ থেকে এবং দ্বিতীয় জোড়াটি পশ্চাৎ বক্ষ থেকে উৎপন্ন হয়। অগ্রডানা বা মেসোথোরাসিক ডানাকে টেগমিনা বলা হয়। এই ডানাজোড়া অস্বচ্ছ চর্মবৎ, কালচে রঙের হয় এবং পশ্চাৎ ডানাজোড়াকে বিশ্রামরত অবস্থায় ঢেকে রাখে। পশ্চাৎ ডানাজোড়া ওড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় আরশোলারই উদর অংশ দশটি খণ্ডক বিশিষ্ট হয়। স্ত্রী আরশোলার সপ্তম স্টারনামটি নৌকাকৃতি হয় এবং এটি অষ্টম ও নবম স্টারনামটির সাথে একসাথে জননথলি বা ব্রুড পাউচ গঠন করে। এর সম্মুখ অংশ স্ত্রী জননছিদ্র, স্পার্মাথিকাল ছিদ্র ও কোল্যাটারেল গ্রন্থি থাকে। পুরুষ আরশোলাতে জনন প্রকোষ্ঠ বা থলি উদরের পশ্চাৎ অংশে থাকে, পৃষ্ঠীয় দিকে নবম ও দশম টার্গা দ্বারা এবং অঙ্কীয় দিকে নবম স্টারনাম দ্বারা আবৃত থাকে। এর পৃষ্ঠীয় দিকে পায়ু, অঙ্কীয়দিকে পুংজননছিদ্র এবং গোনাপো ফাইসিস থাকে। পুরুষ আরশোলাতে একজোড়া ক্ষুদ্র সূত্রাকার অ্যানাল স্টাইল থাকে যা স্ত্রী আরশোলাতে অনুপস্থিত। পুরুষ ও স্ত্রী আরশোলার দশম খণ্ডকে একজোড়া সন্ধিল তন্তুর মতো গঠন থাকে, এদের অ্যানাল সারসি (Anal Cerci) বলা হয়।

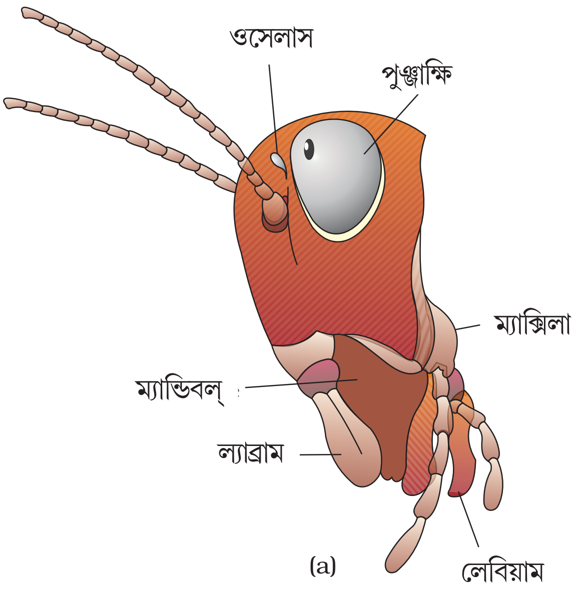

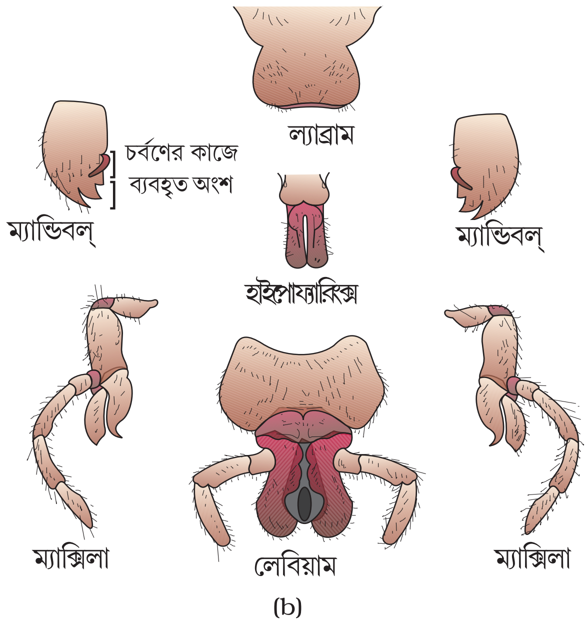

চিত্র 7.15 ঃ আরশোলার মস্তক : (ক) মস্তকের বিভিন্ন অংশ (খ) মুখ উপাঙ্গ

7.4.2 শারীর স্থান

দেহগহ্বরস্থিত পৌষ্টিকনালিটি তিনটি অংশে বিভক্ত অগ্রপৌষ্টিক নালি, মধ্যপৌষ্টিক নালি এবং পশ্চাৎ পৌষ্টিক নালি (চিত্র 7.16 দেখো)। মুখছিদ্রটি ক্ষুদ্র নলাকার গলবিলে মুক্ত হয়। এটি পরবর্তীতে একটি থলের মত অংশে উন্মুক্ত হয়। ক্রপ খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। ক্রপের পরবর্তী অংশ হল গিজার্ড অথবা প্রোডেন্টিকুলাস। গিজার্ডের বহিঃস্তরে স্থূল বৃত্তাকার পেশি থাকে এবং পুরু অভ্যন্তরীণ কিউটিকল 6টি কাইটিন নির্মিত প্লেট গঠন করে, এদের দাঁত বলা হয়। গিজার্ড খাদ্যবস্তু চূর্ণ করতে সাহায্য করে। সম্পূর্ণ অগ্রপৌষ্টিক নালিটি কিউটিকল দ্বারা আবৃত থাকে। অগ্রপৌষ্টিকনালি ও মধ্যপৌষ্টিক নালির সংযোগস্থলে 6–8টি বদ্ধনালিকা সমন্বিত একটি বলয় থাকে, একে হেপাটিক বা গ্যাস্ট্রিক সিকা বলে যা এই নালিগুলোতে পাচকরস নিঃসরণ করে। আবার মধ্যপৌষ্টিকনালি ও পশ্চাৎপৌষ্টিকনালির সংযোগস্থলে 100 – 150 টি হলুদ বর্ণের সরু চুলের মতো ম্যালপিজিয়ান নালিকা সমন্বিত আরও একটি বলয় থাকে। এটি হিমোলিম্ফ থেকে রেচন পদার্থ অপসারণে সহায়তা করে। পশ্চাৎ পৌষ্টিকনালিটি মধ্য পৌষ্টিকনালি অপেক্ষা প্রশস্ত হয় এবং এটি ইলিয়াম কোলন ও রেকটামে বিভেদিত থাকে। মলাশয় পায়ুছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয়।

আরশোলার রক্ত সংবহনতন্ত্র মুক্ত প্রকৃতির হয় (চিত্র 7.17 দেখো)। রক্তবাহগুলো সুগঠিত হয় এবং ফাঁকাস্থানে উন্মুক্ত (হিমোসিল) হয়। হিমোসিলে অবস্থিত আন্তরযন্ত্রগুলো রক্তে (হিমোলিম্ফ) নিমজ্জিত থাকে। হিমোলিম্ফ বর্ণহীন প্লাজমা এবং হিমোসাইটের সমন্বয়ে গঠিত। আরশোলার হৃৎপিণ্ড লম্বাটে পেশিবহুল নালিকার দ্বারা গঠিত এবং এটি বক্ষ ও উদরের মধ্যপৃষ্ঠীয় রেখা বরাবর অবস্থান করে। হৃৎপিণ্ডটি উভয়পার্শ্বে অসটিয়া সমন্বিত ফানেল আকৃতির প্রকোষ্ঠে বিভেদিত থাকে। রক্ত সাইনাস থেকে অসটিয়ার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে এবং হৃৎপিণ্ড থেকে উৎক্ষিপ্ত রক্ত সম্মুখ অভিমুখে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় সাইনাসে ফিরে আসে।

আরশোলার শ্বসনতন্ত্রটি, শাখা প্রশাখাযুক্ত শ্বাসনালির এমন একটি সংগঠন যা দেহের পার্শ্বদেশে উপস্থিত 10 জোড়া ছোটো ছোটো শ্বাসছিদ্র (Spiracle) পাতলা শাখান্বিত নালির মাধ্যমে উন্মুক্ত থাকে।

দেহের সব অংশে (শ্বাসনালি পুনরায় শ্বাসনালিকা অর্থাৎ ট্রাকিওলে বিভক্ত হয়) বায়ু থেকে গৃহীত অক্সিজেন পরিবহণ করে ও শ্বাসছিদ্র বা স্পাইরাকেলে উন্মুক্ত থাকা স্ফিংটার পেশি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

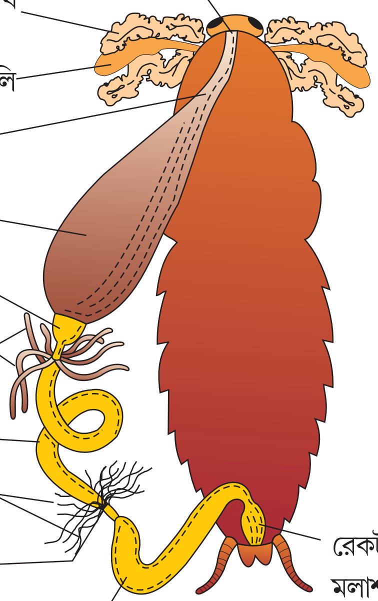

চিত্র 7.16 : আরশোলার পৌষ্টিক তন্ত্র

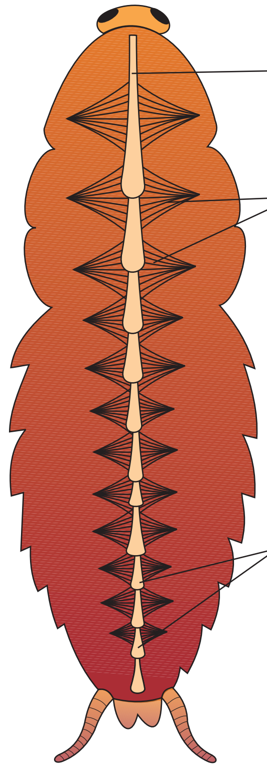

চিত্র 7.17 : আরশোলার মুক্ত সংবহন তন্ত্র

গ্যাসীয় আদান প্রদান ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে ট্রাকিওলে সংগঠিত হয়।

এরা ম্যালপিজিয়ান নালিকার মাধ্যমে রেচন করে। প্রতিটি ম্যালপিজিয়ান নালিকা গ্রন্থিময় এবং অভ্যন্তর সিলিয়া যুক্ত কোশ দ্বারা পরিবৃত থাকে। এই নালিকাগুলো নাইট্রোজেন গঠিত বর্জ্য পদার্থ শোষণ করার পর এদের ইউরিক অ্যাসিডে পরিণত করে যা পৌষ্টিকনালির পশ্চাৎ অংশের মাধ্যমে রেচিত হয়। তাই এই পতঙ্গাটিকে ইউরিকোটেলিক বলা হয়। এছাড়াও ফ্যাট বডি, নেফ্রোসাইট এবং ইউরিকোজ গ্রন্থিও রেচনে সহায়তা করে।

দেহের অঙ্কীয় দেশে উপস্থিত যুগ্ম অনুদৈর্ঘ্য যোজক দ্বারা যুক্ত একটি ক্রমে খণ্ডকের আকারে সজ্জিত একীভূত ও গ্যাংলিয়নগুলোর দ্বারা আরশোলার স্নায়ুতন্ত্র গঠিত হয়। আরশোলায় তিনটি গ্যাংলিয়া বক্ষদেশে এবং ছয়টি গ্যাংলিয়া উদর অঞ্চলে অবস্থান করে। আরশোলার স্নায়ুতন্ত্র সারাদেহে বিস্তৃত থাকে। স্নায়ুতন্ত্রের কিছুটা অংশ মস্তিষ্কে এবং বাকি অংশটুকু এদের দেহের অঙ্কীয় দেশ (উদরের দিকে) বরাবর অবস্থান করে। সুতরাং তোমরা এখন বুঝতেই পারছ যদি কোনো আরশোলার মস্তিষ্ক কেটে ফেলা হয় তবে আরশোলাটি অন্তত আরও একসপ্তাহ বেঁচে থাকবে। মস্তক অঞ্চলে সুপ্রাইসোফেজিয়াল গ্যাংলিয়া মস্তিষ্কের কাজ করে এতে উৎপন্ন স্নায়ুগুলো শুঙ্গা ও পুঞ্জাক্ষিতে পৌঁছায়। আরশোলার জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো হল শুঙ্গা, চক্ষু ম্যাক্সিলারি পাল্প, লেবিয়াল পাল্প, অ্যানাল সারসি ইত্যাদি। মস্তকের পৃষ্ঠতলে পুঞ্জাক্ষিগুলো অবস্থিত। প্রতিটি চক্ষু প্রায় 2000 ষড়ভূজাকৃতি ওমাটিডিয়ার (একবচনে ওমাটিডিয়াম) সমন্বয়ে গঠিত। বহু ওমাটিডিয়ার সাহায্যে একটি আরশোলার চক্ষুতে কোনো একটি বস্তুর অসংখ্য প্রতিবিম্ব গঠিত হতে পারে। এই ধরনের দৃষ্টিকে মোজেইক দৃষ্টি বলে, যার সংবেদনশীলতা বেশি এবং স্পষ্টতা কম। যা সচরাচর রাত্রিকালীন দর্শনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় (তাই একে নৈশকালীন দৃষ্টি বলে)।

আরশোলা ভিন্নবাসী প্রাণী এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয় প্রাণীর দেহেই সুগঠিত জনন অঙ্গা রয়েছে (চিত্র 7.18 দেখো)। পুংজনন তন্ত্রটি একজোড়া শুক্রাশয় নিয়ে গঠিত হয় এবং প্রতিটি শুক্রাশয় দেহের প্রতি পার্শ্বে চতুর্থ ও ষষ্ঠ উদরখণ্ডকে অবস্থান করে। প্রতিটি শুক্রাশয় থেকে সরু ভাসডিফারেন্স উৎপন্ন হয়, যা সেমিনাল ভেসিকল হয়ে নিক্ষেপণ নালিতে উন্মুক্ত হয়। নিক্ষেপণ নালিটি পায়ুর অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত পুংজননছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে থাকে। মাশরুম আকৃতি বিশিষ্ট একটি বিশেষ গ্রন্থি ষষ্ঠ থেকে সপ্তম উদরখণ্ডকের মধ্যে অবস্থান করে। এটি সহকারী জননগ্রন্থি হিসাবে কাজ করে। পুং গোনাপোফাইসিস অথবা ফ্যালোমিয়ার (পুং জননছিদ্রকে আবৃত করে থাকা কাইটিন নির্মিত অপ্রতিসম গঠন বিশেষ) বহিঃযৌনাঙ্গ গঠন করে। শুক্রাণুগুলো শুক্রথলিতে জমা হয় এবং এরা বান্ডিলের আকারে পরস্পর আঠার মতো জুড়ে গিয়ে স্পারমাটোফোর গঠন করে যা সঙ্গমের সময় দেহ থেকে নিক্ষিপ্ত হয়। দুইটি বৃহদাকার ডিম্বাশয় নিয়ে স্ত্রী জননতন্ত্র গঠিত। ডিম্বাশয়গুলো দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ উদর খণ্ডকের পার্শ্বদেশে অবস্থান করে। প্রতিটি ডিম্বাশয় আটটি ডিম্বক নালিকা বা ওভারিওলের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি ডিম্বকনালিতে বর্ধনশীল ডিম্বাণু একটি শৃঙ্খলের আকারে সজ্জিত থাকে। প্রতিটি ডিম্বাশয়ের ডিম্বনালিগুলো যুক্ত হয়ে একটি মধ্যবর্তী একক ডিম্বনালি (যোনিও বলা হয়) গঠন করে, যা জনন প্রকোষ্ঠে উন্মুক্ত হয়। ষষ্ঠ উদরখণ্ডকে অবস্থিত একজোড়া স্পার্মাথিকা জনন প্রকোষ্ঠে উন্মুক্ত হয়।

শুক্রাণুগুলো স্পার্মাটোফোরের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। এদের নিষিক্ত ডিম্বাণুগুলো একটি ক্যাপসুলে আবদ্ধ থাকে এবং একে ওথিকা (Oothica) বলে। ওথিকাগুলো গাঢ় লাল থেকে কালচে বাদামি বর্ণের হয় এবং লম্বায় প্রায় 3/8″ (8 মিমি) হয়। এরা সাধারণত খাদ্যের উৎসের কাছাকাছি অধিক আপেক্ষিক আর্দ্রতা বর্তমান এমন ফাটল বা খাঁজে ওথিকাগুলোকে নিক্ষেপ করে। ওথিকাগুলো একটি উপযুক্ত তলে আঠার মতো সেঁটে যায়।

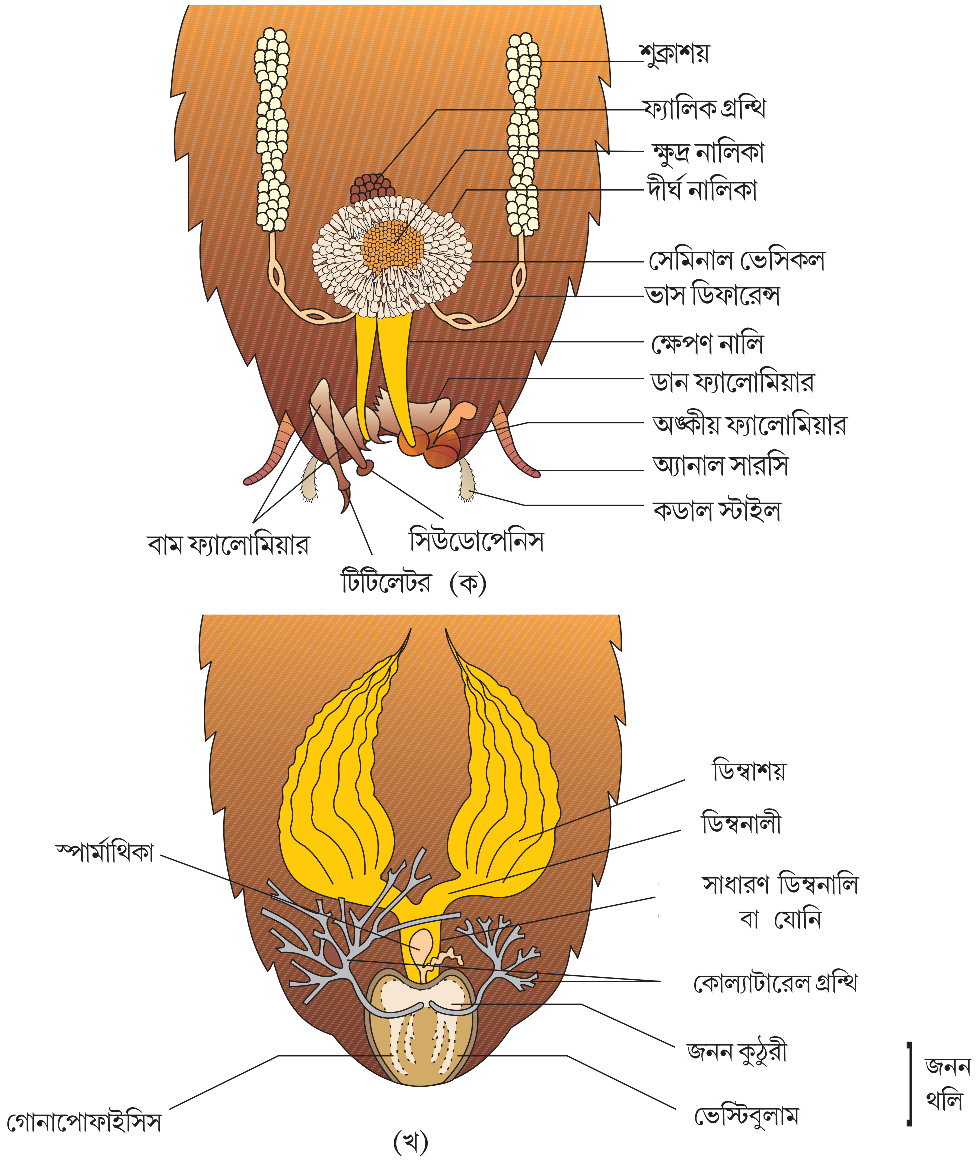

চিত্র 7.18 : আরশোলার জননতন্ত্র : (ক) পুরুৎ (খ) স্ত্রী

স্ত্রী আরশোলা গড়ে 9 –10টি ওথিকা গঠন করে। প্রতিটি ওথিকাতে 14 –16টি নিক্ষিপ্ত ডিম্বাণু থাকে। *P. americana* এর পরিস্ফুরণপোরো মেটাবোলাস প্রকৃতির অর্থাৎ পরিস্ফুরণ নিম্ফ দশার মাধ্যমে ঘটে। নিম্ফ দেখতে অনেকটাই পরিণত আরশোলার মতো হয়। নিম্ফ তের বার খোলস ত্যাগের মাধ্যমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ আরশোলায় পরিণত হয়। শেষ নিম্ফ দশার ঠিক পূর্ববর্তী দশায় উইংপ্যাড গঠিত হয়, কিন্তু শুধুমাত্র পূর্ণাঙ্গ আরশোলারই ডানা থাকে।

আরশোলার অনেক বন্যপ্রজাতিও রয়েছে। কিন্তু এদের কোনো অর্থকরী গুরুত্ব নেই। আরশোলার কিছু প্রজাতি মানুষের বাসস্থানের চারপাশে বসবাস করে এবং দ্রুতহারে বংশবৃদ্ধি করে। এরা খাদ্যকে দূষিত করার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটিরিয়া ঘটিত রোগ ছড়াতে পারে।

7.5 ব্যাঙ (Frogs)

ব্যাঙ স্থলে এবং স্বাদুজল উভয় পরিবেশেই বেঁচে থাকতে পারে এবং এরা পর্ব কর্ডাটা এর অন্তর্গত উভচর শ্রেণিভুক্ত প্রাণী। ভারতবর্ষে সাধারণত ব্যাঙের রানা টাইগ্রিনা (*Rana tigrina*) প্রজাতিটিই দেখা যায়।

ব্যাঙের দেহের তাপমাত্রা সবসময় স্থির থাকে না অর্থাৎ পরিবেশের তাপমাত্রার তারতম্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এদের দেহের তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে। এ ধরনের প্রাণীদের অনুষ্ণশোণিত বা পয়কিলোথার্মিক বলা হয়। তোমরা এদের দেহের রঙের পরিবর্তনও লক্ষ করতে পারবে যখন এরা তৃণভূমিতে এবং শুষ্ক অঞ্চলে থাকে। শত্রুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যই এদের এই বর্ণ পরিবর্তনের ক্ষমতা (Camouflage) রয়েছে। আত্ম রক্ষার্থে এই বর্ণ পরিবর্তনকে বলে মিমিক্রি। তোমরা এটাও জান যে গ্রীষ্মে এবং শীতকালে ব্যাঙ দেখা যায় না। এই সময় এরা নিজেদেরকে অত্যধিক তাপ এবং শৈত্য থেকে রক্ষা করতে গভীর সুড়ঙ্গে আশ্রয় নেয়। এই ঘটনাটিকে বলা হয় গ্রীষ্ম ঘুম (aestivation) এবং শীতঘুম (Hibernation)।

7.5.1 অঙ্গসংস্থান (Norphology)

তুমি কি কখনও ব্যাঙের ত্বক স্পর্শ করেছ? শ্লেষ্মার উপস্থিতির কারণে এদের ত্বক মসৃণ এবং পিচ্ছিল হয়। ত্বক সবসময়ই স্যাঁতস্যাঁতে ভিজা অবস্থায় থাকে। দেহের পৃষ্ঠদেশ সাধারণত জলপাই সবুজ বর্ণের হয় এবং এতে গাঢ় বিক্ষিপ্ত বিন্দু বর্তমান থাকে। আবার দেহের অঙ্কদেশীয় ত্বক সমভাবে ফিকে হলুদ বর্ণের হয়। ব্যাঙ কখনও জলপান করে না। কিন্তু ত্বক দ্বারা জল শোষণ করে। ব্যাঙের দেহ মস্তক এবং দেহকাণ্ডে বিভক্ত থাকে (চিত্র 7.19 দেখ)। গ্রীবা এবং ল্যাজ অনুপস্থিত। মুখের ওপরের দিকে একজোড়া নাসারন্ধ্র বর্তমান। চোখ দুটি স্ফীত এবং নিক্টিনিটিং পর্দা বা তৃতীয় পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। ওই পর্দা জলে থাকাকালীন অবস্থায় চোখকে সুরক্ষা প্রদান করে।

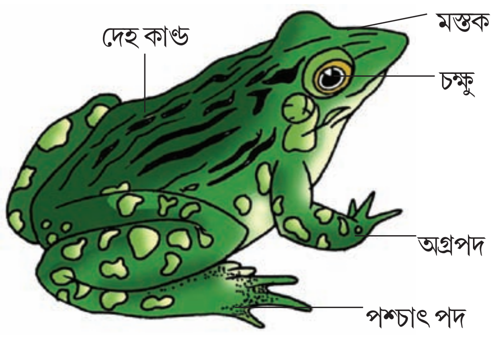

চিত্র 7.19 : ব্যাঙের বহিরাকৃতি

প্রতিটি চোখের উভয়পার্শ্বে উপস্থিত টিমপেনাম্ পর্দা শব্দতরঙ্গ গ্রহণ করে। অগ্রপদদ্বয় এবং পশ্চাৎপদদ্বয় এদেরকে হাঁটতে, লাফাতে এবং গর্ত খুঁড়তে সাহায্য করে। পাঁচ আঙুল সমন্বিত পশ্চাদ্ পদ দুটি, চার আঙ্গুল বিশিষ্ট অগ্রপদের তুলনায় বড়ো এবং পেশিবহুল হয়। এদের লিপ্তপদ বর্তমান, যা এদেরকে সাঁতার কাটতে সাহায্য করে। ব্যাঙে যৌন দ্বিরূপতা পরিলক্ষিত হয়। পুরুষ ব্যাঙ শনাক্তকারী বৈশিষ্ট হল দেহে শব্দ উৎপাদনকারী স্বরথলি (Vocal Sac) এবং অগ্রপদের প্রথম আঙুলে সঙ্গমে সহায়ক আঁঠালো পট্টি (Copulatory Pad) এর উপস্থিতি, যেগুলো স্ত্রী ব্যাঙের দেহে অনুপস্থিত থাকে।

7.5.2 শরীরস্থানিক গঠন (Anatomy)

ব্যাঙের দেহগহ্বরে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গতন্ত্র যেমন পৌষ্টিক তন্ত্র, সংবহন তন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, রেচনতন্ত্র এবং জনন তন্ত্র নির্দিষ্ট গঠন এবং কার্যসহ অবস্থান করে (চিত্র 7.20 দেখ) পৌষ্টিকতন্ত্র পৌষ্টিকনালি ও পাচক গ্রন্থি নিয়ে গঠিত। ব্যাঙ মাংসাসী প্রাণী হওয়ায় এদের পৌষ্টিক নালি দৈর্ঘ্যে ছোট

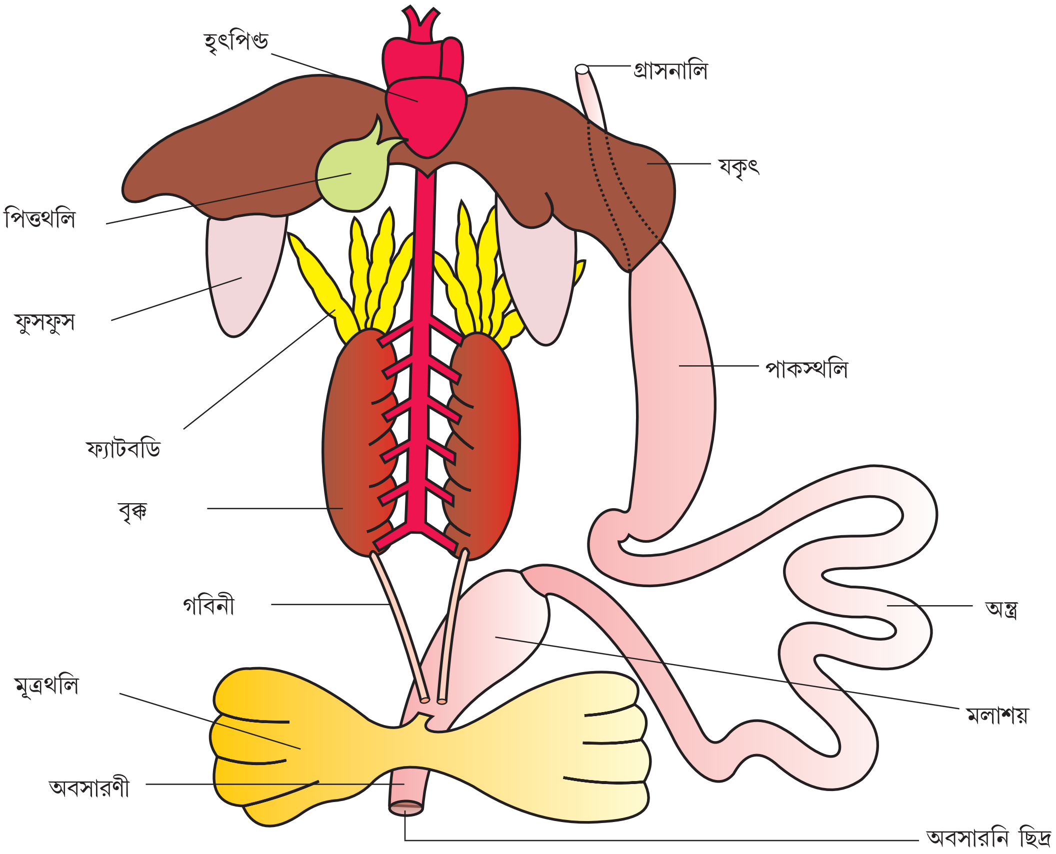

চিত্র **7.20** : ব্যাঙের সম্পূর্ণ পৌষ্টিকতন্ত্রের অন্তর্গত অভ্যন্তরীণ অঙ্গাগুলোর চিত্ররূপ প্রদর্শন।

হয় এবং এরজন্যই অন্ত্রের দৈর্ঘ্যও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। মুখ, মুখগহ্বরে মুক্ত হয় যা গলবিলের মাধ্যমে গ্রাসনালির সঙ্গে যুক্ত থাকে। গ্রাসনালি একটি ছোটো নল যা পাকস্থলীতে মুক্ত হয় এবং পরবর্তীতে অন্ত্র ও পায়ু হয়ে ক্লোয়েকা বা পায়ুছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে মুক্ত হয়। যকৃৎ পিত্তরস ক্ষরণ করে, এই পিত্তরস পিত্তথলিতে জমা হয়। অগ্ন্যাশয় এমন একটি পাচক গ্রন্থি যা পাচক উৎসেচকসহ অগ্ন্যাশয়রস ক্ষরণ করে।

(চিত্র 7.20) জিহ্বার সাহায্যে ব্যাঙ খাবার সংগ্রহ করে। পাকস্থলীর আন্ত:প্রাকার থেকে ক্ষরিত পাচক রস এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় খাদ্যের পরিপাক ঘটে। অর্ধপাচিত খাদ্য বা কাইম পাকস্থলী থেকে অন্ত্রের প্রথম অংশ বা ডিওডিনামে যায়। ডিওডিনামে অর্ধপাচিত খাদ্য আসার পর পিত্তনালির মাধ্যমে পিত্তথলি থেকে পিত্তরস এবং অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয়রস ডিওডিনামে আসে। এখানে পিত্তরস স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে স্নেহের অবদ্রবে পরিণত করে এবং অগ্ন্যাশয় রস শর্করা এবং প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের পরিপাক ঘটায়। অন্ত্রে খাদ্যের পরিপাক সম্পূর্ণ হয়। অন্ত্রের অভ্যন্তরীণ গাত্রে ভিলি এবং মাইক্রোভিলি নামক আঙুলের মতো অসংখ্য ভাঁজ থাকে, এগুলো পাচিত খাদ্যকে শোষণ করে। অপাচ্য কঠিন বর্জ্য মলাশয়ে পরিচালিত হয় এবং ক্লোয়েকার মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে যায়। ব্যাঙ দুটি ভিন্ন উপায়ে স্থলে এবং জলে শ্বাসকার্য চালায়। জলে থাকাকালীন এদের ত্বক শ্বাসঅঙ্গ হিসেবে কাজ করে (ত্বকীয় শ্বসন)।

ব্যাপন পদ্ধতিতে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন ত্বকের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে। স্থলে বসবাসের সময় মুখগহ্বর, ত্বক এবং ফুসফুস শ্বাসঅঙ্গ হিসেবে কাজ করে। ব্যাঙের লম্বাটে, গোলাপি বর্ণের, থলির মতো দেখতে একজোড়া ফুসফুস থাকে। ফুসফুস জোড়া দেহ কান্ডের উর্ধ্বাংশে অবস্থিত। নাসারন্ধ্রের মাধ্যমে বায়ু প্রথমে মুখগহ্বরে এবং পরে ফুসফুসে প্রবেশ করে। গ্রীষ্মঘুম এবং শীতঘুমের সময় ত্বকের মাধ্যমে গ্যাসীয় বিনিময় সংঘটিত হয়।

ব্যাঙের সংবহনতন্ত্র উন্নত মানের বন্ধ সংবহনতন্ত্র। এদের দেহে লসিকাতন্ত্রও বর্তমান। রক্ত সংবহনতন্ত্র হৃৎপিণ্ড, রক্তবাহ এবং রক্ত নিয়ে গঠিত। এই লসিকাতন্ত্র লসিকা, লসিকাবাহ এবং লসিকা গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত দেহগহ্বরের ঊর্দ্ধাংশে পেশিবহুল হৃৎপিন্ডটি অবস্তিত। এটি তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট — এতে দুটো অলিন্দ (অট্রিয়া) এবং একটি নিলয় বা (ভেন্ট্রিকল্) থাকে এবং হৃৎপিণ্ডটি পেরিকর্ডিয়াম নামক পাতলা আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে। ডান অলিন্দের সাথে সাইনাস ভেনোসাস্ নামক একটি ত্রিকোণাকৃতি অংশ যুক্ত থাকে। এটি ভেনাকেভা (Vena Cava) নামক মহাশিরার মাধ্যমে আগত রক্ত গ্রহণ করে। নিলয়টি হৃৎপিন্ডের অঙ্কীয় দেশে অবস্থিত থলির মতো দেখতে কোনাস্ আটারিওসাসে মুক্ত হয়। ধমনীগুলো অর্থাৎ ধমনীতন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের সব অংশে পৌঁছায়। শিরাগুলো দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত হৃৎপিন্ডে পৌঁছায় এবং শিরাতন্ত্র গঠন করে। ব্যাঙের যকৃৎ ও অন্ত্র এবং একইভাবে বৃক্ক এবং দেহের নিম্নাংশের মধ্যে শিরার বিশেষ সংযোগ রয়েছে। প্রথমটিকে বলে হেপাটিক পোর্টাল তন্ত্র এবং দ্বিতীয়টিকে বলে রেনাল পোর্টাল তন্ত্র। ব্যাঙের রক্ত রক্তরস বা প্লাজমা এবং রক্তকোশ নিয়ে তৈরি। রক্ত কোশগুলো হল RBC (লোহিত রক্ত কণিকা) বা এরিথ্রোসাইট, WBC (শ্বেতরক্তকণিকা) বা লিউকোসাইট এবং অণুচক্রিকা। এদের লোহিত রক্তকণিকা নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং এতে লাল রঞ্জক হিমোগ্লোবিন বর্তমান। লসিকা রক্ত থেকে পৃথক হয়। লসিকাতে কিছু প্রোটিন এবং লোহিত রক্তকণিকা অনুপস্থিত থাকে। সংবহনকালে রক্ত নির্দিষ্ট স্থানে পুষ্টিদ্রব্য, গ্যাস এবং জল পরিবহণ করে। পেশিবহুল হৃৎপিন্ডের পাম্পিং এর ফলেই রক্ত সংবাহিত হয়।

একটি সুগঠিত রেচনতন্ত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে নাইট্রোজেন গঠিত বর্জ্য পদার্থ দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়। ব্যাঙের রেচনতন্ত্র একজোড়া বৃক্ক, গবিনী, ক্লোয়েকা এবং মূত্রথলি নিয়ে গঠিত। রেচনতন্ত্রের এই সব অংশগুলো একত্রিত অবস্থায় একটি গাঢ় লাল রঙের শিমবীজের মতো আকার নেয় এবং দেহগহ্বরে সামান্য পেছনের দিকে মেরুদন্ডের দুইপাশে অবস্থান করে। প্রতিটি বৃক্ক কতগুলো গঠনগত ও কার্যগত একক ইউরিনিফেরাস টিবিউল বা নেফ্রন নিয়ে গঠিত। পুরুষ ব্যাঙের ক্ষেত্রে প্রতিটি বৃক্ক থেকে একটি করে গবিনী বা মূত্রনালি বেরিয়ে আসে। এই মূত্রনালিদ্বয় মূত্রজননালি হিসেবে কাজ করে এবং ক্লোয়াকায় উন্মুক্ত হয়। স্ত্রী ব্যাঙের ক্ষেত্রে, মুত্রনালী এবং ডিম্বনালী পৃথকভাবে ক্লোয়েকায় উন্মুক্ত হয়। ব্যাঙ ইউরিয়া রেচন করে বলে একে ইউরিওটেলিক প্রাণী বলে। রক্তের মাধ্যমে রেচন পদার্থসমূহ বৃক্কে পরিবাহিত হয় এবং সেখানে এগুলো পৃথকীকৃত এবং রেচিত হয়।

ব্যাঙের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়কারী তন্ত্রটি অত্যন্ত উন্নত। এই তন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র এবং অন্ত:ক্ষরা গ্রন্থি উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হরমোনের ক্রিয়ার ফলে দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলোর মধ্যে রাসায়নিক সমন্বয় সাধিত হয়। এদের প্রধান অন্ত:ক্ষরাগ্রন্থিগুলোর মধ্যে রয়েছে পিটুইটারি, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, থাইমাস, পিনিয়াল বডি, অ্যাড্রিনাল এবং যৌন গ্রন্থি সমূহ।

ব্যাঙের স্নায়ুতন্ত্র একটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ড) ও একটি প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (করোটীয়

এবং সুষুম্না স্নায়ু) এবং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (সিম্প্যাথিটিক ও প্যারামিমপ্যাথেটিক স্নায়ু) নিয়ে গঠিত। মস্তিষ্ক থেকে দশ জোড়া করোটীয় স্নায়ু বা ক্রেনিয়াল নার্ভ উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্ক একটি অস্থি নির্মিত মস্তিষ্ক কুঠুরী (ক্রেনিয়ামে) সুরক্ষিত থাকে। মস্তিষ্কটি অগ্রমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক এবং পশ্চাৎ মস্তিষ্কে বিভক্ত। অগ্র মস্তিষ্কে অল্ফ্যাক্টরি লোব, যুগ্ম সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার এবং অযুগ্ম ডায়ানসেফালন বর্তমান। একজোড়া অপ্‌টিক লোবের উপস্থিতিতে মধ্য মস্তিষ্ক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পশ্চাদ্‌ মস্তিষ্ক লঘু মস্তিষ্ক ও মেডুলা অব্‌লঙ্গাটা নিয়ে গঠিত। মেডুলা অব্‌লঙ্গাটা ফোরামেন ম্যাগনাম এর মধ্য দিয়ে গিয়ে মেরুদণ্ডের ভিতরে অবস্থিত সুষুম্নাকাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছায়।

ব্যাঙের বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানেন্দ্রিয় রয়েছে। যেমন — স্পর্শেন্দ্রিয় (সেনসরি প্যাপিলি), স্বাদেন্দ্রিয় (স্বাদ কোরক), ঘ্রানেন্দ্রিয় (নেসাল এপিথেলিয়াম), দর্শনেন্দ্রিয় (চক্ষু) এবং শ্রবণেন্দ্রিয় (কর্ণপটহসহ অন্ত:কর্ণ)। এগুলোর মধ্যে চক্ষুদ্বয় এবং অন্তঃকর্ণদ্বয় হল উন্নতমানের জ্ঞানেন্দ্রিয়। অন্যগুলো স্নায়ুপ্রান্তকে ঘিরে থাকা কতগুলো কোশীয় সমষ্টি হিসেবে থাকে। ব্যাঙের চোখ দুটো গোলাকাকার এবং করোটির অক্ষিকোটরে অবস্থিত। চোখগুলো সরলাক্ষি (একটি একক বিশিষ্ট) বহি:কর্ণ অনুপস্থিত। ব্যাঙে কেবলমাত্র কর্ণপহট বা টিম্পোনাম দেহের বাইরের দিকে দেখা যেতে পারে। কান শ্রবণেন্দ্রিয় হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি দেহের ভারসাম্য রক্ষায়ও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ব্যাঙের দেহে সুগঠিত পুরুষ এবং স্ত্রী জননতন্ত্র বর্তমান। পুরুষ জননঅঙ্গ হল একজোড়া হলুদাভ ডিম্বাকৃতি শুক্রাশয় (চিত্র 7.21 দেখো)। এগুলো মেসোরকাইয়াম নামক দ্বিভাঁজযুক্ত পেরিটোনিয়াম এর সাহায্যে বৃক্কের উপরি অংশের সাথে যুক্ত থাকে। বৃক্ক থেকে 10–12টি ভাসা এফারেনসিয়া বেরিয়ে আসে। এগুলো পাশ বরাবর বৃক্কে প্রবেশ করে এবং বিডার্স নালিতে মুক্ত হয়। শেষপর্যন্ত এটি মূত্রজনন নালিতে যুক্ত হয়। এই মূত্র জনন নালিটি বৃক্ক থেকে বেরিয়ে ক্লোয়েকাতে মুক্ত হয়। ক্লোয়েকা দেহের মধ্যরেখা বরাবর অবস্থিত একটি ছোটো মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠ বিশেষ, যা মল, মূত্র এবং শুক্রাণুকে দেহের বাইরে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

ব্যাঙের স্ত্রী জননতন্ত্রে একজোড়া ডিম্বাশয় বর্তমান (চিত্র 7.22 দেখো)। ডিম্বাশয়গুলো বৃক্কের নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করে, তবে বৃক্কের সঙ্গে ডিম্বাশয়ের কার্যাবলির কোনো সম্পর্ক নেই।

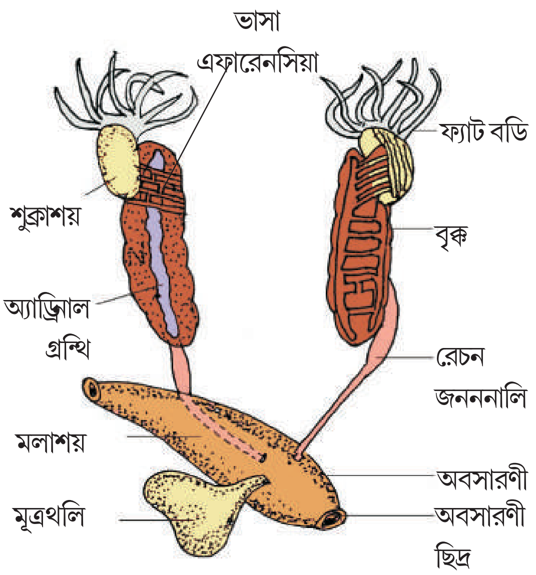

চিত্র 7.21 : ব্যাঙের পুং জননতন্ত্র।

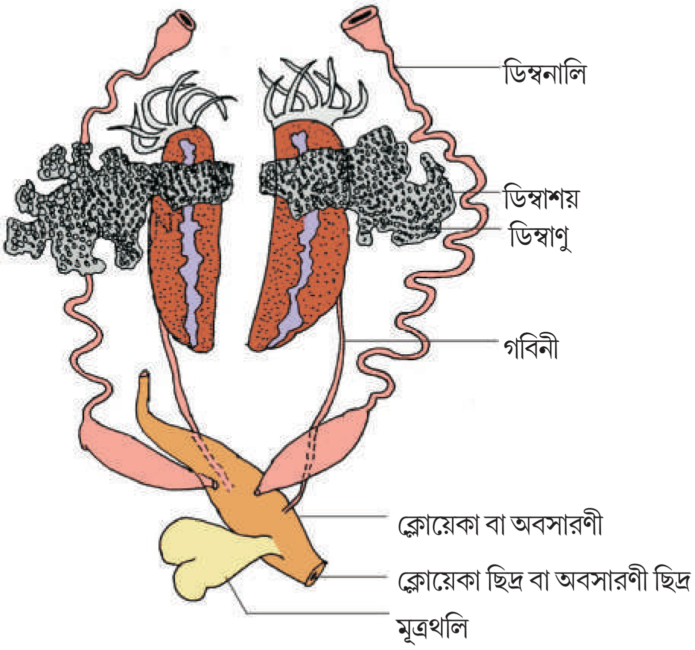

চিত্র : 7.22 : ব্যাঙের স্ত্রী জননতন্ত্র

ডিম্বাশয় দুটির প্রতিটি থেকে একটি করে ডিম্বনালি উৎপন্ন হয় এবং আলাদাভাবে ক্লোয়েকাতে মুক্ত হয়। একটি পরিণত স্ত্রী ব্যাঙ একসাথে 25000–3000 টি ডিম পাড়তে পারে। এদের ক্ষেত্রে বহি:নিষেক হয় এবং তা জলে সংঘটিত হয়। টেডপোল লার্ভা ব্যাঙের পরিস্ফুটন একটি লার্ভা দশার মাধ্যমে ঘটে এবং ব্যাঙের লার্ভাকে ব্যাঙাচি বলে। রূপান্তরের (metamorphosis) মাধ্যমে ব্যাঙাচি পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পরিণত হয়।

মানবজীবনে ব্যাঙের উপকারী ভূমিকা রয়েছে। এরা পোকামাকড় খেয়ে ফসল রক্ষা করে। এরা বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য জালক এবং খাদ্য শৃঙ্খলে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী হিসেবে কাজ করে। যার ফলে এরা বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কোনো কোনো দেশে ব্যাঙের পেশিবহুল পাগুলোকে লোকেরা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে।

সারসংক্ষেপ

দেহের অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে কোশ, কলা, অঙ্গ এবং অস্থিতন্ত্রসমূহ দেহের বিভিন্ন কার্যগুলোকে কোনো একভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় এবং শ্রমবিভাজন প্রদর্শন করে। অন্তঃকোশীয় উপাদানসহ একগুচ্ছ কোশ যখন দেহের এক বা একাধিক কাজ করে, তখন ঐ কোশগুচ্ছকে কলা বলে।

এপিথেলিয়া হল পাতসদৃশ কলা যা দিয়ে দেহতল এবং দেহগহ্বর, নালি এবং নালিকাগুলো আবৃত থাকে। এপিথেলিয়ামের একটি মুক্ত তল থাকে। এই তলটি দেহতরল অথবা বহিঃপরিবেশের দিকে থাকে। এই কলার কোশগুলো গঠনগত এবং কার্যগতভাবে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত।

বিভিন্ন ধরনের যোগকলাগুলো একসাথে সংঘবদ্ধ হয়ে দেহকে দৃঢ়তা ও সুরক্ষা প্রদান করে এবং অন্যান্য কলাগুলোকে আবৃত করে রাখে। নমনীয় যোগকলা সমূহ প্রোটিন তন্তুর পাশাপাশি ধাত্র পদার্থের ওপরে সজ্জিত বিভিন্ন ধরনের কোশ নিয়ে গঠিত। তরুণাস্থি, অস্থি, রক্ত এবং মেদকলা হল বিশেষ ধরনের যোগকলা। তরুণাস্থি এবং অস্থি উভয়ই গঠনকারী বস্তুর পদার্থ। রক্ত হল একপ্রকার তরলকলা যা বিভিন্ন বস্তু পরিবহন করে। মেদকলা হল সঞ্চিত শক্তির ভান্ডার। পেশিকলা যা কি না সংবেদনে সাড়া দিয়ে সংকুচিত হতে পারে, তা সমগ্র দেহের স্থানান্তরণে বা কোনো বিশেষ অংশের নড়াচড়ায় সাহায্য করে। ঐচ্ছিক পেশি (Skeletal muscle) গঠনকারী পেশিকলা হাড় বা অস্থির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। আভ্যন্তরীণ অঙ্গাসমূহের একটি উপাদান হল মসৃণ পেশি। হৃদ্‌পেশি হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশীল প্রাচীর প্রাকার গঠন করে। যোগকলা অন্য তিন প্রকার কলাকে আবৃত করে রাখে। স্নায়ুকলা সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে দেহকে সবচাইতে বেশি নিয়ন্ত্রণ করে। স্নায়ুকলার মূল একক হল নিউরোণ।

কেঁচো, আরশোলা এবং ব্যাঙ-এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো এদের দেহ সংগঠনে পরিলক্ষিত হয়। *Pheretima Posthuma* (কেঁচো) এর দেহ কিউটিকল্ দ্বারা আবৃত থাকে। 14 তম, 15 তম, এবং 16 তম দেহখণ্ডক ছাড়া দেহের বাকি সব খণ্ডকে একই রকম হয়। ঐ তিনটি খণ্ডক গাঢ় বর্ণের গ্রন্থিময় হয় এবং ক্লাইটেলাম গঠন করে। প্রতিটি খণ্ডকে S আকৃতির কাইটিন নির্মিত সিটা পরিলক্ষিত হয়। এই সিটাগুলো কেঁচোকে গমনে সাহায্য করে। দেহের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ এবং সপ্তম, সপ্তম এবং অষ্টম, অষ্টম এবং নবম দেহখণ্ডকগুলোর মধ্যেকার খাঁজে স্পার্মাথিকা ছিদ্র অবস্থান করে।

14 তম খণ্ডকে স্ত্রী জননছিদ্র এবং 18 তম খণ্ডকে পুং জননছিদ্র বর্তমান। পৌষ্টিক নালিটি মুখ, মুখগহ্বর, গলবিল, গিজার্ড, পাকস্থলী, অন্ত্র এবং পায়ু নিয়ে গঠিত একটি সরু নালি। রক্ত সংবহন তন্ত্র হৃৎপিণ্ড ও কপাটিকার সমন্বয়ে গঠিত এবং বন্ধ সংবহন তন্ত্র দেখা যায়। স্নায়ুতন্ত্র অঙ্কীয় স্থায়ুরজ্জু নিয়ে গঠিত। কেঁচো উভয়লিঙ্গা প্রাণী। দেহের দশম (10^{th}) এবং একাদশ (11^{th}) খন্ডকে যথাক্রমে দুইজোড়া শুক্রাশয় অবস্থান করে। একজোড়া ডিম্বাশয় দ্বাদশ (12th) ও ত্রয়োদশ (13th) খণ্ডকের মধ্যবর্তী বিভাজিকায় অবস্থান করে। কেঁচো একটি প্রোটেন্‌ড্রাস (Protandrous) প্রাণী

এবং পরনিষেক ঘটে। ক্লাইটেলামস্থিত গ্রন্থি নিঃসরণ দ্বারা তৈরি কোকুনের মধ্যে নিষেক এবং পরিস্ফুটন সম্পন্ন হয়।

আরশোলার (*Periplaneta americana*) দেহ কাইটিন নির্মিত বহি:কঙ্কাল দ্বারা আবৃত থাকে। দেহ মস্তক, গ্রীবা এবং উদরে বিভক্ত। দেহখণ্ডক সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ ধারণ করে। গ্রীবা তিনটি খণ্ডক নিয়ে গঠিত। প্রতিটি খণ্ডকে একজোড়া করে চলনের সহায়ক দুই জোড়া পদ বর্তমান। দুইজোড়া ডানা বর্তমান। দ্বিতীয় (2^{nd}) এবং তৃতীয় (3^{rd}) খণ্ডক দুটোতে একজোড়া করে ডানা রয়েছে। উদর 10টি খণ্ডক নিয়ে গঠিত। পৌষ্টিকনালি সুগঠিত থাকে এবং এটি মুখ উপাঙ্গ পরিবেষ্টিত মুখগহ্বর, একটি গলবিল, গ্রাসনালি , ক্রপ, গিজার্ড, মধ্যপৌষ্টিকনালি, পশ্চাৎ পৌষ্টিকনালি এবং পায়ু নিয়ে গঠিত। অগ্র পৌষ্টিকনালি এবং পশ্চাৎ পৌষ্টিকনালির সংযোগস্থলে হেপাটিক্ সিকা বর্তমান। আবার মধ্য পৌষ্টিকনালি ও পশ্চাৎ পৌষ্টিকনালির সংযোগস্থলে ম্যালপিজিয়ান নালিকাগুলো বিদ্যমান। এগুলো রেচনক্রিয়ায় সহায়তা করে। ক্রপের সন্নিকটে একজোড়া লালাগ্রন্থি থাকে। আরশোলায় মুক্ত সংবহনতন্ত্র দেখা যায়। ট্রাকিয়া দ্বারা সৃষ্ট জালিকার সাহায্যে শ্বসন সংঘটিত হয়। স্পাইরাকলের মাধ্যমে ট্রাকিয়া বাইরে মুক্ত হয়। এদের স্নায়ুতন্ত্র দেহখণ্ডকগুলোতে উপস্থিত গ্যাংলিয়া এবং অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জু দ্বারা গঠিত। চতুর্থ (4^{th}) থেকে ষষ্ঠ (6^{th}) দেহখণ্ডকে একজোড়া শুক্রাশয় এবং দ্বিতীয় (2^{nd}) থেকে ষষ্ঠ (6^{th}) দেহখণ্ডকে একজোড়া ডিম্বাশয় বর্তমান। অন্তঃনিষেক ঘটে। স্ত্রী আরশোলা 9 –10টি ওথেকা (Ootheca) সৃষ্টি করে। এগুলোতে ভ্রূণের পরিস্ফুটন ঘটে এবং ভ্রূণ পরিণত হতে থাকে। একটি ওথেকা বিদীর্ণ হলে 16টি নতুন আরশোলা বেরিয়ে আসে এগুলোকে নিম্ফ বলে।

ভারতীয় কোলা ব্যাঙ Rana tigrina হল ভারতবর্ষে সবচাইতে পরিচিত ব্যাঙ। দেহ চর্ম, ত্বক দ্বারা আবৃত থাকে। ত্বকে উপস্থিত রক্তজালক সমন্বিত শ্লেষ্মাগ্রন্থিগুলো জলে এবং স্থলে ব্যাঙকে শ্বসনে সহায়তা করে। দেহ মস্তক এবং ধড়ে বিভক্ত। এদের একটি পেশিময় জিহ্বা থাকে। জিহ্বাটির অগ্রভাব দুইভাগে বিভক্ত এবং এটি খাদ্য ধরতে সাহায্য করে। পৌষ্টিকনালিটি গ্রাসনালি, পাকস্থলী, অন্ত্র এবং মলাশয় নিয়ে গঠিত যা ক্লোয়েকাতে মুক্ত হয়। প্রধান পাচক গ্রন্থি হলো যকৃৎ এবং অগ্ন্যাশয়। এরা জলে ত্বকের সাহায্যে এবং স্থলে ফুসফুসের সাহায্য শ্বাসকার্য চালায়। রক্তসংবহন একচক্রী এবং বদ্ধ সংবহন প্রকৃতির। লোহিত রক্তকণিকা নিউক্লিয়াসযুক্ত। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র এবং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে এদের স্নায়ুতন্ত্রটি সংগঠিত। মূত্রজননতন্ত্র গঠনকারী বিভিন্ন অঙ্গগুলো হল বৃক্ক, মূত্রজনননালিদ্বয় যেগুলো ক্লোয়েকাতে মুক্ত হয়। পুং জনন অঙ্গ হিসেবে একজোড়া শুক্রাশয় থাকে। আর স্ত্রীজনন অঙ্গ হিসেবে রয়েছে একজোড়া ডিম্বাশয়। একটি স্ত্রী ব্যাঙ একসাথে 2500–3000 ডিম পাড়ে। বহিঃনিষেক এবং পরোক্ষ পরিস্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়। ডিম ফুটে ব্যাঙাচি হয় এবং ব্যাঙাচি বের রূপান্তরিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পরিণত হয়।

অনুশীলনী

1. একটি শব্দে বা একটি বাক্যে উত্তর দাও :

(i) *Pariplaneta americana* এর সাধারণ নাম কী?

(ii) কেঁচোতে কয়টি স্পারমাথিকা দেখা যায়?

(iii) আরশোলার দেহের কোন্ স্থানে ডিম্বাশয় থাকে?

(iv) আরশোলার উদর অংশটি কয়টি খণ্ডক নিয়ে গঠিত?

(v) তুমি কোথায় ম্যালপিজিয়ান নালিকা দেখতে পাও?

2. **নীচেরগুলোর উত্তর দাও :**
(i) নেফ্রিডিয়ার কাজ কি?
(ii) অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে কেঁচোতে কয় প্রকারের নেফ্রিডিয়া দেখা যায়?
3. কেঁচোর জননতন্ত্রের একটি চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো।
4. আরশোলার পৌষ্টিকনালির একটি চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো।
5. **নিম্নলিখিতগুলোর পার্থক্য নির্দেশ করো :**
(a) প্রোস্টোমিয়াম এবং পেরিস্টোমিয়াম।
(b) ব্যবধায়কবিশিষ্ট নেফ্রিডিয়াম এবং গলবিলীয় নেফ্রিডিয়াম।
6. রক্তের কোশীয় উপাদানগুলো কী কী?
7. নিম্নলিখিতগুলো কী এবং প্রাণীদেহের কোথায় তুমি এদের দেখতে পাও?
(a) কনড্রোসাইট
(b) অ্যাক্সন
(c) রোমশ আবরণী কলা
8. চিহ্নিত চিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার আবরণী কলার বর্ণনা কর।
9. **পার্থক্য নির্দেশ করো :**
(ক) সরল আবরণী কলা এবং জটিল আবরণী কলা।
(খ) হৃদ্‌পেশি এবং সরেখ পেশি।
(গ) ঘন নিয়মিত যোগকলা এবং ঘন অনিয়মিত যোগকলা।
(ঘ) মেদকলা এবং রক্তকলা।
(ঙ) সরল গ্রন্থি এবং জটিল গ্রন্থি।
10. প্রতিটি ক্রমে অমিলটি খুঁজে বের করো।
(ক) শিথিল যোগকলা; রক্ত; নিউরণ; কন্ডরা।
(খ) RBC; WBC; অনুচক্রিকা, তরুণাস্থি।
(গ) বহি:ক্ষরা গ্রন্থি, অন্ত:ক্ষরাগ্রন্থি, লালাগ্রন্থি, লিগামেন্ট।
(ঘ) ম্যাক্সিলা, ম্যান্ডিবল, ল্যাব্রাম, শুঙ্গা।
(ঙ) প্রোটোনিমা, মেসোথোরাক্স, মেটাথোরাক্স, কক্সা।
11. **স্তম্ভ I এবং স্তম্ভ II মেলাও :**

(ক) জটিল আবরণী কলা	(ক) পৌষ্টিক নালি
(খ) পুঞ্জাক্ষি	(খ) আরশোলা
(গ) ব্যবধায়ক বৈশিষ্ট নেফ্রিডিয়া	(গ) ত্বক
(ঘ) মুক্ত সংবহনতন্ত্র	(ঘ) মোজাইক ভিসন
(ঙ) টিফলোসোল	(ঙ) কেঁচো
(চ) অস্টিওসাইট	(চ) ফেলোমিয়ার
(ছ) জেনিটালিয়া	(ছ) অস্থি।

12. কেঁচোর সংবহনতন্ত্রটি সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
13. ব্যাঙের পৌষ্টিক তন্ত্রের একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করো।
14. নিম্নলিখিতগুলোর কার্যাবলি উল্লেখ করো :
(ক) ব্যাঙের গবিনীদ্বয়
(খ) ম্যালপিজিয়ান নালিকা
(গ) কেঁচোর দেহ প্রাকার

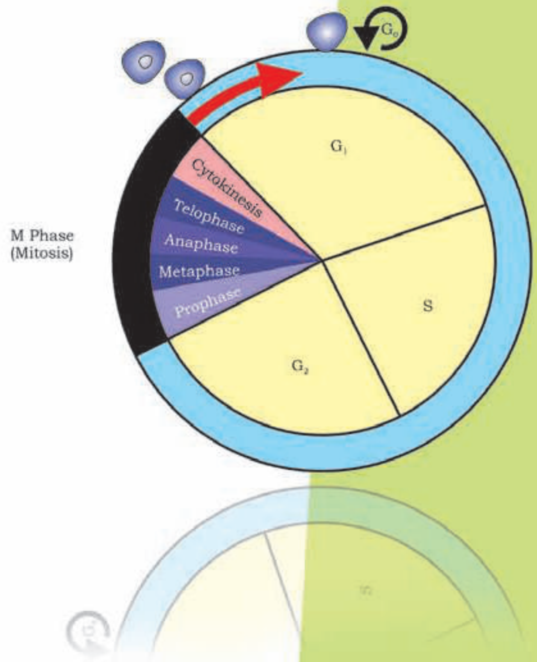

একক - 3 (UNIT 3)
কোশ: গঠন ও কার্যাবলি
(CELL : STRUCTURE AND FUNCTIONS)

অধ্যায় - ৮
কোশ - জীবনের একক

অধ্যায় - ৯
জৈব অণুসমূহ

অধ্যায় - ১০
কোশচক্র এবং কোশ বিভাজন

সজীব বস্তুর অধ্যয়নই হল জীববিদ্যা (Biology)। সজীব বস্তুর ধরন এবং বাহ্যিক গঠনের বিস্তৃত বর্ণনাতেই কেবলমাত্র তাদের মধ্যেকার বৈচিত্র্য ধরা পড়ে। কোশতত্ত্বই সজীব বস্তুর দেহ গঠনের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে লুক্কায়িত একক সাধারণ সত্ত্বা অর্থাৎ সব ধরনের সজীব বস্তুর কোশীয় সংগঠনের উপর জোর দেয়। এই পাঠ এককের অন্তর্গত অধ্যায়গুলোতে কোশের গঠন এবং বিভাজনের মাধ্যমে কোশের বৃদ্ধি বর্ণনা করা হয়েছে। কোশতত্ত্ব জীবজ ঘটনাবলি অর্থাৎ শারীরবৃত্তীয় ও আচরণগত প্রক্রিয়াগুলোকে ঘিরেও এক রহস্যময় অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল। দৃশ্যমান বা প্রদর্শিত হবে এমন জীবজ ঘটনাবলির জন্য কোশীয় সংগঠনের সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা কী তা তখন দুর্বোধ্য ছিল। জীবের শারীরবৃত্তীয় ও আচরণগত প্রক্রিয়াগুলো অধ্যয়ন ও উপলব্ধি করার পরই কোশীয় সংগঠন ব্যাখ্যা করার জন্য শারীরবৃত্তীয় রাসায়নিক পথ অবলম্বন করতে পারে এবং তা অনুসন্ধানের জন্য কোশ মুক্ত পদ্ধতি (Cell-free System) ব্যবহার করতে পারে। এই শারীরবৃত্তীয় রাসায়নিক পথ বিভিন্ন জীবজ প্রক্রিয়াগুলোকে আণবিক পরিভাষার মাধ্যমে বর্ণনা করতে আমাদের সক্ষম করে তোলে। কোশে উপস্থিত বিভিন্ন খনিজ মৌল ও যৌগগুলোকে জানার জন্য সজীব কলার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন এবং এই বিশ্লেষণের মাধ্যমেই শারীরবৃত্তীয় রাসায়নিক পথ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে আমরা সজীব বস্তুতে কী কী ধরনের জৈব যৌগ উপস্থিত তা আমরা জানতে পারি। পরবর্তী পর্যায়ে এই প্রশ্ন মনে আসতে পারে যে এই যৌগগুলো কোশের ভেতরে কী কাজ করে এবং এরা কীভাবে পরিপাক, রেচন, স্মৃতি, প্রতিরক্ষা, শনাক্তকরণ ইত্যাদির মতো প্রধান শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন হতে সাহায্য করে? অন্যভাবে বললে সব শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার আণবিক ভিত্তি কী? এই প্রশ্নটির উত্তর কী হবে তা নিয়েও আমরা ভাবতে পারি। এই শারীরবৃত্তীয় রাসায়নিক পথ রোগগ্রস্থ অবস্থায় দেহে অস্বাভাবিকভাবে যে প্রক্রিয়াগুলো চলে তাও ব্যাখ্যা করতে পারে। এই শারীরবৃত্তীয় রাসায়নিক পথ যা সজীব বস্তুর অধ্যয়নে বা এদেরকে বুঝতে সাহায্য করে তাকে রিডাকশানিস্ট বায়োলজি (Reductionist Biology) বলে। এক্ষেত্রে জীববিদ্যাকে ভালোভাবে বোঝার জন্য পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার ধারণা ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়। এই এককের নবম অধ্যায়ে জৈব অণু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

G.N. Ramachandran
(1922 – 2001)

প্রোটিনের গঠন বিষয়ক ক্ষেত্রের সুবিদিত বিজ্ঞানী জিএন রামচন্দ্রন ছিলেন 'মাদ্রাজ স্কুল অফ্ কনফরমেশানেল অ্যানালাইসিস অফ্ বায়োপলিমার' এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কোলাজেন এর ত্রৈমাত্রিক গঠন আবিষ্কার করেছিলেন এবং এই আবিষ্কারের বিষয়টি 1954 সালে 'নেচার' (Nature) নামক সায়েন্স জার্নাল-এ প্রকাশিত হয়। রামচন্দ্রন প্লট (Ramchandran Plot) ব্যবহার করে তাঁর প্রোটিনের অনুমোদিত গঠনের বিশ্লেষণ সংক্রান্ত গবেষণা গাঠনিক জীববিদ্যার সবচেয়ে অবিদিত অবদানগুলোর মধ্যে একটি। তিনি 1922 সালের 8 অক্টোবর ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলবর্তী কোচিনের অনতিদূরের একটি ছোটো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্থানীয় একটি কলেজে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। রামচন্দ্রনের গণিতের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টিতে তাঁর পিতার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। স্কুলজীবন শেষ করার পর 1942 সালে রামচন্দ্রন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিক্স অনার্স-এ ডিগ্রি লাভ করেন এবং এই পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। 1949 সালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Ph.D ডিগ্রি লাভ করেন। কেমব্রিজ এ থাকাকালীন সময়ে রামচন্দ্রনের Linus Pauling এর সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং Pauling এর প্রকাশিত প্রোটিনের 'α helix ও β' Sheet গঠন তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং কোলাজেন-এর গঠন বিষয়ক সমস্যা সমাধানের দিকে তার মনোযোগ ধাবিত হয়। 2001 সালের 7 এপ্রিল 78 বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

অধ্যায় - 8 (Chapter 8)

কোশ: জীবনের একক
(Cell: The Unit of Life)

8.1 কোশ কী?

8.2 কোশতত্ত্ব

8.3 কোশের নিরীক্ষণ

8.4 প্রোক্যারিওটিক কোশসমূহ

8.5 ইউক্যারিওটিক কোশসমূহ

যখন তুমি তোমার চারপাশে তাকাবে তখন তুমি সজীব ও জড় এ দু'ধরনের বস্তুই দেখতে পাবে। তোমার বিস্ময়াবিষ্ট ও অনুসন্ধিৎসু মনে নিশ্চয়ই এ প্রশ্ন কখনও না কখনও এসেছে যে কী সেই বস্তু যা জীবের সজীব অবস্থার জন্য দায়ী কিংবা জড় পদার্থের মধ্যে কী নেই যেটা সজীব পদার্থের মধ্যে আছে। এই আলোচনার উত্তর হল কোশ - জীবনের মৌলিক একক যা সমস্ত জীবের মধ্যেই রয়েছে।

সব সজীব বস্তুই কোশের সমন্বয়ে গঠিত। কিছু সংখ্যক জীব একটি মাত্র কোশ নিয়ে গঠিত, যাদের এককোশী জীব বলে। আবার আমাদের মতো অন্যান্য জীব যাদের দেহ অসংখ্য কোশের সমন্বয়ে গঠিত তাদের বহুকোশী জীব বলে।

8.1 কোশ কী (What is a Cell)?

এককোশী জীব তার (i) স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে এবং (ii) জীবনের মৌলিক কার্যাবলি সম্পাদন করতে সক্ষম। কোশীয় সংগঠন সম্পূর্ণ হয়নি এমন কোশের ক্ষেত্রে স্বাধীন সজীব সত্তা সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়। কাজেই কোশ হচ্ছে সব সজীববস্তুর মৌলিক গঠনগত ও কার্যগত একক।

এন্টন ভন লিউয়েনহুক সর্বপ্রথম একটি সজীব কোশকে পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা করেন। পরবর্তীকালে রবার্ট ব্রাউন কোশের নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার এবং এর ক্রমোন্নতির মাধ্যমে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে কোশের সব গঠনগত খুঁটিনাটি উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে।

8.2 কোশতত্ত্ব (Cell Theory)

1838 সালে জার্মান উদ্ভিদবিদ ম্যাথিয়াস স্লেইডেন বিশাল সংখ্যক উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন যে সব উদ্ভিদরাই বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য কোশ নিয়ে গঠিত এবং এই কোশগুলো উদ্ভিদদেহে কলা গঠন করে।

প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ 1839 সালে ব্রিটিশ প্রাণী বিজ্ঞানী থিওডোর স্বোয়ান বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য প্রাণী কোশ অধ্যয়ন করেন এবং তার বক্তব্য ছিল এই যে প্রতিটি কোশকে ঘিরে একটি পাতলা আবরণী বর্তমান। এই আবরণীটিই বর্তমানে প্লাজমা পর্দা নামে পরিচিত। উদ্ভিদকলা অধ্যয়নের উপর ভিত্তি করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কোশ প্রাচীরের উপস্থিতি উদ্ভিদ কোশগুলোর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। আবার এর উপর ভিত্তি করে স্বোয়ান এই তত্ত্ব উপস্থাপন করেন যে প্রাণী ও উদ্ভিদদেহ কোশ এবং কোশ থেকে উৎপাদিত পর্দাথ দ্বারা গঠিত।

স্লেইডেন এবং স্বোয়ান যৌথভাবে কোশতত্ত্ব প্রবর্তন করেন। তবে কীভাবে নতুন কোশগুলো উৎপন্ন হয়েছে তা এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেনি। রুডলং ভিরচে (1855) সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা করেন যে কোশগুলো বিভাজিত হয় এবং নতুন কোশগুলো দেহে আগে থেকে উপস্থিত কোশগুলো থেকে উৎপন্ন হয় (omnis cellula-e cellula)। তিনি স্লেইডেন ও স্বোয়ানের তত্ত্বকে পরিমার্জিত করে কোশতত্ত্বকে চূড়ান্ত রূপদান করেন। বর্তমানে কোশতত্ত্ব বলতে যা বোঝায় তা হল -

(i) সব সজীব বস্তুই কোশ এবং কোশ থেকে উৎপন্ন পদার্থ দ্বারা গঠিত।

(ii) সব কোশই দেহে আগে থেকে উপস্থিত কোশগুলো থেকে উৎপন্ন হয়।

8.3 কোশের নিরীক্ষণ (An Overview of Cell)

পূর্বে তোমরা পেঁয়াজের কোশ অথবা মানুষের গালের ভেতরের কোশ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করেছ। চলো, আমরা তাদের গঠন আবার মনে করি। পেঁয়াজের কোশ হল একটি আদর্শ উদ্ভিদ কোশ যার একটি সুস্পষ্ট কোশপ্রাচীর রয়েছে। এই কোশপ্রাচীর কোশটির বহিঃসীমানারূপে অবস্থান করে এবং এর ঠিক ভেতরেই রয়েছে কোশপর্দা বা প্লাজমাপর্দা। মানুষের গালের ভেতরের কোশসমূহের সীমা নির্দেশকারী গঠন হিসাবে একটি বহিঃপর্দা রয়েছে। প্রতিটি কোশের অভ্যন্তরে অবস্থিত পর্দাবৃত ঘনসন্নিবিষ্ট গঠনটিকে নিউক্লিয়াস বলা হয়। এই নিউক্লিয়াসেই ক্রোমোজোম থাকে যা বংশগত বস্তু DNA কে ধারণ করে। যেসব কোশসমূহে পর্দাবৃত নিউক্লিয়াস থাকে তাদের ইউক্যারিওটিক কোশ, আবার যেসব কোশসমূহে পর্দাবৃত নিউক্লিয়াস থাকে না তাদের প্রোক্যারিওটিক কোশ বলা হয়। প্রোক্যারিওটিক ও ইউক্যারিওটিক উভয় প্রকার কোশেই অর্ধতরল ধাত্র সাইটোপ্লাজম কোশের সমগ্র স্থান জুড়ে থাকে। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় কোশেই সাইটোপ্লাজম হল কোশীয় কার্যকলাপের প্রধান ক্ষেত্র। কোশকে সজীব অবস্থায় রাখার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ এই অংশেই ঘটে।

ইউক্যারিওটিক কোশে নিউক্লিয়াসের পাশাপাশি অন্যান্য পর্দাবৃত সুস্পষ্ট গঠন যেমন, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম (ER), গলগিবস্তু, লাইসোজোম, মাইটোকন্ড্রিয়া, মাইক্রোবডি এবং কোশগহ্বর রয়েছে। প্রোক্যারিওটিক কোশে এই ধরনের পর্দাবৃত কোশীয় অঙ্গাণু থাকে না।

রাইবোজোমগুলো হল এমন পর্দাবিহীন অঙ্গাণু যেগুলো প্রোক্যারিওটিক ও ইউক্যারিওটিক উভয় ধরনের কোশেই পাওয়া যায়। রাইবোজোম কেবলমাত্র কোশের সাইটোপ্লাজমেই নয়, অপর দুটি কোশীয় অঙ্গাণু ক্লোরোপ্লাস্ট (উদ্ভিদে) ও মাইটোকন্ড্রিয়া এবং অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামেও থাকে। প্রাণীকোশে অপর একটি পর্দাবিহীন অঙ্গাণু থাকে যা কোশ বিভাজনে সাহায্য করে, এটিকে সেন্ট্রিওল বলে।

আকার, আকৃতি ও কার্যের নিরিখে কোশের মধ্যে ব্যাপক ভিন্নতা রয়েছে (চিত্র 8.1)। উদাহরণস্বরূপ, ক্ষুদ্রতম কোশ মাইকোপ্লাজমা মাত্র 0.3 μm লম্বা, যেখানে ব্যাকটেরিয়া 3.5 μm পর্যন্ত লম্বা হতে পারে।

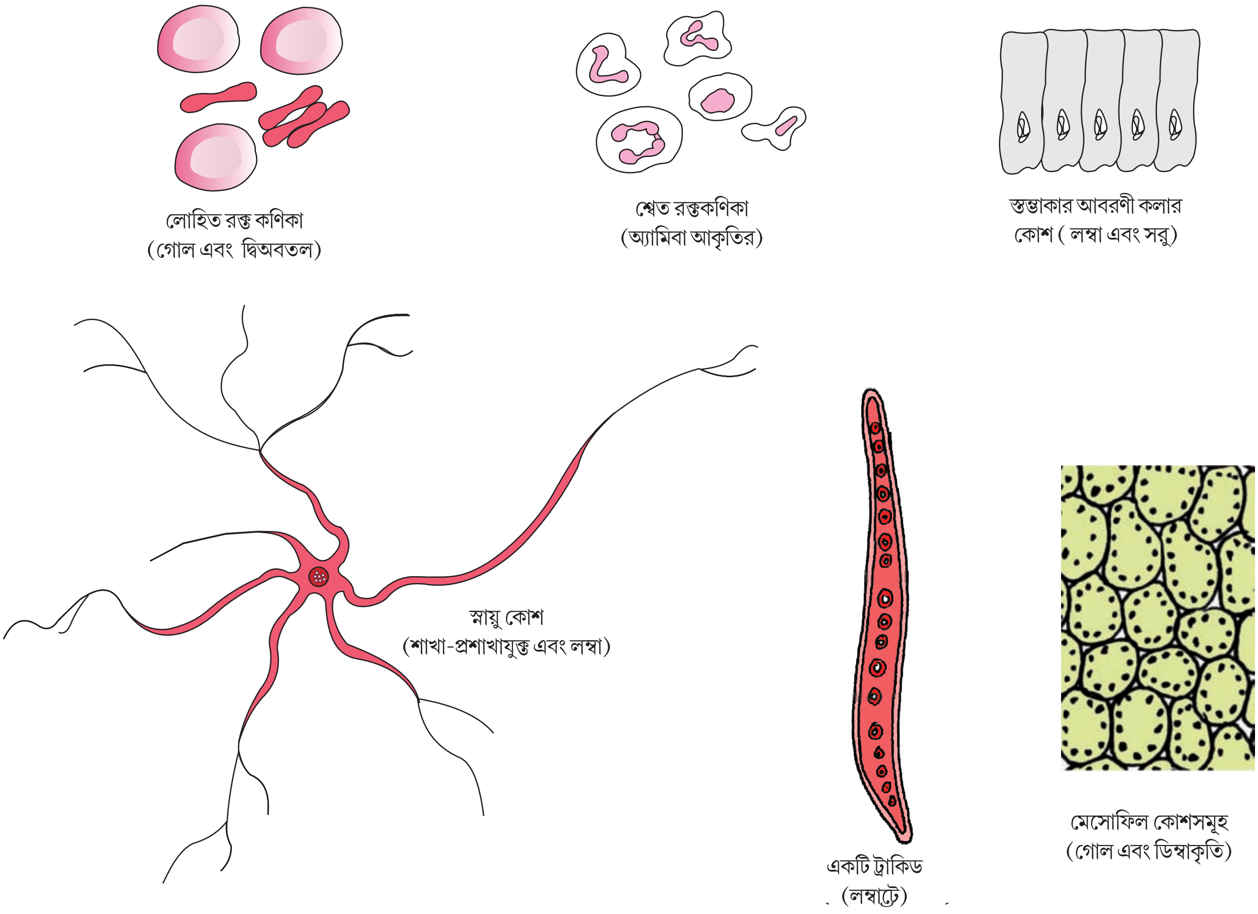

চিত্র 8.1 : বিভিন্ন আকৃতির কোশ দেখানো হয়েছে।

বৃহত্তম পৃথকীকৃত একক কোশ হচ্ছে উটপাখির ডিম। বহুকোশী জীবদের মধ্যে মানুষের লোহিত রক্ত কণিকার ব্যাস প্রায় 7.0 µm। কয়েকটি দীর্ঘতম কোশের মধ্যে স্নায়ুকোশ একটি। কোশ তাদের আকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের হয়। এগুলো চাকতি আকৃতির, বহুভূজাকৃতি, স্তম্ভাকৃতি, ঘনকাকৃতি, সূত্রের ন্যায়, এমনকি অনিয়মিত আকৃতিরও হতে পারে। কাজের উপর ভিত্তি করে কোশের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

8.4 প্রোক্যারিওটিক কোশ (Prokaryotic Cells)

ব্যাকটিরিয়া, নীলাভ-সবুজ শৈবাল, মাইকোপ্লাজমা এবং পিপিএলও (Pleuro Pneumonia Like Organisms) হল প্রোক্যারিওটিক কোশ। এরা সাধারণত ক্ষুদ্রাকার হয় এবং ইউক্যারিওটিক কোশের তুলনায় দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি করে (চিত্র 8.2)। এরা আকার ও আকৃতিতে ভিন্ন ধরনের হতে পারে। আকৃতি অনুযায়ী ব্যাকটিরিয়া মূলত: চার প্রকার — ব্যাসিলাস (দণ্ডাকার), কক্কাস (গোলাকার), ভিব্রিও (কমা চিহ্নের মতো) এবং স্পাইরিলাম (প্যাঁচানো)।

প্রোক্যারিওটিক জীবদের মধ্যে বিস্তৃত পরিসরে আকৃতিগত ও কার্যগতভাবে ভিন্নতা থাকলেও এদের কোশের মৌলিক সংগঠন একই রকমের হয়।

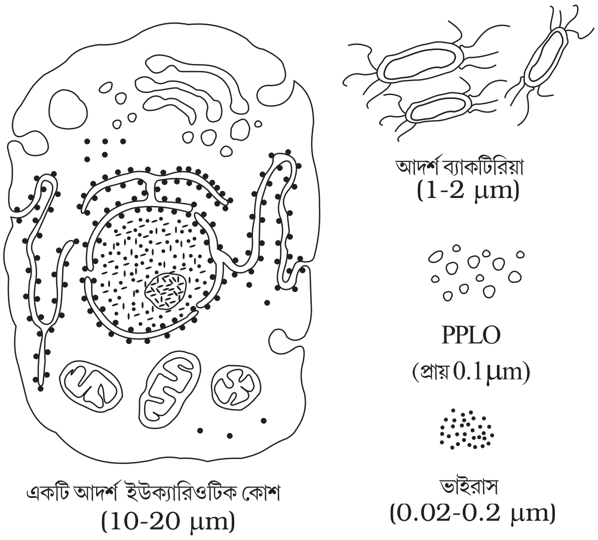

চিত্র 8.2 ঃচিত্রে ইউক্যারিওটিক কোশের সঙ্গে অন্যান্য জীবের তুলনা করা হয়েছে।

মাইকোপ্লাজমা ব্যাতীত সমস্ত প্রোক্যারিওটিক কোশে কোশ পর্দাকে ঘিরে কোশ প্রাচীর বর্তমান। যে তরল ধাত্র দ্বারা কোশ পূর্ণ থাকে তা হল সাইটোপ্লাজম। এদের সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস থাকে না। বংশগত বস্তু প্রকৃতপক্ষে নগ্ন এবং নিউক্লিয়পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে না। অনেক ব্যাকটিরিয়াতে জিনোমিক DNA (একটি একক ক্রোমোজোম/চক্রাকার DNA) ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার DNA রয়েছে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র DNA গুলোকে প্লাজমিড বলা হয়। প্লাজমিড DNA ঐ সমস্ত ব্যাকটিরিয়াতে কিছু স্বতন্ত্র বহিঃলক্ষণের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এই ধরনের একটি বৈশিষ্ট্য হল অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ক্ষমতা। উপরের শ্রেণিতে তোমরা শিখবে যে, এই প্লাজমিড DNA কে বহিরাগত DNA-র সঙ্গে যুক্ত করে ব্যাকটিরিয়ার রূপান্তরভবণ পরিচালনায় ব্যবহার করা হয়। ইউক্যারিওটিক কোশে নিউক্লিও পর্দা থাকে। রাইবোজোম ছাড়া ইউক্যারিওটিক কোশের আর কোনো কোশীয় অঙ্গাণু থাকে না। অজীবীয় বস্তু (Cell inclusions) রূপে কিছু স্বতন্ত্র বস্তু প্রোক্যারিওটিক কোশে পাওয়া যায়। কোশ পর্দার একটি বিশেষিত ও বিভেদিত গঠন হল মেসোজোম এবং কোশে এর উপস্থিতি প্রোক্যারিওটিকদের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মেসোজোমগুলো কোশ পর্দার অত্যাবশ্যকীয় অন্তর্ভাজ।

8.4.1 কোশ আবরক এবং এর রূপান্তরসমূহ

(Cell Envelope and its Modifications)

অধিকাংশ প্রোক্যারিওটিক কোশে বিশেষত ব্যাকটিরিয়ার কোশে জটিল রাসায়নিক গঠন বিশিষ্ট কোশ আবরক রয়েছে। কোশ আবরক হল দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ত্রিস্তরী গঠন অর্থাৎ সর্ববহিস্থ গ্লাইকোক্যালিক্স, এরপর কোশ প্রাচীর ও এর ভেতরের প্লাজমাপর্দা। যদিও কোশ আবরকের প্রতিটি স্তর এক একটি স্বতন্ত্র কাজ সম্পন্ন করে, তবে এরা একসাথে একটি রক্ষণাত্মক একক হিসাবে কাজ করে। বিজ্ঞানী 'গ্রাম' আবিষ্কৃত রঞ্জিতকরণ পদ্ধতিতে সাড়া দেওয়া এবং কোশ আবরকের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে ব্যাকটিরিয়াকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা যে সমস্ত ব্যাকটিরিয়া গ্রাম রঞ্জক দ্বারা স্থায়ীভাবে রঞ্জিত হয় তাদের গ্রাম-পজিটিভ এবং যাদের ক্ষেত্রে এরূপ হয় না তাদের গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়া বলা হয়।

বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়াতে গ্লাইকোক্যালিক্সের উপাদান এবং স্থূলত্ব ভিন্ন ভিন্ন হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা শিথিল আবরণী রূপে থাকতে পারে, একে স্লাইম স্তর বলে। আবার কখনো-কখনো এটা পুরু এবং দৃঢ় হয়, একে ক্যাপসুল বলে। কোশ প্রাচীর কোশের আকৃতি নির্ধারণ করে এবং কোশকে গঠনগতভাবে যান্ত্রিক দৃঢ়তা প্রদান করে যা ব্যাকটিরিয়াকে চুপসে যাওয়া বা বিদীর্ণ হওয়া থেকে রক্ষা করে।

প্লাজমাপর্দা অর্ধভেদ্য প্রকৃতির এবং বহিঃপরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়াশীল। এই পর্দাটি গঠনগতভাবে ইউক্যারিওটিক কোশের সঙ্গে সদৃশ।

মেসোজোম একটি পর্দাযুক্ত বিশেষ গঠন যা কোশের ভিতরের দিকে কোশ পর্দার উপবৃদ্ধি দ্বারা গঠিত হয়। এই উপবৃদ্ধিগুলো থলি আকারের, নলাকার বা ল্যামেলিয় আকারের হয়।

এরা কোশপ্রাচীর গঠন, DNA-র প্রতিলিপিকরণ ও অপত্য কোশে DNA বিতরণে সাহায্য করে। এরা শ্বসন, ক্ষরণ পদ্ধতি, কোশপর্দার তল ও উৎসেচকের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সায়ানোব্যাকটিরিয়াদের মতো কিছু প্রোক্যারিওটিক জীবে রঞ্জক পদার্থ সমন্বিত আরও কিছু কোশপর্দার উপবৃদ্ধি সাইটোপ্লাজমের দিকে থাকে, এদের ক্রোমাটোফোর বলা হয়।

ব্যাকটিরিয়ার কোশ চলনে সক্ষম বা চলনে অক্ষম হতে পারে। যদি চলনে সক্ষম হয় তাহলে তাদের কোশপ্রাচীর থেকে সূক্ষ্ম তন্তুময় প্রলম্বিত অংশ বের হয়, একে ফ্ল্যাজেলা বলে। ব্যাকটিরিয়ার ফ্ল্যাজেলা তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত-ফিলামেন্ট, হুক এবং বেসালবডি। ফিলামেন্ট হল দীর্ঘতম অংশ যা কোশীয়তল থেকে বাইরের দিকে নির্গত হয়।

ফ্ল্যাজেলা ছাড়াও ব্যাকটিরিয়ার কোশীয়তল থেকে পিলি ও ফিমব্রি নামক দু'ধরনের গঠনও নির্গত হতে দেখা যায় কিন্তু এরা চলনে কোনো ভূমিকা পালন করে না। পিলি হল এক ধরনের লম্বাটে নলাকার গঠন যা একটি বিশেষ প্রোটিন দ্বারা গঠিত। ফিমব্রিগুলো কোশ থেকে নির্গত ক্ষুদ্র শুঁড়ের মতো সূত্র। কিছু কিছু ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে এগুলো ব্যাকটিরিয়াকে স্রোতযুক্ত জলে উপস্থিত পাথরের গায়ে এবং পোষক কলার সাথে যুক্ত থাকতে সাহায্য করে।

8.4.2 রাইবোজোম এবং অজীবীয় বস্তুসমূহ (Ribosomes and Inclusion Bodies)

প্রোক্যারিওটিক কোশে রাইবোজোম কোশের প্লাজমাপর্দা সংলগ্ন থাকে। এদের আকার প্রায় 15 nm থেকে 20 nm পর্যন্ত হয় এবং এরা 50s ও 30s এ দুটি অধঃএককের সমন্বয়ে গঠিত। এই অধ:এককদ্বয় যখন একসাথে যুক্ত থাকে তখন 70s প্রোক্যারিওটিক রাইবোজোম গঠন করে। রাইবোজোম হল প্রোটিন সংশ্লেষণের স্থান। অনেকগুলো রাইবোজোম একটি mRNA-র সঙ্গে যুক্ত থেকে একটি শৃঙ্খল গঠন করতে পারে, যাকে পলিজোম বা পলিরাইবোজোম বলা হয়। একটি পলিজোমের রাইবোজোমগুলো mRNA-র বার্তা অনুসারে প্রোটিন সংশ্লেষ ঘটায়।

অজীবিয় বস্তুসমূহ : প্রোক্যারিওটিক কোশের সঞ্চিত বস্তু কোশের সাইটোপ্লাজমে অজীবিয় বস্তু হিসাবে জমা থাকে। এগুলো কোনো প্রকার পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে না এবং সাইটোপ্লাজমে মুক্ত অবস্থায় থাকে, উদাহরণ—ফসফেট দানা, সায়ানোফাইসিয়ান দানা এবং গ্লাইকোজেন দানা। নীলাভ-সবুজ শৈবাল এবং বেগুনি ও সবুজ সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটিরিয়াতে গ্যাসগহ্বর দেখা যায়।

8.5 ইউক্যারিওটিক কোশ (Eukaryotic Cells)

সমস্ত প্রোটিস্টা, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং ছত্রাক এরা সকলেই ইউক্যারিওটিকের অন্তর্ভুক্ত। ইউক্যারিওটিক কোশগুলোতে পর্দাবৃত অঙ্গাণুর উপস্থিতির কারণে কোশের সাইটোপ্লাজম বিস্তৃতভাবে কিছু প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকে। ইউক্যারিওটিক কোশে নিউক্লিয়ার পর্দাবৃত একটি সংগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে। এছাড়াও ইউক্যারিওটিক কোশে বিভিন্ন ধরনের জটিল গমনঅঙ্গ এবং সাইটোপ্লাজমীয় কঙ্কাল থাকে। এদের জীনগতবস্তু ক্রোমোজোমে সুসংসবদ্ধভাবে থাকে।

সব ইউক্যারিওটিক কোশ একইরকম নয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীকোশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে কারণ প্রথমটিতে কোশপ্রাচীর, প্লাসটিড এবং কেন্দ্রীয় বৃহদাকার কোশগহ্বর রয়েছে যেগুলো আবার প্রাণীকোশে অনুপস্থিত। অপরদিকে, প্রাণীকোশে সেন্ট্রিওল থাকে যা সমস্ত উদ্ভিদকোশে প্রায় অনুপস্থিত (চিত্র 8.3)।

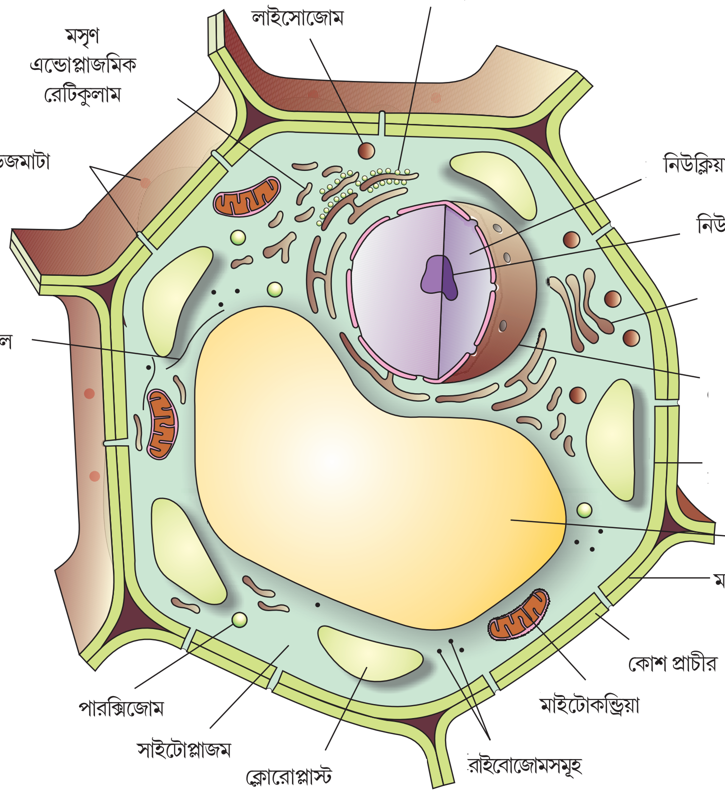

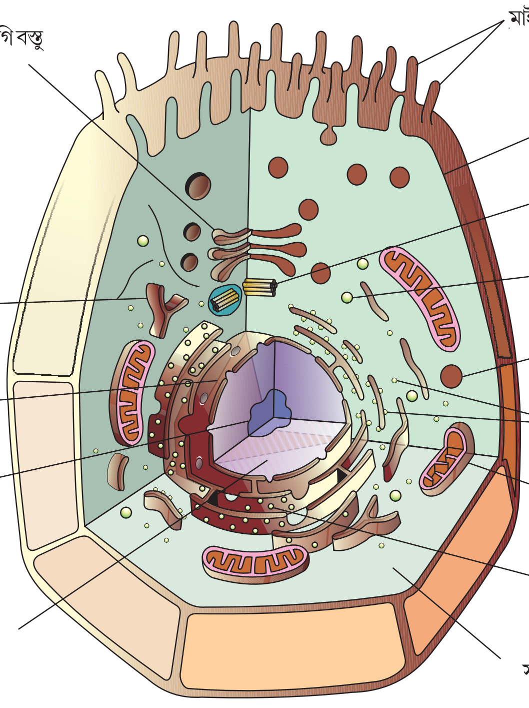

চিত্র 8.3 ঃ চিত্রে (ক) উদ্ভিদ কোশ (খ) প্রাণীকোশ দেখানো হয়েছে।

চলো এখন আমরা প্রতিটি কোশ অঙ্গাণুর গঠন এবং কাজ আলাদাভাবে দেখি।

8.5.1 কোশপর্দা (Cell Membrane)

1950 -এর দশকে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর কোশপর্দার গঠন বিস্তৃতভাবে জানা যায়। ইতোমধ্যে কোশপর্দার রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে অধ্যয়ন, বিশেষত মানুষের লোহিত রক্তকণিকার (RBCs) কোশপর্দার গঠন, বিজ্ঞানীদেরকে কোশপর্দার সম্ভাব্য গঠন বের করতে সহায়তা করেছে।

কোশপর্দার গঠন সম্পর্কিত এই অধ্যয়ন থেকে এটা জানা যায় যে, কোশপর্দা প্রধানত লিপিড ও প্রোটিন নিয়ে গঠিত। প্রধান লিপিডগুলো হল ফসফোলিপিড এবং এরা দুটি স্তরে সজ্জিত থাকে। লিপিড অণুগুলো পর্দায় এমনভাবে বিন্যস্ত থাকে যে এদের মেরু প্রান্ত (Polar head) বাইরের দিকে এবং জলবিরাগী প্রান্ত (Hydrophobic tail) ভিতরের দিকে থাকে। এই সজ্জা সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের নন-পোলার প্রান্তকে জলীয় পরিবেশ থেকে সুরক্ষিত রাখার বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করে (চিত্র 8.4)। ফসফোলিপিড ছাড়া কোশপর্দায় কোলেস্টেরলও থাকে। কোশপর্দার লিপিড অংশ প্রধানত ফসফোগ্লিসারাইড দ্বারা গঠিত।

পরবর্তীকালে জৈব রাসায়নিক পরীক্ষানিরীক্ষায় সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে কোশপর্দায় প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেটও বর্তমান। প্রকৃতি অনুযায়ী কোশপর্দায় লিপিড ও প্রোটিনের অনুপাত ভিন্ন ভিন্ন হয়। মানুষের লোহিত রক্তকণিকার কোশপর্দায় মোটামুটিভাবে 52% প্রোটিন এবং 40% লিপিড থাকে।

নিষ্কাশনের সুবিধার উপর নির্ভর করে পর্দাস্থিত প্রোটিনকে অন্তস্থ (Integral) এবং প্রান্তীয় (Peripheral) প্রোটিনে শ্রেণিবিভক্ত করা যায়। প্রান্তীয় প্রোটিনগুলো পর্দার পৃষ্ঠীয় তলে আর অন্তস্থ প্রোটিনগুলো কোশপর্দায় আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত থাকে।

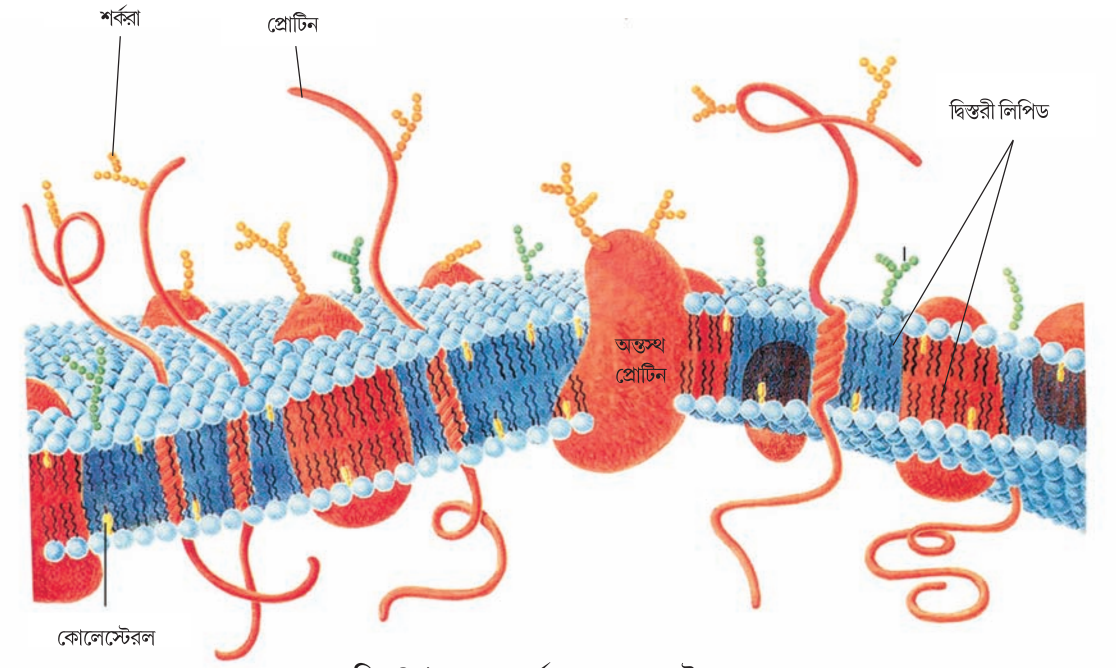

চিত্র 8.4 ঃ প্লাজমাপর্দার তরল মোজেইক নক্সা।

বিজ্ঞানী সিঙ্গার ও নিকলসন (1972) কোশপর্দার উন্নত গঠনের একটি মডেল উপস্থাপন করেছেন যা তরল মোজেইক নক্সা রূপে সর্বাধিক স্বীকৃত হয়েছে (চিত্র 8.4)। এই মডেল অনুযায়ী কোশপর্দা ফসফোলিপিড অণুর একটি দ্বিস্তরী অর্ধতরল সংগঠন যার মধ্যে প্রোটিন অণুগুলো পার্শ্ব চলনে সক্ষম। কোশপর্দার প্রোটিন অণুর চলনের এই ক্ষমতা কোশপর্দার তারল্য (Fluidity) রূপে গণ্য করা হয়।

কোশের বৃদ্ধি, আন্ত: কোশীয় সংযোগ তৈরি, ক্ষরণ, এন্ডোসাইটোসিস ইত্যাদির মতো কার্যকারিতার দিক থেকেও কোশপর্দার তরলায়িত প্রকৃতিটি গুরুত্বপূর্ণ।

একটি কোশপর্দার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল এই যে, এই পর্দার মধ্য দিয়ে অণুগুলোর স্থানান্তরণ ঘটানো। এই পর্দাটি প্রভেদক ভেদ্য হওয়ায় এর উভয়দিকে উপস্থিত কিছু কিছু অণু এর মধ্য দিয়ে চলাচল করতে পারে। শক্তির ব্যবহার ছাড়াই প্লাজমাপর্দার মধ্য দিয়ে অনেক অণুর পরিবহণ ঘটে। একে নিষ্ক্রিয় পরিবহণ (Passive Transport) বলে। কোশপর্দার মধ্য দিয়ে প্রশমদ্রাব সাধারণত সরল ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ঘনত্বের অবক্রমের স্বপক্ষে অর্থাৎ বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে পরিবাহিত হয়। এই পর্দার মাধ্যমে জলও বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বের দিকে পরিবাহিত হতে পারে। ব্যাপন প্রক্রিয়া দ্বারা জলের পরিবহণকে অভিস্রবণ বলে। পোলার অণুগুলো যেহেতু দ্বিস্তরযুক্ত লিপিডের নন্‌পোলার অংশের মধ্য দিয়ে চলাচল করতে পারে না, সেহেতু কোশপর্দার মধ্য দিয়ে সহজে পরিবাহিত হওয়ার জন্য পর্দাস্থিত একটি বাহক প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। কিছু আয়ন বা অণু ঘনত্বের তারতম্যের বিপরীতে অর্থাৎ কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের দিকে কোশপর্দার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। এই ধরনের পরিবহণ একটি শক্তি নির্ভর প্রক্রিয়া যেখানে ATP ব্যবহৃত হয় এবং একে সক্রিয় পরিবহণ বলে। যেমন - Na^+/ K^+ পাম্প।

8.5.2 কোশপ্রাচীর (Cell Wall)

তুমি হয়তো মনে করতে পারছ, একটি জড়, দৃঢ় গঠন ছত্রাক ও উদ্ভিদ কোশের কোশপর্দাকে ঘিরে একটি বহিঃআবরণী গঠন করে যাকে কোশপ্রাচীর বলে। কোশপ্রাচীর শুধুমাত্র কোশের আকৃতিই প্রদান করে না, কোশকে যান্ত্রিক আঘাত ও সংক্রমণ থেকেও রক্ষা করে। এটি কোশের সঙ্গে কোশের মিথস্ক্রিয়া বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং অবাঞ্ছিত বৃহৎ অণুসমূহের অনুপ্রবেশে বাধা দেয়। শৈবালেও কোশপ্রাচীর রয়েছে যা সেলুলোজ, গ্যালাকট্যানস্, ম্যানোজ এবং খনিজ লবণ যেমন ক্যালসিয়াম কার্বনেটের মতো খনিজ লবণ নিয়ে গঠিত। অপরপক্ষে অন্যান্য উদ্ভিদে এটি সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, পেকটিন এবং প্রোটিন দ্বারা গঠিত। তরুণ উদ্ভিদকোশের কোশপ্রাচীর অর্থাৎ প্রাথমিক কোশপ্রাচীরটি বৃদ্ধি পেতে পারে যা কোশের পরিণতির সাথে সাথে অবলুপ্ত হয় এবং গৌণ কোশপ্রাচীরটি কোশের ভিতরের দিকে (কোশপর্দার দিকে) গঠিত হয়।

মধ্যচ্ছদা হল ক্যালসিয়াম পেকটেট্ দ্বারা গঠিত স্তর যা বিভিন্ন পার্শ্ববর্তী কোশগুলোকে একসঙ্গে ধরে রাখে বা আটকে রাখে। কোশপ্রাচীর এবং মধ্যচ্ছদা অনুপ্রস্থভাবে প্লাজমোডেজমাটার সাহায্যে পার্শ্ববর্তী কোশগুচ্ছের সাইটোপ্লাজমের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

8.5.3 এন্ডোমেমব্রেন সিস্টেম (Endomembrane System)

যদিও প্রতিটি পর্দাবৃত কোশীয় অঙ্গাণুগুলো গঠনগত ও কার্যগত দিক থেকে স্বতন্ত্র, তবে এদের মধ্যে বেশির ভাগেরই কাজগুলো সমন্বায়িত হওয়ায় এদের একসাথে একটি অন্তঃপর্দাতন্ত্র (Endomembrane

System) রূপে গণ্য করা হয়। এন্ডোপ্লাজমীয় জালক, গলগি বস্তু, লাইসোজোম এবং কোশগহ্বর অন্তঃপর্দাতন্ত্রের অন্তর্গত। যেহেতু মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট, পারঅক্সিজোমের কাজ উপরোক্ত উপাদানগুলোর কাজের সাথে সমন্বায়িত নয়, তাই এদের এই তন্ত্রের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয় না।

8.5.3.1 এন্ডোপ্লাজমীয় জালক (Endoplasmic Reticulum)

ইউক্যারিওটিক কোশের ইলেকট্রন আণুবীক্ষণিক অধ্যয়ন থেকে এটা প্রকাশিত হয় যে, কিছু অতি ক্ষুদ্র নলাকার গঠন জালকাকারে কোশের সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে এবং এদের এন্ডোপ্লাজমীয় জালক বলে। এই এন্ডোপ্লাজমীয় জালক কোশের অভ্যন্তরীণ অঞ্চলকে দুটি সুস্পষ্ট প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে। এগুলো হল - লুমিনাল (ER মধ্যস্থ) এবং এক্সট্রালুমিনাল (Cytoplasm) প্রকোষ্ঠ।

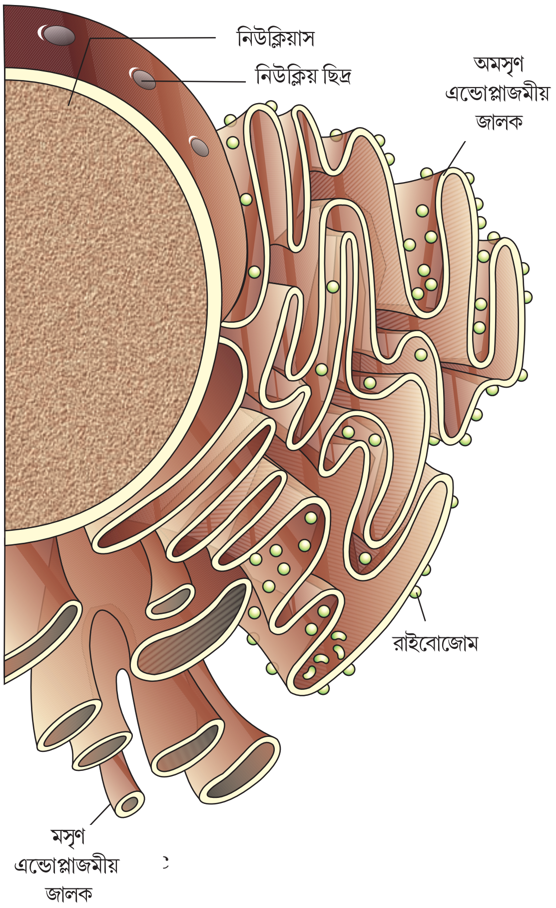

চিত্র 8.5 ঃ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম

এন্ডোপ্লাজমীয় জালকের বহিঃগাত্রে প্রায়শই রাইবোজোম আবদ্ধ থাকে। যেসব এন্ডোপ্লাজমীয় জালকের বহিঃগাত্রে রাইবোজোম যুক্ত থাকে তাদের অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমীয় জালক (RER) বলা হয়। রাইবোজোমের অনুপস্থিতিতে এন্ডোপ্লাজমীয় জালকদের মসৃণ দেখায়। তাই এদের মসৃণ এন্ডোপ্লাজমীয় জালক (SER) বলে।

প্রোটিন সংশ্লেষ ও ক্ষরণ কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী কোশে RER বেশি দেখা যায়। এরা বিস্তৃত হয় এবং নিউক্লিয়াসের বহি:পর্দার সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে।

মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম লিপিড সংশ্লেষের মুখ্য স্থান। প্রাণী কোশে লিপিডের মতো স্টেরয়েড হরমোনগুলো এন্ডোপ্লাজমীয় জালকে সংশ্লেষিত হয়।

8.5.3.2 গলগি বস্তু (Golgi apparatus)

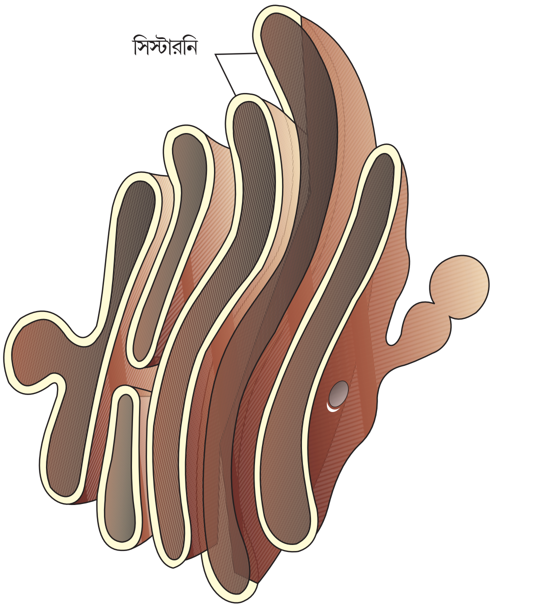

চিত্র 8.6 ঃ গলগি বস্তু

ক্যামিলো গলগি (1898) সর্বপ্রথম নিউক্লিয়াসের নিকটে গাঢ় রঙের রঞ্জিত জালকাকার গঠন পর্যবেক্ষণ করেন। পরবর্তীকালে তার নামানুসারে গলগিবডি নামকরণ করা হয়। বহু চ্যাপ্টা, চাকতি আকৃতি বিশিষ্ট থলি বা 0.5 μm - 1.0 μm ব্যাসবিশিষ্ট সিস্টারনি দ্বারা গলগি বস্তু গঠিত হয় (চিত্র 8.6)। এগুলো একটি অপরটির সাথে সমান্তরালে স্তূপীকৃত থাকে। গলগি বস্তুতে সিস্টারনির সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হয়। গলগি সিস্টারনিগুলো নিউক্লিয়াসের সন্নিকটে সমকেন্দ্রীকভাবে সজ্জিত থাকে এবং এটি সুস্পষ্ট উত্তল সিস্ (cis) বা সৃষ্টির তল (forming face) এবং অবতল ট্রান্স (trans) বা পরিণতির তল (maturing face) সমন্বিত হয়।

এই কোশ অঙ্গাণুর সিস্ (cis) এবং ট্রান্সতল (trans) সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন কিন্তু পরস্পর সংযুক্ত থাকে।

গলগিবস্তুর প্রধান কাজ হল উৎপন্ন পদার্থগুলোর প্যাকেজিং করা, এই পদার্থগুলোকে কোশমধ্যস্থ নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেওয়া বা কোশের বাইরে ক্ষরণ করা। ভেসিক্যালরূপে প্যাকেটজাত হবে এমন বস্তুগুলো ER থেকে বেরিয়ে এসে গলগিবস্তুর সৃষ্টিরতলে পরস্পর মিলিত হয় এবং পরিণতির তলের দিকে অগ্রসর হয়। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় গলগি বস্তু কেন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সঙ্গো ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে। অনেক প্রোটিন এন্ডোপ্লাজমীয় জালকের গাত্রস্থিত রাইবোজোম দ্বারা সংশ্লেষিত হয় এবং গলগিবস্তুর পরিণতির তল থেকে মুক্ত হওয়ার পূর্বে গলগি সিস্টারনিতে এই প্রোটিনগুলোর পরিবর্তন ঘটে। গ্লাইকোলিপিড ও গ্লাইকোপ্রোটিন তৈরির গুরুত্বপূর্ণ স্থান হল গলগিবস্তু।

8.5.3.3 লাইসোজোম (Lysosomes)

লাইসোজোম হল পর্দাবৃত থলির ন্যায় গঠন যেগুলো গলগিবস্তুতে প্যাকেজিং প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়। প্রতিটি একক লাইসোজোমীয় থলি প্রায় সব ধরনের আর্দ্র বিশ্লেষক উৎসেচক (হাইড্রোলেজ, লাইপেজ, প্রোটিয়েজ, কার্বোহাইড্রেজ) সমৃদ্ধ হয়। এই উৎসেচকগুলো আম্লিক pH-এ সর্বাধিক সক্রিয়। এই উৎসসেচকগুলো শ্বেতসার, প্রোটিন, লিপিড ও নিউক্লিক অ্যাসিডের পরিপাক ঘটাতে সক্ষম।

8.5.3.4 কোশগহ্বর (Vacuoles)

কোশগহ্বর হল সাইটোপ্লাজমস্থিত একটি পর্দাবৃত অঞ্চল। এতে জল, রস (sap), রেচনপদার্থ এবং কোশের অপ্রয়োজনীয় অন্যান্য পদার্থ থাকে। কোশগহ্বর যে একটি একক পর্দাদ্বারা আবৃত থাকে তাকে টোনোপ্লাস্ট বলে। উদ্ভিদকোশে কোশগহ্বর কোশের আয়তনের 90 শতাংশ স্থান জুড়ে থাকতে পারে।

উদ্ভিদ কোশে টোনোপ্লাস্ট ঘনত্বের অবক্রমের বিপক্ষে কোশগহ্বরের ভেতরে বহু আয়ন ও অন্যান্য বস্তুর পরিবহণে সহায়তা করে। তাই সাইটোপ্লাজমের তুলনায় কোশগহ্বরের ভেতরে ঐ বস্তুগুলোর ঘনত্ব অনেকটাই বেশি হয়।

অ্যামিবার রেচনে সংকোচনশীল গহ্বরটি (contractile vacuole) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেশির ভাগ কোশেই যেমন প্রোটিস্টদের কোশে খাদ্যকণা আত্মসাৎ-এর ফলে খাদ্যগহ্বর গঠিত হয়।

8.5.4 মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria)

মাইটোকন্ড্রিয়া (একবচনে মাইটোকন্ড্রিয়ন) যদি বিশেষভাবে রঞ্জিত করা না হয় তবে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে সহজে দৃশ্যমান হয় না। প্রতিটি কোশে মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যা কোশগুলোর শারীরবৃত্তীয় কার্যের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়। এদের আকার ও আকৃতির ক্ষেত্রেও কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একটি আদর্শ মাইটোকন্ড্রিয়া ডিসের মতো আকৃতিবিশিষ্ট (Sousage-shaped) বা বেলনাকার হয়, যার ব্যাস 0.2-1 μm (গড় 0.5 μm) এবং দৈর্ঘ্য 1.0-4.1 μm. প্রতিটি মাইটোকন্ড্রিয়া একটি দ্বিপর্দাবৃত গঠন দ্বারা আবৃত। এই পর্দা দুটিকে বহিঃপর্দা ও অন্তঃপর্দা বলে।

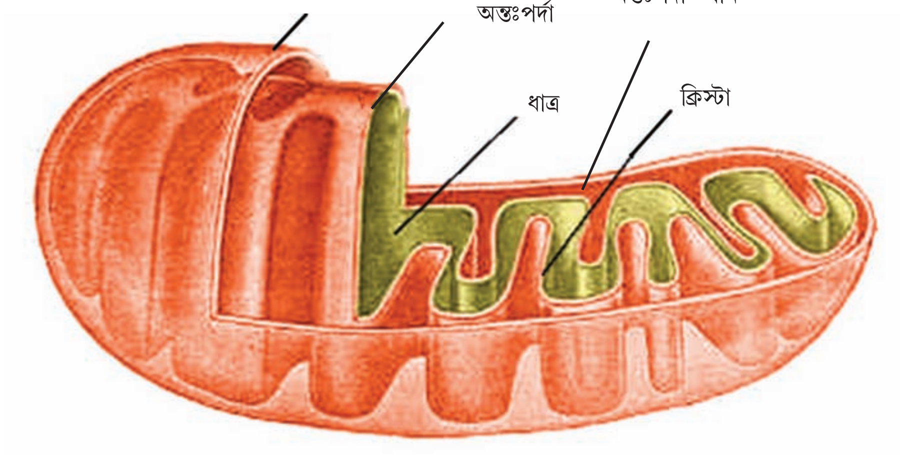

চিত্র 8.7 ঃ মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন (লম্বচ্ছেদ)

মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্তঃপ্রকোষ্ঠটি যে সমসত্ত্ব গাঢ় পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে তাকে মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্স বা ধাত্র বলে। বহিঃপর্দা এই কোশঅঙ্গাণুর অবিচ্ছিন্ন সীমানা গঠন করে। অন্তঃপর্দাটি ধাত্রের দিকে ভাঁজ হয়ে কতগুলো ক্রিস্টি গঠন করে (একবচনে ক্রিস্টা) (চিত্র 8.7)। ক্রিস্টি অন্তঃপর্দার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি করে। পর্দা দুটিতে তাদের নিজস্ব নির্দিষ্ট উৎসেচক রয়েছে যা মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। মাইটোকন্ড্রিয়া হল সবাত শ্বসনের স্থান। মাইটোকন্ড্রিয়াতে ATP রূপে কোশের শক্তি উৎপন্ন হয়। তাই এদের কোশের শক্তিঘর (Power houses) বলা হয়। মাইটোকন্ড্রিয়ার ধাত্রে একটি চক্রাকার DNA অণু, বহু RNA অণু, রাইবোজোম (70S) এবং প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদনসমূহ থাকে। মাইটোকন্ড্রিয়া দ্বিবিভাজনের (fission) মাধ্যমে বিভাজিত হয়।

8.5.5 প্লাস্টিড (Plastids)

প্লাস্টিড সব উদ্ভিদকোশে এবং ইউগ্লিনয়েডে পাওয়া যায়। এরা আকারে বড়ো হওয়ায় সহজেই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা যায়। এগুলোতে কিছু সুনির্দিষ্ট রঞ্জক থাকায় এরা উদ্ভিদের সুনির্দিষ্ট বর্ণ সৃষ্টি করে। রঞ্জক পদার্থের ধরন অনুসারে প্লাস্টিডকে ক্লোরোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্ট এবং লিউকোপ্লাস্টে ভাগ করা যায়।

ক্লোরোপ্লাস্টে ক্লোরোফিল এবং ক্যারোটিনয়েড রঞ্জক থাকে যা সালোকসংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় সৌরশক্তি আবদ্ধকরণের জন্য দায়ী। ক্রোমোপ্লাস্টে স্নেহপদার্থে দ্রাব্য ক্যারোটিনয়েড রঞ্জক যেমন, ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল এবং অন্যান্য রঞ্জক পদার্থ থাকে। এই রঞ্জকগুলোর উপস্থিতির জন্য উদ্ভিদের কোনো কোনো অংশ হলুদ, কমলা বা লাল রঙের হয়। লিউকোপ্লাস্টগুলো সঞ্চিত পরিপোষক সমন্বিত ভিন্ন আকার ও আকৃতির বর্ণহীন প্লাস্টিড। অ্যামাইলোপ্লাস্ট কার্বোহাইড্রেট (স্টার্চ) সঞ্চয় করে, যেমন আলু; ইলাইওপ্লাস্ট তেল ও চর্বি সঞ্চয় করে এবং এলিউরোপ্লাস্ট প্রোটিন সঞ্চয় করে।

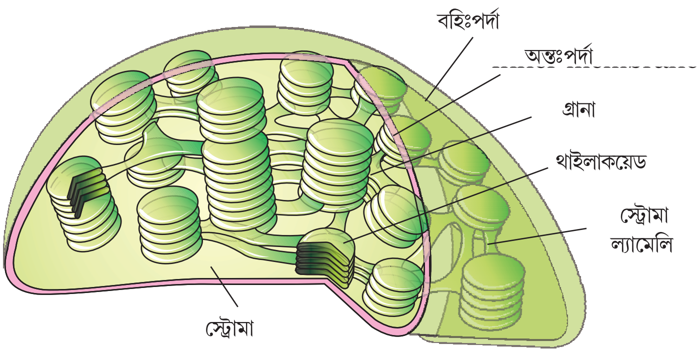

চিত্র **8.8** ঃ ক্লোরোপ্লাস্টের ছেদের দৃশ্য

সবুজ উদ্ভিদের পাতার মেসোফিল কোশে অধিকাংশ ক্লোরোপ্লাস্ট পাওয়া যায়। ক্লোরোপ্লাস্টসমূহ বিভিন্ন দৈর্ঘ্য (5-10 μm) ও প্রস্থবিশিষ্ট (2-4 μm) কোশীয় অঙ্গাণু এবং এরা লেন্স আকৃতির, ডিম্বাকার, গোলাকার, চাকতির ন্যায় এমনকি ফিতার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হয়। ক্লোরোপ্লাস্টগুলোর প্রতিটি কোশ সংখ্যায় ভিন্ন হতে পারে। যেমন *ক্ল্যামাইডোমোনাস* নামক সবুজ শৈবালের প্রতিটি কোশে 1টি করে ক্লোরোপ্লাস্ট উপস্থিত থাকলেও মেসোফিল কলার প্রতিটি কোশে 20-40টি ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। মাইটোকন্ড্রিয়ার মতো ক্লোরোপ্লাস্টও দ্বিপর্দাবৃত অঙ্গাণু। ক্লোরোপ্লাস্টের দুটি পর্দার মধ্যে অন্তঃপর্দার ভেদ্যতা তুলনামূলকভাবে কম হয়। ক্লোরোপ্লাস্টে অন্তঃপর্দা দ্বারা সীমাবন্ধ স্থানটিকে স্ট্রোমা (stroma) বলা হয়। স্ট্রোমার মধ্যে সুসংগঠিত চ্যাপ্টা আকৃতির পর্দাবৃত থলি থাকে, এগুলোকে থাইলাকয়েড বলে (চিত্র ৪.৪)। থাইলাকয়েডগুলো গাদা করে রাখা মুদ্রার মতো থরে থরে সজ্জিত থাকে। এদেরকে গ্রানা (একবচনে গ্রানাম) বা আন্তঃ গ্রানা থাইলাকয়েড বলে। এছাড়াও বিভিন্ন গ্রানার থাইলাকয়েডগুলোর মধ্যে সংযোগকারী চ্যাপ্টা পর্দাবৃত নালিকা থাকে, এদের স্ট্রোমা ল্যামেলি বলে। থাইলাকয়েডের পর্দা যে স্থানটিকে ঘিরে রাখে তাকে লুমেন (lumen) বলে। ক্লোরোপাস্টের স্ট্রোমাতে কাবোহাইড্রেট ও প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচকসমূহ থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টে ক্ষুদ্র দ্বিতন্ত্রী চক্রাকার DNA অণু এবং রাইবোজোমও থাকে। থাইলাকয়েডগুলোতে ক্লোরোফিল রঞ্জক থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টস্থিত রাইবোজোমগুলো (70S) সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত রাইবোজোমগুলোর (80S) তুলনায় আকারে ছোটো হয়।

8.5.6 রাইবোজোম (Ribosomes)

রাইবোজোমগুলো একধরনের দানাদার গঠন যেগুলো বিজ্ঞানী জর্জ প্যালাডে (1953) সর্বপ্রথম ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ঘন কণিকারূপে পর্যবেক্ষণ করেন। রাইবোজোম RNA ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত একটি পর্দাবিহীন অঙ্গাণু।

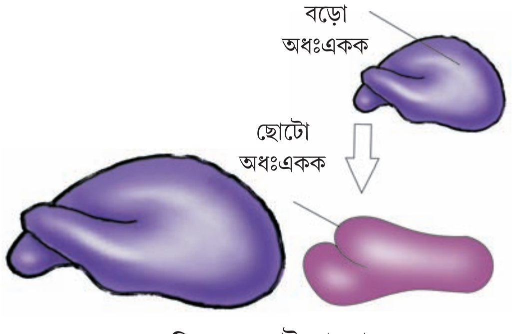

চিত্র **8.9** ঃ রাইবোজোম

ইউক্যারিওটিক কোশের রাইবোজোম 80S প্রকৃতির কিন্তু প্রোক্যারিওটিক কোশের রাইবোজোম 70S প্রকৃতির। প্রতিটি রাইবোজোম বড়ো এবং ছোটো দুটি অধঃএকক নিয়ে গঠিত (চিত্র 8.9 দেখো)। 80S রাইবোজোমের দুটি অধঃ একক হল 60S এবং 40S অপরদিকে, 50S এবং 30S দুটি অধঃএকক নিয়ে 70S রাইবোজোম গঠিত। এখানে 'S' দ্বারা (ভেদবার্গ একক) অধঃক্ষেপণ গুণাঙ্ক বোঝানো হয়েছে। এটি পরোক্ষভাবে ঘনত্ব ও আকার পরিমাপে সহায়ক। 70S এবং 80S দুটি অধ:একক নিয়ে গঠিত।

8.5.7 সাইটোস্কেলিটন (Cytoskeleton)

সাইটোস্কেলিটনে সূত্রাকার প্রোটিন নির্মিত গঠনের একটি বিস্তৃত জালককে সামগ্রিকভাবে সাইটোস্কেলিটন বলে। একটি কোশের সাইটোস্কেলিটন যান্ত্রিক দৃঢ়তা, চলন, কোশের আকৃতি বজায় রাখার মতো বহু কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

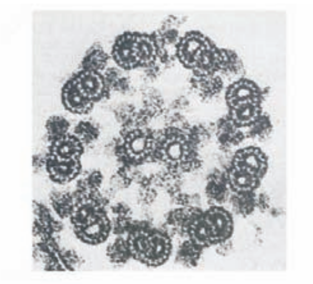

(ক)

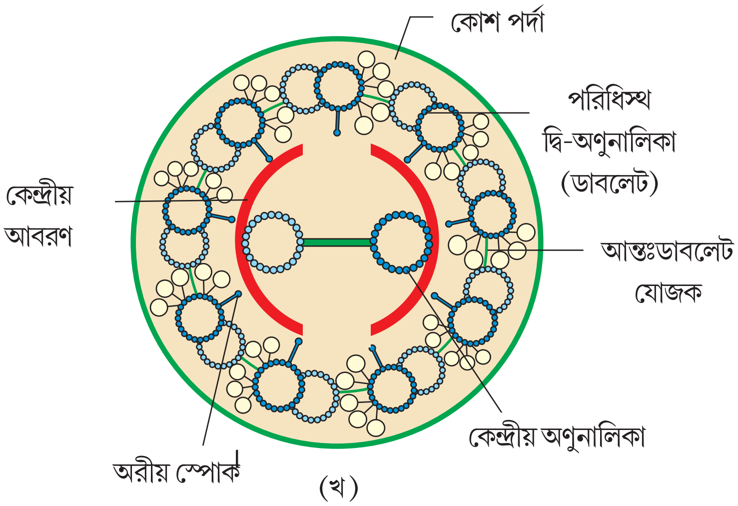

(খ)

চিত্র 8.10 প্রস্থচ্ছেদে সিলিয়া/ফ্ল্যাজেলার বিভিন্ন অংশ দেখানো হয়েছে : (ক) ইলেকট্রন মাইক্রোগ্রাফ (খ) অভ্যন্তরীণ গঠনের চিত্ররূপ উপস্থাপনা।

8.5.8 সিলিয়া এবং ফ্ল্যাজেলা (Cilia and Flagella)

সিলিয়া (একবচনে সিলিয়াম) এবং ফ্ল্যাজেলা (একবচনে ফ্ল্যাজেলাম) কোশপর্দা থেকে উদ্গত চুলের মতো উপবৃদ্ধি। ক্ষুদ্রাকার গঠনযুক্ত সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলাগুলো যা বৈঠার মতো কাজ করে এবং কোশ বা তার চতুস্পার্শ্বস্থ তরলের সঞ্চালনে সাহায্য কাজ করে। ফ্ল্যাজেলা তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ হয় এবং এরা কোশের চলনের জন্য দায়ী। প্রোক্যারিওটিক ব্যাকটিরিয়াতেও ফ্ল্যাজেলা থাকে কিন্তু এরা ইউক্যারিওটিক ফ্ল্যাজেলা থেকে গঠনগতভাবে ভিন্নতর হয়।

একটি সিলিয়া বা ফ্ল্যাজেলার ইলেকট্রন আণুবীক্ষণিক অধ্যয়নে দেখা যায় যে এরা প্লাজমাপর্দা দিয়ে ঘেরা থাকে। এদের কেন্দ্রীয় অংশটিকে বলে এক্সোনিম যার মধ্যে বেশ কিছু অণুনালিকা দীর্ঘ অক্ষের সাথে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। এক্সোনিমে সাধারণত অরীয়ভাবে সজ্জিত নয়টি প্রান্তীয় দ্বি-অণুনালিকা বা ডাবলেট (অর্থাৎ প্রতিটি প্রান্তীয় অণুনালিকাতে দুটি করে অধঃনালিকা পরস্পর সংযুক্ত অবস্থায় থাকে) এবং এক জোড়া কেন্দ্রীয় অণুনালিকা নিয়ে গঠিত। এক্সোনিমে অণুনালিকার এইরূপ বিন্যাসকে 9+2 সজ্জা হিসাবে বর্ণনা করা হয় (চিত্র 8.10 দেখো)। কেন্দ্রীয় অণুনালিকাগুলো সেতু দ্বারা যুক্ত এবং একটি কেন্দ্রীয় পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে যা প্রতিটি প্রান্তীয় অণুনালিকার ডাবলেটের একটি নালিকার সাথে একটি অরীয় স্পোক (radial spoke) দ্বারা যুক্ত থাকে। তাই এখানে 9টি অরীয় স্পোক রয়েছে। প্রান্তীয় অণুনালিকার ডাবলেটগুলোও যোজকের সাহায্যে পরস্পর যুক্ত থাকে। সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলা উভয়ই সেন্ট্রিওলের মতো গঠন থেকে উদ্ভুত হয় এবং এই সেন্ট্রিওল-সদৃশ গঠনগুলোকে বেসাল বডি বলে।

8.5.9 সেন্ট্রোজোম এবং সেন্ট্রিওলস (Centrosomes and centrioles)

সেন্ট্রোজোম হল একটি কোশীয় অঙ্গাণু যা সাধারণত সেন্টিওল নামক দুটি বেলনাকার গঠন সমন্বিত। এগুলো অনিয়তাকার পেরিসেন্ট্রিওলার বস্তু দ্বারা পরিবৃত থাকে। সেন্ট্রোজোমস্থিত উভয় সেন্ট্রিওল একটি অপরটির সাথে লম্বভাবে অবস্থান করে।

যেখানে প্রতিটি সেন্ট্রিওল গোরুর গাড়ির চাকার মতো সংগঠনবিশিষ্ট হয়। এরা সমদূরত্বে অবস্থিত টিউবিউলিন প্রোটিন নির্মিত 9টি পরিধিস্থ তন্তু নিয়ে গঠিত। প্রতিটি পরিধিস্থ তন্তু আবার ট্রিপলেট বা ত্রয়ী প্রকৃতির হয় অর্থাৎ প্রতিটি তন্তু তিনটি নালিকার সমন্বয়ে গঠিত। সংলগ্ন ট্রিপলেট বা ত্রয়ী তন্তুগুলোও পরস্পর সংযুক্ত থাকে। সেন্ট্রিওলের নিকটবর্তী অঞ্চলের কেন্দ্রীয় অংশটিও প্রোটিন নির্মিত এবং একে হাব (Hub) বলে যা পরিধিতে বিন্যস্ত ত্রয়ী নালিকাগুলোর সঙ্গে প্রোটিন দ্বারা গঠিত অরীয় স্পোকের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। সেন্ট্রিওল, সিলিয়া বা ফ্ল্যাজেলার বেসাল বডি এবং বেমতন্তু গঠন করে। প্রাণীকোশ বিভাজনকালে এই বেমতন্তুগুলো থেকেই বেমযন্ত্র গঠিত হয়।

8.5.10 নিউক্লিয়াস (Nucleus)

সর্বপ্রথম 1831 সালেই রবার্ট ব্রাউন নিউক্লিয়াসকে কোশীয় অঙ্গাণু রূপে বর্ণনা করেন। পরবর্তীকালে ফ্লেমিং ক্ষারীয় রঞ্জক দ্বারা নিউক্লিয় পদার্থ রঞ্জিত করেন এবং এর নাম দেন ক্রোমাটিন।

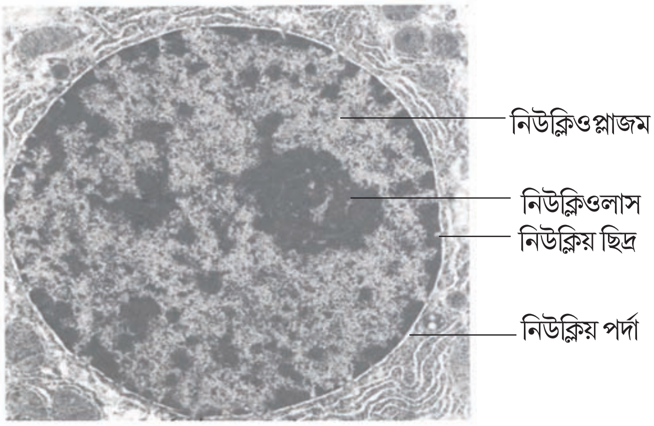

চিত্র 8.11 ঃ নিউক্লিয়াসের গঠন

ইন্টারফেজ নিউক্লিয়াস (কোশের নিউক্লিয়াস যখন বিভাজনরত থাকে না) ক্রোমাটিন নামক অত্যন্ত প্রসারিত এবং বিস্তৃত নিউক্লিও প্রোটিন তন্তু, নিউক্লিয় ধাত্র এবং এক বা একাধিক গোলাকার গঠনবিশিষ্ট নিউক্লিওলাস সমন্বিত হয় (চিত্র 8.11 দেখো)। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এটা বের করা গেছে যে, নিউক্লিওপর্দা নিউক্লিয়াসের ভেতরে উপস্থিত বস্তুগুলো এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যে একটি ব্যবধায়ক গঠন করে। নিউক্লিওপর্দা পরস্পর সমান্তরালে সজ্জিত দুটি আবরণী দ্বারা গঠিত হয় এবং এই দুটি আবরণীর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানটিকে (10-50 nm) পেরিনিউক্লিয়ার স্থান বলে। বহিঃনিউক্লিওপর্দাটি সাধারণত এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকার সাথে অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে থাকে এবং এটি রাইবোজোমও ধারণ করে। নিউক্লিওপর্দা বহু স্থানে ছিদ্রযুক্ত হয়, যেগুলো দুটি নিউক্লিওপর্দা মিলিত হওয়ার ফলে গঠিত হয়। এই ছিদ্রগুলোর মধ্য দিয়ে RNA এবং প্রোটিন অণুসমূহ নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে উভয়দিকে চলাচল করতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিটি কোশে একটিমাত্র নিউক্লিয়াস থাকে। বিভিন্ন কোশে নিউক্লিয়াসের সংখ্যার তারতম্যও প্রায়শই দেখা যায়। তুমি কি এমন জীবের নাম মনে করতে পারবে যাদের প্রতিটি কোশে একাধিক নিউক্লিয়াস রয়েছে? এমনকি কিছু পরিণত কোশও নিউক্লিয়াসবিহীন হয়। উদাহরণস্বরূপ বহু স্তন্যপায়ী প্রাণীর এরিথ্রোসাইটস এবং সংবহনকলাতন্ত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদের সীভনল কোশ নিউক্লিয়াসবিহীন হয়। এই কোশগুলোকে কি 'সজীব' কোশ হিসাবে গণ্য করা যাবে?

নিউক্লিয়াসের ধাত্র বা নিউক্লিওপ্লাজম, নিউক্লিওলাস এবং ক্রোমাটিন সমন্বিত হয়। নিউক্লিওলাস হল নিউক্লিওপ্লাজমে উপস্থিত একটি গোলাকার গঠন। নিউক্লিওলাস পর্দাবৃত না হওয়ায় এতে উপস্থিত বস্তুসমূহ নিউক্লিওপ্লাজমের বাকি অংশের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে অবস্থান করে। এটি হল সক্রিয় রাইবোজোমাল RNA সংশ্লেষণের স্থান। যেসব কোশে সক্রিয়ভাবে প্রোটিন সংশ্লেষ ঘটে সেইসব কোশে তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যক নিউক্লিওলাস থাকে এবং এগুলো আকারে বড়ো হয়।

তুমি হয়তো বা মনে করতে পারবে যে, ইন্টারফেজ নিউক্লিয়াসে নিউক্লিওপ্রোটিন তন্তুর শিথিল এবং অস্পষ্ট জালক বর্তমান এবং একে ক্রোমাটিন বলে। কিন্তু কোশবিভাজনের বিভিন্ন দশা চলাকালে কোশে নিউক্লিয়াসের স্থানে সুগঠিত ক্রোমোজোম দেখা যায়। ক্রোমাটিন, DNA ও কিছু ক্ষারীয় প্রোটিন অর্থাৎ হিস্টোন প্রোটিন, কিছু অহিস্টোন প্রোটিন এবং RNA সমন্বিত হয়। মানবদেহের একটি কোশের 46 ক্রোমোজোমের (23 জোড়া) মধ্যে প্রায় 2 মিটার লম্বা DNA তন্তু রয়েছে। তোমরা দ্বাদশ শ্রেণিতে ক্রোমোজোমরূপে DNA প্যাকেজিং বিস্তৃতভাবে পড়বে।

প্রতিটি ক্রোমোজোমে (কেবলমাত্র বিভাজিত কোশে দৃশ্যমান) আবশ্যিকভাবে একটি প্রাথমিক খাঁজ বা সেন্ট্রোমিয়ার রয়েছে যার পাশে কাইনেটোকোর (kinetochore) নামক চাকতি-আকৃতির গঠন বর্তমান (চিত্র 8.12)। সেন্ট্রোমিয়ার অংশে একটি ক্রোমোজোমের দুটি ক্রোমাটিড যুক্ত থাকে। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোমগুলো চার ধরনের হতে পারে (চিত্র 8.13 দেখো)। মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের ঠিক মাঝখানে থাকে, ফলে ক্রোমোজোমের দুটি বাহু সমদৈর্ঘ্যের হয়। সাব-মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের মাঝখান থেকে কিছুটা দূরে থাকে ফলে ক্রোমোজোমের একটি বাহু অপর বাহু অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে বড়ো হয়। অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমের ক্ষেত্রে সেন্ট্রোমিয়ার প্রান্তের কাছাকাছি থাকায় একটি বাহু খুব লম্বা এবং অপর বাহুটি খর্ব হয়। অপরপক্ষে, টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম প্রান্তীয় সেন্ট্রোমিয়ারবিশিষ্ট হয়।

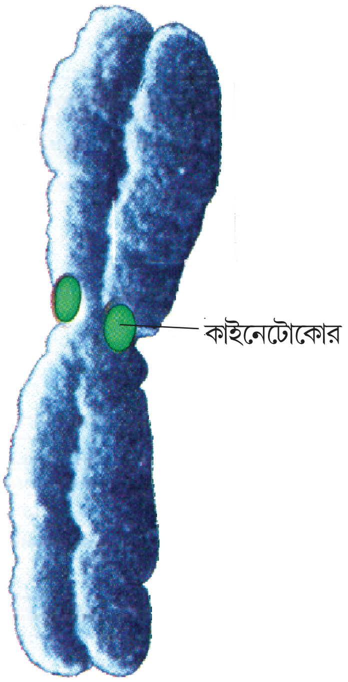

চিত্র 8.12 ঃ কাইনেটোকোর যুক্ত ক্রোমোজোম

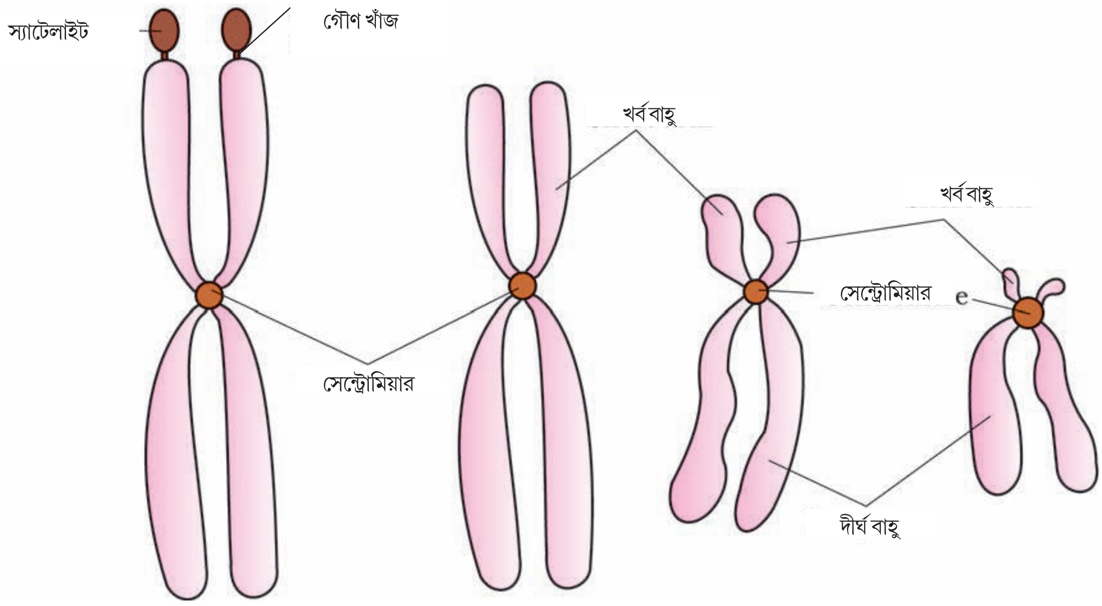

চিত্র 8.13 ঃ সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ক্রোমোজোম

মাঝে মাঝে ক্রোমোজোমের একটি নির্দিষ্ট স্থায়ী অঞ্চলে অরঞ্জিত গৌণখাঁজ দেখা যায় ফলে স্যাটেলাইট নামক একটি ছোটো খণ্ডকের আবির্ভাব ঘটে।

8.5.11 মাইক্রোবডিস (Microbodies)

বিভিন্ন উৎসেচক সমন্বিত বহু পর্দাবৃত থলি অর্থাৎ মাইক্রোবডি উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় কোশেই বর্তমান থাকে।

সারসংক্ষেপ (Summary)

সব জীবই কোশ বা কোশগুচ্ছ নিয়ে গঠিত। আকারগত, আকৃতিগত এবং কার্যগতভাবে কোশ ভিন্ন ভিন্ন হয়। পর্দাবৃত নিউক্লিয়াস বা অন্যান্য কোশ অঙ্গাণুর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে কোশ বা জীবদের প্রোক্যারিওটিক বা ইউক্যারিওটিক বলা যেতে পারে।

একটি আদর্শ ইউক্যারিওটিক কোশ কোশপর্দা, নিউক্লিয়াস এবং সাইট্রোপ্লাজম নিয়ে গঠিত। উদ্ভিদ কোশের কোশপর্দার বাইরে কোশ প্রাচীর রয়েছে। কোশপর্দা প্রভেদক ভেদ্য পর্দা এবং বহু অণুর পরিবহণে সহায়তা করে। এন্ডোমেমব্রেন সিস্টেম, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, গলগিবস্তু, লাইসোজোম এবং কোশ গহ্বর নিয়ে গঠিত। সব কোশীয় অঙ্গাণুসমূহ সুনির্দিষ্ট অথচ বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। সেন্ট্রোজোম এবং সেন্ট্রিওল সিলিয়া এবং ফ্ল্যাজেলার বেসালবডি গঠন করে যা গমনের সহায়ক। প্রাণীকোশে সেন্ট্রিওল কোশ বিভাজনকালে বেমযন্ত্রও গঠন করে। নিউক্লিয়াসে নিউক্লিওলাস এবং ক্রোমাটিন জালিকা রয়েছে। এটি শুধুমাত্র কোশীয় অঙ্গাণুর কার্যকারিতাই নিয়ন্ত্রণ করে না বংশগতিতেও মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম টিউবিউল বা সিস্টারনি সমন্বিত। এরা দুই ধরনের যথা মসৃণ এবং অমসৃণ। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কোশ মধ্যস্থ পদার্থ পরিবহণে, প্রোটিন, গ্লাইকোপ্রোটিন এবং গ্লাইকোজেন সংশ্লেষে সহায়তা করে। গলগিবস্তু পদার্বৃত কোশীয় অঙ্গাণু যা কতগুলো চ্যাপ্টা থলি নিয়ে গঠিত। কোশের ক্ষরিত পদার্থগুলো তাদের মধ্যে প্যাকেটজাত হয় এবং কোশ থেকে পরিবাহিত হয়। লাইসোজোম একক পর্দাবৃত কোশীয় অঙ্গাণু। এতে সব ধরনের বৃহৎ অণু পাচনে সহায়তাকারী উৎসেচকসমূহ বর্তমান। রাইবোজোমগুলো প্রোটিন সংশ্লেষে অংশ নেয়। এরা সাইটোপ্লাজমে মুক্তভাবে বা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে সংলগ্ন থাকে। মাইটোকন্ড্রিয়া অক্সিডেটিভ ফসফোরিভবন এবং ATP উৎপাদনে সহায়তা করে। এরা দ্বি-পর্দাবৃত। বহিঃপর্দা মসৃণ এবং অন্তঃপর্দা ভাঁজ হয়ে কিছু সংখ্যক ক্রিস্টি গঠন করে। প্লাসটিড রঞ্জক পদার্থ বহনকারী এমন একটি কোশীয় অঙ্গাণু যা একমাত্র উদ্ভিদ কোশেই পাওয়া যায়। উদ্ভিদকোশে বর্তমান ক্লোরোপ্লাস্ট সালোকসংশ্লেষের জন্য অপরিহার্য সৌরশক্তিকে আবদ্ধ করতে পারে। প্লাসটিডের গ্রানা অংশ আলোকবিক্রিয়া এবং স্ট্রোমা অংশ অন্ধকার বিক্রিয়ার স্থান। সবুজ রঙের প্লাসটিড হল ক্লোরোপ্লাস্ট, যাতে ক্লোরোফিল থাকে। আবার অন্যান্য রঙিন প্লাসটিডগুলো হল ক্রোমোপ্লাস্ট যাতে ক্যারোটিন এবং জ্যান্থোফিলের মতো রঙিন কণিকা থাকে। নিউক্লিয়াসটি নিউক্লিও ছিদ্রবিশিষ্ট একটি দ্বি-পর্দাবৃত গঠন দ্বারা আবৃত থাকে, একে নিউক্লিও পর্দা বলে। নিউক্লিয়াসের অন্তঃপর্দাটি নিউক্লিওপ্লাজম এবং ক্রোমাটিন বস্তুকে ঘিরে অবস্থান করে। তাই কোশকে জীবনের গঠনগত এবং কার্যগত একক বলে।

অনুশীলনী (Exercises)

1. নিম্নলিখিতগুলোর মধ্যে কোন্‌টি সঠিক?
   (ক) রবার্ট ব্রাউন কোশ আবিষ্কার করেছিলেন।
   (খ) স্লেইডেন ও স্বোয়ান কোশতত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন।
   (গ) ভিরচো ব্যাখ্যা করেছিলেন যে পূর্বতন কোনো কোশ থেকে নতুন কোশের সৃষ্টি হয়।
   (ঘ) একটি এককোশী জীব তার সমস্ত জৈবনিক কার্যাবলি একটি মাত্র কোশের মধ্যেই সম্পন্ন করে।
2. **নতুন কোশ সৃষ্টি হয়—**
   (ক) ব্যাকটিরিয়ার সন্ধান থেকে (খ) পুরাতন কোশের পুনরুৎপাদন দ্বারা
   (গ) পূর্বতন কোশ থেকে (ঘ) অজীবীয় পদার্থ থেকে।
3. **স্তম্ভ মেলাও**

স্তম্ভ - I	**স্তম্ভ II**
(ক) ক্রিস্টি	(i) স্ট্রোমাস্থিত পদার্বৃত চ্যাপ্টা থলিসমূহ
(খ) সিস্টারনি	(ii) মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্তর্ভাজ
(গ) থাইলাকয়েড	(iii) গলগিবস্তুস্থিত চাকতি আকৃতির থলিসমূহ

4. **নিম্নলিখিতগুলোর মধ্যে কোন্‌টি সঠিক :**
   (ক) সব সজীব কোশে নিউক্লিয়াস বর্তমান।
   (খ) প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয় কোশেই একটি সুস্পষ্ট কোশপ্রাচীর থাকে।
   (গ) প্রোক্যারিওটিক কোশে কোনো পর্দাবৃত কোশীয় অঙ্গাণু থাকে না।
   (ঘ) অজীবীয় পদার্থ থেকে নতুন করে কোশ উৎপন্ন হয়।
5. প্রোক্যারিওটিক কোশে উপস্থিত মেসোজোম কাকে বলে? এর কার্যসমূহ উল্লেখ করো।
6. কোশ পর্দার মধ্য দিয়ে প্রশম দ্রাবসমূহ কীভাবে চলাচল করে? মেরুস্থিত অণুগুলোও কি একই পদ্ধতিতে পর্দার মধ্য দিয়ে চলাচল করতে পারে? যদি না পারে তবে এরা পর্দার মধ্য দিয়ে কীভাবে স্থানান্তরিত হয়?
7. দ্বি-পর্দাবৃত দুটি কোশীয় অঙ্গাণুর নাম লেখো। এই দুটি কোশীয় অঙ্গাণুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো। তাদের কার্যাবলি উল্লেখ করো এবং উভয়ের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো।
8. প্রোক্যারিওটিক কোশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
9. 'বহুকোশীয় জীবে শ্রমবিভাজন বর্তমান'— ব্যাখ্যা করো।
10. কোশ জীবনের মূল একক— সংক্ষেপে আলোচনা করো।
11. নিউক্লিয় ছিদ্র কী? এদের কাজ লেখো।
12. লাইসোজোম এবং কোশগহ্বর উভয়ই অন্তপর্দা গঠন (Endomembrane System) তথাপি তাদের কাজ ভিন্ন, মন্তব্য করো।
13. নিম্নলিখিতগুলোর চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো এবং এদের গঠন বর্ণনা করো।
    (ক) নিউক্লিয়াস (খ) সেন্ট্রোজোম
14. সেন্ট্রোমিয়ার কী? সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোমগুলোকে কীভাবে শ্রেণিবিভক্ত করা যায়? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে, সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান দেখিয়ে বিভিন্ন প্রকার ক্রোমোজোমের চিত্র অঙ্কন করো।

অধ্যায় – 9 (Chapter - 9)

জৈব অণুসমূহ (Biomolecules)

9.1. রাসায়নিক গঠনের বিশ্লেষণ কীভাবে করা হয়?
9.2 প্রাথমিক ও গৌণ বিপাকজাত বস্তুসমূহ
9.3 বৃহৎ জৈব অণুসমূহ
9.4 প্রোটিনসমূহ
9.5 পলিস্যাকারাইড
9.6 নিউক্লিক অ্যাসিডস্
9.7 প্রোটিনের গঠন
9.8 পলিমারের মধ্যে মনোমারের বন্ধনী সংযোগের প্রকৃতি
9.9 দেহ উপাদানের গতিশীল অবস্থা বিপাকের ধারণা
9.10 জীবনধারণের বিপাকীয় ভিত্তি
9.11 সজীব অবস্থা
9.12 উৎসেচক

এই জীবমন্ডলে অনেক ধরনের জীব বৈচিত্র দেখা যায়। এখন মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, সব সজীব, জীব কি একই রাসায়নিক উপাদানে তৈরি, অর্থাৎ মৌল এবং যৌগ? কিভাবে মৌলগুলির বিশ্লেষণ করতে হয় তা তোমরা রসায়ন বিদ্যায় শিখেছ। উদ্ভিদ কলা, প্রাণী কলা এবং অণুজীবের লেই (microbial Paste) নিয়ে আমরা যদি এ ধরনের বিশ্লেষণ করি তাহলে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এর মতো মৌলসমূহ এবং সজীব কলার প্রতি একক ভরে তাদের পরিমাণ আমরা জানতে পারি এখন যদি জড় পদার্থ যেমন এক খণ্ড মাটি নিয়ে একই পরীক্ষা আমরা করি তাহলেও আমরা একই ধরনের মৌলগুলোর তালিকা পাব। এই দুটি তালিকার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? সুনিশ্চিতভাবে বলতে গেলে তেমন কোনো পার্থক্য পাওয়া যায় না। মাটির মধ্যে যেসব মৌল বর্তমান, সজীব কোশের মধ্যেও সেইসব মৌল বর্তমান। যাই হোক, সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, অন্যান্য মৌলের সাপেক্ষে কার্বন ও হাইড্রোজেনের আপেক্ষিক প্রাচুর্য মাটির মধ্যে যতটুকু থাকে, যে-কোনো সজীব বস্তুতে তার থেকে বেশি (সারণি 9.1 দেখো) থাকে।

9.1. রাসায়নিক উপাদানের বিশ্লেষণ কীভাবে করা হয়? (How to analyse chemical composition)?

একইভাবে আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে- কোন্ ধরনের জৈব যৌগ সজীব বস্তুর মধ্যে পাওয়া যায়? এর উত্তর কীভাবে খুঁজবে? এর উত্তর পাওয়ার জন্য রাসায়নিক বিশ্লেষণ করতে হবে। আমরা যে কোনো একটি সজীব কলা (সবজির বা যকৃতের একটা টুকরো ইত্যাদি) নিলাম, তারপর সেটিকে ট্রাইক্লোরো অ্যাসেটিক অ্যাসিড (Cl_3CCOOH) এর সাথে মর্টার ও পেস্টল সাহায্যে চূর্ণ করা হল। এর ফলে আমরা একটি পুরু কাই (slurry) পাই, যদি এটাকে এখন মিহি কাপড় বা তুলার মধ্য দিয়ে ছেঁকে নিই তাহলে আমরা দুটো অংশ পাই। প্রথমাংশে পরিশ্রুত তরল বা প্রায়োগিক অংশ অ্যাসিডে দ্রাব্য পদার্থসমূহ এবং দ্বিতীয়াংশ অধঃক্ষেপ বা অ্যাসিড অদ্রাব্য অংশ। বিজ্ঞানীরা অ্যাসিড দ্রাব্য অংশ থেকে হাজার হাজার যৌগ পেয়েছেন।

একটি সজীব কলার নমুনাকে কীভাবে বিশ্লেষণ করে এক একটি জৈব যৌগ শনাক্ত করা যায়, তা তোমরা উপরের শ্রেণীতে গিয়ে জানবে। এখানে এটা বলা প্রয়োজন যে, যৌগসমূহের নিষ্কাশনের পর যতক্ষণ না অন্য সব যৌগ থেকে নির্দিষ্ট যৌগটিকে পৃথক করা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন পৃথকীকরণ কৌশলের সাহায্যে নিষ্কাশিত যৌগগুলোর পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া চলে। অন্যভাবে বলতে গেলে এটি হল যৌগের পৃথকীকরণ এবং এর বিশুদ্ধিকরণ। যৌগের উপর বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে তার আণবিক সংকেত এবং সম্ভাব্য গঠনের ধারণা আমরা পেতে পারি। সজীব কলা থেকে কার্বনের যে সমস্ত যৌগ আমরা পাই তাদেরকে জৈব অণু বা বায়োমলিকিউল বলে। যাই হোক, এটা আমরা কেমন করে জানি? একটু আলাদা ধরনের কিছুটা ধ্বংসাত্মক বিশ্লেষণের সাহায্যে এটা করা যায়। সজীব কলার একটা ছোটো খণ্ড ওজন করা হল যাকে আমরা আর্দ্র ওজন বলি এবং তাকে শুষ্ক করা হল। এখন এরমধ্যেকার সমস্ত জল বাষ্পায়িত হয়ে যাবে। অবশিষ্ট পদার্থটির ওজনকে বলা হবে শুষ্ক ওজন। এখন যদি এই পদার্থটিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে কার্বনের সমস্ত যৌগগুলো জারিত (CO_2 এবং জল) হয়ে এখান থেকে বের হয়ে যাবে। এখন যেটা পড়ে থাকবে তাকে বলে ছাই। এই ছাই এর মধ্যে থাকে অজৈব মৌলগুলো (যেমন ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি)। আম্লিক দ্রবণের মধ্যেও পাওয়া যায় সালফেট, ফসফেট জাতীয় অজৈব যৌগ অর্থাৎ উপাদানের বিশ্লেষণে সজীব কলার মধ্যে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ক্লোরিন, কার্বন ইত্যাদি মৌল উপাদান হিসাবে পাওয়া যায়। আর যৌগের বিশ্লেষণে পাওয়া যায় জৈব (চিত্র 9.1 দেখো) এবং অজৈব (সারণি 9.2 দেখো) যৌগের উপাদানের ধারণা। রাসায়নিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে কার্যকরীমূলক যেমন অ্যালডিহাইড, কিটোন, অ্যারোম্যাটিক যৌগ ইত্যাদি শনাক্ত করা যায়। কিন্তু জীববিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যৌগগুলোকে অ্যামাইনো অ্যাসিড, নিউক্লিওটাইড, ক্ষার, ফ্যাটি অ্যাসিড ইত্যাদি ভাগ করতে পারি।

সারণী 9.1 সজীব ও জড় পদার্থের মধ্যে বর্তমান মৌলিক পদার্থের একটি তুলনা *

মৌল	% ওজন ভূত্বক	মানব দেহ
হাইড্রোজেন (H)	0.14	0.5
কার্বন (C)	0.03	18.5
অক্সিজেন (O)	46.6	65.0
নাইট্রোজেন (N)	খুব সামান্য	3.3
সালফার (S)	0.03	0.3
সোডিয়াম (Na)	2.8	0.2
ক্যালশিয়াম (Ca)	3.6	1.5
ম্যাগনেসিয়াম (Mg)	2.1	0.1
সিলিকন (Si)	27.70	নগণ্য

* Universities Press, Hyderabad থেকে প্রকাশিত, CNR-Rao understanding Chemistry থেকে গৃহীত

সারণি 9.2 : সজীব কলায় প্রতিনিধিত্বমূলক অজৈব উপাদানের তালিকা

উপাদান	সংকেত
সোডিয়াম	Na^{+}
পটাশিয়াম	k^{+}
ক্যালসিয়াম	Ca^{++}
ম্যাগনেশিয়াম	Mg^{++}
জল	H_2O
যৌগ সমূহ	$NaCl$, $CaSO_3$, PO^{3-}, + SO_4^{+2}

অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো হল একটি অ্যামাইনো গ্রুপ এবং একটি অম্লীয় গ্রুপ সমন্বিত জৈব যৌগ যেখানে একই কার্বন পরমাণু অর্থাৎ α কার্বন পরমাণুর উপরে একটি অ্যামাইনো মূলক প্রতিস্থাপনযোগ্য। সেইজন্য এদের বলে α অ্যামাইনো অম্ল এবং এরা হল চারটি প্রতিস্থাপনযোগ্য মিথেন। এই ক্ষেত্রে চারটি প্রতিস্থাপনযোগ্য গ্রুপ চারটি যোজ্যতার স্থান দখল করে অবস্থান করে। এগুলো হল হাইড্রোজেন, কার্বক্সিল মূলক, অ্যামাইনোমূলক এবং একটি পরিবর্তনশীল মূলক R। R মূলকের প্রকৃতি অনুযায়ী অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো পরিবর্তিত হয়ে অনেক যৌগ উৎপন্ন করে। তবে মাত্র 20 প্রকারের অ্যামাইনো অ্যাসিডই প্রোটিন গঠনে অংশ নেয়। এই সমস্ত প্রোটিন গঠনকারী অ্যামাইনো অ্যাসিডের R মূলক হতে পারে হাইড্রোজেন (অ্যামাইনো অ্যাসিডটিকে বলে গ্লাইসিন), একটি মিথাইল মূলক (অ্যালানিন),

হাইড্রক্সি মিথাইল মূলক (সেরিন) ইত্যাদি। এই কুড়িটির মধ্যে তিনটি নীচে দেখানো হয়েছে। (চিত্র 9.1 দেখো)

অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলোর ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম আবশ্যিকভাবে নির্ভর করে অ্যামাইনো, কার্বক্সিল ও R কার্যকরী মূলকের উপর। অ্যামাইনো ও কার্বক্সিল মূলকের সংখ্যার উপর নির্ভর করে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো অম্লীয় (যেমন গ্লুটামিক অ্যাসিড), ক্ষারীয় (লাইসিন) বা প্রশম (ভ্যালিন) হতে পারে। একইভাবে কতগুলো সুগন্ধযুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে (টাইরোসিন, ফিনাইল অ্যালানাইন, ট্রিপটোফেন)। অ্যামাইনো অ্যাসিডের একটি বিশেষ ধর্ম হল অ্যামাইনো ($-NH_2$) ও কার্বক্সিলমূলকগুলো ($-$ CooH) আয়নিত হতে পারে। সেজন্য বিভিন্ন P^H -এর দ্রবণে অ্যামাইনো অ্যাসিডের গঠন পরিবর্তিত হয়।

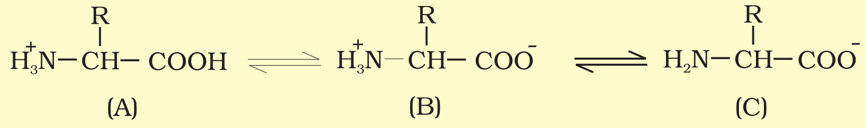

'B' কে বলা হয় জুইটার আয়নিক গঠন

লিপিডগুলো সাধারণত জলে অদ্রাব্য হয়। এগুলো সরল ফ্যাটি অ্যাসিডও হতে পারে। একটি ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বক্সিলমূলকটি 'R' মূলকের সাথে যুক্ত থাকে। R মূলকটি একটি মিথাইল ($-CH_3$), ইথাইল ($-C_2H_5$) অথবা বেশি সংখ্যক CH_2 মূলকবিশিষ্ট (1 থেকে 19 কার্বন) হতে পারে। যেমন পামিটিক অ্যাসিড, অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড কার্বক্সিলমূলক যথাক্রমে 16টি এবং 20টি কার্বন পরমাণু থাকে। ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো সম্পৃক্ত (দ্বি-যোজী বন্ধনী) অথবা অসম্পৃক্ত (একটি অথবা একাধিক $C=C$ দ্বি-যোজী বন্ধনীবিশিষ্ট) হয়। গ্লিসারল বা ট্রাইহাইড্রক্সি প্রোপেন আরও একটি লিপিড। অনেক লিপিডের মধ্যে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল উভয়ই বর্তমান থাকে। এখানে ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো গ্লিসারলের সঙ্গে এস্টেরিফাইড অবস্থায় থাকে। সেগুলো হতে পারে মনোগ্লিসারাইড ডাইগ্লিসারাইড বা ট্রাইগ্লিসারাইড। গলনাঙ্কের উপর নির্ভর করে এগুলোকে চর্বি বা তেল বলা হয়। তেলের গলনাঙ্ক কম (যেমন জিন্‌জেলি তেল) হওয়ায় শীতকালেও তেল হিসাবে পাওয়া যায়। তোমরা কি বাজারের কোনো চর্বিকে শনাক্ত করতে পারো? কোনো কোনো লিপিডে ফসফরাস থাকে এবং একটি ফসফোরিলেটেড জৈব যৌগ থাকে। এগুলোকে বলে ফসফো লিপিড। এগুলো কোশপর্দার মধ্যে থাকে। লেসিথিন এর একটি। উদাহরণ কিছু কিছু কলায় বিশেষত স্নায়ুকলায় অধিক জটিল গঠনবিশিষ্ট লিপিড বর্তমান।

সজীব বস্তুর মধ্যে এমন অনেক কার্বন যৌগ থাকে যেগুলোতে হেটারোসাইক্লিক বলয় পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কয়েকটি হল নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষার — অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোইসন, ইউরাসিল এবং থাইমিন। এগুলো যখন শর্করার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তাদের বলা হয় নিওক্লিওসাইড। যদি ফসফেটমূলক নিউক্লিওসাইডের শর্করার সঙ্গে এস্টার বন্ধনীর মাধ্যমে যুক্ত থাকে তখন তাদের বলা হয় নিউক্লিওটাইড। অ্যাডিনোসিন, গুয়ানোসিন, থাইমিডিন, ইউরিডিন এবং সাইটিডিন হল নিউক্লিওসাইড। আর অ্যাডিনাইলিক অ্যাসিড, থাইমিডাইলিক অ্যাসিড, গুয়ানাইলিক অ্যাসিড, ইউরিডাইলিক অ্যাসিড এবং সাইটিডাইলিক অ্যাসিড হল নিউক্লিওটাইড। নিউক্লিক অ্যাসিড যেমন DNA এবং RNA শুধুমাত্র নিউক্লিওটাইড দ্বারা গঠিত। DNA এবং RNA জীনবস্তু হিসাবে কাজ করে।

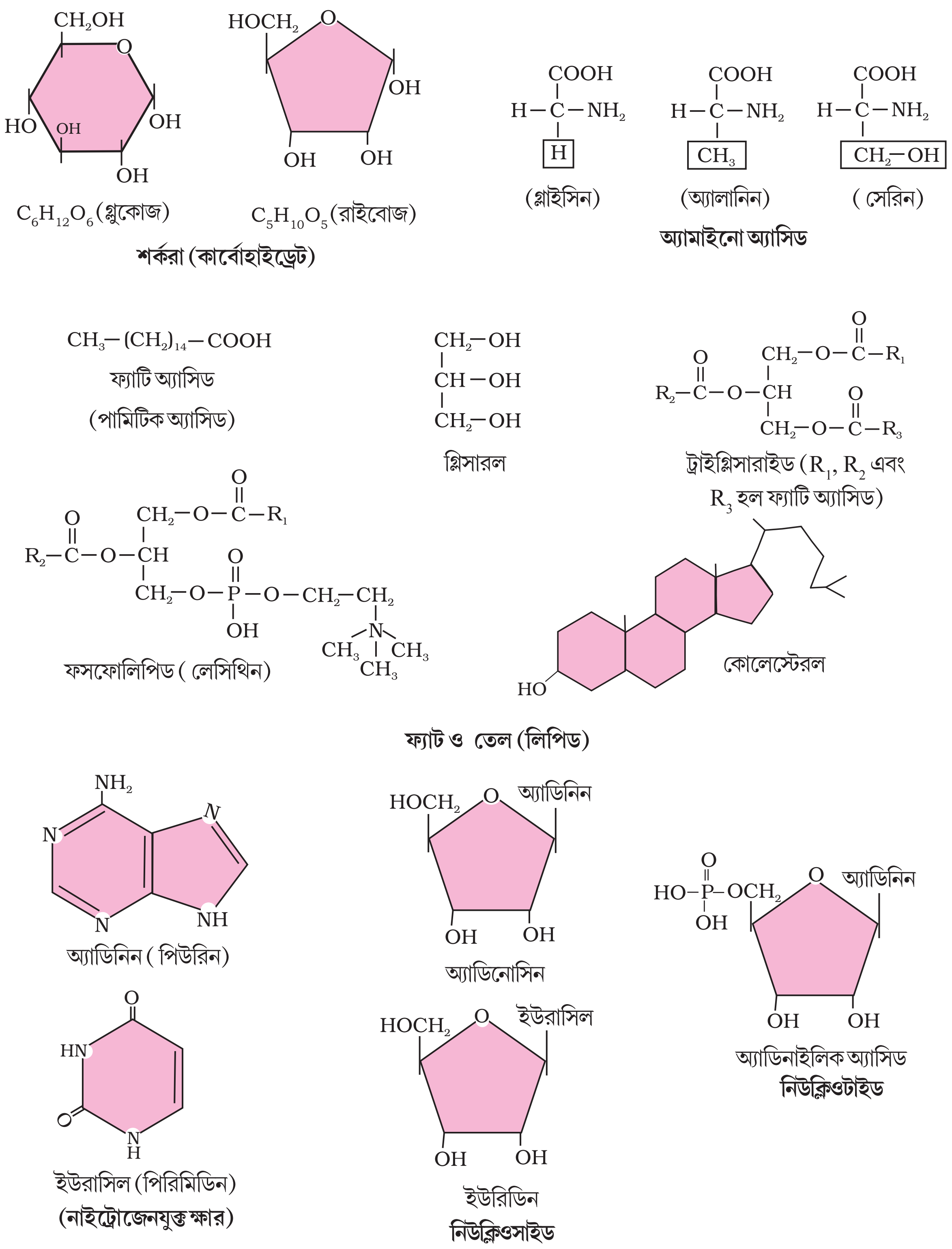

চিত্র 9.1 : সজীব কলায় উপস্থিত কম আণবিক গুরুত্ববিশিষ্ট জৈব যৌগের চিত্ররূপ

9.2. প্রাথমিক ও গৌণ বিপাকজাত বস্তুসমূহ (Primary and Secondary Metabolites):

রসায়নবিদ্যার মধ্যে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর দিক হল সজীব বস্তু থেকে ছোটো, বড়ো হাজারো যৌগের পৃথকীকরণ, গঠনসংকেত নিরূপণ এবং সম্ভব হলে তাদের সংশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করা।

কেউ যদি জৈব অণুর একটা তালিকা প্রস্তুত করে তবে সে তালিকায় অ্যামাইনো অ্যাসিড, শর্করা প্রভৃতিসহ হাজারো জৈবযৌগ অন্তর্ভুক্ত হবে। এই জৈব অণুগুলোকে আমরা বিপাকজাত পদার্থ বলতে পারি। 9.10 অনুচ্ছেদে প্রদত্ত কারণগুলোর জন্য আমরা এই জৈব অণুগুলোকে বিপাকজাত বস্তু বলতে পারি। চিত্র 9.1 এ দেখানো এই ধরনের সব ক্যাটাগরির যৌগের উপস্থিতি প্রাণীকলায় পরিলক্ষিত হয়। তবে উদ্ভিদ, ছত্রাক ও অণুজীবের কোশের বিশ্লেষণ করলে যৌগগুলোতে এইসব প্রাথমিক বিপাকজাত পদার্থ ছাড়াও হাজারো যৌগ দেখতে পাবে, যেমন তরুক্ষীর, ফ্ল্যাভোনয়েড, রাবার, অত্যাবশ্যকীয় তৈল (essential oil), অ্যান্টিবায়োটিকস্, রঙিন রঞ্জক পদার্থ, গন্ধদ্রব্য, আঠা, মশলা ইত্যাদি। এগুলোকে বলা হয় সেকেন্ডারি বিপাকজাত পদার্থ (সারণি 9.3 দেখো)। স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় কাজে প্রাথমিক বিপাকজাত পদার্থগুলোর ভূমিকা জানা থাকলেও পোষক (Host) জীবে সমস্ত গৌণ (সেকেন্ডারি) বিপাকজাত পদার্থগুলোর ভূমিকা বা কাজ। এই মুহূর্তে আমাদের বোধগম্য নয়। তবে এদের মধ্যে অনেকগুলো মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হয় (উদাহরণস্বরূপ রাবার, ঔষধ, মশলা, গন্ধদ্রব্য এবং রঞ্জক পদার্থ)। কিছু সেকেন্ডারি বিপাকজাত পদার্থের বাস্তুতান্ত্রিক গুরুত্ব রয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এবং পরবর্তী বছরগুলোতে অধ্যয়নকালে তোমরা এ সম্পর্কে আরও জানবে।

সারণি 9.3 : কিছু গৌণ বিপাকজাত পদার্থ

রঞ্জক	ক্যারোটিনয়েড, অ্যান্থোসায়ানিন ইত্যাদি
উপক্ষার	মরফিন, কোডেইন ইত্যাদি
টারপিনয়েড	মনোটারপিন, ডাইটারপিন ইত্যাদি
অপরিহার্য তেল	লেমনগ্রাস তেল ইত্যাদি
টক্সিন (বিষ)	অ্যাবরিন, রিসিন
লেক্টিন্স্	কন্কেনাডেলিন A
ঔষধ	ভিনব্লাসটিন, কারকুমিন ইত্যাদি
পলিমারিক পদার্থ	রাবার, আঠা, সেলুলোজ ইত্যাদি

9.3. বৃহৎ জৈব অণুসমূহ (Biomacromolecules)

অ্যাসিডে দ্রাব্য যৌগসমূহের মধ্যে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তাদের আণবিক ওজন 18 থেকে শুরু করে প্রায় 800 ডালটন (Da) পর্যন্ত হয়।

অ্যাসিডে অদ্রাব্য অংশের মধ্যে মোট চার ধরনের জৈব যৌগ পাওয়া যায়। যথা প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, পলিস্যাকারাইড এবং লিপিড। লিপিডগুলোকে বাদ দিলে তাদের আণবিক ওজন দশ হাজার ডালটন বা তার বেশি। এই কারণের জন্য জৈব অণুগুলোকে বা জৈব রাসায়নিক পদার্থগুলোকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেগুলোর আণবিক ওজন এক হাজার ডাল্টনের নীচে থাকে। আমরা জৈবক্ষুদ্র অণু এদের বলে থাকি। যেগুলো অ্যাসিডে অদ্রাব্য অংশে থাকে এবং ওজন দশ হাজারের বেশি সেগুলোকে বৃহৎ অণু বা বৃহৎ জৈব অণু বলে থাকি।

লিপিড ছাড়া অদ্রাব্য অংশের প্রাপ্ত অণুগুলো হল পলিমার। লিপিডের আণবিক ওজন 800 ডালটন অতিক্রম না করা সত্ত্বেও তাহলে কেন তা অ্যাসিড অদ্রাব্য অর্থাৎ বৃহৎ অণু অংশে থেকে যায়? লিপিডের আনবিক ওজন বাস্তবিকই কম এবং কোশপর্দা ও অন্যান্য পর্দার মধ্যে এমনই থাকে না, সজ্জিত অবস্থায় থাকে। যখন আমরা কোনো কলাকে চূর্ণ করে ফেলি তখন কোশের গঠন সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। কোশপর্দা বা অন্যান্য পর্দাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং থলি (vesicle) তৈরি করে যা জলে দ্রাব্য হয় না। এই কারণে পর্দার টুকরো অংশগুলো, যা থলি তৈরি করে এবং অ্যাসিড অদ্রাব্য অংশ থেকে পৃথক হয় এবং বৃহৎ অণু অংশে থেকে যায়। সঠিকভাবে বলতে গেলে লিপিডগুলো কোনোভাবেই বৃহৎ অণু নয়।

অ্যাসিড দ্রাব অংশ স্থূলভাবে সাইটোপ্লাজমীয় গঠনকে বোঝায়। সাইটোপ্লাজম এবং কোশীয় অঙ্গাণুস্থিত বৃহৎ অণুগুলো অ্যাসিডে অদ্রাব্য অংশে থাকে। সবমিলিয়ে এটি সজীব কলা বা জীবের সমস্ত রাসায়নিক গঠনটিকে উপস্থাপন করে।

সংক্ষেপে প্রতুলতার দিক থেকে যদি আমরা সজীবকলার রাসায়নিক গঠন লক্ষ করি এবং তাদের শ্রেণি বিন্যস্ত করি তবে আমরা দেখব যে জলই হল সেই রাসায়নিক পদার্থ যা জীবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে (সারণি 9.4 দেখো)।

সারণি 9.4 : কোশ গঠনকারী উপাদানসমূহের গড় পরিমাণ

উপাদান	কোশের মোট ভরের শতকরা ভাগ
জল	70–90
প্রোটিন	10–15
কার্বোহাইড্রেট	3
লিপিড	2
নিউক্লিক অ্যাসিড	5–7
আয়ন	1

9.4 প্রোটিনসমূহ (Proteins)

প্রোটিনগুলো হল পলিপেপটাইড, এগুলো হল পেপটাইড বন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত বহু অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলোর রৈখিক শৃঙ্খল। (চিত্র 9.3 তে দেখানো হয়েছে)। প্রোটিন 20 প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড (যেমন অ্যালানিন, সিস্টেইন, প্রোলিন, ট্রিপটোফেন, লাইসিন ইত্যাদি) দ্বারা গঠিত।

প্রোটিন একটি হেটেরোপলিমার, হোমোপলিমার নয়। একটি হোমোপলিমার কেবলমাত্র এক ধরনের মনোমার দ্বারা গঠিত যেখানে মনোমারগুলো 'n' সংখ্যক হয় বা এর পুনরাবৃত্তি ঘটে। পরবর্তীকালে যখন অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণ সংক্রান্ত এই তথ্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ পরবর্তী সময়ে পুষ্টি অধ্যায়ে তোমরা জানবে যে, কিছু কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য এবং এদের খাদ্যের মাধ্যমে দেহে সরবরাহের প্রয়োজন হয়। তাই খাদ্যস্থিত প্রোটিনগুলো অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের উৎস। এই কারণে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো অপরিহার্য বা অনপরিহার্য হতে পারে। অনপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো হল সেই সব অ্যামাইনো অ্যাসিড যেগুলো আমাদের দেহে সংশ্লেষিত হয়। অপরদিকে অপরিহার্য

সারণি 9.5 : কিছু প্রোটিন এবং তাদের কার্যবলি

প্রোটিন	কার্যাবলি
কোলাজেন	আন্তঃকোশীয় ভিত্তি
ট্রিপসিন	উৎসেচক
ইনসুলিন	হরমোন
অ্যান্টিবডি	সংক্রমণকারী রোগজীবাণু প্রতিরোধ
গ্রাহক	সংবেদ গ্রহণ (ঘ্রাণ, স্বাদ, হরমোন ইত্যাদি)
GLUT-4	কোশাভ্যন্তরে গ্লুকোজের পরিবহণে সাহায্য করে।

অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো আমরা খাদ্যের মাধ্যমে পাই। সজীব বস্তুতে প্রোটিন নানা ধরনের কাজ করে। কিছু প্রোটিন কোশপর্দার মধ্য দিয়ে পরিপোষক পরিবহণে, কিছু প্রোটিন জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে। আবার কিছু প্রোটিন হল হরমোন, কিছু প্রোটিন হল উৎসেচক ইত্যাদি। সারণি 9.5 দেখো। প্রাণী জগতে কোলাজেন প্রোটিনের প্রাচুর্যই সবচেয়ে বেশি এবং সমস্ত জীবমণ্ডলের মধ্যে রাইবিউলেজ বিস্‌ফস্‌ফেট, কার্বোক্সিলেজ অক্সিজিনেজ (Rubisco) প্রোটিনের প্রাচুর্য সবচেয়ে বেশি।

9.5 পলিস্যাকারাইড (Polysaccharides)

অ্যাসিড অদ্রাব্য অংশের অধঃক্ষেপে অপর এক শ্রেণির বৃহৎ অনুরূপী পলিস্যাকারাইডও (কার্বোহাইড্রেড) বর্তমান। পলিস্যাকারাইড গুলো হল শর্করার দীর্ঘ শৃঙ্খল। এরা হল গাঠনিক একক রূপে বিভিন্ন শর্করা দ্বারা গঠিত সূত্র বিশেষ (আক্ষরিত অর্থে একটি তুলার সূত্র)। উদাহরণস্বরূপ সেলুলোজ একটি পলিমারিক পলিস্যাকারাইড যা কেবলমাত্র এক ধরনের মনোস্যাকারাইডের সমন্বয়ে গঠিত (যেমন গ্লুকোজ)। সেলুলোজ একটি হোমোপলিমার। শ্বেতসার হল এর থেকে ভিন্ন ধরনের একটি হোমোপলিমার যা উদ্ভিদকলায় শক্তির সঞ্চয় ভাণ্ডাররূপে বর্তমান থাকে। প্রাণীদেহে অপর একটি ভিন্ন ধরনের হোমোপলিমার থাকে, একে গ্লাইকোজেন বলে। ইনসুলিন হল ফ্রুক্টোজের পলিমার। একটি পলিস্যাকারাইড শৃঙ্খলে (ধরা যাক গ্লাইকোজেন) ডান প্রান্তটিকে বিজারণক্ষম প্রান্ত এবং বাম প্রান্তটিকে বিজারণ অক্ষম প্রান্ত বলে। এটি শাখান্বিত গঠনবিশিষ্ট, যেমনটা কার্টুনে দেখানো হয়েছে (চিত্র 9.2 দেখো)। শ্বেতসার প্যাঁচানো (Helical) গৌণগঠন তৈরি করে। আসলে শ্বেতসার এর প্যাঁচানো অংশে আয়োডিন ধারণ করতে পারে। শ্বেতসার-আয়োডিনযুক্ত যৌগের বর্ণ হল লাল। সেলুলোজের জটিল প্যাঁচানো গঠন (Complex Helix) না থাকায় এটি আয়োডিনকে ধারণ করতে পারে না।

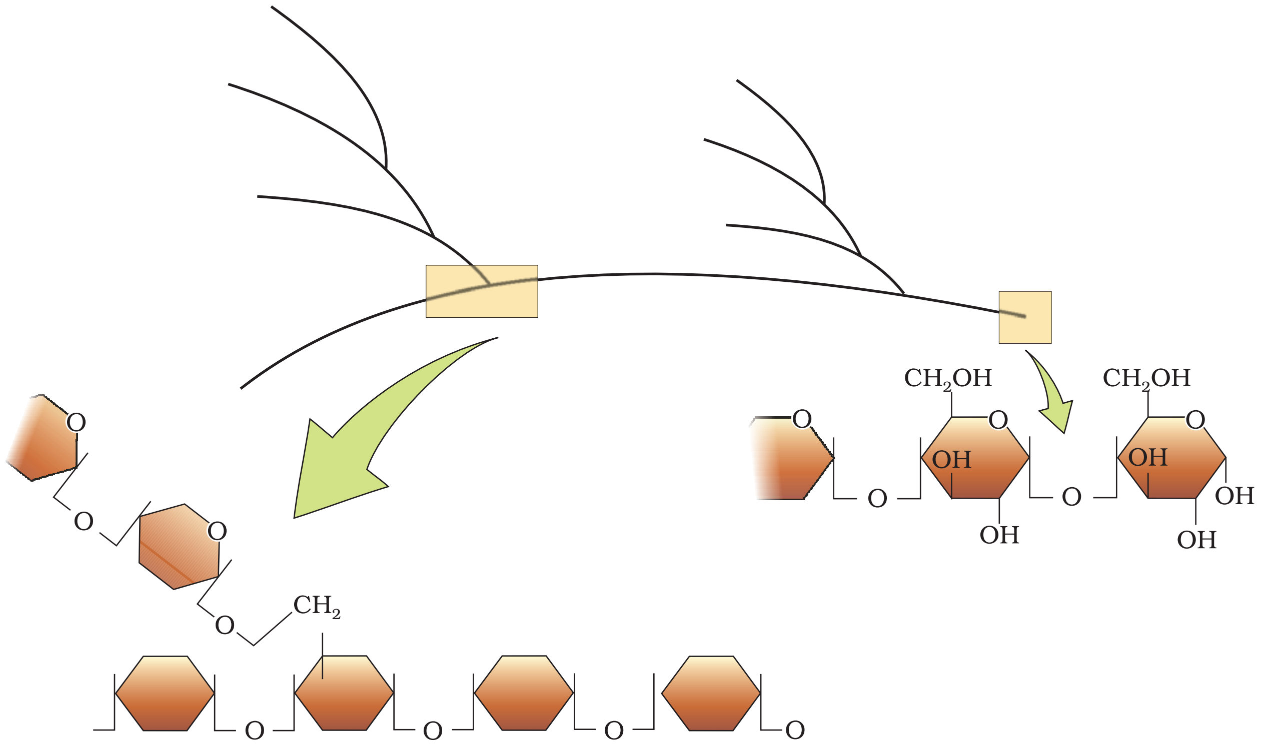

চিত্র 9.2 : গ্লাইকোজেনের চিত্ররূপের কিছু অংশ উপস্থাপন

উদ্ভিদের কোশ প্রাচীর সেলুলোজ নির্মিত। উদ্ভিদের কাষ্ঠমণ্ড থেকে উৎপাদিত কাগজ এবং তুলোর তন্তুগুলো সেলুলোজ নির্মিত। প্রকৃতিতে আরও জটিল পলিস্যাকারাইডও পাওয়া যায়। সেখানে অ্যামাইনো শর্করা এবং রাসায়নিকভাবে পরিবর্তিত শর্করা (যেমন গ্লুকোস্যামিন N অ্যাসিটাইল গ্যালাক টোস্যামিন ইত্যাদি) গঠনকারী উপাদান হিসাবে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ সন্ধিপদী প্রাণীদের বহিঃকঙ্কালে এক জটিল পলিস্যাকারাইড থাকে, একে কাইটিন বলে। এই জটিল পলিস্যাকারাইডগুলো অধিকাংশই হোমোপলিমার।

9.6. নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic Acids)

কোনো সজীব কলার অ্যাসিডে অদ্রাব্য অংশের আরেক ধরনের বৃহৎ অণু হল নিউক্লিক অ্যাসিড। এগুলো হল পলিনিউক্লিওটাইড। পলিস্যাকারাইড ও পলিপেপটাইডের সঙ্গে এগুলো আসলে যে কোনো সজীব কলা বা কোশের প্রকৃত বৃহৎ অণু সম্বলিত অংশ গঠন করে। নিউক্লিক অ্যাসিডের গঠনগত একক নিউক্লিওটাইড। একটি নিউক্লিওটাইডের গঠনে রাসায়নিকভাবে তিনটি সুস্পষ্ট উপাদান রয়েছে। প্রথমটি একটি হেটারোসাইক্লিক যৌগ, দ্বিতীয়টি মনোস্যাকারাইড এবং তৃতীয়টি হল ফসফোরিক অ্যাসিড বা ফসফেট।

চিত্র 9.1 এ তোমরা লক্ষ করেছ যে, নিউক্লিক অ্যাসিডস্থিত হেটারোসাইক্লিক যৌগগুলো হল অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, ইউরাসিল, সাইটোসিন এবং থায়মিন। অ্যাডিনিন এবং গুয়ানিন হল প্রতিস্থাপিত পিউরিন আর বাকিগুলো হল প্রতিস্থাপিত পিরিমিডিন। হেটারোসাইক্লিক বলয়বিশিষ্ট কাঠামোগুলো হল যথাক্রমে পিউরিন এবং পিরিমিডিন। পলিনিউক্লিওটাইডে যে শর্করা পাওয়া যায় তা হল রাইবোজ (একটি পেন্টোজ মনোস্যাকারাইড) বা 2- ডি অক্সিরাইবোজ। ডি-অক্সিরাইবোজ শর্করা সমন্বিত নিউক্লিক অ্যাসিডকে ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA) বলে। অপরদিকে রাইবোজ সমন্বিত নিউক্লিক অ্যাসিডকে রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (RNA) বলে।

9.7. প্রোটিনের গঠন (Structure of Proteins)

আগে যেমন বলা হয়েছে, প্রোটিন হল সূত্রকারে নির্মিত অ্যামাইনো অ্যাসিডের সূত্র সমন্বিত হেটারোপলিমার। অণুসমূহের গঠন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়। অজৈব রসায়নে অণুর গঠন বলতে বোঝায় আণবিক সংকেত (যেমন NaCl, $MgCl_2$ ইত্যাদি)। জৈব রসায়নবিদগণ কিন্তু অণুর গঠন বলতে দ্বিমাত্রিক গঠন লিপিবদ্ধ করেন (যেমন বেঞ্জিন, ন্যাপথালিন ইত্যাদি)। পদার্থবিদরা অণুর ত্রিমাত্রিক গঠন উপস্থাপন করেন। অন্যদিকে জীববিজ্ঞানীরা প্রোটিনের গঠনকে চারটি স্তরে বর্ণনা করেন। প্রোটিনে অ্যামাইনো অ্যাসিড সজ্জাক্রম অর্থাৎ কোন্‌টি প্রথম অ্যামাইনো অ্যাসিড, কোন্‌টি দ্বিতীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড, এইভাবে অ্যামাইনো অ্যাসিডের অবস্থানজনিত তথ্য পাওয়া যায়, তাকে প্রোটিনের প্রাথমিক গঠন বলে। একটি প্রোটিনকে একটি লাইন হিসাবে কল্পনা করা হয়। যেখানে বামপ্রান্তের অ্যামাইনো অ্যাসিডটিকে বলা হয় প্রথম এবং ডানপ্রান্তের অ্যাসিডকে বলা হয় শেষ। প্রথম অ্যামাইনো অ্যাসিডটিকে N প্রান্তও বলা হয়। শেষটিকে C প্রান্তীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড বলা হয়। একটি প্রোটিন সূত্র কিন্তু শক্ত সোজা রডের মতো থাকে না। সূত্রটি হেলিক্স এর (ঘোরানো সিঁড়ির মতো) আকারে

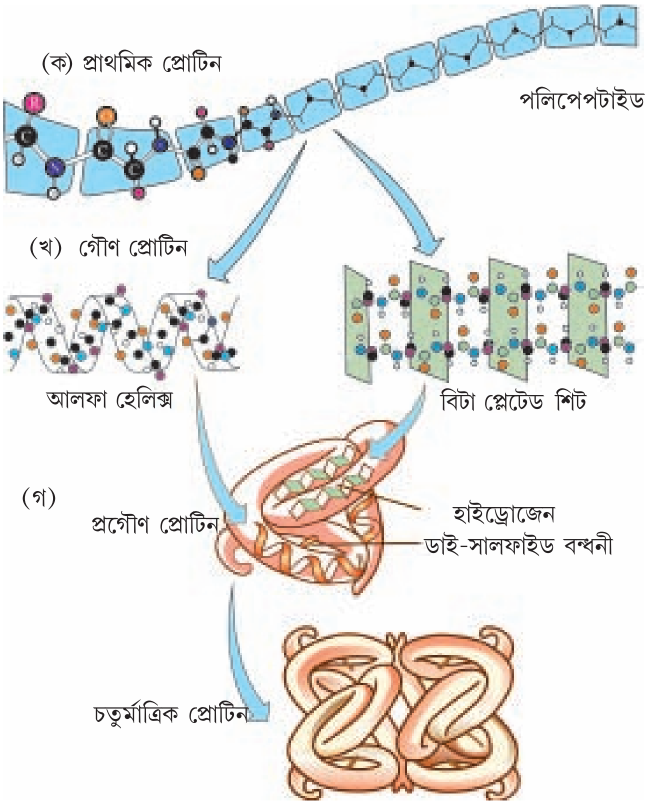

চিত্র 9.3 : প্রোটিনের গঠনের বিভিন্ন স্তরসমূহ

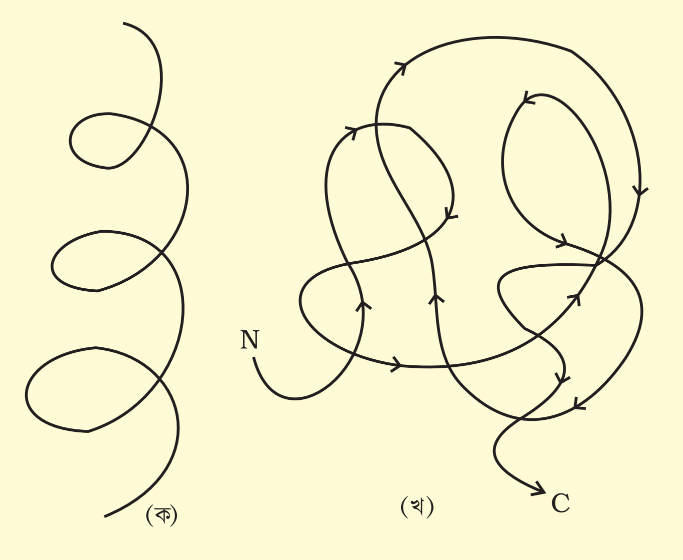

চিত্র 9.4 : কার্টুনের সাহায্যে (ক) সেকেন্ডারি প্রোটিনের গঠন (খ) টার্শিয়ারি গঠন দেখানো হয়েছে

ভাঁজ করা থাকে। অবশ্য প্রোটিন সূত্রের কিছুটা অংশ হেলিক্স এর আকারে বিন্যস্ত থাকে। প্রোটিন শুধুমাত্র ডানদিকে ঘোরানো হেলিক্সই দেখা যায়। প্রোটিন সূত্রের অন্যান্য অংশ আবার অন্যরকমভাবেও ভাঁজ করা থাকে যাকে বলা হয় — গৌণ বা সেকেন্ডারি গঠন। তাছাড়াও একটি দীর্ঘ প্রোটিনশৃঙ্খল উলের ফাঁপা বলের মতো উপরে-নীচে ভাঁজ হয়ে থাকে। একে বলে প্রগৌণ বা টার্সিয়ারি গঠন (চিত্র 9.4 ক, খ দেখো)। এটি একটি প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক দৃশ্যের প্রদর্শন করে। প্রোটিনের অনেক জৈবনিক কার্যকারিতার জন্য প্রগৌণ বা (টার্সিয়ারি) গঠন অবশ্যই প্রয়োজন।

কোনো কোনো প্রোটিন একাধিক পলিপেপটাইড বা অধঃএককের সমন্বয়ে গঠিত। যে উপায়ে প্রতিটি ভাঁজযুক্ত পলিপেপটাইড বা উপ একক নিজেদের মধ্যে বিন্যস্ত থেকে (যেমন লম্বা সূত্রের গোলক,

একটার উপর আরেকটা গোলকের বিন্যস্ত ঘনক বা আবরণ ইত্যাদি) প্রোটিনের স্থাপত্য তৈরি করে। তাকে প্রোটিনের চতুর্মাত্রিক (quaternary structisre) গঠন বলে। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের হিমোগ্লোবিনে 4টি উপএকক থাকে। এদের মধ্যে দুটি সর্বাংশে একরূপ। দুটি উপ একক (α) ধরনের এবং অপর দুটি β ধরনের। এই দুই ধরনের উপ এককের সমন্বয়ে মানুষের হিমোগ্লোবিন (Hb) গঠিত।

9.8 পলিমারের মধ্যে মনোমারের বন্ধনী সংযোগের প্রকৃতি (Nature of Bond linking monomers in a polymer)

পলিপেপটাইড বা প্রোটিনে, অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো পেপটাইড বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকে। একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের – COOH মূলক পরের অ্যামাইনো অ্যাসিডের NH_2 মূলকের সঙ্গে বিক্রিয়ার মাধ্যমে এক অণু জল বর্জন করে (প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় জল বিয়োজন, dehydration) পেপটাইড বন্ধনী গঠন করে। একটি পলিস্যাকারাইডে একক মনোস্যাকারাইডগুলো, গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকে। এই বন্ধনীটিও জল বিয়োজনের মাধ্যমে গঠিত হয়। পাশাপাশি দুটি মনোস্যাকারাইডের দুটি কার্বনের মধ্যে এই বন্ধনীটি গঠিত হয়। নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে ফসফেট অংশটি একটি শর্করার ও কার্বনের সঙ্গে পরবর্তী নিউক্লিওটাইডের শর্করার S কার্বনকে যুক্ত করে। ফসফেট মূলক ও শর্করার হাইড্রক্সিল মূলকের মধ্যে যে বন্ধনী গঠিত হয়, তাকে এস্টার বন্ধনী বলে। ফসফেট মূলকের দুদিকে এমন এস্টার বন্ধনী করে বলে এটিকে ফসফোডাইএস্টার বন্ধনী বলে (চিত্র 9.5 দেখো)।

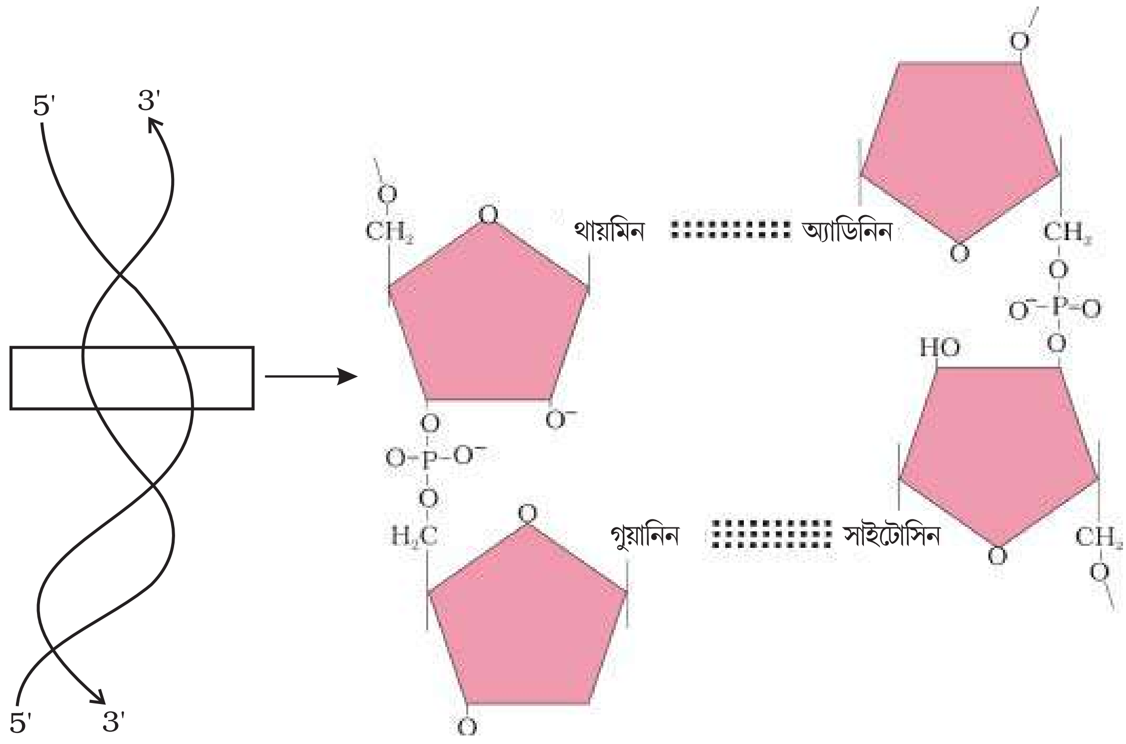

চিত্র 9.5 : চিত্রে DNA এর গৌণ গঠন দেখানো হয়েছে।

নিউক্লিক অ্যাসিডে অনেক ধরনের গৌণ গঠন দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় — DNA এর যে সমস্ত গৌণ গঠন (Secondary Structure) দেখায় তার মধ্যে বিখ্যাত হল ওয়াটসন ক্রিক মডেল। এই মডেল অনুযায়ী DNA দ্বিতন্ত্রী প্যাঁচানো গঠনবিশিষ্ট। পলিনিউক্লিওটাইডের তন্তু দুটি বিপরীতমুখী সমান্তরাল। অর্থাৎ একটি তন্তু অপরটির বিপরীত অভিমুখে চলে। DNA-র কাঠামোটি শর্করা-ফসফেট-শর্করা শৃঙ্খল দ্বারা গঠিত হয়। নাইট্রোজেন ক্ষারগুলো কাঠামোটির সঙ্গে মোটামুটি লম্বভাবে প্রক্ষিপ্ত থাকে কিন্তু এদের অভিমুখ ভেতরের দিকে থাকে। একটা তন্তুর A ও G ক্ষারক অপর তন্তুর যথাক্রমে T ও C ক্ষারকের সাথে জোড় তৈরি করে। A ও T জোড়ের মধ্যে দুটি হাইড্রোজেন বন্ধনী থাকে এবং G ও C জোড়ের মধ্যে থাকে তিনটি। প্রতি জোড়া ক্ষারক যেন সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ। প্রতিটি ক্ষারকজোড়া তন্তুগুলোকে 36^0 ঘুরিয়ে দেয়। দ্বিতন্ত্রীর সম্পূর্ণ একপাক ঘুরতে তাই দশটি ক্ষারক জোড়া বা ধাপ লাগে। একটি রেখাচিত্র ড্রয়িং করতে চেষ্টা করো। দুটি তন্তুর একটি সম্পূর্ণ ঘূর্ণন বা প্যাঁচের দূরত্ব 34Å। প্রতি জোড়া নাইট্রোজেন হারের উত্থান হবে 3.4Å। উপরোক্ত লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্টযুক্ত এই ধরনের DNA কে B DNA বলা হয়। উপরের শ্রেণিতে তুমি জানতে পারবে যে, এক ডজনেরও বেশি ধরনের DNA আছে ও এদের নামকরণ ইংরেজি বর্ণমালার সাহায্যে প্রকাশ করা হয় এবং এরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র গাঠনিক বৈশিষ্টসম্পন্ন।

9.9 দেহ গঠনকারী উপাদানসমূহের গতিশীল অবস্থা-বিপাকের ধারণা (Dynamic State of Body Constituents-Concept of Metabolism)

এই পর্যন্ত আমরা যা শিখেছি তাতে দেখেছি সজীব জীবে হাজার হাজার যৌগ থাকে। তা সে সরল ব্যাকটিরিয়া, প্রোটোজোয়া, উদ্ভিদ বা প্রাণী যাই হোক না কেন। এই যৌগগুলো বা জৈব অণুগুলো একটা নির্দিষ্ট ঘনত্বে বর্তমান থাকে (মোল/কোশ অথবা মোল/ ইত্যাদিতে প্রকাশ করা হয়)। যত বড়ো আবিষ্কার এখন পর্যন্ত হয়েছে তার মধ্যে অনন্য একটি পর্যবেক্ষণ হল এই জৈব অণুগুলোর একটি টার্ন ওভার রয়েছে। এর মানে হল এইসব অণুগুলো অবিরাম অন্য কোনো জৈব অনুতে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে এবং অন্য কোনো জৈবঅণু থেকে অনুগুলো আবার তৈরি হচ্ছে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে অবিচ্ছিন্ন এই ভাঙাগড়া সজীব জীবে সবসময় ঘটে চলছে। এই বিক্রিয়াগুলোকে একসাথে বলে বিপাক। প্রতিটি বিপাকীয় বিক্রিয়ার ফলে জৈব অনুর রূপান্তর ঘটে। বিপাকীয় এইসব রূপান্তরের কয়েকটি উদাহরণ হল অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে CO_2 অপসারণ করে তাকে অ্যামাইনে পরিণত করা, নিউক্লিওটাইডের ক্ষারক থেকে অ্যামাইনোমূলক অপসারণ করা, ডাইস্যাকারাইডের গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনীর আর্দ্রবিশ্লেষণ করা ইত্যাদি, এমন হাজারো উদাহরণের তালিকা আমরা তৈরি করতে পারি। বিপাকীয় এইসব বিক্রিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৃথকভাবে ঘটে না, ঘটে অন্যান্য আরও বিক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। অন্যভাবে বলা যায় বিপাকজাত পদার্থগুলো পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিক্রিয়ায় একটি থেকে আরেকটিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ক্রমিক এই বিক্রিয়াগুলোকে বলে বিপাকীয় পথ। শহরের গাড়ি চলাচলের সঙ্গে এই বিপাকীয় পথের তুলনা করা যেতে পারে। এই পথগুলো রৈখিক অথবা বৃত্তাকার হতে পারে। পথগুলো নিজেদের মধ্যে ক্রসাকারে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ এই পথগুলোর সংযোগস্থল ট্রাফিক ব্যবস্থার মতো। বিপাকজাত পদার্থগুলো, বিপাকীয় পথে গাড়ির মতো একটি নির্দিষ্ট হারে এবং দিকে চলতে থাকে। বিপাকজাত পদার্থের এই প্রবাহকে বলে দেহ উপাদানের গতিশীল অবস্থা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এই যে স্বাস্থ্যপূর্ণ অবস্থায় এই অন্তর্ভুক্তযুক্ত পথে বিপাকজাত পদার্থের চলাচল এতই মসৃণ যে একটি দুর্ঘটনাও সেখানে ঘটে না। এইসব বিপাকীয় বিক্রিয়ার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যে প্রতিটি বিক্রিয়াই এখানে অনুঘটক নির্ভর

বিক্রিয়া। সজীব বস্তুতে এমন কোনো বিক্রিয়াই অনুঘটকের ব্যতিরেকে ঘটে না। এমনকি CO_2 এর জলে দ্রবীভূত হওয়ার মতো ভৌত প্রক্রিয়াও সজীবদেহে একটি অনুঘটক নির্ভর বিক্রিয়া। বিপাকীয় রূপান্তরের হার বর্ধনকারী এইসব অনুঘটকগুলো হল প্রকৃতপক্ষে প্রোটিন। অনুঘটক ক্ষমতা যুক্ত প্রোটিনদের বলে উৎসেচক।

9.10. জীবনধারণের বিপাকীয় ভিত্তি (Metabolic Basis for Living)

বিপাকীয় পথ সরলতর গঠনকে অধিক জটিল করতে পারে (যেমন অ্যাসেটিক অ্যাসিড কোলেস্টেরলে পরিণত হয়)। আবার জটিল গঠনকে সরলতর গঠনে পরিবর্তিত করতে পারে (যেমন, আমাদের অস্থিপেশিতে গ্লুকোজ ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হয়)। প্রথমটিকে বলা হয় জৈব সংশ্লেষণ বা উপচিতি। পরেরটি ভাঙন বা অপচিতি। উপচিতি পথ আশানুরূপভাবে শক্তি খরচ করে। অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে প্রোটিন প্রস্তুতিতে শক্তির প্রয়োজন হয়। অপরদিকে অপচিতি পথে শক্তির নির্গমন ঘটে। যেমন, আমাদের অস্থিপেশিতে গ্লুকোজ ভেঙে যখন ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। তখন শক্তির নির্গমন ঘটে। গ্লুকোজ থেকে ল্যাকটিক অ্যাসিডের এই বিপাকীয় পথে 10টি বিপাকীয় ধাপ আছে; একে গ্লাইকোলাইসিস (Glycolysis) বলে। সজীব জীব ভাঙনের সময়ে নির্গত শক্তিকে ধরে রাসায়নিক বন্ধনে সংরক্ষণ করতে পারে। জৈব সংশ্লেষণ, অভিস্রবণ বা যান্ত্রিক কার্যকরী সম্পাদনের সময় যখন এবং যেমন প্রয়োজন হয় সেই অনুযায়ী এই বন্ধনশক্তি ব্যবহার করে। সজীব জীবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি মুদ্রা হল অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট (ATP) নামক রাসায়নিক বন্ধন শক্তি।

সজীব বস্তু কীভাবে তাদের শক্তি আহরণ করে? তাদের শক্তি অর্জনের জন্য কী কী কৌশল উদ্ভব করতে হয়েছে? এই শক্তি তারা কীভাবে এবং কোন্‌রূপে সংরক্ষণ করে? কীভাবে তারা তাদের শক্তিকে কার্যে রূপান্তরিত করে? পরবর্তী সময়ে উপরের শ্রেণিতে বায়োএনার্জেটিক্স নামক উপ অধ্যায়ে এগুলো তোমরা পড়বে এবং বুঝবে।

9.11. সজীব অবস্থা (The Living State)

অধ্যয়নের এই স্তরে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝেছ যে, সজীব বস্তুতে যে হাজার হাজার রাসায়নিক যৌগ থাকে অন্যভাবে বললে বিপাকজাত পদার্থ বা জৈব অণু বলে। সেগুলো প্রত্যেকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত ঘনত্বে দেহে উপস্থিত থাকে। যেমন স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান মানুষের রক্তে গ্লুকোজের ঘনত্ব 4.5 – 5.0 mm সেখানে হরমোনের ক্ষেত্রে সেটা ন্যানোগ্রাম বা ml এ প্রকাশ করা হয়। বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল যে প্রত্যেকটি জৈব অণুর ঘনত্বের ব্যাপারে দেহ স্থিতাবস্থা বজায় রাখে। এই জৈব অণুগুলো নিরন্তর বিপাকীয় পরিবর্তনের মধ্যে থাকে। যে- কোনো রাসায়নিক এবং ভৌত প্রক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাম্যাবস্থার দিকে চলতে থাকে। স্থিতাবস্থা হল এমন একটি অবস্থা যাকে কোনোভাবেই সাম্যাবস্থা বলা যায়না। পদার্থবিদ্যার জ্ঞান থেকে মনে করা যায়, কোনো সিস্টেম যখন সাম্যাবস্থায় পৌঁছায় তখন সেই সিস্টেম কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সজীব বস্তু যেহেতু নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে তাই তারা সাম্যাবস্থায় পৌঁছতে চায় না। তাহলে সজীব অবস্থা একটি সাম্যহীন স্থিতাবস্থা যা কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম। জীবনের প্রক্রিয়াগুলো তাই অবিরাম সচেষ্ট থাকে যাতে কোনোভাবে সাম্যাবস্থায় না পৌঁছাতে হয়। শক্তির ব্যবহার দ্বারা কাজটি সম্ভব হয়। বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলেই শক্তি উৎপন্ন হয়। সেই কারণে সজীব অবস্থা এবং বিপাক সমার্থক। বিপাক ব্যতীত সজীব অবস্থা বজায় থাকতে পারে না।

9.12 উৎসেচক (Enzymes)

প্রায় সব উৎসেচকই প্রোটিন। কিছু কিছু নিউক্লিক অ্যাসিড আছে, যা উৎসেচকের মতো আচরণ করে। এগুলোকে বলে রাইবোজাইম। একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে একটি উৎসেচকের বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রোটিনের মতোই উৎসেচকগুলোর প্রাইমারি গঠন আছে অর্থাৎ এটিও পর পর অ্যামাইনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত প্রোটিন। যে-কোনো প্রোটিনের মতো উৎসেচকের সেকেন্ডারি এবং টার্শিয়ারি গঠনও রয়েছে। যখন তোমরা টার্সিয়ারি গঠন দেখবে (চিত্র 9.4b দেখো) তখন তোমরা লক্ষ করবে যে প্রোটিন শৃঙ্খলটি নিজের উপরই ভাঁজ হয়ে আছে। প্রোটিন শৃঙ্খলটি ক্রস আকারে সজ্জিত থাকে এবং তাই অনেকগুলো ফাঁকফোকর বা পকেটের সৃষ্টি করে। এরকমই একটা পকেট হল সক্রিয়স্থান। উৎসেচকের সক্রিয় স্থান হল সেই ফাঁকফোকর বা পকেট যেখানে সাবস্ট্রেট আবদ্ধ হতে পারে। এইভাবেই সক্রিয় স্থানের সাহায্যে উৎসেচক উচ্চহারে বিক্রিয়ার অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। কিন্তু এদের মধ্যে প্রধান পার্থক্যটি উল্লেখের প্রয়োজন। অজৈব অনুঘটক উচ্চতাপমাত্রায় এবং উচ্চচাপে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে। অন্যদিকে উচ্চতাপমাত্রায় (ধরো 40^0C এর উপরে) উৎসেচক নষ্ট হয়ে যায়। তাহলেও অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রায় (উত্তপ্ত বায়ু ও তরলের নির্গমন পথ এবং সালফার সমন্বিত উষ্ণ প্রস্রবণ) সাধারণভাবে বসবাস করে তাদের দেহ থেকে নিষ্কাশিত উৎসেচকগুলো সুস্থিত থাকে এবং এমনকি উচ্চ তাপমাত্রাতেও (80^0C- 90^0C পর্যন্ত) তাদের অনুঘটন ক্ষমতা বজায় থাকে। তাই উচ্চ তাপমাত্রায় স্থিতিশীল থাকা থার্মোফিলিক জীবসমূহ থেকে নিষ্কাশিত এই ধরনের উৎসেচকগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম।

9.12.1 রাসায়নিক বিক্রিয়া (Chemical Reactions)

এই উৎসেচকদের আমরা বুঝব কীভাবে? প্রথমে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে বুঝে নেওয়া যাক। রাসায়নিক যৌগে দু'ধরনের পরিবর্তন ঘটে। ভৌত পরিবর্তন — রাসায়নিক বন্ধন বিভাজিত না হয়ে শুধুমাত্র আকৃতির পরিবর্তন। এটি একটি ভৌত প্রক্রিয়া। আরেকটি ভৌত পরিবর্তন হল পদার্থের অবস্থান্তর যেমন বরফ থেকে জল বা জল থেকে বাষ্পে রূপান্তর এগুলো ভৌত প্রক্রিয়া। আর রূপান্তরের সময় যেখানে বন্ধনী ভাঙে ও নতুন বন্ধনী সৃষ্টি হয় তাকে রাসায়নিক বিক্রিয়া বলে। যেমন

$$Ba(OH)_2 + H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2H_2O$$

এটি একটি অজৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া। তেমনি স্টার্চের বা শ্বেতসারের আর্দ্রবিশ্লেষণে গ্লুকোজের উৎপাদন একটি জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া। ভৌত ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার বলতে বোঝায় একক সময়ে বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের উৎপাদন। এটিকে এইভাবে প্রকাশ করা হয় —

বিক্রিয়ার হার =

$$\frac{\delta P}{\delta t}$$

বিক্রিয়ার হারকে বেগও বলা যায় যদি বিক্রিয়ার গতিমুখ নির্দিষ্ট থাকে। ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার হার অন্যান্য কারণের সঙ্গে তাপমাত্রার উপরও নির্ভরশীল। একটা সাধারণ চলতি নিয়ম হল 10^0C তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাসে হার দ্বিগুণ বা অর্ধেক হয়ে যায়। অনুঘটকযুক্ত বিক্রিয়াগুলো অনুঘটকহীন বিক্রিয়াগুলো থেকে অনেক বেশি হারে সম্পন্ন হয়। যখন উৎসেচক অনুঘটকযুক্ত

বিক্রিয়াগুলো পর্যবেক্ষণ করা যায়। তখন অনুঘটকহীন একই বিক্রিয়ার থেকে হার অনেক বেশি দেখা যায়। যেমন ঃ

$$CO_2 + H_2O \xrightleftharpoons{\text{কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ}} H_2CO_3$$

কার্বন ডাইঅক্সাইড জল কার্বনিক অ্যাসিড

উৎসেচকের অনুপস্থিতিতে এই বিক্রিয়াটি খুব ধীরে হয়। ঘণ্টায় 200 অণু H_2CO_3 উৎপন্ন হয়। কিন্তু সাইটোপ্লাজমে বর্তমান কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ উৎসেচকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়ার বেগ আশ্চর্যজনকভাবে বেড়ে প্রতি সেকেন্ডে 600,000 অণু গঠিত হয়। উৎসেচক বিক্রিয়ার হারকে প্রায় 10 মিলিয়ন গুণ বাড়িয়ে দেয়। হাজার হাজার ধরনের উৎসেচক আছে, প্রত্যেকটি একটি অনন্য রাসায়নিক বা বিপাকীয় বিক্রিয়াকে অনুঘটন করে। কোনো ধাপের রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ কোনো একই উৎসেচকগুচ্ছ বা বিভিন্ন উৎসেচক অনুঘটন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তখন তাকে বিপাকীয় পথ বলে। যেমন —

গ্লুকোজ → 2 পাইরুভিক অ্যাসিড

$$C_6H_{12}O_6 + O_2 \rightarrow 2C_3H_4O_3 + 2H_2O$$

একটি বিপাকীয় পথ যেখানে গ্লুকোজ বিভিন্ন উৎসেচকের অনুঘটন ক্রিয়ার মাধ্যমে দশটি বিপাকীয় বিক্রিয়ায় পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। যখন তোমরা অধ্যায় 14-এ শ্বসন পড়বে তখন এই বিক্রিয়াগুলো জানবে। এই অবস্থায় তোমাদের এইটুকু জানা উচিত যে, একটি বা দুটি অতিরিক্ত বিক্রিয়াসহ এই বিপাকীয় পথই বিভিন্ন বিপাকজাত শেষ উৎপন্ন পদার্থ তৈরি করে। অবাত অবস্থায় আমাদের অস্থিপেশিতে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। স্বাভাবিক সবাত অবস্থায় পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। কোহল সন্ধানের সময় এই একই বিপাকীয় পথ ইস্টে ইথানল (অ্যালকোহল) উৎপন্ন করে। অর্থাৎ বিভিন্ন শর্তে বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব।

9.12.2 উৎসেচকগুলো কীভাবে এত উচ্চহারে রাসায়নিক রূপান্তরণ ঘটায় (How do Enzymes bring about such high rate of chemical conversions)?

এটা বুঝতে হলে উৎসেচক সম্বন্ধে আমাদের আরও একটু বেশি জানতে হবে। আমরা ইতোমধ্যেই উৎসেচকের সক্রিয় স্থানের ধারণা পেয়ে গেছি। রাসায়নিক বা বিপাকীয় রূপান্তর বলতে একটি বিক্রিয়াকেই বোঝায়। যে রাসায়নিক পদার্থটি বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থে পরিবর্তিত হয় তাকে সাবস্ট্রেট বলে। তাহলে উৎসেচক অর্থাৎ প্রগৌণ গঠনবিশিষ্ট প্রোটিনের সক্রিয় স্থানে সাবস্টেটটি (S) উপজাত পদার্থে (P) রূপান্তরিত হয় এবং সাংকেতিকভাবে এটি এভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে —

$$S \rightarrow P$$

এটা এখন বোঝা গেছে যে সাবস্ট্রেটকে (S) উৎসেচকের সক্রিয় স্থানের খাঁজ বা পকেটের মতো অংশে যুক্ত হতে হয়। সাবস্ট্রেটটি উৎসেচকের সক্রিয় স্থানে যুক্ত হয়। তাই আবশ্যিকভাবেই একটি ES

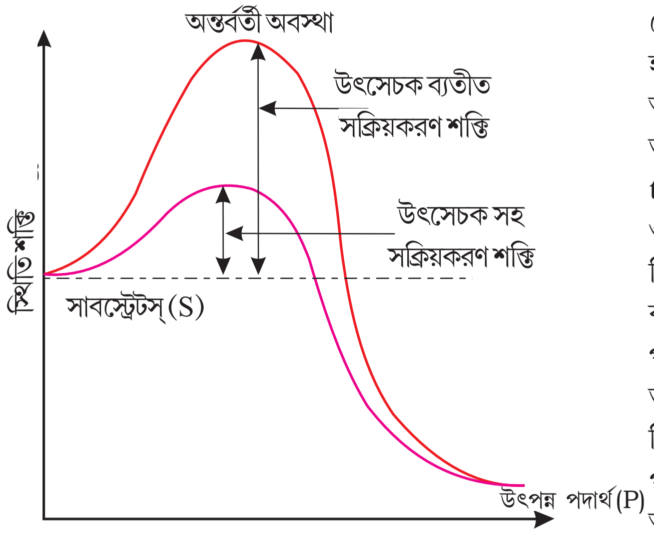

চিত্র 9.6: সক্রিয়করণ শক্তির ধারণা

জোট গঠিত হয়। E বলতে এখানে উৎসেচককে বোঝানো হয়েছে। এই জোট গঠন একটি ক্ষণস্থায়ী ঘটনা। এই অবস্থায় সাবস্ট্রেট যখন উৎসেচকের সক্রিয় স্থানে যুক্ত হয় তখন সাবস্ট্রেটের একটি নতুন, অন্তর্বর্তী গঠন (transition state) তৈরি হয়। খুব শীঘ্রই বন্ধনীর কাঙ্ক্ষিত ভাঙন ও গড়ন (Breaking/making) সম্পূর্ণ হয়ে যায় এবং বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থটি সক্রিয় স্থান থেকে মুক্ত হয়। অন্যভাবে বলা যায় সাবস্ট্রেটের গঠনটি রূপান্তরিত হয়ে বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ গঠন করে। এই রূপান্তরভবনের বিক্রিয়াপথটি অবশ্যই তথাকথিত অন্তর্বর্তী গঠনগত অবস্থার মধ্য দিয়ে যায়। স্থিতিশীল সাবস্ট্রেট ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের মধ্যে বহু পরিবর্তিত গঠনগত অবস্থা থাকতে পারে। এই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ হল এই যে অন্য সব অন্তর্বর্তী গঠনগত অবস্থাগুলো অস্থিতিশীল। স্থিতিশীলতা বলতে এমন কিছু বোঝায় যা অণুস্থিত শক্তির পরিমাণ বা গঠনের সাথে সম্পর্কিত। তবে যখন আমরা এটিকে লেখচিত্রের আকারে দেখব তখন এটি দেখতে অনেকটা চিত্র 9.6 এর মতো লাগবে।

y-অক্ষটি স্থিতিশক্তির পরিমাণকে উপস্থাপন করে। x অক্ষটি সাবস্ট্রেটের গঠনগত রূপান্তরণ প্রক্রিয়ার অগ্রগতি বা অন্তর্বর্তী অবস্থার মধ্য দিয়ে ঘটা অবস্থানসমূহকে উপস্থাপন করে। তোমরা হয়তো দুটো বিষয় লক্ষ করেছ, S এবং P এর মধ্যে শক্তিস্তরের ব্যবধান। যদি P এর শক্তিস্তর S-এর চেয়ে নীচে থাকে তবে বিক্রিয়াটি তাপমোচী বিক্রিয়া। বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ উৎপাদনের জন্য কাউকে শক্তির জোগান দেওয়ার (উত্তপ্ত করার) প্রয়োজন পড়বে না। তবে বিক্রিয়াটি তাপমোচী বা স্বতস্ফূর্ত বা তাপগ্রাহী বা শক্তি ব্যবহারকারী বিক্রিয়া যাই হোক না কেন সাবস্ট্রেট বা S কে অনেকটা উচ্চ শক্তিস্তর অর্থাৎ ট্রানজিশন বা অস্থায়ী স্তরে পৌঁছাতে হয়। S-এর গড় শক্তির পরিমাণ ও অন্তর্বর্তী দশার শক্তির পরিমাণের পার্থক্যকে সক্রিয়করণ শক্তি (Activation energy) বলা হয়।

অবশেষে উৎসেচকের প্রভাবেই শক্তিজনিত বাধা হ্রাস পায় এবং এর ফলে খুব সহজে সাবস্ট্রেট বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থে পরিণত হয়।

9.12.3 উৎসেচকের কার্যকারিতার প্রকৃতি (Nature of Enzyme Action):

প্রতিটি উৎসেচক অণুর একটি সাবস্ট্রেট সংযুক্তির স্থান থাকে, যাতে অত্যন্ত সক্রিয় উৎসেচক সাবস্ট্রেট জোট (ES) তৈরি হয়। এই জোটটি স্বল্পস্থায়ী হয় এবং একটি অন্তর্বর্তী উৎসেচক-উপজাত বস্তু জোট গঠনের মাধ্যমে উপজাত বস্তু এবং অপরিবর্তিত উৎসেচকে বিশ্লিষ্ট হয়।

অনুঘটনের জন্য ES জোট গঠিত হওয়া প্রয়োজন।

$$E + S \rightleftharpoons ES \longrightarrow EP \quad E + P$$

উৎসেচকের ক্রিয়ার অনুঘটন চক্রটি নিম্নলিখিত ধাপের সাহায্যে বর্ণনা করা যেতে পারে —

1. প্রথমে সাবস্ট্রেটটি উৎসেচকের সক্রিয় স্থানে যুক্ত হয় এবং দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়।
2. উৎসেচকের সক্রিয় স্থানে সাবস্ট্রেটের সংযুক্তি উৎসেচকটিকে তার আকৃতির পরিবর্তনের জন্য উদ্দীপিত করে। এর ফলে উৎসেচকটি সাবস্ট্রেটটিকে ঘিরে আরও দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে।
3. উৎসেচকের সক্রিয় স্থানটি এখন সাবস্ট্রেটের খুব কাছাকাছি আসে ও সাবস্ট্রেটস্থিত রাসায়নিক বন্ধনীগুলো ভেঙে দেয় এবং এর ফলে নতুন উৎসেচক উপজাত বস্তু জোট (ES Complex) গঠিত হয়।
4. সাবস্ট্রেট থেকে উপজাত বস্তুগুলো মুক্ত হয় এবং মুক্ত উৎসেচক অপর একটি সাবস্ট্রেট অণুর সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় এবং উৎসেচকটি পুনরায় অনুঘটন চক্রের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে।

9.12.4. উৎসেচক ক্রিয়ার প্রভাবকারী শর্তসমূহ (Factors affecting enzyme activity)

যেসব অবস্থার পরিবর্তনে প্রোটিনের প্রগৌণ গঠন পরিবর্তিত হতে পারে সেগুলো উৎসেচকের ক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। এই অবস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে তাপমাত্রা, pH, সাবস্ট্রেটের ঘনত্বের পরিবর্তন বা বিশেষ রাসায়নিকের সংযুক্তি যা উৎসেচকের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।

তাপমাত্রা এবং pH (Temperature and pH)

উৎসেচক সাধারণত তাপমাত্রা ও pH এর একটি সংকীর্ণ পরিসরে কাজ করে (চিত্র 9.7)। প্রতিটি উৎসেচক যে তাপমাত্রা ও pH এ সবচেয়ে ভালো কাজ করে সেই তাপমাত্রা ও pH কে ঐ উৎসেচকের যথাক্রমে সর্বাধিক অনুকূল তাপমাত্রা ও সর্বাধিক অনুকূল pH বলে। তাপমাত্রা ও pH এর এই সর্বাধিক অনুকূল মানের কম বা বেশি হলে উৎসেচকের কার্যকারিতা হ্রাস পায়। নিম্ন তাপমাত্রায় উৎসেচকটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে এবং উচ্চ তাপমাত্রায় উৎসেচকের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায় কারণ উচ্চতাপমাত্রায় প্রোটিনের গঠনটি ভেঙে যায়।

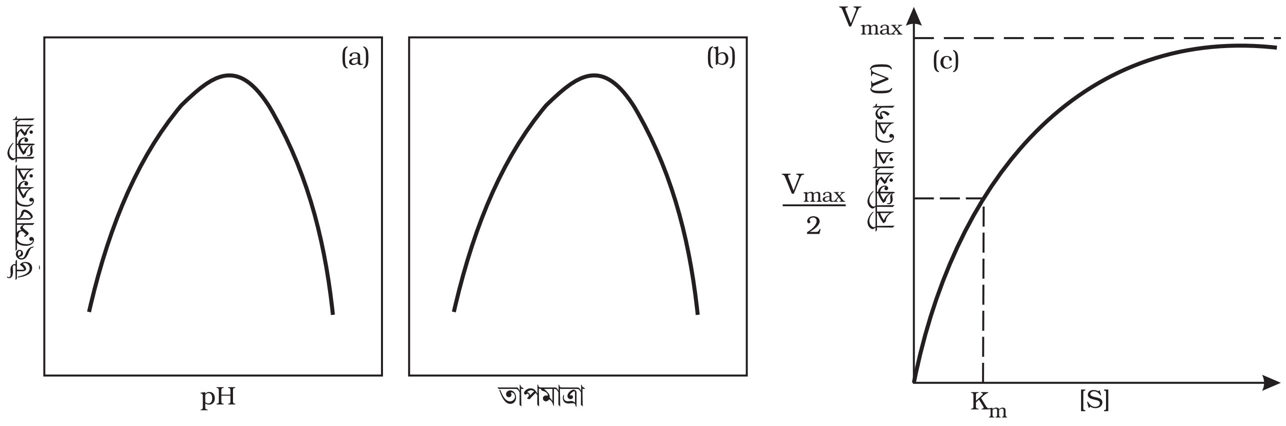

চিত্র 9.7: উৎসেচকের ক্রিয়ার উপর (a) pH (b) তাপমাত্রা (c) সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব এর প্রভাব

সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব (Concentration of Substrate)

সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎসেচক-অনুঘটন বিক্রিয়ার গতিবেগ প্রথমে বৃদ্ধি পায়। বিক্রিয়াটি সর্বশেষে সর্বোচ্চ গতিবেগসম্পন্ন (V_{max}) হলে সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব আরও বৃদ্ধি করলেও বিক্রিয়াটির গতিবেগ আর বৃদ্ধি পায় না। এর কারণ হল এই যে উৎসেচক অণুর সংখ্যা সাবস্ট্রেট অণুর তুলনায় কম হয় এবং উৎসেচক অণুগুলো সম্পৃক্ত হওয়ার পর অতিরিক্ত সাবস্ট্রেট অণুর সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আর কোনো মুক্ত উৎসেচক থাকে না। উৎসেচকের সাথে যুক্ত হতে পারে এমন নির্দিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতিতেও একটি উৎসেচকের ক্রিয়া সংবেদনশীল হয়। যখন উৎসেচকের সাথে রাসায়নিক দ্রব্যটির সংযুক্তির ফলে উৎসেচকের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় তখন প্রক্রিয়াটিকে প্রতিরোধ (inhibition) এবং রাসায়নিক দ্রব্যটিকে প্রতিরোধক (inhibitor) বলে। যখন প্রতিরোধকটির আণবিক গঠন অনেকটাই সাবস্ট্রেটের আণবিক গঠনের মতো হয় তখন প্রতিরোধকটি উৎসেচকের ক্রিয়া রোধ করে। একে প্রতিযোগী প্রতিরোধক (competative inhibitor) বলে। সাবস্ট্রেটের সাথে প্রতিরোধকটির অনেকটাই গঠনগত সাদৃশ্য থাকায় প্রতিরোধকটি উৎসেচকের সাবস্ট্রেট সংযুক্তির স্থানটি দখল করার জন্য সাবস্ট্রেটের সাথে প্রতিযোগিতা করে। কাজেই সাবস্ট্রেটটি উৎসেচকের সাথে যুক্ত হতে পারে না এবং এর ফলস্বরূপ উৎসেচকের ক্রিয়া হ্রাস পায়। যেমন — গঠনগতভাবে ম্যালোনেট অনেকটাই সাবস্ট্রেটের মতো হওয়ায় এটি সাক্সিনিট ডিহাইড্রোজিনেজের ক্রিয়া প্রতিরোধ করে। এই ধরনের প্রতিযোগী প্রতিরোধকগুলো প্রায়শই প্যাথোজেনিক ব্যাকটিরিয়া নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।

9.12.5 উৎসেচকের শ্রেণিবিভাগ ও নামকরণ (Classification and nomenclature of Enzyme)

হাজার হাজার উৎসেচক আবিষ্কৃত হয়েছে, পৃথক করা হয়েছে এবং এদের সম্পর্কে অধ্যয়ন করা হয়েছে। যেসব বিক্রিয়ায় এরা অনুঘটকের কাজ করে তার উপর ভিত্তি করে এই উৎসেচকগুলোর বেশিরভাগকে বিভিন্ন গ্রুপে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়েছে। উৎসেচককে 6টি শ্রেণিতে ও প্রতিটি শ্রেণিকে আবার 4 – 13টি উপশ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে এবং একটি চার অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যার সাহায্যে অতঃপর এদের নামকরণ করা হয়েছে।

অক্সিডোরিডাক্টেজ/ ডিহাইড্রোজিনেজ : যে সমস্ত উৎসেচক S এবং S′ এর মধ্যে জারণ-বিজারণ ধর্মী বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। যেমন —

S বিজারিত + S′ জারিত ⟶ S জারিত + S′ বিজারিত

ট্রান্সফারেজ : যে সমস্ত উৎসেচক একজোড়া সাবস্ট্রেট S এবং S′ এর মধ্যে কোনো একটি মূলক, G এর (হাইড্রোজেন ব্যতীত অন্যান্য) স্থানান্তকরণে অনুঘটকের কাজ করে। যেমন —

$$S - G + S' \longrightarrow S + S' - G$$

হাইড্রোলেজেজ : যেসব উৎসেচক এস্টার, ইথার, পেপটাইড, গ্লাইকোসাইডিক C – C, C-হ্যালাইড বা P – N বন্ধনীর আর্দ্রবিশ্লেষণে অনুঘটকের কাজ করে।

লাইয়েজেজ : যেসব উৎসেচক আর্দ্রবিশ্লেষণ ছাড়াই অন্য কোনো পদ্ধতি দ্বারা দ্বিবন্ধনীগুলোকে ভেঙে সাবস্ট্রেট থেকে কোনো মূলকের অপসারণে অনুঘটকের কাজ করে।

$$\begin{array}{cc} X & Y \\ | & | \\ C & \!\!-\!\! C \end{array} \longrightarrow X - Y + C = C$$

আইসোমারেজ : এই শ্রেণিভুক্ত সব উৎসেচক আলোক সক্রিয়, জ্যামিতিক বা অবস্থানগত আইসোমারগুলো আন্তঃরূপান্তরে অনুঘটকের কাজ করে।

লাইগেজ : যেসব উৎসেচক দুটি যৌগকে পরস্পর যুক্ত করতে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। যেমন- C–O, C–S, C–N, P–O ইত্যাদি বন্ধনীগুলোর সংযোগ বিক্রিয়ায় যেসব উৎসেচক অনুঘটক হিসাবে কাজ করে সেগুলোই লাইগেজ উৎসচেক।

9. 12. 6 কোফ্যাক্টর (Co-factors)

উৎসেচক একটি বা বহু পলিপেপটাইডের শৃঙ্খল নিয়ে গঠিত হয়। তবে এমন বহু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে কোফ্যাক্টর নামক অপ্রোটিন উপাদানগুলো উৎসেচকের সাথে যুক্ত হয়ে উৎসেচককে অনুঘটনের কাজে সক্রিয় করে। এইসব ক্ষেত্রে উৎসেচকের প্রোটিন অংশকে বলে অ্যাপোএনজাইম। তিন ধরনের কোফ্যাক্টরকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এগুলো হল প্রস্থেটিক গ্রুপ, কোএনজাইম এবং ধাতব আয়ন।

প্রস্থেটিক গ্রুপ হল জৈব যৌগ যারা অ্যাপোএনজাইমের সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে এবং এইভাবে এই কোফ্যাক্টরটি অন্য কোফ্যাক্টরগুলো থেকে আলাদা হয়। যে বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ভেঙে জল ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়, পারঅক্সিডেজ ও ক্যাটালোজ উৎসেচক সেই বিক্রিয়ায় অনুঘটকের কাজ করে। এই দুই উৎসেচকে হিম প্রস্থেটিক গ্রুপ হিসাবে কাজ করে এবং এটি উৎসেচকের সক্রিয় স্থানের একটি অংশ।

কোএনজাইমগুলোও জৈব যৌগ কিন্তু অ্যাপোএনজাইমের সাথে এদের সংযুক্তি ক্ষণস্থায়ী, সাধারণতঃ অনুঘটনকালে এই সংযোগ ঘটে। অধিকন্তু, কোএনজাইমগুলো বিভিন্নধরনের উৎসেচক-অনুঘটন বিক্রিয়ায় কোফ্যাক্টর রূপে কাজ করে। বহু কোএনজাইমের আবশ্যিক রাসায়নিক উপাদান হল ভিটামিন, যেমন- নিকোটিনামাইড অ্যাডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড (NAD) এবং NADP নামক কোএনজাইমগুলোতে নিয়াসিন ভিটামিন থাকে।

অনেক উৎসেচকের ক্রিয়ার জন্য ধাতব আয়ন প্রয়োজন হয়। এগুলো উৎসেচকের সক্রিয় স্থানে পার্শ্বশৃঙ্খলের সাথে সমযোজী বন্ধনী গঠন করে এবং একই সময়ে সাবস্ট্রেটের সাথে এক বা একাধিক সমযোজী বন্ধনী গঠন করে। যেমন প্রোটিওলাইটিক উৎসেচক, কার্বক্সিপেপটাইডেজের কোফ্যাক্টর হল জিঙ্ক।

উৎসেচক থেকে কোফ্যাক্টারটির অপসারণ ঘটলে উৎসেচকটি এর কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে উৎসেচকের অনুঘটন ক্রিয়ায় কোফ্যাক্টর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সারাংশ (Summary)

জীবজগতের হতভম্ব করার মতো বৈচিত্র্য রয়েছে তবুও তাদের রাসায়নিক গঠন এবং বিপাকীয় বিক্রিয়াগুলো লক্ষ্যণীয়ভাবে একই হতে দেখা যায়। গুণগতভাবে বিশ্লেষণে সজীব কলা ও জড়বস্তুর মৌলিক গাঠনিক উপাদানও একইরকম হতে দেখা যায়। পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষণের মাধ্যমে এটি প্রকাশিত হয়েছে যে জড় বস্তুর তুলনায় সজীব বস্তুতে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের আপেক্ষিক প্রাচুর্য বেশি হয়। সজীব বস্তুতে যে রাসায়নিক দ্রব্যটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় তা হল জল। কম আণবিক ওজনবিশিষ্ট হাজার হাজার (<10000 Da) জৈব অণু রয়েছে। সজীব বস্তুতে দেখা যায় যে

এমন কিছু জৈব অণু হল অ্যামাইনো অ্যাসিড, মনোস্যাকারাইড এবং ডাইস্যাকারাইড শর্করা, ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লিসারল, নিউক্লিওটাইড, নিউক্লিওসাইড এবং নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষারক। সজীব বস্তুতে 20 ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং 5 ধরনের নিউক্লিওটাইড পাওয়া যায়। চর্বি ও তেল হল গ্লিসারাইড, যেখানে ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসারলের সাথে এস্টার বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকে। এছাড়া ফসফোলিপিডে একটি ফসফোরিভূত নাইট্রোজেন যৌগ রয়েছে।

সজীব বস্তুতে মাত্র তিন ধরনের বৃহৎ অণু পাওয়া যায় — যেমন প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড এবং পলিস্যাকারাইড। লিপিডগুলো কোশপর্দার সাথে আবদ্ধ থাকে বলে বৃহৎ অণু অংশের সঙ্গে তা পৃথক হয়। বৃহৎ জৈব অণুগুলো হল পলিমার। এই অণুগুলো বিভিন্ন ধরনের গাঠনিক এককের সমন্বয়ে গঠিত হয়। প্রোটিনগুলো বহু অ্যামাইনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত হেটারোপলিমার। নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA এবং RNA) নিউক্লিওটাইডের সমন্বয়ে গঠিত হয়। বৃহৎ জৈব অণুগুলোর গঠনের ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাস দেখা যায় — প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি এবং কোয়ার্টারনারি। নিউক্লিক অ্যাসিডগুলো জীনগতবস্তু হিসাবে কাজ করে। উদ্ভিদ ও ছত্রাকের কোশপ্রাচীর এবং সন্ধিপদ প্রাণীদের বহিঃকঙ্কালেরও উপাদান হল পলিস্যাকারাইড। এগুলো শক্তির আধার হিসাবেও কাজ করে (যেমন স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন)। প্রোটিন নানা ধরনের কোশীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে। এই প্রোটিনগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই হল উৎসেচক, কিছু হল এন্টিবডি, কিছু প্রোটিন হল গ্রাহক, কিছু আবার হরমোন এবং অন্যান্য কিছু প্রোটিন হল গাঠনিক প্রোটিন। প্রাণীজগতে যে প্রোটিনটি সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় তা হল কোলাজেন এবং সমগ্র জীবমণ্ডলে যে প্রোটিনটি সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় সেটি হল রাইবিউলোজ বিসফসফেট কার্বক্সিলেজ অক্সিজিনেজ (RuBisCo)

উৎসেচক হল এমন প্রোটিন যা কোশে সংঘটিত জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। রাইবোজাইম হল অনুঘটন ক্ষমতাসম্পন্ন নিউক্লিক অ্যাসিড। প্রোটিন জাতীয় উৎসেচকগুলো সাবস্ট্রেট সুনির্দিষ্ট হয়ে থাকে এবং এদের সর্বাধিক ক্রিয়ার জন্য সর্বাপেক্ষা অনুকূল তাপমাত্রা এবং pH এর প্রয়োজন হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় উৎসেচকগুলো নষ্ট হয়ে যায়। উৎসেচক বিক্রিয়ার সক্রিয়করণ শক্তি হ্রাস করে এবং বিক্রিয়ার হার অত্যন্ত বাড়িয়ে দেয়। নিউক্লিক অ্যাসিড বংশগত বৈশিষ্ট্য বহন করে এবং জনিতৃ জনু থেকে অপত্য জনুতে নিয়ে যায়।

অনুশীলনী (Exercise)

1. বৃহৎ অণু বলতে কী বোঝ? উদাহরণ দাও।
2. একটি গ্লাইকোসাইডিক, পেপটাইড এবং একটি ফসফোডাইএস্টার বন্ধনী বর্ণনা করো।
3. প্রোটিনের প্রগৌণ বা টার্শিয়ারি গঠন বলতে কী বোঝ?
4. 10টি চমকপ্রদ কম আণবিক ওজন সম্পন্ন জৈব অণু খুঁজে বের করো এবং তাদের গঠনগুলো লেখো। এমন একটি কারখানা খুঁজে বের করো যেখানে পৃথকীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে যৌগসমূহের উৎপাদন করা হয়। কারখানায় উৎপাদিত এই যৌগগুলোর ক্রেতা কারা তাও খুঁজে বের করো।
5. একটি প্রোটিনের দুই প্রান্তের প্রতিটিতে কোন্ অ্যামাইনো অ্যাসিডটি রয়েছে তা জানার জন্য একটি পদ্ধতি গ্রহণ করার কথা বলা হলে তুমি কি ওই প্রোটিনটির বিশুদ্ধতা বা হোমোজেনেসিটির সঙ্গে এই তথ্যটি সংযুক্ত করতে পারবে?
6. চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এমন প্রোটিনগুলো খুঁজে বের করো এবং এর একটি তালিকা তৈরি করো।

প্রোটিনের অন্যান্য ব্যাবহারিক প্রয়োগগুলো বের করো (যেমন প্রসাধনী সামগ্রী ইত্যাদি)।

7. ট্রাইগ্লিসারাইডের গঠনটি ব্যাখ্যা করো।

8. যখন দুধ থেকে দই তৈরি হয় তখন কী ঘটে তা তোমার প্রোটিন সম্পর্কিত ধারণা থেকে বর্ণনা করতে পারবে কি?

9. বাণিজ্যিকভাবে সহজলভ্য পারমাণবিক মডেল (বল এবং স্টিক্ মডেল) ব্যবহার করে তুমি কি জৈব অণুর মডেল তৈরীর চেষ্টা করেছ?

10. একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের বিপরীতে একটি দুর্বল ক্ষার নিয়ে টাইট্রেশন করার চেষ্টা করো এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডের বিশিষ্ট কার্যকরীমূলকের সংখ্যা খুঁজে বের করো।

11. অ্যালানিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিডটির চিত্র অঙ্কন করো।

12. আঠা কী দিয়ে তৈরি হয়? ফেভিকল কি এর থেকে আলাদা?

13. প্রোটিন, ফ্যাট, তেল ও অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য একটি গুণগত পরীক্ষা খুঁজে বের করো এবং যে- কোনো ফলের রস, লালারস, ঘর্ম এবং মূত্র নিয়ে এইগুলোর জন্য পরীক্ষা করো।

14. জীবমণ্ডলের সব উদ্ভিদ দ্বারা কী পরিমাণ সেলুলোজ উৎপন্ন হয় তা খুঁজে বের করো এবং এর সাথে মানুষ কী পরিমাণ কাগজ উৎপাদন করে তার তুলনা করো এবং এই হিসাবে মানুষ সারাবছর কী পরিমাণ উদ্ভিজ বস্তু আত্মসাৎ করে দেখো। উদ্ভিদ সম্পদের কী বিশাল ক্ষতি!

15. উৎসেচকের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগুলো বর্ণনা করো।

অধ্যায় – 10 (Chapter - 10)

কোশচক্র ও কোশ বিভাজন
(Cell Cycle and Cell Division)

10.1. কোশচক্র

10.2. M দশা

10.3. মাইটোসিসের তাৎপর্য

10.4. মিয়োসিস

10.5. মিয়োসিসের তাৎপর্য

তোমরা কি জান যে সব সজীব বস্তু এমনকি সবচেয়ে বড়ো জীবটিও তাদের জীবন একটি মাত্র কোশ থেকে শুরু করে? তোমরা জানলে অবাক হবে যে কীভাবে একটি কোশ থেকে এত বড়ো জীবের সৃষ্টি হয়। সব সজীব বস্তুর মতই বৃদ্ধি ও জনন কোশেরও বৈশিষ্ট্য। সব কোশই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রজনন করে। প্রতিটি জনিতৃ কোশ প্রতিবার বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য কোশ সৃষ্টি করে। এইসব নতুন অপত্য কোশগুলোর বৃদ্ধি ও বিভাজন ঘটতে পারে। এইভাবে একটি জনিতৃ কোশ এবং তার থেকে উৎপন্ন অপত্য কোশগুলো বৃদ্ধি পেয়ে ও বিভাজিত হয়ে নতুন কোশ গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে। অন্যভাবে বলতে গেলে এই ধরনের বৃদ্ধি ও বিভাজন চক্রের ফলেই একটি কোশ থেকে লক্ষ লক্ষ কোশের সমন্বয়ে কোন জীবদেহ গঠিত হয়।

10.1 কোশচক্র (Cell Cycle)

সব সজীব বস্তুতেই কোশ বিভাজন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। কোশ বিভাজনকালে, DNA প্রতিলিপিকরণ এবং কোশের বৃদ্ধিও ঘটে থাকে। সম্পূর্ণ জিনোম সমন্বিত অপত্য কোশগুলোর সৃষ্টি এবং সঠিক বিভাজন সুনিশ্চিত করতে কোশ বিভাজন, DNA-র প্রতিলিপিকরণ এবং কোশের বৃদ্ধি এইসব প্রক্রিয়াগুলো সম্মিলিতভাবে সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন। যেসব পর্যায়ক্রমিক ঘটনার মাধ্যমে একটি কোশ তার জিনোমের দ্বিত্বকরণ ঘটায়, অন্যান্য কোশীয় উপাদানসমূহ সংশ্লেষ করে এবং অবশেষে বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য কোশের সৃষ্টি করে, তাকেই কোশচক্র (Cell Cycle) বলে। যদিও কোশের বৃদ্ধি (সাইটোপ্লাজমিয় বৃদ্ধির সাপেক্ষে) একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া কিন্তু DNA সংশ্লেষ কোশচক্রের শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট দশায়ই সম্পন্ন হয়। ক্রোমোজোমের (DNA) প্রতিলিপিকরণের পর এরা কোশ বিভাজনকালে একটি জটিল ঘটনাক্রমের মাধ্যমে অপত্য নিউক্লিয়াসে বণ্টিত হয়। এই ঘটনাগুলো জিনের নিয়ন্ত্রণাধীন।

10.1.1 কোশচক্রের দশাসমূহ (Phases of cell cycle)

একটি আদর্শ ইউক্যারিওটিক কোশের কোশচক্র কালচারে বা পালন মাধ্যমে থাকা মানবকোশের মাধ্যমে বর্ননা করা যায় । এই কোশগুলো প্রায় প্রতি 24 ঘণ্টায় একবার বিভাজিত হয় (চিত্র 10.1) । যদিও কোশচক্রের এই সময়কাল এক জীব থেকে অন্য জীবের ক্ষেত্রে এবং একধরনের কোশ থেকে অন্য ধরনের কোশের ক্ষেত্রে ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইস্ট কেবলমাত্র 90 মিনিটেই কোশচক্র সম্পন্ন করতে পারে।

কোশচক্রকে মুখ্যত দুটি দশায় বিভক্ত করা যায়:

- ইন্টারফেজ
- M দশা (মাইটোসিস দশা)

M দশা বলতে সেই দশাকে বোঝায় যখন প্রকৃতপক্ষে কোশ বিভাজন বা মাইটোসিস ঘটে এবং ইন্টারফেজ বলতে দুটি পর্যায়ক্রমিক M দশার অন্তবর্তী দশাকে বোঝায়। এটি মনে রাখা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, মানবকোশের কোশচক্রের গড়ে 24 ঘণ্টা সময়কালে কোশ বিভাজনের স্থায়ীত্বকাল মাত্র এক ঘণ্টা। কোশচক্রের সময়কালের 95% এর বেশি সময় ইন্টারফেজ স্থায়ী হয়।

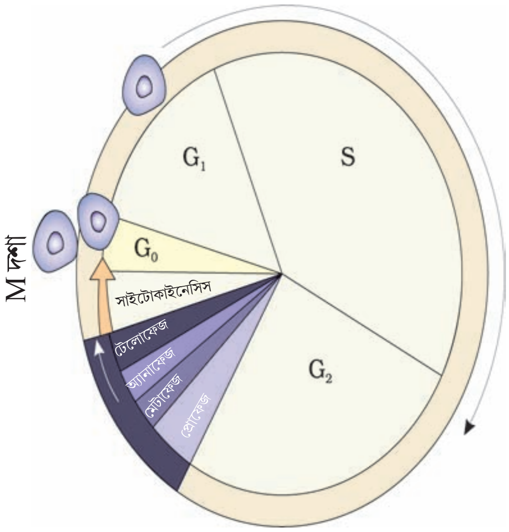

চিত্র 10.1 ঃ কোশচক্রের চিত্ররূপ, যেখানে একটি কোশ থেকে দুটি কোশের সৃষ্টি দেখানো হয়েছে।

M ফেজ নিউক্লিয়াসের বিভাজনের মাধ্যমে শুরু হয় যা অপত্য ক্রোমোজোমের পৃথকীকরণ ঘটায় (ক্যারিওকাইনেসিস) এবং সাধারণত সাইটোপ্লাজমের বিভাজনের (সাইটোকাইনেসিস) মাধ্যমে শেষ হয়। ইন্টারফেজকে যদিও বিশ্রাম দশা বলা হয় কিন্তু এই সময়কালে কোশ সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে বৃদ্ধি পেয়ে এবং DNA প্রতিলিপিকরণ ঘটিয়ে বিভাজনের জন্য প্রস্তুত হয়। ইন্টারফেজকে আরও তিনটি দশায় বিভক্ত করা যায়:

- G_1 দশা (প্রথম ছেদ দশা)
- S দশা (সংশ্লেষ দশা)
- G_2 দশা (দ্বিতীয় ছেদ দশা)

মাইটোসিস এবং DNA প্রতিলিপিকরণ শুরুর অন্তবর্তী পর্যায়কে G_1 দশা বলে। G_1 দশায় কোশ বিপাকীয়ভাবে সক্রিয় থাকে এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে কিন্তু DNA- এর প্রতিলিপিকরণ ঘটায় না। S বা সংশ্লেষ দশা সেই সময়কালকে বোঝায় যখন DNA-র সংশ্লেষ বা প্রতিলিপিকরণ ঘটে। এই সময়কালে প্রতিটি কোশে DNA-র পরিমাণ দ্বিগুণ হয়। DNA- র প্রারম্ভিক পরিমাণ 2C দ্বারা প্রকাশ করা হলে তা বৃদ্ধি পেয়ে 4C হবে। তবে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। G_1 দশায় কোশের ক্রোমোজোম সংখ্যা ডিপ্লয়েড বা 2n থাকলে , S দশার পরেও ক্রোমোজোম সংখ্যা অপরিবর্তিত অর্থাৎ 2n থাকে।

প্রাণীকোশের ক্ষেত্রে S দশায় কোশের নিউক্লিয়াসে DNA- র প্রতিলিপিকরণ শুরু হয় এবং সাইটোপ্লাজমে সেন্ট্রিওলের দ্বিত্বকরণ ঘটে। G_2 দশায় কোশের বৃদ্ধি চলাকালীন সময়ে মাইটোসিসের প্রস্তুতি হিসাবে প্রোটিন সংশ্লেষ ঘটে।

> উদ্ভিদ এবং প্রাণী কীভাবে তাদের জীবনকালে ক্রমাগত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়? উদ্ভিদের সব কোশই কি প্রতিনিয়ত বিভাজিত হয়? তোমরা কি ভাবছ যে সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর সব কোশই প্রতিনিয়ত বিভাজিত হতে থাকে? তোমরা কি উন্নত উদ্ভিদের এমন সব কলার নাম এবং অবস্থান উল্লেখ করতে পারো যার কোশগুলো সারা জীবন ধরে বিভাজত হয়? প্রাণীদেরও কি অনরূপ ভাজক কলা রয়েছে?

তোমরা পেঁয়াজের মূলের অগ্রভাগের কোশসমূহে ঘটা মাইটোসিস সম্পর্কে পড়েছ। এর প্রতিটি কোশে 16 টি করে ক্রোমোজোম থাকে। তোমরা কি বলতে পারবে সেই কোশটিতে G_1 দশায়, S দশার পর এবং M দশার পর কয়টি করে ক্রোমোজোম থাকবে? এছাড়াও যদি M দশার পর কোশটির DNA-র পরিমাণ 2C হয়, তাহলে G_1 দশায়,S দশার পর এবং G2 দশায় তার DNA-র পরিমাণ কী হবে?

পরিণত প্রাণীর কিছু কোশ বিভাজিত হয় না (যেমন হৃৎপিণ্ডের কোশ) এবং অন্য বহু কোশ আঘাত বা কোশের মৃত্যুর কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়া কোশগুলোর অপসারণের জন্য কেবলমাত্র সময় বিশেষে বিভাজিত হয়। এইসব কোশ যেগুলো পুনরায় বিভাজিত হয় না সেগুলো G_1 দশা থেকে বেরিয়ে একটি নিষ্ক্রিয় দশায় প্রবেশ করে যাকে কোশচক্রের নিষ্ক্রিয় দশা (G_0) বলে। এই দশায় কোশগুলো বিপাকীয়ভাবে সক্রিয় থাকে কিন্তু কোশের চাহিদার উপর ভিত্তি করে যতক্ষণ না বিভাজনের প্রয়োজন হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এরা সংখ্যাবৃদ্ধি করে না।

প্রাণীদের মধ্যে মাইটোটিক কোশ বিভাজন শুধুমাত্র ডিপ্লয়েড দেহ কোশসমূহে দেখা যায়। অন্যদিকে উদ্ভিদকূলে হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড উভয় কোশেই মাইটোটিক বিভাজন দেখা যায়। উদ্ভিদদেহে জনুক্রমের উদাহরণগুলোকে স্মরণ করে বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি এবং সেই দশাগুলোকে চিহ্নিত করো যেখানে হ্যাপ্লয়েড কোশে মাইটোসিস দেখা যায়।

10.2 M দশা (M Phase)

এটি কোশচক্রের সর্বাপেক্ষা ঘটনাবহুল দশা, বস্তুত সব কোশীয় উপাদানগুলোর মুখ্য পুনঃসংগঠন এর অন্তর্ভূক্ত। জনিতৃ কোশে এবং এর বিভাজনে উৎপন্ন অপত্য কোশগুলোর ক্রোমোজোম সংখ্যা একই থাকে। একে সমবিভাজন বলা হয়। যদিও অধ্যয়নের সুবিধার্থে মাইটোসিসকে চারটি নিউক্লিয় বিভাজন দশায় বিভক্ত করা যায়। কিন্তু এটা বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কোশ বিভাজন একটি ঘটমান প্রক্রিয়া এবং এর বিভিন্ন দশার মধ্যে সুনির্দিষ্ট সীমা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। মাইটোসিসকে নিম্নলিখিত চারটি দশায় বিভক্ত:

- প্রোফেজ (Prophase)
- মেটাফেজ (Metaphase)
- অ্যানাফেজ (Anaphase)
- টেলোফেজ(Telophase)

10.2.1 প্রোফেজ (prophase)

প্রোফেজ হল মাইটোসিসের প্রথম দশা যা ইন্টারফেজের S এবং G_2 দশার অনুবর্তী হয়। এই S এবং G_2 দশায় নতুন উৎপন্ন DNA অণুগুলো সুস্পষ্ট থাকে না কিন্তু কুন্ডলিত থাকে। ক্রোমোজোমীয় উপাদানের ঘনীভবনের সূচনার দ্বারা প্রোফেজের সূত্রপাত হয়। ক্রোমাটিন তন্তুর ঘনীভবনের ফলে (চিত্র 10.2 ক) ক্রোমোজোমীয় উপাদান জটমুক্ত হয়। ইন্টারফেজের S দশা চলাকালে দ্বিত্বকরণ ঘটা সেন্ট্রিওল এই দশায় কোশের দুই বিপরীত মেরুর দিকে চলতে শুরু করে। নিম্নলিখিত ঘটনাবলির সাহায্যে প্রোফেজ দশার সমাপ্তি চিহ্নিত করা যেতে পারে।

- ক্রোমোজোমীয় উপাদান ঘনীভূত হয়ে সুসংহত মাইটোটিক ক্রোমোজোম গঠন করে। একটি ক্রোমোজোম দুটি ক্রোমাটিডের সমন্বয়ে গঠিত যা পরস্পর সেন্ট্রোমিয়ার অংশে যুক্ত থাকে।
- কোশের সাইটোপ্লাজমস্থিত প্রোটিন নির্মিত উপাদান অণুনালিকা মাইটোটিক বেম সংগঠন তৈরির প্রক্রিয়ার সূচনা করতে সাহায্য করে।

প্রোফেজ দশার শেষে কোশকে মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখলে এর মধ্যে গলগি কমপ্লেক্স, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, নিউক্লিওলাস এবং নিউক্লিও পর্দা পরিলক্ষিত হয় না ।

10.2.2 মেটাফেজ (metaphase)

নিউক্লিয়পর্দার সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্তি মাইটোসিসের দ্বিতীয় দশার সূচনা নির্দেশ করে, তাই ক্রোমোজোমগুলো কোশের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করে। এই দশায় ক্রোমোজোমের ঘনীভবন সম্পূর্ণ হয় এবং অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সুস্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। এটি সেই দশা যেখানে ক্রোমোজোমের অঙ্গসংস্থান খুব সহজেই অধ্যয়ন করা যায়। এই দশায়, মেটাফেজ ক্রোমোজোম দুটি সিস্টার ক্রোমাটিডের সমন্বয়ে গঠিত হয় যা পরস্পর সেন্ট্রোমিয়ার দ্বারা যুক্ত থাকে (চিত্র 10.2 খ)। সেন্টোমিয়ারের উপরিতলে অবস্থিত ছোটো চাকতি-আকৃতির গঠনকে কাইনেটোকোর বলে। এই গঠনসমূহ কোশের মধ্যবর্তী অবস্থানে সরে আসা ক্রোমোজোমের সাথে বেমতন্তুর সংযুক্তিকরণের স্থান হিসাবে কাজ করে। মেটাফেজ দশার বৈশিষ্ট্য হল এই যে এই দশায় সব ক্রোমোজোমগুলো নিরক্ষীয় অঞ্চলের সন্নিকটে অবস্থান করে এবং প্রতিটি ক্রোমোজোমের একটি ক্রোমাটিডের কাইনেটোকোরের সাহায্যে এক মেরুতে বেমতন্তুর সাহায্যে যুক্ত থাকে এবং এর সিস্টার ক্রোমাটিডটি এর কাইনেটোকোরের সাহায্যে বিপরীত মেরুতে বেমতন্তুর সাথে যুক্ত থাকে (চিত্র 10.2 খ)। মেটাফেজ দশায় একই পৃষ্ঠতল বরাবর ক্রোমোজোমের সজ্জাকে মেটাফেজ প্লেট বলে।

মেটাফেজের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হল:

- বেমতন্তুগুলো ক্রোমোজোমের কাইনেটোকোরের সাথে যুক্ত হয়।
- ক্রোমোজোমগুলো বেমের নিরক্ষীয় তলে আসে এবং উভয় মেরুর বেমতন্তুর সাহায্যে মেটাফেজ প্লেট বরাবর সজ্জিত হয়।

10.2.3 অ্যানাফেজ (Anaphase)

অ্যানাফেজের শুরুতে মেটাফেজ প্লেটে সজ্জিত প্রতিটি ক্রোমোজোম একই সাথে বিভক্ত হয় এবং অপত্য ক্রোমাটিড দুটি পরবর্তীকালে সৃষ্টি হওয়া অপত্য নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম হিসাবে পরিগনিত হয়। অপত্য ক্রোমোজোমগুলো দুই বিপরীত মেরুর দিকে চলতে শুরু করে। প্রতিটি ক্রোমোজোম নিরক্ষীয় তল থেকে দূরে সরে যেতে থাকায়, প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার মেরুর দিকে অগ্রগামী প্রান্ত হিসাবে থাকে যা ক্রোমোজোমের বাহুগুলোকে টেনে নিয়ে যায় (চিত্র 10.2 গ) সুতরাং,

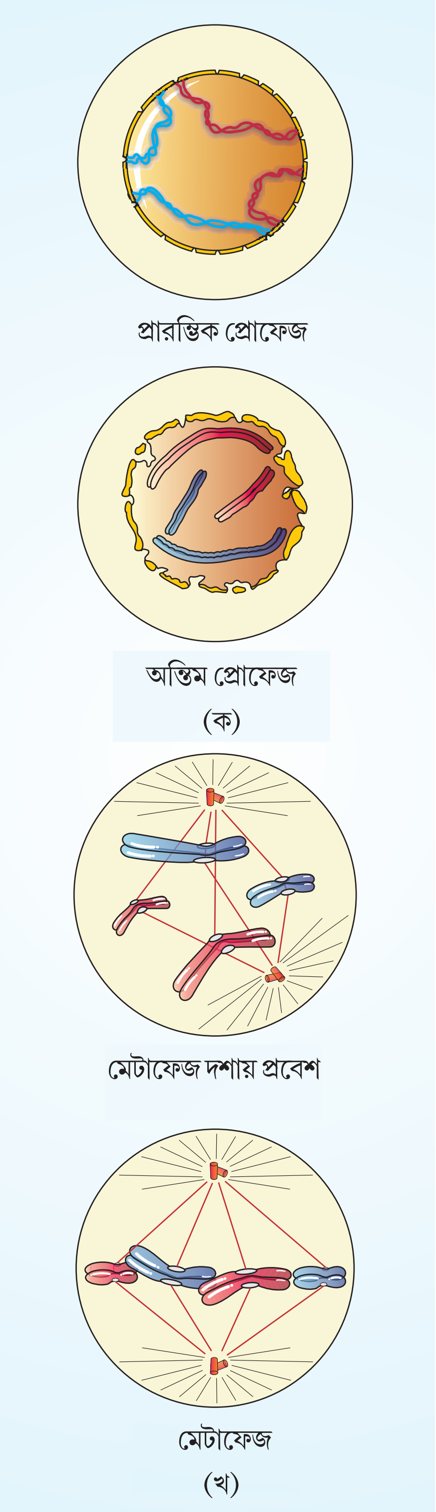

চিত্র 10.2 ঃ (ক) এবং (খ) মাইটোসিসের দশাসমূহের চিত্ররূপ

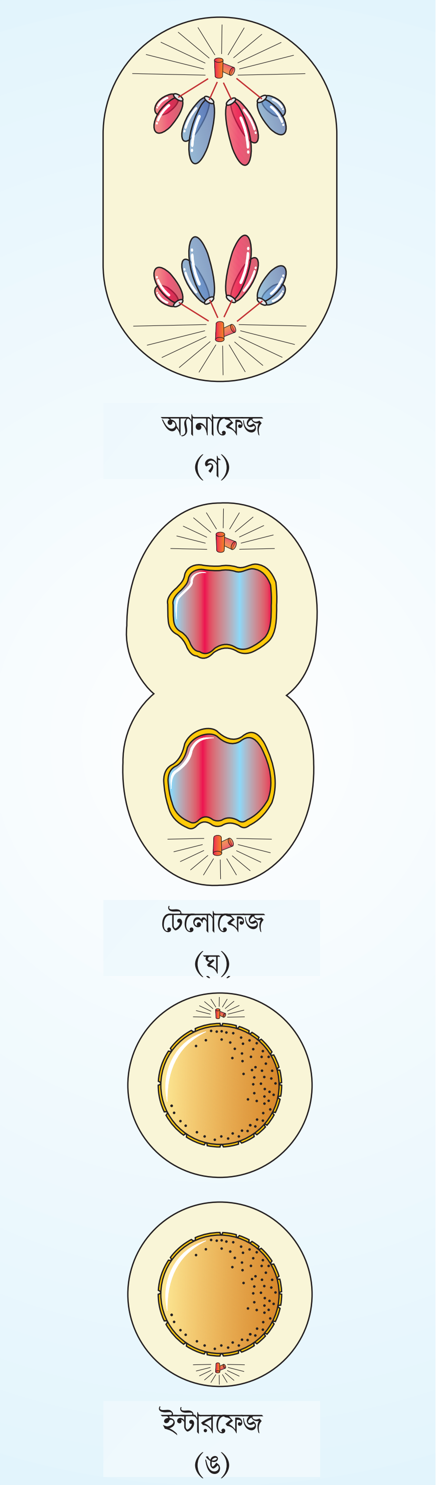

চিত্র 10.2 ঃ (গ) থেকে (ঙ) মাইটোসিসের দশাগুলোর চিত্ররূপ

নিম্নলিখিত মুখ্য ঘটনাবলির সাহায্যে অ্যানাফেজ দশার বৈশিষ্ট্যগুলোকে বোঝানো যায়—

- সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয় এবং ক্রোমাটিড পৃথক হয়।
- ক্রোমাটিডগুলো বিপরীত মেরুর দিকে সরে যায়।

10.2.4 টেলোফেজ (Telophase)

মাইটোসিসের অন্তিম দশার শুরুতে অর্থাৎ টেলোফেজ দশায় নিজ নিজ মেরুতে পৌঁছে যাওয়া ক্রোমোজোম পরস্পর থেকে আলাদা হতে শুরু করে অর্থাৎ ডিকনডেসেশন ঘটে এবং এরা স্বাতন্ত্র হারায়। তাই একক ক্রোমোজোমগুলো আর পরিলক্ষিত হয় না এবং ক্রোমাটিন তন্তুগুলো দুই মেরুতে পুঞ্জীভূত হয় (চিত্র 10.2ঘ)। এই দশায় নিম্নলিখিত মুখ্য ঘটনাবলি ঘটতে দেখা যায়:

- ক্রোমোজোমগুলো পুঞ্জীভূত হয়ে বেমের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে এবং স্বতন্ত্র উপাদান হিসাবে নিজেদের স্বত্ত্বা হারিয়ে ফেলে।
- পুঞ্জীভূত ক্রোমোজোমকে ঘিরে নিউক্লিও পর্দা গঠিত হয়।
- নিউক্লিওলাস, গলগি কমপ্লেক্স এবং ER পুনর্গঠিত হয়।

10.2.5 সাইটোকাইনেসিস (Cytokinesis)

মাইটোসিসে শুধুমাত্র দ্বিত্বকরণ ঘটা ক্রোমোজোমগুলোর অপত্য নিউক্লিয়াসে পৃথকীকরণই ঘটে না কিন্তু এতে কোশ বিভাজন শেষ হওয়ার পর একটি পৃথক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোশটি দুটি অপত্য কোশে বিভক্ত হয়, একে সাইটোকাইনেসিস বলে (চিত্র 10.2 ক, খ, গ, ঘ, ঙ)। প্রাণীকোশের ক্ষেত্রে কোশপর্দায় একটি খাঁজ (Furrow) সৃষ্টির মাধ্যমে সাইটোকাইনেসিস ঘটে। এই খাঁজ ক্রমশ ভেতরের দিকে গভীর হয় এবং কোশের মাঝামাঝি পরস্পরের সাথে সংলগ্ন হয়ে কোশের সাইটোপ্লাজমকে দুটি সমান অংশে ভাগ করে। উদ্ভিদকোশ তুলনামূলক প্রসারণে অক্ষম কোশ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকে, সেইজন্য এই সকল কোশের সাইটোকাইনেসিসের পদ্ধতিটিও ভিন্ন । উদ্ভিদকোশে কোশপ্রাচীর তৈরির প্রক্রিয়া কোশের মাঝামাঝি অবস্থান থেকে শুরু হয় এবং পরিধির দিকে বৃদ্ধি পেয়ে কোশে উপস্থিত পার্শ্বপ্রাচীরের সাথে যুক্ত হয়। কোশ পাত (cell plate) নামক প্রাথমিক সংগঠন তৈরির মধ্য দিয়ে নতুন কোশপ্রাচীর গঠন শুরু হয় যা দুটো সন্নিহিত কোশের কোশপ্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে মিডল ল্যামেলা তৈরি করে ।সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকালে কোশীয় অঙ্গাণুগুলো যেমন মাইটোকন্ড্রিয়া এবং প্লাস্টিড দুটো অপত্য কোশের মধ্যে বণ্টিত হয়। কিছু জীবে ক্যারিওকাইনেসিসের পর সাইটোকাইনেসিস ঘটে না। এর ফলে বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত অবস্থা উদ্ভুত হয় যা অতপর সিনসিটিয়াম (উদাহরণ, নারকেলের তরল সস্যল অংশ) গঠন করে।

10.3 মাইটোসিসের তাৎপর্য (Significance of mitosis)

মাইটোসিস বা সমবিভাজন সাধারণত শুধুমাত্র ডিপ্লয়েড কোশের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। তবে কিছু নিম্ন শ্রেণির উদ্ভিদ এবং কিছু সামাজিক পতঙ্গের হ্যাপ্লয়েড কোশগুলোও মাইটোসিসের মাধ্যমে বিভাজিত হয়। কোনো জীবের জীবনে এই বিভাজনের তাৎপর্য বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোমবিশিষ্ট এমন কিছু পতঙ্গের উদাহরণের সাথে তোমরা পরিচিত আছ কি যেগুলো সম্পর্কে তোমরা অধ্যয়ন করেছ?

মাইটোসিস বিভাজনের ফলে সমরূপ বংশগত উপাদান বিশিষ্ট দুটি ডিপ্লয়েড অপত্য কোশ সৃষ্টি হয়। বহুকোশী জীবের বৃদ্ধি মাইটোসিস বিভাজনের ফলে ঘটে। কোশে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের স্বাভাবিক অনুপাত বিঘ্নিত হওয়ার ফলশ্রুতিতেই কোশের বৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং কোশে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের স্বাভাবিক অনুপাত পুনরায় ফিরিয়ে আনতে হলে কোশ বিভাজন আবশ্যক। মাইটোসিসের একটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ অবদান হল কোশের ক্ষয়পূরণ করা। বহি:ত্বকের উপরিস্তরের কোশগুলো, পৌষ্টিকনালীর আবরণ গঠনকারী কোশগুলো এবং রক্তকণিকাগুলোর ক্রমাগত প্রতিস্থাপন ঘটতে থাকে। অগ্রস্থ ভাজক কলা এবং পার্শ্বস্থ ক্যাম্বিয়াম কলায় মাইটোসিস বিভাজনের ফলে উদ্ভিদের সারা জীবন ব্যাপি বৃদ্ধি চলতে থাকে।

10.4 মিয়োসিস (Meiosis)

যৌনজননের মাধ্যমে অপত্য জীবের সৃষ্টিতে দুটি ক্রোমোজোমের একটি সম্পূর্ণ হ্যাপ্লয়েড সেট বিশিষ্ট দুটি গ্যামেটের মিলন ঘটা প্রয়োজন। বিশেষিত ডিপ্লয়েড কোশসমূহ থেকে গ্যামেট উৎপন্ন হয়। এই বিশেষ ধরনের কোশ বিভাজনে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যাওয়ার ফলে হ্যাপ্লয়েড অপত্য কোশসমূহের সৃষ্টি হয়। এই ধরনের বিভাজনকে বলা হয় মিয়োসিস। যৌন জননকারী জীবের জীবন চক্রে মিয়োসিসের ফলে হ্যাপ্লয়েড দশা সৃষ্টি সুনিশ্চিত হয়, অপরদিকে নিষেকের পর ডিপ্লয়েড দশাটি ফিরে আসে। উদ্ভিদ ও প্রাণীতে গ্যামেটোজেনেসিসের সময় আমরা মিয়োসিস দেখতে পাই। এর ফলে হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট উৎপন্ন হয়। মিয়োসিসের মূখ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

- নিউক্লিয়াসের বিভাজন এবং কোশ বিভাজন দুটি ধারাবাহিক চক্র অর্থাৎ মিয়োসিস I এবং মিয়োসিস II -এর অন্তর্ভুক্ত। তবে মিয়োসিস বিভাজনকালে DNA প্রতিলিপিকরণের কেবলমাত্র একটি চক্র সংঘটিত হয়।
- কোশচক্রের S দশায় সমরূপ সিস্টার-ক্রোমাটিড তৈরির জন্য জনিতৃ ক্রোমোজোমের বিভাজনের পরই মিয়োসিস-I এর সূচনা হয়।
- মিয়োসিস বিভাজনকালে সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলো জোড় বাঁধে এবং এদের মধ্যে পুনঃসংযোজন (recombination) ঘটে।
- মিয়োসিস-II এর শেষে চারটি হ্যাপ্লয়েড কোশ উৎপন্ন হয়।

মিয়োসিস বিভাজনের ঘটনাপ্রবাহকে নিম্নলিখিত কয়েকটি দশার অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে:

মিয়োসিস I	মিয়োসিস II
প্রোফেজ I	প্রোফেজ II
মেটাফেজ I	মেটাফেজ II
অ্যানাফেজ I	অ্যানাফেজ II
টেলোফেজ I	টেলোফেজ II

10.4.1 মিয়োসিস I (Meiosis I)

প্রোফেজ I : মাইটোসিসের প্রোফেজ অপেক্ষা প্রথম মিয়োটিক বিভাজনের প্রোফেজ দশাটি তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী এবং অনেকটাই জটিল । ক্রোমোজোমের আচরণের ভিত্তিতে এই দশাটিকে আবার পাঁচটি উপদশায় বিভক্ত করা যায় , যা হল লেপ্টোটিন, জাইগোটিন, প্যাকাইটিন, ডিপ্লোটিন এবং ডায়াকাইনেসিস।

লেপ্টোটিন উপদশায় ক্রোমোজোমগুলো আলোক অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ক্রমশঃ দৃশ্যমান হয়। সমগ্র লেপ্টোটিন উপদশা জুড়ে ক্রোমোজোমের ঘনীভবন চলতে থাতে। এই দশার পর প্রোফেজ-I এর দ্বিতীয় উপদশা জাইগোটিন শুরু হয়। এই উপদশায় ক্রোমোজোমগুলো একসাথে জোড় বাঁধতে শুরু করে এবং এরুপ জোড় বাঁধার পদ্ধতিকে সাইন্যাপসিস (Synapsis) বলে। এ ধরনের জোড়বদ্ধ ক্রোমোজোমগুলোকে সমসংস্থ ক্রোমোজোম (Homologoas chromosome) বলে। ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই উপদশার চিত্র গ্রহণ করলে বোঝা যায় যে ক্রোমোজোমের সাইন্যাপসিস এবং সাইন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্স নামক একটি জটিল গঠন তৈরির ঘটনা একইসাথে ঘটে। একজোড়া জোড়বদ্ধ সমসংস্থ ক্রোমোজোম দ্বারা সৃষ্ট গঠনকে বাইভ্যালেন্ট (Bivalent) বা টেট্রাড (tetrad) বলে। যদিও এগুলো পরবর্তী উপদশায় আরও স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। প্রোফেজ I এর দশার প্রথম দুটো উপদশার তার পরবর্তী উপদশা অর্থাৎ প্যাকাইটিনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্বল্পস্থায়ী হয়। এই উপদশায় বাইভ্যালেন্ট ক্রোমোজোমগুলো টেট্রাড হিসাবে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের নন-সিস্টার ক্রোমাটিডগুলোর মধ্যে যে স্থানে ক্রসিং ওভার ঘটে সেই স্থানে রিকম্বিনেশন নডিউলের আবির্ভাব এই উপদশার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ক্রসিং ওভার হল দুটো সমসংস্থ ক্রোমোজোমের মধ্যে জিনগত বস্তুর আদান প্রদান প্রক্রিয়া। এটি একটি উৎসেচক নির্ভর প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী উৎসেচকটি হল রিকম্বিনেজ। হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের মধ্যে পুনঃ সংযোজন প্যাকাইটিন উপদশার শেষ পর্যায়ের মধ্যেই সম্পুর্ণ হয় এবং ক্রোমোজোমগুলো ক্রসিং ওভার ঘটা স্থানে পরস্পর যুক্ত থাকে।

সাইন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্সের ভাঙন এবং পুন:সংযোজিত হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের বাইভ্যালেন্টগুলো ক্রসিংওভার ঘটা স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে পরস্পর থেকে আলাদা হওয়ার প্রবণতা ডিপ্লোটিন দশার সূচনাকে চিহ্নিত করে। ক্রসিংওভারের ফলে সমসংস্থ ক্রোমোজোমের মধ্যে সৃষ্ট 'X' আকৃতির গঠনটিকে কায়াজমাটা (chiasmata) বলে। কিছু মেরুদন্ডী প্রাণীর ডিম্বানুতে (primary oocyte) ডিপ্লোটিন উপদশা বহু মাস বা বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

মিয়োসিস বিভাজনের প্রোফেজ I এর অন্তিম উপদশাটি হল ডায়াকাইনেসিস। কায়াজমার প্রান্তীয় গমন দ্বারা এই উপদশাটি চিহ্নিত হয়। এই উপদশায় ক্রোমোজোমগুলো সম্পূর্ণরুপে ঘনীভূত হয় এবং সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলোর পৃথকীভবনের জন্য মিয়োটিক বেম সংগঠিত হয়। ডায়াকাইনেসিসের শেষে নিউক্লিওলাস অবলুপ্ত হয় এবং নিউক্লিও পর্দার ভাঙ্গান ঘটে। ডায়াকাইনেসিস এমন একটি উপদশা যার ঠিক পরই মেটাফেজ দশা শুরু হয়।

মেটাফেজ I : বাইভ্যালেন্ট ক্রোমোজোমগুলো কোশের নিরক্ষীয় তল বরাবর সজ্জিত হয় (চিত্র 10.3)। বেমের বিপরীত মেরু থেকে আগত অণুনালিকাগুলো সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড়ার সাথে যুক্ত হয়।

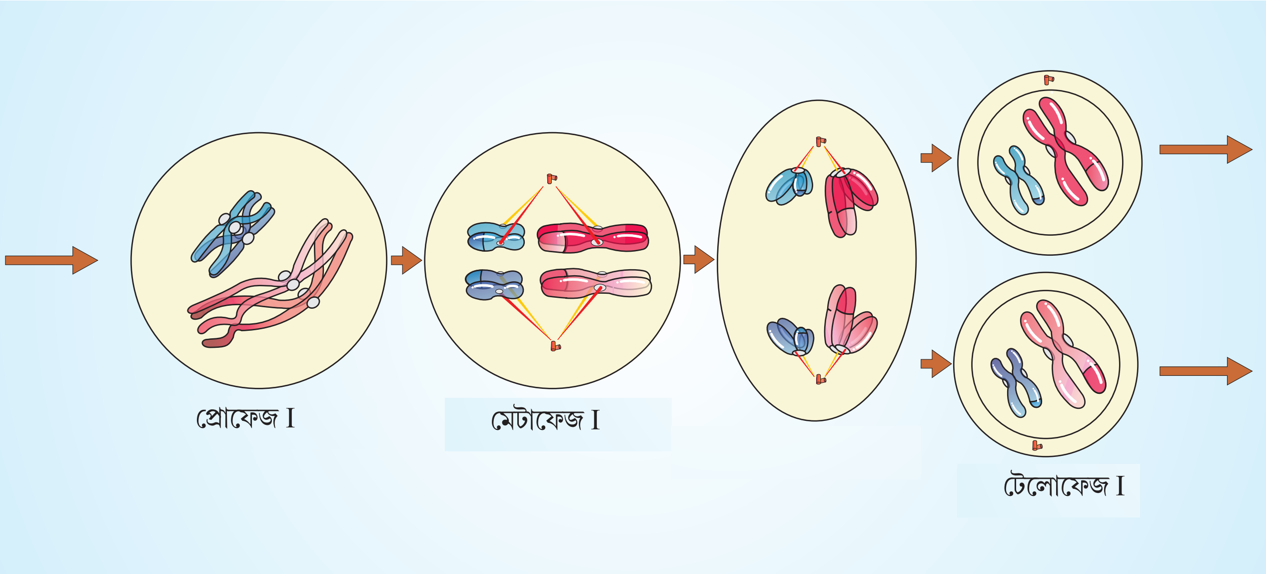

চিত্র 10.3 ঃ মিয়োসিস I এর দশাসমূহ

অ্যানাফেজ I : এই দশায় সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলো পৃথক হয় , যদিও সিস্টার ক্রোমাটিড দুটি তাদের সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে যুক্ত থেকে যায় (চিত্র 10.3)।

টেলোফেজ I : নিউক্লিওপর্দা এবং নিউক্লিওলাসের পুনরাবির্ভাব ঘটে, সাইটোকাইনেসিসের সূচনা হয়, একে কোশের ডায়াড অবস্থা বলে (চিত্র 10.3) । ক্রোমোজোমগুলো কিছুটা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যাতে তারা ইন্টারফেজ নিউক্লিয়াসের চূড়ান্ত বিস্তৃত দশায় পৌঁছাতে পারে না। দুটো মিয়োটিক বিভাজনের অন্তর্বর্তী দশাকে ইন্টারকাইনেসিস বলে যা সাধারণত স্বল্পস্থায়ী হয়। ইন্টারকাইনেসিসের পর প্রোফেজ II শুরু হয় যা প্রোফেজ I এর তুলনায় অনেকটাই সরল।

10.4.2 মিয়োসিস II (Meiosis II)

প্রোফেজ II : সাইটোকাইনেসিসের পরপরই সাধারণত ক্রোমোজোমগুলোর সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত হওয়ার আগে মিয়োসিস II এর সূচনা ঘটে। মিয়োসিস I এর সঙ্গে মাইটোসিসের সাদৃশ্য না থাকলেও মিয়োসিস II এর সাথে মাইটোসিসের সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রোফেজ II এর (চিত্র10.4) শেষে নিউক্লিওপর্দার অবলুপ্তি ঘটে। ক্রোমোজোমগুলো পুনরায় সুসংহত হয়।

মেটাফেজ II : এই দশায় ক্রোমোজোমগুলো কোশের নিরক্ষীয়তলে সজ্জিত হয় এবং বেমের বিপরীত মেরু থেকে আগত অণুনালিকাগুলো সিস্টার ক্রোমাটিডের কাইনেটোকোরের (চিত্র 10.4) সাথে যুক্ত হয়।

অ্যানাফেজ II :প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারের (সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমাটিড অংশে যুক্ত থাকে) বিভাজনের সাথেই এই দশার সূচনা হয় এবং এর ফলে ক্রোমোজোমগুলো কোশের বিপরীত মেরুর দিকে সরে যেতে থাকে (চিত্র 10.4)।

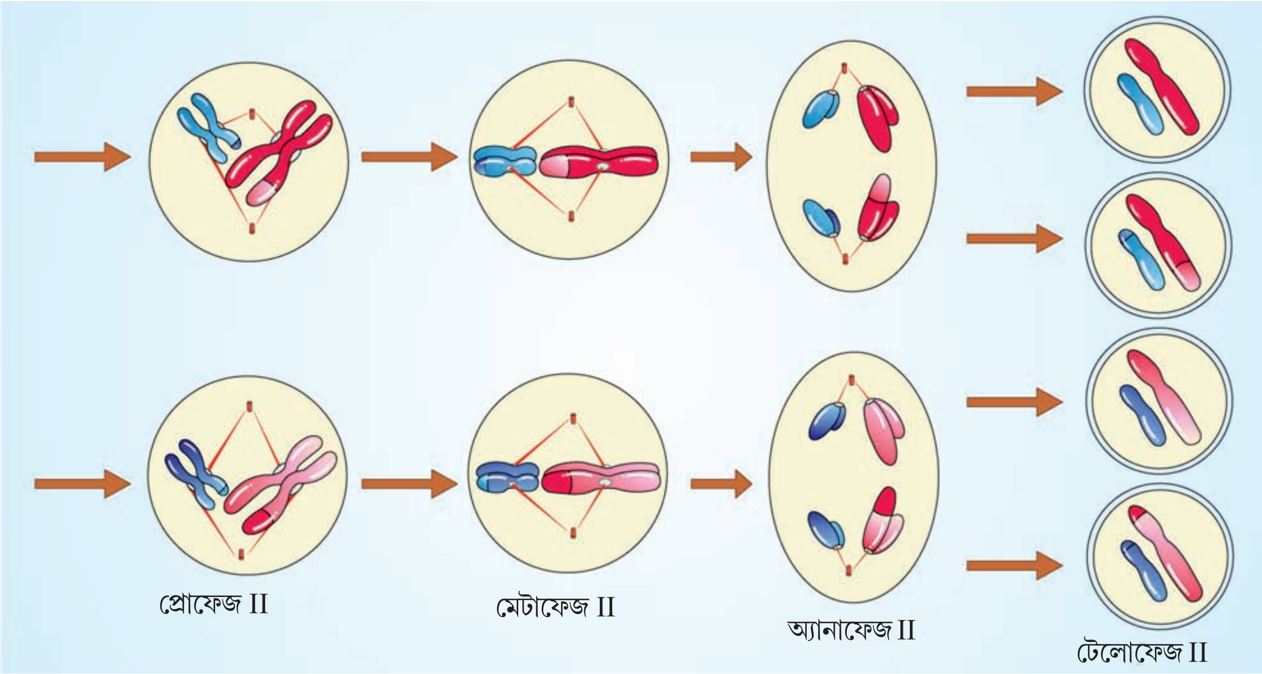

চিত্র 10.4 ঃ মিয়োসিস II এর দশাসমূহ

টেলোফেজ II : টেলোফেজ II শেষ হওয়ার সাথে সাথেই মিয়োসিসের সমাপ্তি ঘটে। দুই মেরুতে উপস্থিত ক্রোমোজোমগুলো পুনরায় একটি নিউক্লিও পর্দা দ্বারা আবৃত হয়। সাইটোকাইনেসিসের পর টেট্রাড অর্থাৎ চারটি হ্যাপ্লয়েড অপত্য কোশের সৃষ্টি হয় (চিত্র 10.4)।

10.5 মিয়োসিসের তাৎপর্য (Significance of meiosis)

মিয়োসিস হল সেই পদ্ধতি যার দ্বারা যৌন জননকারী জীবের প্রতিটি প্রজাতির নির্দিষ্ট ক্রোমোজোম সংখ্যা বংশ পরম্পরায় ধ্রুবক থাকে। যদিও এই বক্তব্যের অসঙ্গতি হল এই যে এই প্রক্রিয়ায় ক্রোমোজোমের হ্রাস বিভাজনের ফলে অপত্য কোশের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোশের অর্ধেক হয়। এটি এক জনু থেকে পরবর্তী জনুতে জীবগোষ্ঠীতে জীনগত প্রকরণও বৃদ্ধি করে। বিবর্তন প্রক্রিয়ার জন্য প্রকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সারসংক্ষেপ

কোশতত্ত্ব অনুযায়ী, সব কোশই পূর্বতন কোশসমূহ থেকে উৎপন্ন হয়। যে প্রক্রিয়ায় নতুন কোশসমূহ উৎপন্ন হয় তা হল কোশ বিভাজন। যে-কোনো যৌন জননকারী জীব তার জীবনচক্র একটি এককোশী জাইগোট থেকে শুরু করে । পূর্ণাঙ্গ জীব সৃষ্টির সাথে সাথে কোশ বিভাজন প্রক্রিয়া বন্ধ হয় না বরং জীবের সমগ্র জীবনচক্র জুড়েই এটি চলতে থাকে। যে সকল দশার মাধ্যমে কোশ একটি বিভাজন দশা থেকে তার পরবর্তী বিভাজন দশায় প্রবেশ করে তাকে কোশচক্র বলে।

কোশচক্রকে দুইটি দশায় ভাগ করা যায় -(i) ইন্টারফেজ-কোশ বিভাজনের প্রস্তুতি কাল এবং (ii) মাইটোসিস (M দশা)- কোশ বিভাজন কাল। ইন্টারফেজকে আবার G_1, S, এবং G_2 দশায় ভাগ করা যায়। G_1 হল সেই দশা যে দশায় কোশের বৃদ্ধি ঘটে এবং স্বাভাবিক বিপাকীয় প্রক্রিয়া চলতে থাকে। বেশিরভাগ অঙ্গানুর দ্বিত্বকরণও এই দশাতেই ঘটে। DNA প্রতিলিপিকরণ এবং ক্রোমোজমের দ্বিত্বকরণ S দশাকে চিহ্নিত করে। G_2 দশা হল সাইটোপ্লাজমীয় বৃদ্ধির সময়কাল। মাইটোসিসকে প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ এবং টেলোফেজ এই চারটি দশায় ভাগ করা যায়। ক্রোমোজোমের ঘনীভবন প্রোফেজ দশায় সম্পন্ন হয়। একই সাথে এই দশায় সেন্ট্রিওল বিপরীত মেরুতে সরে যেতে থাকে, নিউক্লিও পর্দা এবং নিউক্লিওলাস অবলুপ্ত হয় এবং বেমতন্তুগুলো দৃশ্যমান হয়। কোশগুলোর নিরক্ষীয় তল বরাবর ক্রোমোজোমের সজ্জা দ্বারা মেটাফেজ দশাকে চিহ্নিত করা যায়। অ্যানাফেজ দশায় সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজিত হয় এবং ক্রোমাটিডগুলো দুই বিপরীত মেরুর দিকে চলতে থাকে। ক্রোমাটিডগুলো দুই মেরুতে পৌঁছে যাওয়ার পর ক্রোমোজোমের দীর্ঘীকরণ শুরু হয়, নিউক্লিওলাস এবং নিউক্লিওপর্দার পুনরাবির্ভাব ঘটে। এই দশাটিকে টেলোফেজ বলে। নিউক্লিয়াসের বিভাজনের পর সাইটোপ্লাজমের বিভাজন ঘটে থাকে এবং একে সাইটোকাইনেসিস বলে। সুতরাং মাইটোসিস হল সমবিভাজন যেখানে জনিতৃ কোশের ক্রোমোজোম সংখ্যা অপত্য কোশে অপরিবর্তিত থাকে।

মাইটোসিসের সাথে মিয়োসিসের পার্থক্য হল এই যে মিয়োসিস জননকোশ উৎপাদনকারী ডিপ্লয়েড কোশেই ঘটে। মিয়োসিস বিভাজনে গ্যামেট উৎপাদনকালে ক্রোমোজম সংখ্যা হ্রাস পেয়ে জনিতৃ কোশের অর্ধেক হয়ে যায়, তাই এটিকে হ্রাস বিভাজন বলা হয়। যৌন জননকালে দুটি গ্যামেটের মিলন হলে অপত্য জীবে ক্রোমোজোম সংখ্যা জনিতৃ জীবের সমান হয়ে যায়। মিয়োসিসকে দুটি দশায় ভাগ করা যায় যথা-মিয়োসিস I এবং মিয়োসিস II। প্রথম মিয়োটিক বিভাজন দশায় হোমোলোগাস ক্রোমোজোমগুলো জোড়বদ্ধ হয়ে বাইভ্যালেন্ট গঠন করে এবং ক্রসিং ওভার ঘটায়। মিয়োসিস I এর প্রোফেজ দশাটি দীর্ঘস্থায়ী হয়, এটি আবার পাঁচটি উপদশায় বিভক্ত। এগুলো হল লেপ্টোটিন, জাইগোটিন, প্যাকাইটিন, ডিপ্লোটিন এবং ডায়াকাইনেসিস। মেটাফেজ I দশায় বাইভ্যালেন্টগুলো কোশের নিরক্ষীয় তল বরাবর সজ্জিত হয়। এর পরবর্তী অ্যানাফেজ I দশায় উভয় ক্রোমাটিডসহ সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলো বিপরীত মেরুর দিকে চলতে শুরু করে। প্রতিটি মেরুতে, জনিতৃ কোশের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজোম পৌঁছায়। টেলোফেজ I দশায় নিউক্লিও পর্দা এবং নিউক্লিওলাসের পুনরাবির্ভাব ঘটে। মিয়োসিস II মাইটোসিস সদৃশ হয়। অ্যানাফেজ II দশায় সিস্টার ক্রোমাটিডগুলো পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। এইভাবে মিয়োসিস বিভাজনের শেষে চারটি হ্যাপ্লয়েড কোশ গঠিত হয়।

অনুশীলনী

1. স্তন্যপায়ী প্রাণীর কোশে কোশচক্রের গড় সময়কাল কত?
2. সাইটোকাইনেসিস এবং ক্যারিওকাইনেসিসের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো।
3. ইন্টারফেজ দশায় সংঘটিত হওয়া ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করো।
4. কোশচক্রের G_0 (নিষ্ক্রিয় দশা) কী?
5. মাইটোসিসকে কেন সমবিভাজন বলা হয়?
6. কোশচক্রের সেই দশাটির উল্লেখ করো যেখানে নিম্নলিখিতি ঘটনাসমূহ সম্পন্ন হয়:

   (i) ক্রোমোজোমগুলো বেমের নিরক্ষীয় তলে অবস্থান করে।

   (ii) সেন্ট্রোমিয়ারের বিভাজন ঘটে এবং ক্রোমাটিড পৃথক হয়।

(iii) সমসংস্থ ক্রোমাজোম জোড়বন্ধ হয়।

(iv) সমসংস্থ ক্রোমোজোমের মধ্যে ক্রসিং ওভার সংঘটিত হয়।

7. নিম্নলিখিতগুলো বর্ণনা করো।

a) সাইন্যাপসিস b) বাইভ্যালেন্ট c) কায়াজমাটা

তোমার উত্তরটি চিত্র সহ ব্যাখ্যা করো।

8. উদ্ভিদ কোশের সাইটোকাইনেসিস, প্রাণীকোশের সাইটোকাইনোসিস থেকে কীভাবে আলাদা?

9. এমন কিছু উদাহরণ খুঁজে বের করো যেখানে মিয়োসিসের ফলে উৎপন্ন চারটি অপত্য কোশ সমআকারের হয় এবং যেখানে এই অপত্য কোশগুলো বিষম আকারের হয়।

10. মিয়োসিস অ্যানাফেজ I এবং মাইটোসিস অ্যানাফেজের মধ্যে তুলনা করো।

11. মাইটোসিস এবং মিয়োসিসের মধ্যে মুখ্য পার্থক্যগুলো লিপিবদ্ধ করো।

12. মিয়োসিসের তাৎপর্য্য কী?

13. নিম্নলিখিত বিষয়ে তোমরা শিক্ষকের সাথে আলোচনা করো।

(i) হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোমবিশিষ্ট পতঙ্গ এবং নিম্ন শ্রেণির উদ্ভিদ যেখানে কোশ বিভাজন দেখা যায় এবং

(ii) উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের কিছু হ্যাপ্লয়েড কোশ যেখানে কোশ বিভাজন দেখা যায় না।

14. S দশায় DNA -র প্রতিলিপিকরণ ছাড়া কি মাইটোসিস হতে পারে?

15. কোশ বিভাজন ছাড়া কি DNA প্রতিলিপিকরণ ঘটতে পারে?

16. কোশচক্রের প্রতিটি দশার ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণ করো এবং লক্ষ করো কীভাবে নিম্নলিখিত দুটি ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটেছে।

(i) প্রতি কোশে ক্রোমোজোমের সংখ্যা (N)

(ii) প্রতি কোশে DNA-র পরিমাণ (C)

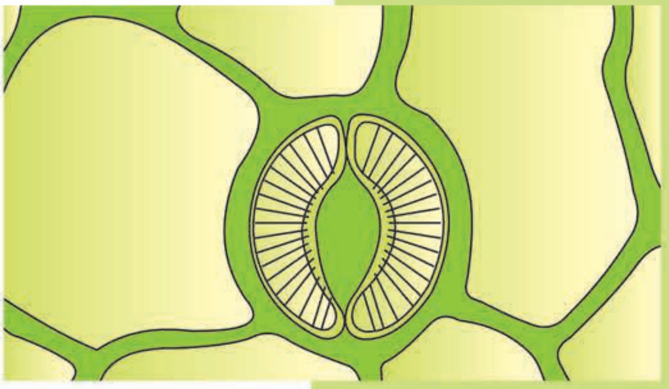

চতুর্থ একক

উদ্ভিদ শারীরবৃত্ত (Plant Physiology)

একাদশ অধ্যায়

উদ্ভিদদেহে পরিবহণ

দ্বাদশ অধ্যায়

খনিজ পুষ্টি

ত্রয়োদশ অধ্যায়

উন্নত উদ্ভিদ দেহে সালোক সংশ্লেষ

চতুর্দশ অধ্যায়

উদ্ভিদদেহে শ্বসন

পঞ্চদশ অধ্যায়

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশ

দীর্ঘ সময় ধরে সজীব বস্তুর গঠন এবং বৈচিত্র্যের বর্ণনা স্পষ্টতই জীববিদ্যার পরস্পর বিরোধী দুটি পটভূমিকাতে গিয়ে শেষ হয়। এই দুটি পটভূমিকা মূলত জীবনের ধরন ও ঘটনাবলির সংগঠনের দুটি স্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত। এদের মধ্যে একটি সজীববস্তু সংক্রান্ত এবং দেহ সংগঠনের উপরের স্তরে বর্ণিত এবং অপরটি কোশীয় ও দেহসংগঠনের আণবিক স্তরে বর্ণিত। প্রথমটি থেকে বাস্তুবিদ্যা ও এর সম্পর্কিত শাখা সৃষ্টি হয়েছিল। দ্বিতীয়টি থেকে প্রসূত হয়েছিল শরীরবিদ্যা ও জৈব রসায়ন শাখা। এই এককের অধ্যায়গুলোতে উদাহরণ হিসেবে বর্ণিত সপুষ্পক উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলোর বর্ণনা হল তা, যা উপরে বলা হয়েছে। উদ্ভিদের খনিজ পুষ্টি, সালোকসংশ্লেষ, পরিবহণ, শ্বসন এবং সর্বশেষ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রক্রিয়াগুলো আণবিক পরিভাষায় বর্ণনা করা হলেও তা হয়েছে কোশীয় কার্যাবলির নিরিখে এবং এমনকি সজীব বস্তুর স্তরে। যেখানে যথাযথ মনে হয়েছে সেখানেই শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলোর সাথে পরিবেশের সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

মেলভিন কেলভিন

মেলভিন কেলভিন (Melvin Calvin) 1911 সালের এপ্রিল মাসে আমেরিকার মিন্নেসোটা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিন্নেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নশাস্ত্রে Ph.D ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বার্কলে শহরের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরে হিরোসিমা নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব পর্যবেক্ষণ করে যখন সারাবিশ্ব শোকস্তব্ধ, তখন কেলভিন ও তাঁর সহকর্মী গবেষকগণ তেজস্ক্রিয়তাকে মানুষের উপকারী কাজে লাগানোর কথা চিন্তা করেন। J.A. Bassham এর সাথে একযোগে তিনি কার্বন ডাই অক্সাইডকে তেজস্ক্রিয় কঠিন C^{14} দ্বারা চিহ্নিত করে সবুজ উদ্ভিদে কার্বন ডাই অক্সাইড, জল এবং খনিজ লবনের মতো কাঁচামালগুলোর সাহায্যে শর্করা ও অন্যান্য পদার্থ সংশ্লেষের বিক্রিয়াগুলো অধ্যয়ণ করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, রঞ্জক অনুসমূহ এবং অন্যান্য পদার্থগুলোর সংঘটিত বিন্যাসে ইলেকট্রন স্থানান্তরণের মাধ্যমে সবুজ উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। সালোকসংশ্লেষ কালে কার্বন আত্তীকরণের বিক্রিয়াপথ বিশদভাবে বর্ণনা করে তিনি 1961 সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

কেলভিন প্রতিষ্ঠিত সালোক সংশ্লেষের মূলনীতি বর্তমানে শক্তির ও অন্যান্য পদার্থের পূণনবীকরণযোগ্য উৎসের অধ্যয়নে এবং সৌরশক্তির গবেষণার মূল বিষয় অধ্যয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অধ্যায় 11 (CHAPTER 11)

উদ্ভিদ দেহে পরিবহণ (Transport in Plants)

11.1 পরিবহণের মাধ্যমসমূহ
11.2 উদ্ভিদ জল সম্পর্ক
11.3 দূরবর্তী স্থানে জলের পরিবহণ
11.4 বাষ্পমোচন
11.5 খনিজ পরিপোষকের শোষণ ও পরিবহণ
11.6 ফ্লোয়েমের মাধ্যমে পরিবহণ: উৎস থেকে সিঙ্কের অভিমুখে পরিবহণ

তুমি কি এটা ভেবে কখনো অবাক হয়েছ যে কীভাবে জল সুউচ্চ উদ্ভিদের শীর্ষভাগ অবধি পৌঁছায়, বা বিভিন্ন উপাদানসমূহ কেন এবং কীভাবে এককোশ থেকে অন্য কোশে পরিবাহিত হয়, সব উপাদান কি একই উপায়ে বা একই দিকে স্থানান্তরিত হয় কিনা এবং এই সকল উপাদানসমূহ স্থানান্তরণের জন্য বিপাকীয় শক্তি প্রয়োজন হয় কিনা। প্রাণীদের তুলনায় উদ্ভিদদের বিভিন্ন অণুসমূহকে আরও অধিক দূরত্বে পরিবহণ করতে হয়। উদ্ভিদ দেহে কোনো সংবহনতন্ত্রও থাকে না। মূল দ্বারা শোষিত জলকে উদ্ভিদের সব অংশে এমনকি বর্ধনশীল কাণ্ডের শীর্ষভাগ পর্যন্তও পৌঁছুতে হয়।

সালোকসংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন পদার্থসমূহ বা খাদ্য মাটির নীচে প্রেরিত মূল সহ উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়। উদ্ভিদদেহের পরিবহণ স্বল্প দূরত্বে অর্থাৎ কোশের মধ্যে কোশপর্দার মধ্য দিয়ে এবং কলাস্থিত কোশগুলোর মধ্যেও ঘটা প্রয়োজন। উদ্ভিদদেহে ঘটমান পরিবহন পদ্ধতিসমূহ বুঝতে গেলে একজনকে অবশ্যই কোশের গঠন এবং উদ্ভিদদেহের অঙ্গসংস্থান সম্পর্কে সাধারণ ধারণাটি মনে করতে হবে। রাসায়নিক বিভব এবং আয়ন সম্পর্কেও কিছু জ্ঞান আহরণের পাশাপাশি ব্যাপন সম্পর্কে আমাদের ধারণার বোধগম্যতার পুনরায় যাচাই করতে হবে।

যখন আমরা কোনো পদার্থের পরিবহণ সম্পর্কে কথা বলি, তখন প্রথমেই আমাদের জানা প্রয়োজন যে আমরা কী ধরনের পরিবহণের এবং কোন্ কোন্ পদার্থের পরিবহণের কথা বলছি। সপুষ্পক উদ্ভিদে যেসব পদার্থের পরিবহণ প্রয়োজন হয় সেগুলো হল জল, খনিজ পরিপোষক, জৈব পরিপোষক এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রকসমূহ। স্বল্প দূরত্বে পদার্থের পরিবহণ ব্যাপন এবং সাইটোপ্লাজমীয় আবর্তন ছাড়াও সক্রিয় পরিবহণের মাধ্যমে ঘটে। দূরবর্তী স্থানে পরিবহণ সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে (জাইলেম ও ফ্লোয়েম) ঘটে যাকে ট্রান্সলোকেশন (Translocation) বলে।

একটি প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হল পরিবহণের অভিমুখ। মূল সমন্বিত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মূল দ্বারা কাণ্ডের দিকে জাইলেমের মাধ্যমে পরিবহণ আবশ্যিকভাবে একমুখী হয়। যদিও, জৈব এবং খনিজ পরিপোষকগুলোর বহুমুখী পরিবহণ ঘটে।

সালোকসংশ্লেষকারী পাতায় সংশ্লেষিত হওয়া জৈব যৌগ উদ্ভিদের সঞ্চয়ী অঙ্গ সহ অন্যান্য সব অংশে পরিবাহিত হয়। পরবর্তীকালে সঞ্চয়ী অঙ্গ থেকে এদের পুনঃপরিবহন ঘটে। উদ্ভিদের কাণ্ড, পাতা এবং বর্ধনশীল অঞ্চলে মূল দ্বারা শোষিত খনিজ পরিপোষকগুলোর উর্ধ্বমুখী পরিবহণ ঘটে। যখন উদ্ভিদের কোনো অংশ বার্ধক্য দশা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই সকল অঞ্চল থেকে পরিপোষকগুলো বেরিয়ে বর্ধনশীল অঞ্চলসমূহের দিকে ধাবিত হয়। খুব স্বল্প পরিমাণ হলেও হরমোন অথবা উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রকসমূহ এবং অন্যান্য রাসায়নিক উদ্দীপকগুলোও উদ্ভিদদেহে পরিবাহিত হয়। কখনো কখনো এই সমস্ত পদার্থগুলো কেবলমাত্র একই স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে অথবা সংশ্লেষণের স্থান থেকে অন্যান্য অংশের দিকে এদের একমুখী পরিবহণ ঘটে। সুতরাং সপুষ্পক উদ্ভিদে জটিল যৌগগুলো জটিল চলাচল পথ রয়েছে (খুব সম্ভবত সুশৃঙ্খলভাবে) যাতে বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন দিকে যায়, একটি অঙ্গ কিছু উপাদান গ্রহণ করে আবার কিছু উপাদান ছেড়ে দেয়।

11.1 পরিবহনের মাধ্যমসমূহ (Means of Transport)

11.1.1 ব্যাপন (Diffusion)

ব্যাপন হল নিষ্ক্রিয় পরিবহন পদ্ধতি যা কোশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বা এক কোশ থেকে অন্য কোশে বা স্বল্প দূরত্বে যেমন পাতার আন্তঃকোশীয় স্থান থেকে বাইরের দিকে ঘটে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় কোনো শক্তি ব্যবহৃত হয়না। ব্যাপন প্রক্রিয়ায়, অনুগুলো যথেচ্ছভাবে চলাচল করে, তবে এর চূড়ান্ত ফল হিসাবে পদার্থসমূহ বেশি ঘনত্বযুক্ত স্থান থেকে কম ঘনত্বযুক্ত স্থানের দিকে পরিবাহিত হয়। ব্যাপন একটি ধীর প্রক্রিয়া এবং তা সজীব পদ্ধতি নির্ভর নয়। ব্যাপন অবশ্যই গ্যাসীয় এবং তরল মাধ্যমে ঘটে কিন্তু কঠিন মাধ্যমে ব্যাপনও কঠিন পদার্থের ব্যাপন অপেক্ষা সহজতর। উদ্ভিদের জন্য ব্যাপন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া কারণ এটিই উদ্ভিদদেহে গ্যাসীয় বিনিময়ের একমাত্র মাধ্যম।

ব্যাপনের হার ঘনত্বের নতিমাত্রা, পর্দা যা দুটি মাধ্যমকে পৃথক করে রাখে এর ভেদ্যতা, তাপমাত্রা এবং চাপ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

11.1.2 সহায়ক ব্যাপন (Facilitated diffusion)

পূর্বে দেখানো হয়েছে যে, ব্যাপন ঘটার জন্য নতিমাত্রা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। ব্যাপনের হার পদার্থের আকারের উপর নির্ভর করে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পদার্থসমূহের ব্যাপন অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি ঘটে। পর্দার মধ্য দিয়ে কোনো পদার্থের ব্যাপন লিপিডে এর দ্রাব্যতার উপর নির্ভর করে। লিপিড হল পর্দার মূখ্য উপাদান। পর্দার মাধ্যমে লিপিডে দ্রাব্য পদার্থসমূহের ব্যাপন অপেক্ষাকৃত দ্রুত ঘটে। জলাকর্ষী (Hydrophilic) অংশযুক্ত পদার্থের পর্দার মাধ্যমে চলাচল অসুবিধাজনক হওয়ায় তাদের চলাচলে সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে। মেমব্রেন প্রোটিন এই ধরনের পদার্থগুলোকে সেই স্থান প্রদান করে যার মাধ্যমে এরা পর্দা ভেদ করে যেতে পারে। এই প্রোটিনসমূহ ঘনত্বের নতিমাত্রা তৈরি করে না ঃ অণুর ব্যাপন সহায়ক প্রোটিন দ্বারা ঘটলেও ব্যাপনের জন্য ঘনত্বের নতিমাত্রার উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক। এই পদ্ধতিকে বলা হয় সহায়ক ব্যাপন (facilitated diffusion)।

সহায়ক ব্যাপনে বিশেষ প্রোটিনগুলো ATP স্থিত শক্তি ব্যবহার না করেই পর্দার মধ্য দিয়ে পদার্থের চলাচলে সাহায্য করে। সহায়ক ব্যাপন নিম্ন ঘনত্ব থেকে উচ্চ ঘনত্বের দিকে পুরোপুরিভাবে সব অণুর পরিবহণ ঘটাতে সক্ষম হয় না, কারণ তা হতে গেলে শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। যখন এই পরিবাহী প্রোটিনের সবগুলো সহায়ক ব্যাপনে অংশ নেয় (সম্পৃক্ত) তখনই পরিবহণের হার সর্বাধিক হয়। সহায়ক ব্যাপন প্রক্রিয়াটি খুবই সুনির্দিষ্ট; এর দ্বারা কোশ তার গ্রহণোপযোগী পদার্থসমূহের নির্বাচন করতে পারে।

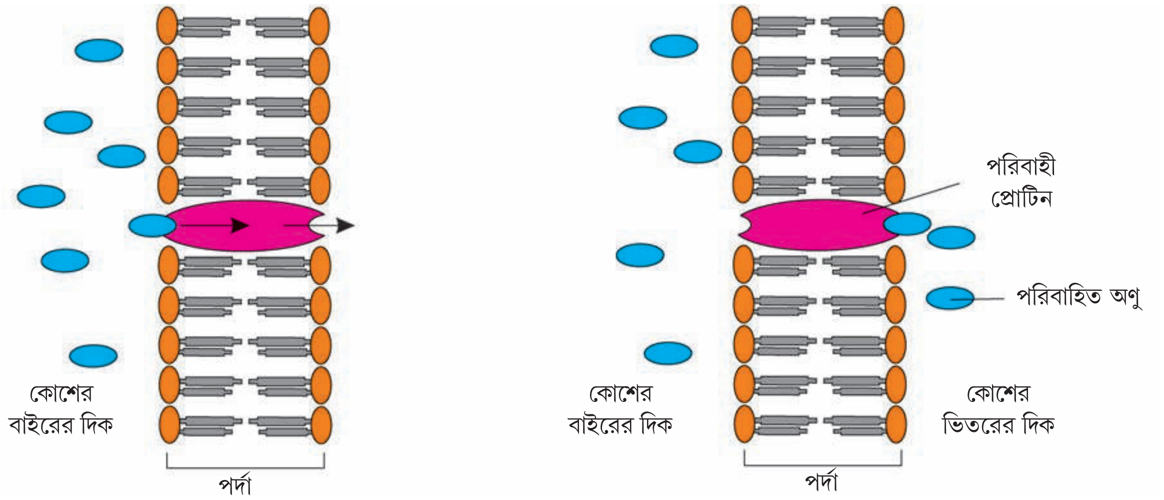

চিত্র 11.1 সহায়ক ব্যাপন

প্রোটিন পরিবাহীগুলো এমন সব প্রতিরোধকের (inhibitor) প্রতি সংবেদনশীল যেগুলো প্রোটিনের পার্শ্বশৃঙ্খলের সাথে বিক্রিয়া করে।

পর্দার মধ্য দিয়ে অণুগুলোর চলাচলের জন্য প্রোটিনগুলো এই পর্দায় কতগুলো চ্যানেল বা প্রণালী গঠন করে। কিছু প্রণালী সবসময় উন্মুক্ত থাকে আবার অন্য প্রণালীগুলোর মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত চলন ঘটতে পারে। কিছু প্রণালী প্রশস্ত হয় যার ফলে বিভিন্ন ধরনের অণুসমূহ চলাচল করতে পারে। পোরিন (Porin) প্রোটিনগুলো প্লাস্টিড, মাইটোকন্ড্রিয়া এবং কিছু ব্যাকটিরিয়া কোশের বহিঃপর্দায় বহু সংখ্যক ছিদ্র তৈরি করে যার ফলে পর্দার মধ্য দিয়ে ছোটো প্রোটিনের মতো আকার বিশিষ্ট অণুগুলোও চলাচল করতে পারে।

চিত্র 11.1 এ পরিবাহী প্রোটিনের সাথে যুক্ত বহিঃকোশীয় অণু দেখানো হয়েছে। এই পরিবাহী প্রোটিন তারপর আবর্তিত হয়ে কোশের অভ্যন্তরে অণুর মুক্তি ঘটায়। উদাহরণ- জল প্রণালী আটটি ভিন্ন ধরনের একোয়াপোরিন দ্বারা গঠিত হয়।

11.1.2.1 নিষ্ক্রিয় সিমপোর্ট এবং এন্টিপোর্ট (Passive symports and antiports)

কিছু বাহক বা পরিবাহী প্রোটিন কেবল তখনই ব্যাপন ঘটায় যখন দুই ধরনের অণু একসাথে পরিবাহীত হয়। সিমপোর্ট পদ্ধতিতে উভয় অণু একই দিকে পর্দার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। এন্টিপোর্ট পদ্ধতিতে উভয় অণু বিপরীত অভিমুখে পরিবাহিত হয় (চিত্র 11.2)। যখন কোনো অণু অন্যান্য অণু থেকে আলাদা হয়ে স্বতন্ত্রভাবে পর্দার মাধ্যমে পরিবাহিত হয় তখন সেই পদ্ধতিকে ইউনিপোর্ট বলা হয়।

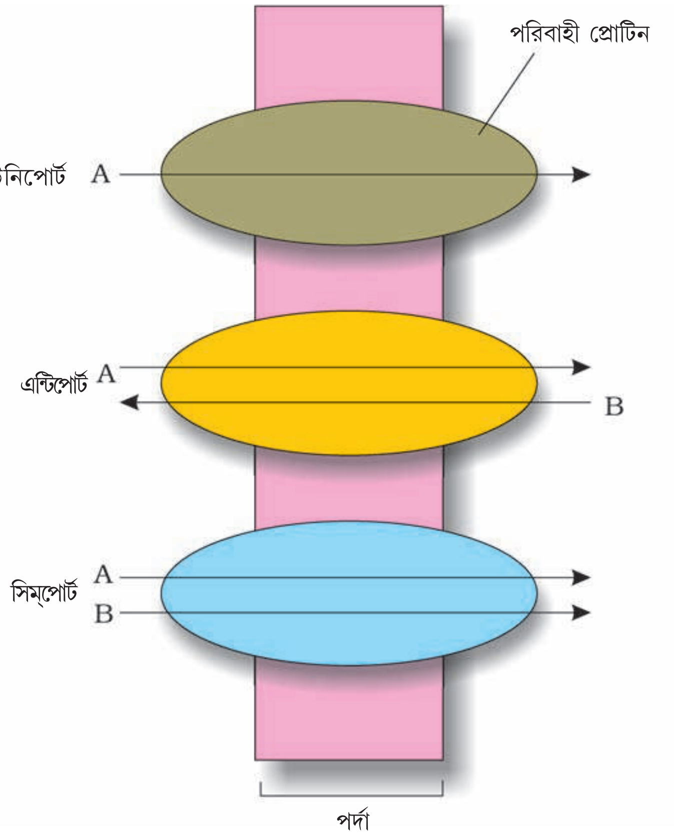

চিত্র 11.2 সহায়ক ব্যাপন

11.1.3 সক্রিয় পরিবহণ (Active Transport)

সক্রিয় পরিবহণে ঘনত্বের নতিমাত্রার বিপরীতে অণুসমূহের পরিবহণ ঘটাতে শক্তির প্রয়োজন হয়। সক্রিয় পরিবহণ পর্দাস্থিত প্রোটিনের মাধ্যমে ঘটে। অতএব, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পরিবহণ উভয়ক্ষেত্রেই কোশপর্দায় উপস্থিত বিভিন্ন প্রোটিনসমূহ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। পাম্প বলতে সে সকল প্রোটিনদের বোঝায় যারা কোশপর্দার মধ্য দিয়ে পদার্থসমূহ পরিবহণের জন্য শক্তি ব্যবহার করে। এই সকল পাম্প নিম্ন ঘনত্ব থেকে উচ্চ ঘনত্বের দিকে পদার্থের পরিবহন করতে পারে (উর্ধ্বমুখী পরিবহণ)। সব পরিবাহী প্রোটিনসমূহ ব্যবহৃত হলে বা সম্পৃক্ত হলে পরিবহণ হার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়। বাহক প্রোটিনগুলো উৎসেচকের ন্যায় খুবই সুনির্দিষ্ট হয় অর্থাৎ এটি পর্দার মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট পদার্থ পরিবহণ করে। এই প্রোটিন সেইসব প্রতিরোধকগুলোর প্রতি সংবেদনশীল হয় যারা প্রোটিনের পার্শ্ব শৃঙ্খলগুলোর সাথে বিক্রিয়া করে।

11.1.4 বিভিন্ন পরিবহণ পদ্ধতির তুলনা (Comparison of Different Transport processes)

সারণী 11.1 এ বিভিন্ন পরিবহণ পদ্ধতির মধ্যে তুলনা দেখানো হয়েছে। কোশপর্দায় উপস্থিত প্রোটিন সহায়ক ব্যাপন ও সক্রিয় পরিবহনের জন্য দায়ী এবং এগুলো কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি প্রদর্শন করে যেমন, উচ্চ সংবেদনশীলতা, পরিপৃক্তি, প্রতিরোধকে সাড়া দেওয়া এবং হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া। কিন্তু ব্যাপন সহায়ক হোক বা না হোক, তা নতিমাত্রা বরাবরই ঘটে এবং তা শক্তির ব্যবহার করে না।

সারণি 11.1 বিভিন্ন পরিবহণ পদ্ধতির মধ্যে তুলনা

বৈশিষ্ট্য	সাধারণ ব্যাপন	সহায়ক পরিবহণ	সক্রিয় পরিবহণ
বিশেষ মেমব্রেন প্রোটিন প্রয়োজন হয়	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ
উচ্চ প্রভেদক	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ
পরিবহন পরিপৃক্তি	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ
উর্ধ্বমুখী পরিবহণ	না	না	হ্যাঁ
শক্তিরূপে ATP প্রয়োজন	না	না	হ্যাঁ

11.2 উদ্ভিদ-জল সম্পর্ক (Plant Water Relation)

জল উদ্ভিদের সব শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য আবশ্যক এবং এটি সব সজীববস্তুর ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি এমন একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করে যার মধ্যে বেশিরভাগ পদার্থই দ্রবীভূত হয়। কোশের প্রোটোপ্লাজম জল ছাড়া আর কিছুই না যার মধ্যে বিভিন্ন অণু দ্রবীভূত এবং (বিভিন্ন কণা) নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে। একটি তরমুজে প্রায় 92 শতাংশ জল থাকে। বেশিরভাগ বিরুৎ উদ্ভিদের সরস ওজনের প্রায় 10 থেকে 15 শতাংশ মাত্র শুষ্ক বস্তু থাকে। উদ্ভিদের অভ্যন্তরে জলের বণ্টন অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন হয় কাষ্ঠল অংশে তুলনামূলকভাবে খুবই কম জল থাকে; যেখানে নরম অংশের বেশিরভাগই জল।

একটি বীজ দেখতে শুকনো হতে পারে কিন্তু তবুও এতে জল থাকে, তা না হলে বীজটি সজীব থাকবে না এবং শ্বসনক্রিয়াও চালাতে পারবে না।

স্থলজ উদ্ভিদ প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ জল শোষণ করে কিন্তু এর বেশিরভাগ জলই পাতা থেকে বাষ্পায়নের মাধ্যমে অর্থাৎ বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ার ফলে পরিবেশে মুক্ত হয়। একটি পরিণত ভুট্টা উদ্ভিদ একদিনে প্রায় তিন লিটার জল শোষণ করে, যেখানে একটি সর্ষে গাছ 5 ঘন্টায় তার নিজের ওজনের প্রায় সমান ওজনের জল শোষণ করে নেয়। জলের এই উচ্চ চাহিদার কারণেই, এটি আশ্চর্য হওয়ার কোনো বিষয় নয় যে কৃষিক্ষেত্র বা প্রাকৃতিক পরিবেশ উভয় ক্ষেত্রেই উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং ফলনের জন্য প্রায়শই জল একটি সীমাস্থ প্রভাবক হিসেবে থাকে।

11.2.1 জল বিভব (Water Potential)

উদ্ভিদের সাথে জলের সম্পর্ক বুঝতে গেলে কিছু নির্দিষ্ট পরিভাষা জানা জরুরি। জলের পরিবহণ বিষয়টি বোঝার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক ধারণা হল জল বিভবের (Ψ_w) ধারণা। দ্রাব বিভব (Ψ_s) এবং চাপ বিভব (Ψ_p) হল দুটি মুখ্য উপাদান যা জল বিভব নির্ধারণ করে।

জলের অণুগুলোতে গতিশক্তি বর্তমান। তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থায় জলের অণুগুলো এলোমেলোভাবে এমন গতিশীল অবস্থায় থাকে যখন এদের গতি দ্রুত থাকে এবং এই গতিশক্তির মান ধ্রুবক হয়। কোনো ব্যবস্থায় জলের ঘনত্ব যত বেশি হবে, তার গতিশক্তি বা জল বিভবও তত বেশি হবে। অর্থাৎ এটি স্পষ্ট যে বিশুদ্ধ জলের জল বিভব সর্বাধিক হবে। যদি জল সমন্বিত দুটি ব্যবস্থা পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তাহলে জলের অণুর মধ্যে সৃষ্ট এলোমেলো গতির কারণে শেষপর্যন্ত জল উচ্চশক্তিসম্পন্ন ব্যবস্থা থেকে নিম্নশক্তিসম্পন্ন ব্যবস্থার দিকে পরিবাহিত হয়। অর্থাৎ জল উচ্চ জল বিভবসম্পন্ন ব্যবস্থা থেকে নিম্ন জল বিভবসম্পন্ন ব্যবস্থার দিকেই পরিবাহিত হবে। মুক্ত শক্তির নতিমাত্রার সপক্ষে পদার্থের পরিবহণের এই পদ্ধতিকে ব্যাপন বলা হয়। জল বিভব চিহ্নিত করার জন্য আমরা গ্রীক চিহ্ন Psi অথবা Ψ ব্যবহার করি যেমনটি চাপের একক বোঝাতে Pa (পাসকেল) ব্যবহার করা হয়। প্রচলিতভাবে প্রমাণ তাপমাত্রায় কোনো প্রকার চাপের অনুপস্থিতিতে বিশুদ্ধ জলের জল বিভব শূন্য ধরা হয়।

যদি বিশুদ্ধ জলে কিছু দ্রাব দ্রবীভূত করা হয় তবে দ্রবণটিতে অল্পসংখ্যক মুক্ত জলের অণু থাকে ফলে জলের ঘনত্ব হ্রাস পায় এবং সঙ্গে এর জল বিভবও হ্রাস পায়। অতএব সব দ্রবণের জল বিভবই বিশুদ্ধ জলের জল বিভব অপেক্ষা কম হয়। দ্রাবের দ্রবীভবনের ফলে দ্রবণে জল বিভব মানের এই পরিবর্তনকেই দ্রাব বিভব বা Ψ_s বলে। Ψ_s সর্বদাই ঋণাত্মক। দ্রবণে দ্রাবের অণু যত বেশি, Ψ_s এর মান তত কম (অধিক ঋণাত্মক) হবে। স্বাভাবিক বায়ুমন্ডলীয় চাপে একটি দ্রবণের (জল বিভব) Ψ_w= (দ্রাব বিভব) Ψ_s ।

যদি বিশুদ্ধ জল বা কোনো দ্রবণে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ অপেক্ষা অধিক চাপ প্রয়োগ করা হয় তাহলে এর জল বিভব বৃদ্ধি পায়। এটি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে জল উৎক্ষেপণের সমতুল্য। তুমি কি আমাদের দেহের এমন কোনো তন্ত্রের কথা ভাবতে পার, যেখানে চাপ সৃষ্টি হয়? উদ্ভিদ তন্ত্রে চাপ সৃষ্টি হয় যখন ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে জল উদ্ভিদ কোশে প্রবেশ করে। এর ফলে কোশ প্রাচীরের উপর চাপ সৃষ্টি হয় যা কোশকে রসস্ফীত (turgid) করে তোলে (11.2.2 বিভাগটি দেখ)। ফলে চাপ বিভব বৃদ্ধি পায়। চাপ বিভব সাধারণত ধনাত্মক হয় যদিও উদ্ভিদে ঋণাত্মক বিভব বা জাইলেম স্থিত জলস্তম্ভে টান কান্ডের

মাধ্যমে জলের উর্ধ্বমুখী পরিবহণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। চাপ বিভবকে Ψ_p দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

একটি কোশের জল বিভব, দ্রাব বিভব এবং চাপ বিভব উভয়ের দ্বারাই প্রভাবিত হয়। দ্রাব বিভব এবং চাপ বিভবের মধ্যে সম্পর্ক নিম্নরূপ হয় :

$$\Psi_w = \Psi_s + \Psi_p$$

11.2.2 অভিস্রবণ (Osmosis)

উদ্ভিদ কোশ একটি কোশপর্দা এবং একটি কোশপ্রাচীর দ্বারা পরিবৃত থাকে। কোশপ্রাচীর জল ও দ্রবীভূত পদার্থের সাপেক্ষে ভেদ্য হওয়ায় তা এদের পরিবহণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। উদ্ভিদ কোশসমূহে সাধারণত একটি বৃহদাকার কেন্দ্রীয় কোশ গহ্বর থাকে, যাতে উপস্থিত বস্তুসমুহ অর্থাৎ গহ্বররস কোশের দ্রাব বিভব বজায় রাখতে সহায়তা করে। উদ্ভিদ কোশের কোশপর্দা ও কোশগহ্বরের পর্দা (টোনোপ্লাস্ট) এক সাথে কোশে পদার্থের প্রবেশ ও নির্গমনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসেবে কাজ করে।

'অভিস্রবণ' এই শব্দটি সুনির্দিষ্টভাবে প্রভেদক ভেদ্য অথবা অর্ধভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে জলের ব্যাপনের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। কোশের চালিকা শক্তির প্রভাবে অভিস্রবণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে। পুরো অভিস্রবণ প্রক্রিয়াটির অভিমুখ এবং হার চাপের নতিমাত্রা ও ঘনত্বের নতিমাত্রা উভয়ের উপরই নির্ভর করে। উচ্চ রাসায়নিক বিভব (বা ঘনত্ব) থেকে নিম্ন রাসায়নিক বিভবের দিকে ততক্ষণই জলের পরিবহণ ঘটে যতক্ষণ না তা সাম্যাবস্থায় পৌঁছায়। সাম্যাবস্থায় দুটি তরলপূর্ণ কক্ষে জল বিভব অবশ্যই সমান হতে হবে।

তোমরা পূর্বে হয়ত স্কুলে আলুর অসমোমিটার তৈরি করেছো। যদি কন্দটিকে জলে বসানো হয় তাহলে আলুর কন্দস্থিত গর্তে থাকা গাঢ় চিনির দ্রবণ অভিস্রবণের ফলে জল গ্রহণ করে।

চিত্র 11.3 পর্যবেক্ষণ করো, যেখানে দুটি প্রকোষ্ঠ A এবং B এর মধ্যে থাকা দ্রবণ পরস্পর অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথক করা আছে।

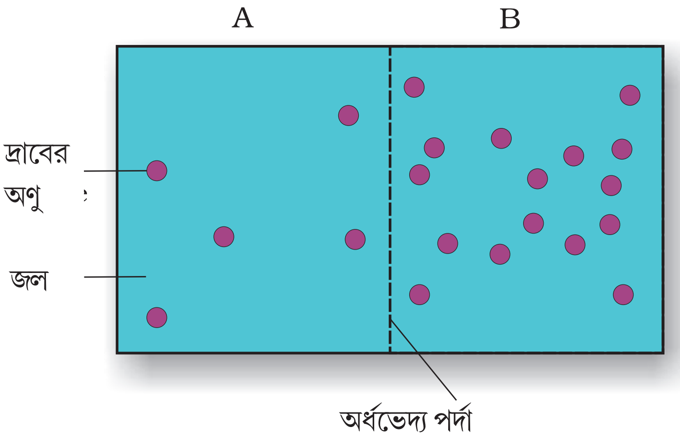

চিত্র 11.3

(ক) কোন্ প্রকোষ্ঠের দ্রবণটি নিম্ন জল বিভব সম্পন্ন?
(খ) কোন্ প্রকোষ্ঠের দ্রবণটির নিম্ন দ্রাব বিভব রয়েছে?
(গ) কোন্ অভিমুখে অভিস্রবণ ঘটবে?
(ঘ) কোন্ দ্রবণটির উচ্চ দ্রাব বিভব রয়েছে?
(ঙ) সাম্যাবস্থায় কোন্ প্রকোষ্ঠটি নিম্ন জল বিভব সম্পন্ন হবে?
(ঞ) যদি একটি প্রকোষ্ঠের Ψ এর মান 2000 K Pa এবং অন্যটির 1000 K Pa হয়, তাহলে কোন্ প্রকোষ্ঠটির Ψ উচ্চতর হবে?

চলো আমরা অন্য একটি পরীক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করি যেখানে একটি ফানেলে সুক্রোজের জলীয় দ্রবণ নিয়ে অর্ধভেদ্য পর্দার মাধ্যমে সেটিকে বিকারে রাখা বিশুদ্ধ জল থেকে পৃথক করা হয় (চিত্র 11.4)। ডিমের মধ্যে তুমি এ ধরনের অর্ধভেদ্য পর্দা পাবে। ডিমের একপ্রান্তে একটি ছোটো ছিদ্র করে এর মাধ্যমে ডিমের কুসুম ও অ্যালবুমিন বের করে নাও এবং খোলসটিকে কয়েক ঘন্টার জন্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের লঘু দ্রবণে রাখ। ডিমের খোলসটি দ্রবীভূত হয়ে পর্দাটিকে অবিকৃত রাখবে। ফানেলের মধ্যে জলের প্রবেশ ঘটবে যার ফলে ফানেলের মধ্যে দ্রবণের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। সাম্যাবস্থায় পৌঁছানো অবধি এই পদ্ধতি চলতে থাকবে। যদি কোনো কারণে পর্দার মাধ্যমে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় সুক্রোজ বেরিয়ে যায় তাহলে কি কখনো এই সাম্যাবস্থায় পৌঁছানো যাবে?

ফানেলের উপরিভাগ থেকে বাহ্যিক চাপ প্রয়োগ করা যেতে পারে যাতে পর্দার মাধ্যমে ফানেলের মধ্যে জলের ব্যাপন না ঘটে। জলের ব্যাপন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় এই চাপ হল অভিস্রবণ চাপ এবং এটি দ্রাব ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। দ্রাবের ঘনত্ব যত বেশি হবে জলের ব্যাপন প্রতিরোধে ততবেশি চাপ প্রয়োগের প্রয়োজন পড়বে। সংখ্যাগতভাবে অভিস্রবণ চাপ ও জল বিভব সমমানসম্পন্ন হয়। কিন্তু চিহ্ন বিপরীত হয়। অভিস্রবণ চাপ হল ধনাত্মকমানসম্পন্ন, অন্যদিকে জল বিভব হল ঋণাত্মক মানের।

11.2.3 প্লাজমোলাইসিস (Plasmolysis)

জল পরিবহণের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ কোশের (বা কলার) আচরণ বহিঃকোশীয় দ্রবণের উপর নির্ভর করে। যদি বহিঃকোশীয় দ্রবণটি কোশের সাইটোপ্লাজমের অভিস্রবণ চাপের সাথে সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে পারে, তবে সেটিকে সমসারক (isotonic) দ্রবণ বলা হয়। যদি বহিঃকোশীয় দ্রবণটি সাইটোপ্লাজমের তুলনায় লঘু হয়, তবে সেটিকে লঘুসারক (hypotonic) এবং যদি বহিঃ কোশীয় দ্রবণটি অধিক ঘনত্বযুক্ত হয় তবে সেটিকে অতিসারক (hypertonic) দ্রবণ বলা হয়। লঘুসারক দ্রবণে কোশের রসস্ফীতি ঘটে এবং অতিসারক দ্রবণে কোশ কুঞ্চিত হয়।

কোশ থেকে জল নির্গত হলে প্লাজমোসাইসিস ঘটে এবং উদ্ভিদ কোশের কোশপর্দা কুঞ্চিত হয়ে কোশপ্রাচীর থেকে দূরে সরে আসে। এটি তখনই ঘটে যখন কোনো কোশ (বা কলাকে) তার প্রোটোপ্লাজমের তুলনায় অতিসারক (অধিক দ্রাবযুক্ত) দ্রবণে রাখা হয় জল কোশের বাইরে বেরিয়ে আসে।

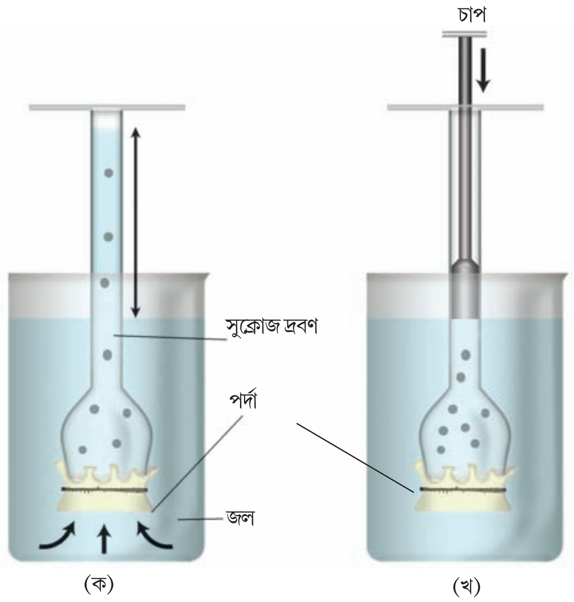

চিত্র 11.4 অভিস্রবণের প্রদর্শন। একটি থিসেল ফানেল সুক্রোজ দ্রবণ দ্বারা পূর্ণ করে জলপূর্ণ বিকারে উল্টে রাখা হল। (ক) পর্দার মধ্য দিয়ে জলের ব্যাপন ঘটবে (যেমনটা তির চিহ্ন দ্বারা দেখানো হয়েছে) ও ফানেলের মধ্যে দ্রবণের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে (খ) ফানেলের মধ্যে জলের প্রবেশ বন্ধ করতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে চাপ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

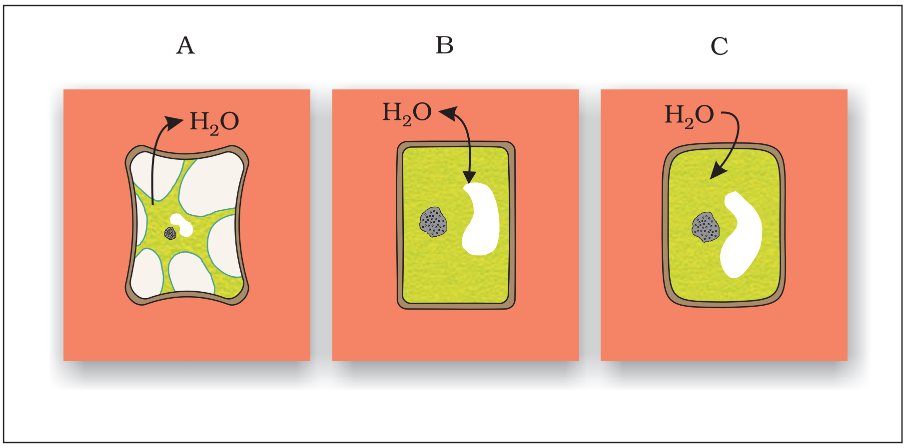

চিত্র 11.5 উদ্ভিদ কোশে প্লাজমোলাইসিস

জল প্রথমে সাইটোপ্লাজম থেকে এবং পরে কোশগহ্বর থেকে বের হয়। কোশ থেকে জল ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বহিঃকোশীয় (কোশের বাইরে) তরলে নিষ্কাশিত হলে প্রোটোপ্লাজম কুঞ্চিত হয়ে কোশপ্রাচীর থেকে দূরে সরে আসে। এই কোশটিকে তখন প্লাজমোলাইজড্ বলা হয়। পর্দার মধ্য দিয়ে জলের পরিবহন উচ্চ জল বিভবসম্পন্ন ক্ষেত্র (অর্থাৎ কোশ) থেকে নিম্ন জল বিভবসম্পন্ন ক্ষেত্রের (কোশের বাইরে) দিকে ঘটে (চিত্র 11.5)।

প্লাজমোলাইসড্ কোশের কুঞ্চিত প্রোটোপ্লাস্ট এবং কোশ প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে কী থাকে?

কোশ বা কলাকে সমসারক দ্রবণে রাখলে কোশের ভেতরের দিকে বা কোশ থেকে বাইরের দিকে জলের সামগ্রিক প্রবাহ ঘটবে না। যদি বাহ্যিক দ্রবণটি সাইটোপ্লাজমের সাথে অভিস্রবণ চাপের সমতা বজায় রাখতে পারে তাহলে সেটিকে সমসারক বলা হয়। যখন কোশের ভেতরে এবং বাইরে জলের প্রবাহ ঘটে এবং কোশ সাম্যবস্থায় থাকে কোশটি রসশিথিল (Flaccid) হয়ে পড়ে।

প্লাজমোলাইসিস পদ্ধতিটি সাধারণত উভয়মুখী। কোশগুলোকে লঘুসারক দ্রবণে (সাইটোপ্লাজমের তুলনায় অধিক জল বিভব বা লঘু দ্রবণ) রাখলে কোশের মধ্যে জলের ব্যাপন ঘটে ফলস্বরূপ সাইটোপ্লাজম কোশপ্রাচীরের উপর যে চাপ সৃষ্টি হয় সেটিকে রসস্ফীতি চাপ (Turgor Pressure) বলে। কোশে জল প্রবেশের কারণে প্রোটোপ্লাজম দ্বারা দৃঢ় কোশপ্রাচীরের উপর প্রযুক্ত চাপকে চাপ বিভব (Ψ_p) বলে। কোশপ্রাচীরের দৃঢ়তার কারণে কোশের বিদারণ ঘটে না। এই রসস্ফীতি চাপই শেষপর্যন্ত কোশগুলোর স্ফীতি ও প্রসারণজনিত বৃদ্ধির জন্য দায়ী।

একটি রসশিথিল কোশের চাপ বিভব Ψ_p কী হবে? উদ্ভিদ ছাড়া আর কোন্ কোন্ জীব কোশপ্রাচীর ধারণ করে?

11.2.4 আত্মভূতি (Imbibition)

আত্মভূতি হল একটি বিশেষ ধরনের ব্যাপন যেখানে কঠিন কোলয়ডীয় পদার্থ দ্বারা জল শোষিত হয়ে তাদের আয়তন বৃদ্ধি ঘটায়। আত্মভূতির সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হল বীজ ও শুষ্ক কাঠ দ্বারা জলের শোষণ। আদিম মানুষ শিলা ও নুড়ি ভাঙতে, কাঠের স্ফীতির ফলে সৃষ্ট এই চাপকে ব্যবহার করত।

আত্মভূতির ফলে সৃষ্ট চাপের কারণেই বীজ থেকে চারাগাছ মাটি ভেদ করে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। তা না হলে কখনোই তা সম্ভব হত না।

আত্মভূতিও একপ্রকার ব্যাপন যেহেতু জলের পরিবহণ ঘনত্বের নতিমাত্রার অভিমুখে ঘটে। বীজ এবং অন্য একধরনের পদার্থে জল প্রায় না থাকায় সেগুলো খুব সহজেই জল শোষণ করে। শোষক এবং যে তরলের আত্মভূতি হবে এদের মধ্যে জল বিভবের নতিমাত্রা থাকা আবশ্যক। পাশাপাশি, কোনো পদার্থের আত্মভূতির জন্য সেই শোষক পদার্থ এবং তরলের মধ্যে আকর্ষণ থাকাও অত্যাবশ্যক শর্ত।

11.3 দূরবর্তী স্থানে জলের পরিবহণ (Long Distance Transport of Water)

পূর্ববর্তী শ্রেণিতে তুমি নিশ্চয়ই এই পরীক্ষাটি করেছিলে যেখানে তুমি একটি সাদা ফুলসহ গাছের ডালকে রঙিন জলে রেখেছিলে এবং লক্ষ করেছিলে এটি রঙিন হয়ে গেছে। কয়েক ঘন্টা পর ডালের কাটা প্রান্ত পরীক্ষা করে তুমি সেই অঞ্চলসমূহকে চিহ্নিত করেছিলে যার মাধ্যমে রঙিন জল পরিবাহিত হয়েছিল। এই পরীক্ষাটি খুব সহজেই এটি প্রদর্শন করে যে নালিকা বান্ডিলের মধ্য দিয়ে বিশেষত জাইলেমের মধ্য দিয়েই জলের পরিবহণ ঘটে। এখন উদ্ভিদে জল ও অন্যান্য পদার্থের পরিবহণের পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের আরও জানার চেষ্টা করতে হবে।

উদ্ভিদদেহে পদার্থের দূরবর্তী স্থানে পরিবহণ শুধুমাত্র ব্যাপন দ্বারা সম্ভব নয়। ব্যাপন একটি ধীর প্রক্রিয়া। এটি কেবলমাত্র স্বল্প দূরত্বে অণুর চলন ঘটাতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, একটি সাধারণ উদ্ভিদ কোশের (প্রায় 50μm) মধ্য দিয়ে অণুর চলন ঘটতে প্রায় 2.5 সেকেন্ড সময় লাগে। তুমি কি হিসাব করতে পারবে যে এই হারে শুধুমাত্র ব্যাপন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের 1 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে অনুসমূহের কত বছর সময় লাগবে?

বৃহদাকার ও জটিল জীবদেহে কখনও কখনও পদার্থসমূহকে খুবই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। কখনও কখনও উৎপাদন বা শোষণ স্থান এবং সঞ্চয় স্থান একে অপর থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে, সেক্ষেত্রে পরিবহণের জন্য ব্যাপন বা সক্রিয় পরিবহণ পর্যাপ্ত নয়। তার জন্য বিশেষ দূরবর্তী পরিবহণ ব্যবস্থাসমূহ প্রয়োজন হয়ে পড়ে যাতে দূরবর্তী স্থানে পদার্থের পরিবহণ দ্রুত হারে ঘটে। জল ও খনিজ লবন এবং খাদ্য সাধারণত মাস (mass) বা বাল্ক (bulk) প্রবাহ পদ্ধতিতে পরিবাহিত হয়। দুটি স্থানের মধ্যে চাপের তারতম্যের কারণে একস্থান থেকে অন্যস্থানে পদার্থের বাল্ক বা দলবদ্ধভাবে পরিবহণই হল মাস (mass) প্রবাহ। মাস্ (mass) প্রবাহের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, নদী প্রবাহের মতোই এই প্রবাহে দ্রবীভূত বা নিলম্বিত অবস্থায় থাকা সব পদার্থগুলো সমগতিতে পরিবাহিত হয়। এটি ব্যাপন থেকে আলাদা, যেখানে বিভিন্ন পদার্থ স্বাধীনভাবে তাদের ঘনত্বের নতিমাত্রার উপর নির্ভর করে পরিবাহিত হয়। কিন্তু দলবদ্ধ প্রবাহের ক্ষেত্রে এটি হয় ধনাত্মক জলস্ফীতি চাপের নতিমাত্রা (যেমন = বাগানে জল দেওয়ার নল) অথবা ঋণাত্মক জলস্ফীতি চাপের নতিমাত্রার (যেমন = স্ট্র দ্বারা টানা) মাধ্যমে ঘটে।

উদ্ভিদের সংবহন কলা বা নালিকা বান্ডিলের মাধ্যমে পদার্থের দলবদ্ধ পরিবহণকে ট্রান্সলোকেশন বলে।

তুমি কী উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পাতার প্রস্থচ্ছেদ এবং নালিকা বান্ডিল সম্পর্কে যা অধ্যয়ন করেছো তা মনে করতে পারছ কি? উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে বিশেষভাবে গঠিত নালিকা বান্ডিলে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম রয়েছে। উদ্ভিদের মূল থেকে মুখ্যত জল, খনিজ লবণ, কিছু জৈব নাইট্রোজেন এবং হরমোন জাইলেমের মাধ্যমে বায়বীয় অংশে পরিবাহিত হয়। ফ্লোয়েম বিভিন্ন ধরনের জৈব ও অজৈব দ্রাবকে প্রধানত পাতা থেকে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পরিবহণ করে।

11.3.1 কীভাবে উদ্ভিদ জল শোষণ করে? (How do plants absorb water)

আমরা জানি যে উদ্ভিদে মূল দ্বারাই বেশিরভাগ জল শোষিত হয়। সেজন্যই আমরা মাটিতে জল প্রয়োগ করি, পাতায় নয়। মূলের অগ্রভাগে উপস্থিত লক্ষাধিক মূলরোম অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে জল ও খনিজ শোষণের কাজটি সম্পন্ন করে। মূলরোম হল মূলের বহিঃত্বকীয় কোশ থেকে প্রবর্ধিত সরু পাতলা প্রাচীরযুক্ত অংশ যা ব্যাপকভাবে শোষণ-তল বৃদ্ধি করে। মূলরোম দ্বারা শুধুমাত্র ব্যাপন প্রক্রিয়ায় জল খনিজ দ্রাব সহ শোষিত হয়। মূলরোম দ্বারা জল শোষিত হওয়ার পর সুস্পষ্ট দুটি পথে এই জল মূলের গভীরস্তর সমূহে পরিবাহিত হয় :

- অ্যাপোপ্লাস্ট পথ
- সিমপ্লাস্ট পথ

অ্যাপোপ্লাস্ট হল এমন একটি পরিবহণ ব্যবস্থা যা মূলের অন্তত্বকে ক্যাসপিরিয়ান পট্টি (চিত্র 11.6) ব্যাতীত সমগ্রহ উদ্ভিদদেহে বিস্তৃত। জলের অ্যাপোপ্লাস্টিক পরিবহণ একচেটিয়াভাবে কোশের আন্তঃকোশীয় স্থান এবং কোশপ্রাচীরের মাধ্যমে ঘটে। অ্যাপোপ্লাস্ট পরিবহণ ব্যবস্থায় জলের পরিবহণ কোশ পর্দাকে অতিক্রমণ ছাড়াই ঘটে।

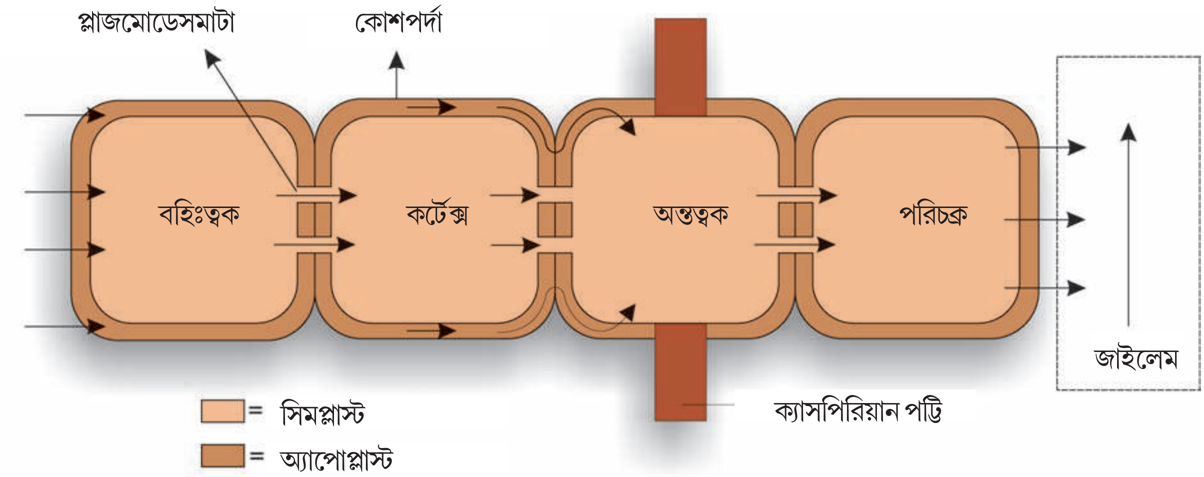

চিত্র 11.6 মূলে জল পরিবহনের পথ

এই পরিবহণ নতিমাত্রার উপর নির্ভর করে। অ্যাপোপ্লাস্ট জল পরিবহণে কোনোরূপ বাধা দান করে না এবং জল পরিবহণ দলবদ্ধ (mass) প্রবাহের মাধ্যমে ঘটে। আন্তঃকোশীয় স্থানে বা বায়ুমণ্ডলে জলের বাষ্পীভবনের ফলে অ্যাপোপ্লাস্টের নিরবচ্ছিন্ন জল প্রবাহে চাপ সৃষ্টি হয়, অতএব জলের অসমসংযোগ (adhesion) এবং সমসংযোগ (cohesion) ধর্মের কারণে জলের দলবদ্ধ (mass) প্রবাহ ঘটে থাকে।

সিমপ্লাস্টিক পদ্ধতি হল পরস্পর সংযুক্ত প্রোটোপ্লাস্টভিত্তিক পদ্ধতি। পার্শ্ববর্তী কোশ সমূহ প্লাজমোডেজমাটার মাধ্যমে বিস্তৃত সাইটোপ্লাজমীয় সূত্রের সাহায্যে যুক্ত থাকে। সিমপ্লাস্টিক পদ্ধতিতে জল কোশের মধ্য দিয়ে এদের সাইটোপ্লাজমের মাধ্যমে পরিবাহীত হয়। আন্তঃকোশীয় পরিবহণ প্লাজমোডেসমাটার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে কোশে জলের প্রবেশ কোশ পর্দার মধ্য দিয়ে ঘটায় এই ধরনের পরিবহণ অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে ঘটে। এক্ষেত্রেও পরিবহণ বিভবের নতিমাত্রার সপক্ষে ঘটে। সাইটোপ্লাজমীয় প্রবাহ সিমপ্লাস্টিক পরিবহণে সাহায্য করে। তোমরা হয়ত হাইড্রিলা পাতার কোশে সাইটোপ্লজমীয় প্রবাহ লক্ষ করেছ। প্রবাহের ফলে ক্লোরোপ্লাস্টের গতিবিধি খুব সহজেই দৃশ্যমান হয়।

মূলের কর্টেক্সের কোশগুলো শিথিলভাবে সজ্জিত থাকায় মূলে জল প্রবাহের বেশির ভাগটাই অ্যাপোপ্লাস্টের মাধ্যমে ঘটে এবং জল পরিবহণ কোনোভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় না। যদিও কর্টেক্সের ভেতরের সীমানায় অর্থাৎ অন্তঃস্ত্বকে সুবেরিনযুক্ত পট্টি থাকায় তা জল অভেদ্য হয়। এই পট্টিটিকে ক্যাসপেরিয়ান পট্টি বলে। জলের অনুসমূহ এই স্তর ভেদে অক্ষম হয় তাই তা প্রাচীরের সুবেরিনযুক্ত অঞ্চল হয়ে কোশপর্দার মাধ্যমে কোশের ভেতরে প্রবেশ করে। তখন সিমপ্লাস্টের মাধ্যমে জলের পরিবহণ ঘটে এবং পুনরায় একটি পর্দা অতিক্রম করে জাইলেমের কোশে পৌঁছায়। মূলস্তরের মাধ্যমে জলের পরিবহণ শেষপর্যন্ত এন্ডোডারমিসের পর থেকে সিমপ্লাস্টিক পদ্ধতিতে ঘটে। এটিই একমাত্র পথ যার মাধ্যমে জল এবং অন্যান্য দ্রাব নালিকা বান্ডিলে প্রবেশ করে।

একবার জাইলেমে প্রবেশ করার পর জল পুনরায় কোশের মধ্যে এমনকি এক কোশ থেকে অন্য কোশে মুক্তভাবে পরিবাহিত হয়। তরুণ মূলে জল সরাসরি জাইলেম ভেসেল এবং অথবা ট্র্যাকীডে প্রবেশ করে। এগুলো হল জলনালী এবং অ্যাপোপ্লাস্টের অংশ। মূলের নালিকাতন্ত্রের মাধ্যমে জল ও খনিজ আয়নের পরিবহণ পথ সংক্ষিপ্তাকারে চিত্র 11.7 দেখানো হয়েছে।

কিছু উদ্ভিদে এগুলোর সাথে আনুষঙ্গিক অতিরিক্ত গঠনও থাকে যা জল (এবং খনিজ) শোষণে সাহায্য করে। মাইকোরাইজা হল ছত্রাক এবং উদ্ভিদের মূলের মধ্যে মিথোজীবী সম্পর্ক।

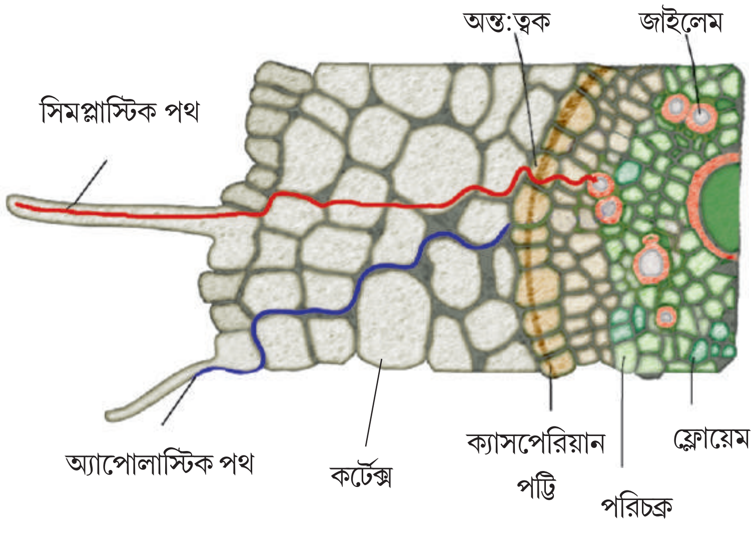

চিত্র 11.7 সিমপ্লাস্টিক এবং অ্যাপোপ্লাস্টিক পথ যার মাধ্যমে মূলে জল এবং আয়নের শোষণ ও পরিবহণ ঘটে।

ছত্রাক অনুসূত্র তরুণ মূলের চারদিকে জালক গঠন করে বা মূলের কোশকে ভেদ করে। এই অনুসূত্রগুলো তাদের প্রশস্ত পৃষ্ঠতল দ্বারা মাটি থেকে অধিক মাত্রায় জল ও খনিজ আয়ন শোষণ করে যা হয়ত মূল দ্বারা সম্ভব নয়। ছত্রাক উদ্ভিদ মূলে জল ও খনিজের যোগান দেয়, পরিবর্তে মূল মাইকোরাইজায় শর্করা ও নাইট্রোজেনযুক্ত যৌগ সরবরাহ করে। মাইকোরাইজার সাথে কিছু উদ্ভিদের বাধ্যতামূলক সম্পর্ক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বলা যায় পাইন বীজের অঙ্কুরোদগম এবং বেঁচে থাকা মাইকোরাইজার উপস্থিতি ছাড়া সম্ভব নয়।

11.3.2 উদ্ভিদে জলের ঊর্ধ্বমুখী পরিবহণ (Water movement up a plant)

আমরা দেখেছি যে উদ্ভিদ কীভাবে মাটি থেকে জল শোষণ করে এবং তা কীভাবে নালিকা বান্ডিলে যায়। আমাদের এখন বোঝার চেষ্টা করতে হবে যে কীভাবে এই জল উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়। জলের এই পরিবহণ সক্রিয় না কি নিষ্ক্রিয়? যেহেতু এখানে কান্ডের মাধ্যমে অভিকর্ষ বলের বিপরীতে জলের ঊর্ধ্বমুখী পরিবহণ ঘটে, তাই এই পরিবহণের জন্য শক্তির জোগানই বা কে দেয়?

11.3.2.1 মূলজ চাপ (Root Pressure)

মাটি থেকে বিভিন্ন আয়ন সক্রিয়ভাবে মূলের নালিকা বান্ডিলে পরিবাহিত হয় এবং জল নতিমাত্রার সপক্ষে পরিবাহিত হয়ে জাইলেমের ভেতর চাপের বৃদ্ধি ঘটায়। এই ধনাত্মক চাপকে বলা হয় মূলজ চাপ এবং এই চাপই কান্ডের মধ্য দিয়ে স্বল্প উচ্চতায় জলের ঊর্ধ্বমুখী পরিবহণের জন্য দায়ী। আমরা কীভাবে মূলজ চাপের অস্তিত্ব বুঝতে পারি? একটি ছোটো নরম কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদ বাছাই করো এবং খুব ভোরে পর্যাপ্ত বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতার উপস্থিতিতে উদ্ভিদের কাণ্ডটিকে গোড়ার কাছাকাছি ধারালো ব্লেডের সাহায্যে অনুভূমিকভাবে কাটো। তুমি সাথে সাথেই দেখতে পাবে যে কান্ডের কাটা অংশ থেকে ফোঁটা ফোঁটা রস নিঃসৃত হচ্ছে। ধনাত্মক মূলজ চাপের ফলে এই নিঃসরণ ঘটে। যদি তুমি কান্ডের কাটা অংশে একটি রাবারের টিউব সেঁটে দাও তাহলে তুমি নিঃসৃত পদার্থটিকে সঠিকভাবে সংগ্রহ করতে পারবে ও নিঃসরণের হার পরিমাপ করতে পারবে এবং নিঃসৃত পদার্থের উপাদানসমূহও শনাক্ত করতে পারবে। রাত্রিবেলা ও ভোরবেলা যখন বাষ্পীভবন কম হয় তখনও মূলজ চাপের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ ও অন্য বহু তৃণজাতীয় উদ্ভিদের পত্রফলকের অগ্রভাগে উপস্থিত শিরার বিশেষ ছিদ্রপথকে ঘিরে অতিরিক্ত জল বিন্দু বিন্দু রূপে সঞ্চিত হয়। তরল রূপে এই জল মোচনকে নিঃস্রাবণ (Guttation) বলে।

সমগ্র জল-পরিবহণ পদ্ধতিতে মূলজ চাপ এর ক্ষমতা অনুযায়ী কেবলমাত্র কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী চাপ প্রয়োগ করতে পারে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে সুউচ্চ উদ্ভিদে জলের ঊর্ধ্বমুখী পরিবহণে মূলজ চাপ মুখ্য ভূমিকা পালন করে না। মূলজ চাপের সবচেয়ে বড়ো অবদান হল জাইলেমের মধ্যে জলের অণুর নিরবচ্ছিন্ন শৃঙ্খল পুনস্থাপন করা যা প্রায়শই বাস্পমোচনের ফলে সৃষ্ট অতিরিক্ত টানের প্রভাবে বিচ্ছিন্ন হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মূলজ চাপ দ্বারা জল পরিবহণ সম্ভব হয় না। তাই বেশিরভাগ উদ্ভিদই এই চাহিদা বাস্পমোচন টান দ্বারা পূরণ করে।

11.3.2.2 বাষ্পমোচন টান (Transpiration Pull)

উদ্ভিদে হৃৎপিণ্ড বা কোনো প্রকার সংবহন তন্ত্রের অনুপস্থিতি স্বত্বেও জাইলেমের মধ্য দিয়ে যথেষ্ট উচ্চ হারে, সর্বাধিক 15 মিটার/প্রতি ঘণ্টায় ঊর্ধ্বমুখে জলের প্রবাহ ঘটে।

কীভাবে এই পরিবহণ সম্পন্ন হয়? এখানে একটি বড়ো প্রশ্ন দাঁড়ায় যে উদ্ভিদদেহের মধ্য দিয়ে জলের পরিবহণ কি ধাক্কার ফলে ঘটে নাকি টানের ফলে জলের ঊর্ধ্বমুখী পরিবহণ ঘটে। বেশিরভাগ গবেষকই একমত হয়েছেন যে উদ্ভিদের মধ্য দিয়ে জলের পরিবহণ মুখ্যত টানের ফলেই সম্পন্ন হয় এবং এই পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় চালিকা শক্তি আসে পাতা থেকে বাষ্পমোচনের ফলে; যাকে জল পরিবহণের বাষ্পমোচন সমসংযোগ টান মডেল (Cohesion tension transpiration pull model) বলা হয়। কিন্তু কী কারণে এই বাষ্পমোচন টান সৃষ্টি হয়?

উদ্ভিদদেহে জল ক্ষণস্থায়ী। উদ্ভিদের পাতায় পৌঁছানো জলের এক শতাংশেরও কম সালোকসংশ্লেষ ও উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয় এবং এই জলের বেশিরভাগই পাতায় উপস্থিত পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে নির্গত হয়। উদ্ভিদের জল মোচনের এই পদ্ধতিকে বাষ্পমোচন বলে।

পূর্ববর্তী শ্রেণিতে তোমরা বাষ্পমোচন সম্পর্কে পড়েছ, যেখানে একটি সুস্থ উদ্ভিদকে পলিথিন ব্যাগ দ্বারা আবৃত করলে এর ভেতরে জলবিন্দু জমা হতে দেখা গেছে। তোমরা কোবাল্ট ক্লোরাইড পেপার, যা জল শোষণের ফলে রঙ পরিবর্তিত হয় এর ব্যবহারেও পাতার মাধ্যমে জলের অপসারণ অধ্যয়ন করতে পার।

11.4 বাষ্পমোচন (Transpiration)

বাষ্পমোচন হল উদ্ভিদ দেহ থেকে বাষ্পাকারে জলের অপসারণ। এটি মুখ্যত পাতায় উপস্থিত পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে ঘটে। পত্ররন্ধ্র নামক ছিদ্রের মাধ্যমে বাষ্পমোচনের ফলে বাষ্পাকারে জলের অপসারণের পাশাপাশি পাতায় অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের আদান প্রদানও ঘটে। স্বাভাবিক অবস্থায় পত্ররন্ধ্র দিনের বেলায় উন্মুক্ত এবং রাত্রিবেলায় বন্ধ থাকে। পত্ররন্ধ্রের খোলা বা বন্ধ হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ হল রক্ষীকোশগুলোর রসস্ফীতির পরিবর্তন। পত্ররন্ধ্রের অভিমুখে অবস্থিত রক্ষীকোশের অভ্যন্তরীণ প্রাচীর পুরু ও স্থিতিস্থাপক হয়। পত্ররন্ধ্র-ছিদ্রকে ঘিরে থাকা রক্ষীকোশ দুটিতে রসস্ফীতি বৃদ্ধি পেলে রক্ষীকোশের পাতলা বহিঃপ্রাচীরের বহিঃস্ফীতি ঘটে এবং এটি অভ্যন্তরীণ প্রাচীরে এমনভাবে চাপ সৃষ্টি করে যাতে এই প্রাচীর অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকার ধারণ করে। রক্ষীকোশের কোশ প্রাচীরে মাইক্রোফাইব্রিলের সম্মিলিত অবস্থানও পত্ররন্ধ্রের উন্মোচনে সাহায্য করে। সেলুলোজ মাইক্রোফাইব্রিলসমূহ অনুদৈর্ঘ্য বরাবর সুস্থিত না হয়ে অরীয়ভাবে সজ্জিত থেকে পত্ররন্ধ্রের উন্মোচন সহজতর করে। রক্ষীকোশ থেকে জলের নির্গমন বা পরিবেশে জলের অপচয় বা ঘাটতির কারণে রক্ষীকোশগুলো রসস্ফীতি হারালে, এদের স্থিতিস্থাপক অন্তঃপ্রাচীর পুনরায় পূর্ব আকৃতি লাভ করে, রক্ষীকোশগুলো চুপসে (faccid) যায় এবং পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়।

বিষমপৃষ্ঠ (প্রায়শই দ্বিবীজপত্রী) পাতার নিম্নপৃষ্ঠে সাধারণত উপরিপৃষ্ঠ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক পত্ররন্ধ্র থাকে, যেখানে সমাঙ্গপৃষ্ঠ (একবীজপত্রী) পাতার উভয়পৃষ্ঠেই প্রায় সমান সংখ্যক পত্ররন্ধ্র বর্তমান। বিভিন্ন বাহ্যিক প্রভাবক দ্বারা বাষ্পমোচন প্রক্রিয়া প্রভাবিত হয় যেমন তাপমাত্রা, আলো, আর্দ্রতা, বায়ু প্রবাহের তীব্রতা। যে সব উদ্ভিদ সম্পর্কীয় প্রভাবক দ্বারা বাষ্পমোচন প্রক্রিয়া প্রভাবিত হয় সেগুলো হল পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা ও বিন্যাস, খোলা পত্ররন্ধ্রের শতকরা সংখ্যা, উদ্ভিদদেহে জলের উপস্থিতি, কেনোপির (Canopy) গঠন মূলবীয় (উদ্ভিদের বায়ব অংশের শাখা প্রশাখা ও পাতা মিলে যে আচ্ছাদন তৈরি হয়)।

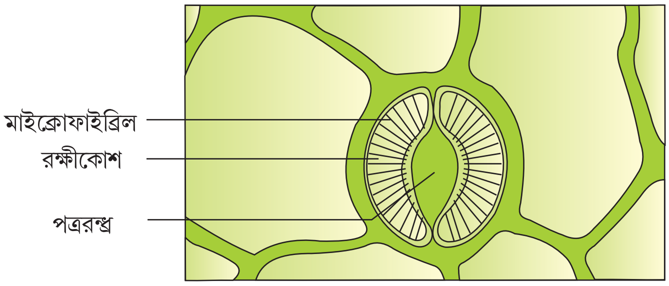

চিত্র 11.8 রক্ষীকোশসহ পত্ররন্ধ্র

বাষ্পমোচনের ফলে জাইলেমে রসের উৎস্রোত মুখ্যত জলের নিম্নলিখিত ভৌত ধর্মগুলোর উপর নির্ভর করে:

- সমসংযোগ (Cohesion) — জলের অনুসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ।
- অসমসংযোগ (Adhesion) — জলের অনুসমূহ ও মেরু পৃষ্ঠের (যেমন জাইলেম বাহিকার পৃষ্ঠ) মধ্যে আকর্ষণ।
- পৃষ্ঠটান (Surface Tension) — জলের অনুসমূহ গ্যাসীয় অবস্থা অপেক্ষা তরল অবস্থায় পরস্পরের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়।

এই সব ধর্ম জলকে উচ্চ প্রসার্য শক্তি (Tensile Strength) অর্থাৎ উত্তোলন বল প্রতিরোধের ক্ষমতা এবং উচ্চ কৈশিক বল অর্থাৎ সরু নলের মধ্য দিয়ে উত্থিত হওয়ার ক্ষমতা যোগায়। উদ্ভিদে কৈশিক বল ক্ষুদ্র ব্যাসার্ধযুক্ত ট্র্যাকিয়ার উপাদান যেমন ট্র্যাকিড এবং ভেসেল উপাদান দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।

সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে জলের প্রয়োজন হয়। জাইলেম বাহিকা তন্ত্র মূল থেকে পাতার শিরায় প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু কোন্ শক্তি ব্যবহার করে উদ্ভিদ জলের অণু পাতার প্যারেনকাইমা কোশে পৌঁছায় যেখানে জলের প্রয়োজন হয়? পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে জলের বাষ্পীভবন ঘটার ফলে কোশগুলোর উপর জলের একটি পাতলা নিরবচ্ছিন্ন স্তর গঠিত হয় যা জাইলেম থেকে পাতায় একের পর এক জলের অণুর পর পর উত্তোলন ঘটায়। পত্ররন্ধ্রের তলদেশীয় গহ্বর (উপপত্ররন্ধ্রীয় গহ্বর) এবং কোশান্তর স্থানের তুলনায় বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব কম হওয়ার কারণে চারপাশের বায়ুতে জলের ব্যাপন ঘটে। এর ফলে একটি টান (pull) এর সৃষ্টি হয় (চিত্র 11.9)।

পরিমাপ করে দেখা গেছে যে বাষ্পমোচনের ফলে সৃষ্ট বল 130 মিটারেরও অধিক উচ্চতায় পুরো জাইলেম জুড়ে সৃষ্ট জলস্তম্ভটিকে উত্তোলনের জন্য পর্যাপ্ত চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

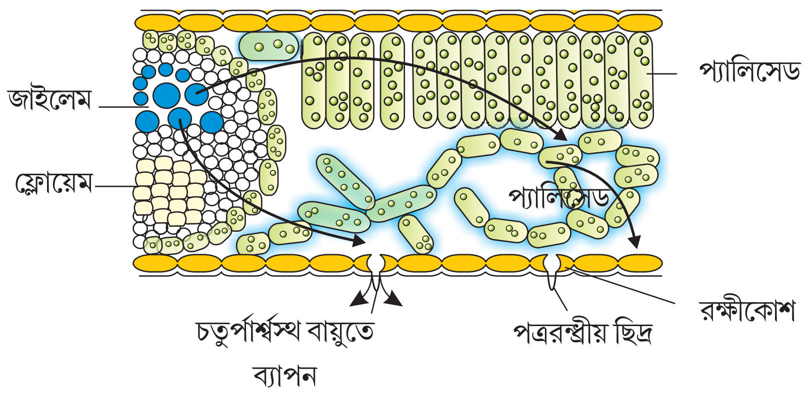

চিত্র 11.9 পাতায় জলের সঞ্চালন, পাতা থেকে জলের বাষ্পীভবন পাতার বায়ুস্থান ও বাহ্যিক বায়ুমণ্ডলের মধ্যে চাপ বিভবের সৃষ্টি করে। এই বিভব সালোকসংশ্লেষকারী কোশে এবং পাতার শিরায় উপস্থিত জলস্তম্ভ জাইলেমে প্রেরিত হয়।

11.4.1 বাষ্পমোচন ও সালোকসংশ্লেষ — একটি পারস্পরিক সমঝোতা (Transpiration and Photosynthesis a Compromise)

বাষ্পমোচনের একাধিক উদ্দেশ্য রয়েছে :

- উদ্ভিদে পদার্থের শোষণ ও পরিবহনের জন্য বাষ্পমোচন টান সৃষ্টি করে।
- সালোকসংশ্লেষের জন্য — জল সরবরাহ করে।
- মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিদের সকল অংশে খনিজ পদার্থ পরিবহণ করে।
- বাষ্পীভবনের ফলে পত্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা হ্রাস পায়, যা কখনও কখনও 10 থেকে 15 ডিগ্রিও হয়ে থাকে।
- কোশের রসস্ফীতির মাধ্যমে উদ্ভিদের স্বাভাবিক আকৃতি ও গঠন বজায় রাখে।

একটি সক্রিয়ভাবে সালোকসংশ্লষকারী উদ্ভিদে জলের চাহিদা সবথেকে বেশি। বাষ্পমোচনের ফলে ব্যবহারযোগ্য জলের দ্রুত নির্গমণ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটিকে সীমিত রাখে। বৃষ্টিচ্ছায় অরণ্যে আর্দ্রতা মুখ্যত জলের মূল থেকে পাতা, পাতা থেকে বায়ুমণ্ডল এবং পুনরায় বায়ুমণ্ডল থেকে মাটিতে ফিরে আসা — এই বিশাল জলচক্রের মাধ্যমে বজায় থাকে।

জলের অপচয় হ্রাসের পাশাপাশি কার্বনডাইঅক্সাইডের সর্বাধিক লভ্যতার জন্য কৌশলগুলোর মধ্যে উদ্ভিদে বিবর্তনের ফলে C_4 সালোকসংশ্লেষীয় তন্ত্রের উদ্ভব সম্ভবত একটি কৌশল। কার্বন সংবন্ধনের ক্ষেত্রে (শর্করা তৈরি) C_3 উদ্ভিদের তুলনায় C_4 উদ্ভিদ-এর দক্ষতা দ্বিগুণ হয়। তবে একই পরিমাণ CO_2 সংবন্ধনের জন্য একটি C_3 উদ্ভিদের তুলনায় C_4 উদ্ভিদ অর্ধেক জল ব্যয় করে।

11.5 খনিজ পরিপোষকের শোষণ ও পরিবহণ (Uptake and Transport of Mineral Nutrients)

বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত CO_2 থেকে উদ্ভিদ তাদের প্রয়োজনীয় কার্বন ও অক্সিজেনের বেশিরভাগটাই গ্রহণ করে থাকে। অবশিষ্ট পরিপোষকের চাহিদা পূরণ হয় মৃত্তিকা থেকে প্রাপ্ত খনিজ লবন এবং জল থেকে প্রাপ্ত হাইড্রোজেনের মাধ্যমে।

11.5.1 খনিজ আয়নের শোষণ (Uptake of Mineral Ions)

খনিজ লবনগুলো জলের ন্যায় উদ্ভিদের মূল দ্বারা নিষ্ক্রিয়ভাবে শোষিত হয় না। খনিজ আয়ন শোষণের জন্য দুটি প্রভাবক দায়ী : (i) মৃত্তিকায় খনিজ পদার্থসমূহ আধানযুক্ত কণা (আয়ন) রূপে উপস্থিত থাকে যা কোশপর্দার মধ্য দিয়ে চলাচল করতে পারে না এবং (ii) মৃত্তিকায় খনিজ পদার্থের ঘনত্ব সাধারণত মূলে উপস্থিত খনিজ পদার্থের ঘনত্ব অপেক্ষা কম থাকে। অতএব, বেশিরভাগ খনিজই সক্রিয় পরিবহণের মাধ্যমে মূলের এপিডারমাল কোশের সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে। এই প্রক্রিয়ায় ATP রূপ শক্তির প্রয়োজন হয়। মূলে জল বিভব নতিমাত্রা এবং অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় জলের শোষণ উভয়ের জন্যই আয়নের সক্রিয় শোষণ আংশিকভাবে দায়ী। কিছু আয়ন আবার নিষ্ক্রিয়ভাবে বহিঃত্বকীয় কোশে প্রবেশ করে।

মৃত্তিকা থেকে আয়নের শোষণ নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় উভয় প্রকার পরিবহণ পদ্ধতিতেই ঘটে থাকে। মূলরোমের কোশ পর্দায় উপস্থিত সুনির্দিষ্ট প্রোটিনসমূহ, মৃত্তিকা থেকে বহিঃত্বকীয় কোশের সাইটোপ্লাজমে সক্রিয়ভাবে আয়নের উৎক্ষেপণ ঘটায়। অন্য সব কোশের মত বহিঃত্বকীয় কোশের প্লাজমা পর্দায়ও অনেক পরিবাহী প্রোটিন নিহিত থাকে যার মাধ্যমে পর্দার মধ্য দিয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট দ্রাবই অতিক্রম করে। সব দ্রাব পর্দা অতিক্রম করতে পারে না। অন্তঃত্বকীয় কোশে উপস্থিত পরিবাহী প্রোটিনসমূহ হল নিয়ন্ত্রক স্থান (Control point) যার মাধ্যমে উদ্ভিদ জাইলেমে পরিবাহিত দ্রাবের মাত্রা ও দ্রাবের প্রকৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। এখানে জেনে রাখা দরকার যে মূলের অন্তঃত্বকে সুবেরিন স্তরের উপস্থিতির কারণে অন্তঃত্বকের আয়নের একমুখী সক্রিয় পরিবহন ঘটাতে সক্ষম।

11.5.2 খনিজ আয়নের পরিবহণ (Translocation of Mineral Ions)

সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় শোষণ বা এই দুইয়ের সংযোগে আয়নসমূহের জাইলেমে পৌঁছানোর পর, উদ্ভিদ কাণ্ড সহ সব অংশে এর পুনরায় ঊর্ধ্বমুখী পরিবহণ বাষ্পমোচন স্রোতের মাধ্যমে ঘটে।

খনিজ উপাদানের মুখ্য সিঙ্কগুলো (Sink) হল উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঞ্চলসমূহ, যেমন অগ্রস্থ এবং পার্শ্বস্থ ভাজক কলা, কচি পাতা, বৃদ্ধিরত পুষ্প, ফল ও বীজ এবং সঞ্চয়ী অঙ্গগুলো। সূক্ষ্ম শিরাপ্রান্তের মাধ্যমে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় এবং এইসব কোশ দ্বারা সক্রিয় শোষনের ফলে খনিজ আয়ন মুক্ত হয়।

বিশেষত উদ্ভিদের পুরোনো, জরাগ্রস্থ অংশ থেকে খনিজ আয়নসমূহের ঘন ঘন পুনঃপ্রবাহ ঘটে। পুরোনো মৃতপ্রায় পাতাগুলো তাদের খনিজ উপাদানের বেশিরভাগই কচি পাতায় স্থানান্তরিত করে। একইভাবে, পর্ণমোচী উদ্ভিদে পত্রমোচনের পূর্বে খনিজ পদার্থগুলোর উদ্ভিদের অন্যান্য অংশে স্থানান্তরণ ঘটে। খুব সহজে স্থানান্তরণে সক্ষম কিছু খনিজ উপাদান হল ফসফরাস, সালফার, নাইট্রোজেন এবং পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়ামের মতো কিছু মৌল যেগুলো গাঠনিক উপাদান হিসাবে কাজ করে এদের পুনঃস্থানান্তরন ঘটে না।

জাইলেম থেকে ক্ষরিত পদার্থের বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন অজৈব আয়নরূপে পরিবাহিত হলেও এর বেশিরভাগটাই জৈব যৌগ যেমন অ্যামাইনো অ্যাসিড ও অন্যান্য সম্পর্কিত যৌগ হিসাবে পরিবাহিত হয়। একইভাবে, স্বল্প পরিমাণ P এবং S জৈব যৌগ হিসাবে পরিবাহিত হয়। এছাড়াও জাইলেম এবং ফ্লোয়েমের মধ্যেও স্বল্প পরিমাণে কিছু পদার্থের বিনিময় ঘটে। তাই প্রচলিত ধারণার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারিনা যে জাইলেম শুধুমাত্র অজৈব পরিপোষক এবং ফ্লোয়েম শুধুমাত্র জৈব পদার্থই পরিবহণ করে এবং এর ভিত্তিতে জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যে পার্থক্যও নিরূপণ করা যায় না।

11.6 ফ্লোয়েমের মাধ্যমে পরিবহণ : উৎস থেকে সিঙ্কের অভিমুখে প্রবাহ (Phloem Transport : Flow From Source To Sink)

নালিকা বান্ডিলের ফ্লোয়েমের মাধ্যমে উৎস (Source) থেকে সিঙ্কের (Sink) অভিমুখে খাদ্য হিসাবে প্রাথমিকভাবে সুক্রোজ পরিবাহীত হয়। সাধারণত উৎস বলতে উদ্ভিদের সেই সব অংশকে বোঝায় যেখানে খাদ্যবস্তু সংশ্লেষিত হয় — অর্থাৎ, পাতা এবং সিঙ্ক (Sink) হল সেই সব অংশ যেখানে খাদ্যের প্রয়োজন হয় এবং খাদ্য সঞ্চিত হয়। কিন্তু ঋতুর ভিত্তিতে বা উদ্ভিদের চাহিদার ভিত্তিতে উৎস এবং সিঙ্ক উল্টে যেতে পারে। বসন্তের শুরুতে মূলে সঞ্চিত শর্করা খাদ্য হিসাবে বৃক্ষের মুকুলে স্থানান্তরিত হতে পারে; মুকুল অংশটি তখন সিঙ্ক হিসাবে কাজ করে। সালোকসংশ্লেষীয় অঙ্গের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। যেহেতু উৎস-সিঙ্ক সম্পর্ক পরিবর্তনশীল হওয়ায় ফ্লোয়েমের মাধ্যমে পরিবহণের অভিমুখ ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী অর্থাৎ উভয়মুখীই হতে পারে। এর বিপরীতে জাইলেমের মাধ্যমে পরিবহণ সর্বদা একমুখী অর্থাৎ ঊর্ধ্বমুখী হয়। অতএব, বাষ্পমোচনকালে জলের একমুখী প্রবাহের মতো না হয়ে ফ্লোয়েম কলার রসের মাধ্যমে উৎস থেকে শর্করা সিঙ্কের যে দিকে ব্যবহার, সঞ্চয় বা অপসারণ প্রয়োজন সেই দিকে পরিবহণ হয়।

ফ্লোয়েম রসে মুখ্যত রয়েছে জল ও সুক্রোজ, কিন্তু অন্যান্য শর্করা, হরমোন এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডও ফ্লোয়েমের মাধ্যমে পরিবাহিত হয় (Translocation)

11.6.1 চাপ প্রবাহ বা ভর প্রবাহ প্রকল্প (The pressure Flow or Mass Flow Hypothesis)

উৎস থেকে সিঙ্ক অঞ্চলে শর্করা স্থানান্তনের সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতিটি হল চাপ প্রবাহ প্রকল্প (Pressure Flow Hypothesis) (চিত্র 11.10 দেখ)। উৎসস্থলে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ সংশ্লেষিত হওয়ায় এটি সুক্রোজে (দ্বিশর্করায়) পরিণত হয়। এরপর সুক্রোজরূপে এই শর্করা সক্রিয় পরিবহণের মাধ্যমে সঙ্গীকোশে এবং তারপর সেখান থেকে ফ্লোয়েমের সীভনল কোশে পরিবাহিত হয়। এইভাবে উৎসস্থলে সুক্রোজ জমা জমা হওয়ার ফলে ফ্লোয়েমে একটি অতিসারক অবস্থার সৃষ্টি হয়। সংলগ্ন জাইলেম থেকে জল অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় ফ্লোয়েমে প্রবেশ করে। অভিস্রবণ চাপ গড়ে ওঠার ফলে ফ্লোয়েম রস নিম্ন চাপযুক্ত অঞ্চলের দিকে বাহিত হবে। তবে এক্ষেত্রে সিঙ্ক অঞ্চলে অভিস্রবণ চাপ অবশ্যই কমতে হবে। ফ্লোয়েম রস থেকে সুক্রোজের নির্গমন এবং সেই সাথে এর কোশে প্রবেশের জন্য আবারও সক্রিয় পরিবহণের প্রয়োজন হয়। এরপর কোশের ভেতরে এই শর্করা শক্তি উৎপাদন এবং স্টার্চ বা সেলুলোজে রূপান্তনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ফ্লোয়েম থেকে শর্করার অপসারণ ঘটায় অভিস্রবণ চাপ হ্রাস পায় এবং এর থেকে জল বেরিয়ে যায়।

সংক্ষেপে বলা যায়, ফ্লোয়েমে শর্করার প্রবেশ উৎস অঞ্চলে শুরু হয়, যেখানে শর্করা সীভনলে প্রবেশ করে (সক্রিয় পরিবহণ)। ফ্লোয়েমে শর্করা জমা হয়ে জল-বিভবের নতিমাত্রা স্থাপন করে, যা ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়ে ভর প্রবাহকে সহজতর করে।

ফ্লোয়েম কলা সীভনল কোশ দ্বারা গঠিত, যেখানে কোশগুলো একটি দীর্ঘ নল গঠন করে এবং এদের প্রান্ত-প্রাকার ছিদ্রযুক্ত হয়। সীভনলের ছিদ্রযুক্ত এই প্রান্ত-প্রাকারকে সীভপ্লেট বলে। সাইটোপ্লাজমীয় তন্তু সীভপ্লেটের ছিদ্রগুলোর মধ্যে দিয়ে বিস্তৃত থেকে নিরবিচ্ছিন্ন তন্তু গঠন করে। ফ্লোয়েমের সীভনলে জলস্ফীতি চাপ বা উদস্থৈতিক (hydrostatic) চাপ বৃদ্ধি পেলে চাপ প্রবাহের সূত্রপাত হয় এবং ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়ে খাদ্যরসের চলন ঘটে। এরই মধ্যে সিঙ্ক অঞ্চলে ফ্লোয়েম বাহিত শর্করাগুলো সক্রিয় পরিবহণ পদ্ধতিতে ফ্লোয়েম থেকে জটিল শর্করা হিসেবে অপসারিত হয়। ফ্লোয়েম থেকে দ্রাবের (শর্করা) নির্গমন ফ্লোয়েমে উচ্চ জল-বিভব সৃষ্টি করে এবং এর ফলে ফ্লোয়েম থেকে জল নির্গত হয়ে পুনরায় জাইলেমে প্রবেশ করে।

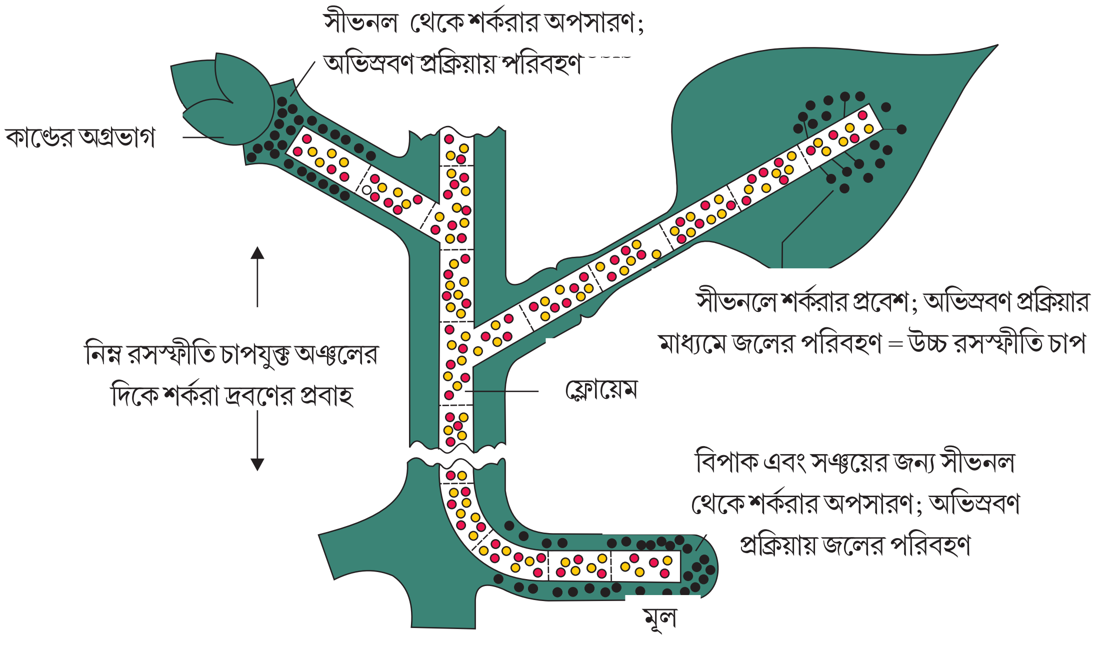

চিত্র 11.10 খাদ্যরসের সংবহন পদ্ধতির চিত্ররূপ উপস্থাপনা।

গার্ডলিং (Girdling) পরীক্ষা নামে পরিচিত একটি সরল পরীক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভিদদেহে খাদ্য পরিবহনকারী কলার শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়েছিল। এই পরীক্ষার জন্য একটি বৃক্ষের কাণ্ড থেকে ফ্লোয়েম স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত বাকলের একটি বলয় সতর্কতার সাথে কেটে নেওয়া যেতে পারে। কয়েক সপ্তাহ পর দেখা গেল খাদ্যের নিম্নমুখী পরিবহণের অনুপস্থিতির কারণে কাণ্ডটির ঠিক উপরের বাকলের অংশটি স্ফীত হয়ে উঠে। এই সরল পরীক্ষণটি থেকে বোঝা যায় যে ফ্লোয়েম কলাই খাদ্য সংবহনের জন্য দায়ী এবং এই পরিবহণ একমুখী অর্থাৎ উদ্ভিদের মূলের অভিমুখে ঘটে। তোমরা সহজেই এই পরীক্ষাটি করতে পারবে।

সারাংশ

উদ্ভিদ তাদের চারপাশ থেকে বিশেষত জল ও মাটি থেকে বিভিন্ন ধরনের অজৈব উপাদানগুলো (আয়ন) এবং খনিজ লবণ শোষণ করে থাকে। পরিবেশ থেকে উদ্ভিদে এবং পাশাপাশি একটি উদ্ভিদ কোশ থেকে অন্য উদ্ভিদ কোশে এইসব পরিপোষকের পরিবহণ আবশ্যিকভাবে কোশপর্দার মাধ্যমে ঘটে। কোশ পর্দার মধ্য দিয়ে পরিপোষকের পরিবহণ ব্যাপন, সহায়ক পরিবহণ বা সক্রিয় পরিবহণের মাধ্যমে ঘটতে পারে। মূল দ্বারা শোষিত জল ও খনিজ লবণ জাইলেমের মাধ্যমে পরিবাহিত হয় এবং পাতায় সংশ্লেষিত জৈব পদার্থ ফ্লোয়েমের মাধ্যমে উদ্ভিদের অন্যান্য অংশে পরিবাহিত হয়।

সজীব বস্তুতে কোশপর্দার মাধ্যমে পরিপোষক পরিবহণের দুটি উপায় হল নিষ্ক্রিয় পরিবহণ ও সক্রিয় পরিবহণ। নিষ্ক্রিয় পরিবহণে কোশপর্দার মধ্য দিয়ে পরিপোষকের চলন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ঘটে। এই পরিবহণ সর্বদা ঘনত্বের নতিমাত্রার সপক্ষে ঘটায় এই ক্ষেত্রে কোনো শক্তি ব্যবহৃত হয় না। অতএব প্রক্রিয়াটি এনট্রপি (entropy) চালিত। পদার্থের এই ব্যাপন তাদের আকার, জল বা জৈব দ্রাবকে দ্রাব্যতার উপর নির্ভর করে। অভিস্রবণ হল একটি অর্ধভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে জলের বিশেষ ধরনের ব্যাপন যা চাপের নতিমাত্রা ও ঘনত্বের নতিমাত্রার উপর নির্ভর করে। সক্রিয় পরিবহণের ক্ষেত্রে পর্দার মধ্য দিয়ে ঘনত্বের নতিমাত্রার বিপক্ষে অণুগুলোকে পাম্প করার জন্য ATP রূপে শক্তি ব্যবহৃত হয়। জল-বিভব হল জলের সেই বিভব শক্তি যা জলের পরিবহণে সহায়তা করে। দ্রাব বিভব এবং চাপ বিভব দ্বারা এটি নির্ধারিত হয়। কোশের আচরণ তার পারিপার্শ্বিক দ্রবণের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যদি কোশের পারিপার্শ্বিক দ্রবণটি অতিসারক হয় তাহলে কোশটির প্রোটোপ্লাজমের কুঞ্চন ঘটবে। বীজ এবং শুকনো কাঠ দ্বারা জলের শোষণ এক বিশেষ ধরনের ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে। একে আত্মভূতি (Imbibition) বলে।

উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে জল ও খাদ্যরসের স্থানান্তরণের জন্য জাইলেম ও ফ্লোয়েম দ্বারা গঠিত সংবহনতন্ত্র বর্তমান। শুধুমাত্র ব্যাপন প্রক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভিদদেহের অভ্যন্তরে জল, খনিজ এবং খাদ্য পরিবাহিত হতে পারে না। অতএব, এগুলো পরিবাহিত হয় দলবদ্ধ প্রবাহতন্ত্রের মাধ্যমে — দুটি স্থানের মধ্যে চাপের পার্থক্যের ফলে, দলবদ্ধভাবে বস্তুগুলোর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহণ ঘটে।

মূলরোম দ্বারা শোষিত জল দুটি সুনির্দিষ্ট পথ অর্থাৎ অ্যাপোপ্লাস্ট ও সিমপ্লাস্টের মাধ্যমে মূলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মূলজ চাপের ফলে মৃত্তিকা থেকে বিভিন্ন আয়ন ও জল কাণ্ডের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় পরিবাহিত হয়। বাষ্পমোচন টান মডেল (Transpiration pull model) জলের পরিবহণ পদ্ধতি বর্ণনার

জন্য সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতবাদ। বাষ্পমোচন হল উদ্ভিদ অঙ্গ থেকে পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বাষ্পরূপে জলের নির্গমন। তাপমাত্রা, আলো, আর্দ্রতা, বায়ু প্রবাহের গতি এবং পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা বাষ্পমোচনের হারকে প্রভাবিত করে। উদ্ভিদের পাতার অগ্রভাগের মাধ্যমে অতিরিক্ত জল নিঃস্রাবণ (Guttation) প্রক্রিয়ায় নির্গত হয়।

উৎস থেকে সিঙ্ক অঞ্চলে খাদ্য হিসাবে সুক্রোজের (প্রাথমিকভাবে) পরিবহণ, ফ্লোয়েমের মাধ্যমে ঘটে। ফ্লোয়েমের মাধ্যমে পরিবহণ একটি উভয়মুখী প্রক্রিয়া এবং খাদ্যরস পরিবহণের ক্ষেত্রে উৎসস্থল-সিঙ্ক সম্পর্কটি পরিবর্তনশীল হয়। চাপ প্রবাহ প্রকল্প দ্বারা ফ্লোয়েমের মাধ্যমে খাদ্যরসের পরিবহণ পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অনুশীলনী

1. ব্যাপনের হারের উপর প্রভাব বিস্তারকারী প্রভাবকগুলো কী কী?
2. পোরিন (Porin) কী? ব্যাপন প্রক্রিয়ায় এটি কী ভূমিকা পালন করে?
3. উদ্ভিদদেহে সক্রিয় পরিবহণকালে প্রোটিন পাম্প (Protein pump) কী ভূমিকা পালন করে তা বর্ণনা করো।
4. বিশুদ্ধ জলের জল-বিভব সর্বাধিক হয় কেন তা ব্যাখ্যা কর।
5. নিম্নলিখিত সমূহের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো :
   (ক) ব্যাপন ও অভিস্রবণ।
   (খ) বাষ্পমোচন ও বাষ্পীভবন।
   (গ) অভিস্রবণ চাপ ও অভিস্রবণ বিভব।
   (ঘ) আত্মভূতি ও ব্যাপন।
   (ঙ) উদ্ভিদে জল পরিবহনের অ্যাপোপ্লাস্ট ও সিমপ্লাস্ট পথ।
   (চ) নিঃস্রাবন ও বাষ্পমোচন।
6. সংক্ষেপে জল-বিভব বর্ণনা করো। এর প্রভাবকগুলো কী কী?
7. বিশুদ্ধ জল বা কোনো দ্রবণে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের তুলনায় অধিক চাপ প্রয়োগ করলে কী ঘটবে?
8. (ক) চিহ্নিত চিত্রের সাহায্যে উদ্ভিদদেহে সংঘটিত প্লাজমোলাইসিস প্রক্রিয়াটি উপযুক্ত উদাহরণ সহ বর্ণনা করো।
   (খ) একটি উদ্ভিদ কোশকে উচ্চ জলবিভবসম্পন্ন দ্রবণে রাখলে কী ঘটবে তা ব্যাখ্যা করো।
9. মাইকোরাইজা সমন্বিত সহাবস্থান উদ্ভিদদেহে জল ও খনিজ লবণ শোষণে কীভাবে সহায়ক হয়?
10. উদ্ভিদদেহে জল পরিবহণে মূলজ চাপ কী ভূমিকা পালন করে?
11. উদ্ভিদদেহে জল পরিবহণের জন্য দায়ী বাষ্পমোচন টান মডেলটি বর্ণনা করো। বাষ্পমোচনকে প্রভাবিত করে এমন প্রভাবকগুলো কী কী? উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি কীভাবে উপযোগী হয়?
12. উদ্ভিদদেহে জাইলেম রসের উর্দ্ধমুখী পরিবহনের জন্য দায়ী প্রভাবকগুলো কী কী তা আলোচনা করো।
13. উদ্ভিদদেহে খনিজ পদার্থের শোষণকালে মূলের অন্তঃত্বক কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?
14. কেন জাইলেম পরিবহণ একমুখী এবং ফ্লোয়েম পরিবহণ উভয়মুখী তা ব্যাখ্যা করো।
15. উদ্ভিদদেহে শর্করা পরিবহণের জন্য দায়ী চাপ প্রবাহ প্রকল্পটি ব্যাখ্যা করো।
16. বাষ্পমোচনকালে পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোশের খোলা ও বন্ধ হওয়ার কারণগুলো কী কী?

অধ্যায়-12 (Chapter-12)
খনিজ পুষ্টি (Mineral Nutrition)

12.1 উদ্ভিদে খনিজ পদার্থের চাহিদা অধ্যয়নের পদ্ধতি
12.2 অত্যাবশ্যক খনিজ মৌলসমূহ
12.3 মৌলসমূহের শোষণ পদ্ধতি
12.4 দ্রাবসমূহের স্থানান্তরণ
12.5 মাটি- অত্যাবশ্যকীয় মৌলসমূহের ভাণ্ডার
12.6 নাইট্রোজেন বিপাক

সব সজীব বস্তুর মৌলিক চাহিদাগুলো মূলত এক । তাদের বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট এবং জল ও খনিজ লবণের মতো বৃহৎ অণুসমূহের প্রয়োজন হয়।

এই অধ্যায়ে মূখ্যত অজৈব উদ্ভিদ পরিপোষককে কেন্দ্রবিন্দু করা হয়েছে, যেখানে তুমি উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং বিকাশের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের চিহ্নিতকরণের পদ্বতিগুলো সম্বন্ধে এবং অপরিহার্যতা নির্ধারণের শর্তগুলো সম্বন্ধে পড়বে। তুমি অত্যাবশ্যক মৌল উপাদানগুলোর ভূমিকা, তাদের মুখ্য অভাবজনিত লক্ষণসমূহ এবং এই সকল অত্যাবশ্যক মৌল উপাদানের শোষন পদ্ধতি সম্বন্ধেও অধ্যয়ন করবে। এই অধ্যায়ে জীবজ নাইট্রোজেন সংবন্ধনের পদ্ধতি এবং এর তাৎপর্য সম্বন্ধেও সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

12.1 উদ্ভিদে খনিজ পদার্থের চাহিদা অধ্যয়নের পদ্ধতি (Methods To study The Mineral Requirements of plants)

1860 সালে, বিশিষ্ট জার্মান উদ্ভিদবিদ Julius Von Sachs, সর্বপ্রথম প্রদর্শন করেন যে উদ্ভিদকে তার পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত একটি জ্ঞাত পরিপোষকের দ্রবণে রেখে মাটির সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে বৃদ্ধি করা যায়। পরিপোষক দ্রবণে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটানোর এই কৌশলকে জল অনুশীলন পরীক্ষা (Hydroponics) বলে। তখন থেকে উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় পরিপোষকের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের জন্য একাধিক উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। এই সকল পদ্ধতির সারাংশের মধ্যে রয়েছে, মৃত্তিকাবিহীন জ্ঞাত খনিজ পরিপোষক দ্রবণে উদ্ভিদের পালন। এই পদ্ধতিগুলোর জন্য পরিশোধিত জল এবং খনিজ পরিপোষক লবণ প্রয়োজন। তুমি কি ব্যাখ্যা করতে পারবে যে এটি এতটা অত্যাবশ্যক কেন?

একটি ধারাবাহিক পরীক্ষার পর যেখানে পরিপোষক দ্রবণে উদ্ভিদের মূলগুলোকে নিমজ্জিত রেখে এবং এর মধ্যে একটি মৌলিক পদার্থ যোগ করে /বাদ দিয়ে বা ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বে প্রয়োগ করে উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য অনুকূল একটি খনিজ-দ্রবণ তৈরি করা হয়েছে। এই পদ্ধতির দ্বারা অত্যাবশ্যকীয় মৌল উপাদানগুলোকে চিহ্নিত করা গিয়েছিল এবং তাদের অভাবজনিত লক্ষণগুলোও আবিষ্কৃত হয়েছিল।

টমেটো, বীজবিহীন শসা এবং লেটুসের মতো বিভিন্ন সব্জি বাণিজ্যিক উৎপাদনের একটি কৌশল হিসাবে জল অনুশীলন পরীক্ষা (Hydroponics) সফলভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। উদ্ভিদের সর্বাধিক বৃদ্ধির জন্য পুষ্টি দ্রবণ পর্যাপ্তভাবে বায়ু-সম্পৃক্ত রাখার উপর অবশ্যই গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। দ্রবণটিতে পর্যাপ্ত বায়ুর পরিমাণ কম থাকলে কী ঘটবে? জল অনুশীলন পরীক্ষা পদ্ধতির চিত্ররূপ চিত্র 12.1 এবং 12.2-তে দেখানো হয়েছে।

চিত্র 12.1 পরিপোষক দ্রবণ পালন মাধ্যমের আদর্শ ব্যবস্থাপনার চিত্ররূপ।

12.2 অত্যাবশ্যক খনিজ মৌলসমূহ (Essential Mineral Elements)

মৃত্তিকাস্থিত বেশিরভাগ খনিজগুলোই মূলের মাধ্যমে উদ্ভিদে প্রবেশ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত 105 টি মৌলের মধ্যে 60 এর অধিক মৌলই বিভিন্ন উদ্ভিদে পাওয়া যায়। কিছু উদ্ভিদ প্রজাতি তাদের দেহে সেলেনিয়াম (Selenium) এবং অন্য কিছু উদ্ভিদ প্রজাতি তাদের দেহে স্বর্ণ জমা করে। আবার যে সমস্ত উদ্ভিদেরা পারমাণবিক বোমা পরীক্ষণ স্থানের কাছাকাছি জন্মায় সেই উদ্ভিদগুলো তেজস্ক্রিয় স্ট্রোনটিয়াম নিজেদের দেহে শোষণ করে। এমন কিছু কৌশলও রয়েছে যার সাহায্যে খনিজকে (10^{-8} g/ml) অত্যন্ত কম ঘনত্বে শনাক্ত করা যায়। প্রশ্ন হল, উদ্ভিদে উপস্থিত এই সকল বৈচিত্র খনিজ মৌলগুলো যেমন-স্বর্ণ এবং সেলেনিয়াম যা উপরে বর্ণিত হয়েছে সত্যিই কি প্রয়োজনীয়? আমরা কীভাবে নির্ধারণ করব যে উদ্ভিদের জন্য কোন্‌টি অত্যাবশ্যকীয় এবং কোন্‌টি অত্যাবশ্যকীয় নয়?

12.2.1 অপরিহার্যতার শর্ত (Criteria for essentiality)

কোনো মৌলের অপরিহার্যতার শর্তগুলো নিম্নে দেওয়া হল:

(ক) মৌলটি উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং প্রজননে সহায়তা প্রদানের জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় হতে হবে। মৌলটির অনুপস্থিতিতে উদ্ভিদ তার জীবনচক্র সম্পূর্ণ করতে পারবে না বা বীজ উৎপাদন করতে পারবে না।

(খ) মৌলটির চাহিদা অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হতে হবে এবং এটি অন্য কোনো মৌল দ্বারা প্রতিস্থাপনযোগ্য হবে না। অন্যভাবে বললে কোনো একটি মৌলের ঘাটতি অন্য মৌল সরবরাহের দ্বারা পূরণ করা যাবে না।

(গ) মৌলটি অবশ্যই উদ্ভিদের বিপাকক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত থাকবে।

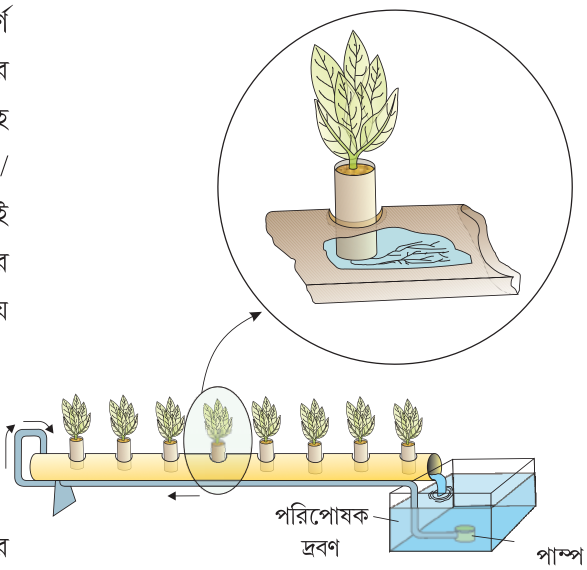

চিত্র 12.2 হাইড্রোপনিক্স দ্বারা উদ্ভিদ সৃষ্টি। উদ্ভিদকে একটি টেস্ট টিউবে বা কিছুটা হেলানো অবস্থায় রাখা ঢাকনাহীন সরু লম্বা পাত্রে রেখে বৃদ্ধি করা হয়। একটি পাম্পের সাহায্যে পরিপোষক দ্রবণের আধার থেকে পরীক্ষানলের উপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিপোষক দ্রবণের সংবহন ঘটে। এই দ্রবণটি টিউবের মাধ্যমে নীচের দিকে পরিবাহিত হয় এবং অভিকর্ষের প্রভাবে আধারে ফিরে আসে। সন্নিবেশিত চিত্র (inset) দেখায় যে এই ব্যবস্থায় রাখা উদ্ভিদের মূল প্রতিনিয়ত বাতান্বিত পরিপোষক দ্রবণ দ্বারা স্নাত হয়। তিরচিহ্নগুলো দ্রবণ প্রবাহের অভিমুখ নির্দেশ করছে।

উপরিউক্ত মানদণ্ডের নিরিখে কেবলমাত্র অল্প কয়েকটি মৌলই উদ্ভিদের এবং বিপাকক্রিয়ার জন্য সম্পূর্ণভাবে আবশ্যক মৌল হিসাবে পাওয়া গেছে। পরিমাণগত চাহিদার ভিত্তিতে সেগুলোকে পুনরায় দুটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

(i) অতিমাত্রিক পরিপোষক (Macronutrients) এবং

(ii) স্বল্পমাত্রিক পরিপোষক (Micronutrients)

অতিমাত্রিক পরিপোষকগুলো উদ্ভিদকলায় সাধারণত প্রচুর পরিমাণে থাকে (প্রতি kg শুষ্ক পদার্থে 10m mole-এর বেশি)। অতিমাত্রিক পরিপোষকের মধ্যে রয়েছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম। এগুলোর মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন মুখ্যত CO_2 এবং H_2O থেকে পাওয়া যেখানে অন্যগুলো মৃত্তিকা থেকে খনিজ পরিপোষক হিসাবে শোষিত হয়। স্বল্পমাত্রিক পরিপোষক খুব কম পরিমাণে প্রয়োজন হয় (প্রতি kg শুষ্ক পদার্থে 10 m mole- এর কম)। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, কপার, মলিবডেনাম, জিঙ্ক, বোরন, ক্লোরিন এবং নিকেল।

উপরে উল্লিখিত 17 টি অত্যাবশ্যক মৌল ছাড়াও আরও কিছু উপযোগী মৌল রয়েছে যেমন- সোডিয়াম, সিলিকন,কোবাল্ট, এবং সেলেনিয়াম। এগুলো উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদের জন্য আবশ্যক।

অত্যাবশ্যক মৌলগুলোকে তাদের বিবিধ কার্যের ভিত্তিতে চারটি বৃহৎ গোষ্ঠীতেও বিভক্ত করা হয়। এই গোষ্ঠীগুলো হল:

(i) অত্যাবশ্যক মৌলগুলো যা জৈব অণুসমূহের উপাদান এবং তাই এরা কোশের গঠনগত মৌল (যেমন-কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন)।

(ii) এই গোষ্ঠীভুক্ত অত্যাবশ্যক মৌল উদ্ভিদে শক্তি উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত রাসায়নিক যৌগের উপাদান (যেমন-ক্লোরোফিলে উপস্থিত ম্যাগনেসিয়াম এবং ATP তে উপস্থিত ফসফরাস)।

(iii) এই গোষ্ঠীভুক্ত অত্যাবশ্যক মৌল যা উৎসেচককে সক্রিয় করে বা এর কাজে বাধাদান করে, উদাহরণস্বরূপ, রাইবিউলোজ বিস ফসফেট কার্বোক্সিলেজ- অক্সিজিনেজ এবং ফসফোএনোল পাইরুভেট কার্বোক্সিলেজ উভয়েরই সক্রিয়ক হল Mg^{2+}, এরা উভয়েই সালোকসংশ্লেষ কালে কার্বন আবদ্ধকরণের প্রয়োজনীয় উৎসেচক। Zn^{2+} অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজের সক্রিয়ক এবং নাইট্রোজেন বিপাককালে Mo হল নাইট্রোজিনেজের সক্রিয়ক। তোমরা কি আরও বেশ কিছু মৌলের নাম বলতে পারবে? এর জন্য তোমাদের পূর্বে পড়া কিছু জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়াপথগুলো মনে করা প্রয়োজন।

(iv) এই গোষ্ঠীভুক্ত কিছু অত্যাবশ্যক মৌল কোশের অভিস্রবণ বিভবের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। পত্ররন্ধ্রের খোলা এবং বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে পটাশিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তোমরা হয়ত একটি কোশের জল বিভব নির্ণয়ে দ্রাব হিসাবে ব্যবহৃত খনিজের ভূমিকা মনে করতে পার।

12.2.2 অতিমাত্রিক এবং স্বল্পমাত্রিক পরিপোষকের ভূমিকা (Role of Macro and Micro-nutrients)

অত্যাবশ্যকীয় মৌলসমূহ বিবিধ কার্য সম্পাদন করে। এগুলো উদ্ভিদ কোশে বিভিন্ন বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে যেমন কোশপর্দার ভেদ্যতা, কোশরসের অভিস্রবণীয় গাঢ়ত্ব বজায় রাখা, ইলেকট্রন পরিবহণতন্ত্র,

বাফার ক্রিয়া, উৎসেচকের ক্রিয়া এবং ম্যাক্রোমলিকিউল ও কো-উৎসেচকের মুখ্য গাঠনিক উপাদান হিসাবে কাজ করে ।

অত্যাবশ্যকীয় পরিপোষক মৌলের বিভিন্ন ধরন ও কার্যসমূহ নিম্নে দেওয়া হল।

নাইট্রোজেন: এই অত্যাবশ্যক পরিপোষক মৌলটি সর্বাধিক পরিমাণে উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয়। এটি মুখ্যত NO^-_3 হিসাবে শোষিত হয় যদিও কিছু আবার NO^-_2 বা NH^+_4 হিসাবেও শোষিত হয়। উদ্ভিদের সকল অংশে, বিশেষত ভাজক কলায় এবং বিপাকীয়ভাবে সক্রিয় কোশসমূহে নাইট্রোজেন প্রয়োজন হয়। নাইট্রোজেন হল প্রোটিন , নিউক্লিক অ্যাসিড, ভিটামিন এবং হরমোনের একটি মুখ্য গাঠনিক উপাদান।

ফসফরাস: ফসফরাস মাটি থেকে উদ্ভিদ দ্বারা ফসফেট আয়রন (H_2PO_4 অথবা HPO_4^{2-}) রূপে শোষিত হয়। ফসফরাস হল কোশপর্দার, কিছু প্রোটিনের, সকল নিউক্লিক অ্যাসিডের এবং নিউক্লিওটাইডের গাঠনিক উপাদান এবং সকল ফসফোরাইলেসন বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয়।

পটাশিয়াম: পটাশিয়াম আয়ন ($K+$) রূপে শোষিত হয়। উদ্ভিদের ভাজক কলায়, মুকুলে, পাতায় এবং মূলাগ্রে এটি আরও অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয়। পটাশিয়াম কোশের অ্যানায়ান- ক্যাটায়নের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং প্রোটিন সংশ্লেষ, পত্ররন্ধ্রের উন্মোচনে ও বন্ধে, উৎসেচকের সক্রিয়তায় ও কোশের রসস্ফীতি বজায় রাখতে অংশগ্রহণ করে।

ক্যালসিয়াম: উদ্ভিদ মাটি থেকে ক্যালসিয়াম আয়নরূপে (Ca^{2+}) ক্যালসিয়াম শোষণ করে। ভাজক কলা এবং বিভেদনশীল কলায় ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হয়। কোশ বিভাজনকালে কোশ প্রাচীর সংশ্লেষে এটি ব্যবহত হয়, বিশেষত ক্যালসিয়াম পেকটেট হিসাবে মিডল ল্যামেলায় ব্যবহৃত হয়। মাইটোটিক বেমতন্তু তৈরির সময়ও মধ্যচ্ছদায় এর প্রয়োজন হয়। পুরোনো পাতায় এই মৌলটি জমা হয় । কোশপর্দার স্বাভাবিক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এটি কোনো কোনো উৎসেচককে সক্রিয় করে এবং বিপাকীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ম্যাগনেসিয়াম : এই খনিজ মৌলটি উদ্ভিদে ডাইভেলেন্ট Mg^{2+} রূপে শোষিত হয়। এটি শ্বসনের, সালোকসংশ্লেষের উৎসেচকসমূহকে সক্রিয় করে এবং DNA ও RNA সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে। ম্যাগনেসিয়াম হল ক্লোরোফিলের বলয়াকার গঠনের একটি উপাদান এবং এটি রাইবোজোমের গঠন বজায় রাখতে সহায়তা করে।

সালফার : উদ্ভিদ সালফারকে সালফেট (SO_4^{2-}) রূপে গ্রহণ করে। সালফার দুটি অ্যামাইনো অ্যাসিড সিস্টিন এবং মিথিওনিনে উপস্থিত থাকে এবং এই মৌলটি বিভিন্ন কো-এনজাইম, ভিটামিন (থায়ামিন, বায়োটিন, কোএনজাইম A) ও ফেরিডক্সিনের মুখ্য গাঠনিক উপাদান।

আয়রন: উদ্ভিদ ফেরিক আয়ন ($Fe^{3}+$) রূপে আয়রন গ্রহণ করে। অন্যান্য স্বল্পমাত্রিক পরিপোষকের তুলনায় অধিক পরিমাণে এর প্রয়োজন হয়। এই মৌলটি ফেরিডক্সিন ও সাইটোক্রোমের মত ইলেকট্রন বাহক প্রোটিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইলেকট্রন পরিবহণকালে এটি উভমুখী জারনের মাধ্যমে $Fe^{2}+$ থেকে Fe^{3+} তৈরি করে। এই মৌলটি ক্যাটালেজ উৎসেচককে সক্রিয় করে এবং ক্লোরোফিল তৈরির জন্য আবশ্যক।

ম্যাঙ্গানিজ: এই মৌলটি ম্যাঙ্গানাস আয়ন ($Mn^{2}+$) রূপে শোষিত হয়। এটি সালোকসংশ্লেষ, শ্বসন এবং নাইট্রোজেন বিপাকের সাথে যুক্ত বহু উৎসেচককে সক্রিয় করে। ম্যাঙ্গানিজের সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কার্য হল সালোকসংশ্লেষকালে জলের বিশ্লেষণ ঘটিয়ে অক্সিজেন মুক্ত করা ।

জিঙ্ক: উদ্ভিদ জিঙ্ক আয়ন (Zn^{2+}) হিসাবে জিঙ্ক সংগ্রহ করে। এটি বিভিন্ন উৎসেচক বিশেষত কার্বোক্সিলেজকে সক্রিয় করে। অক্সিন সংশ্লেষেও এর প্রয়োজন হয়।

কপার: এই মৌলটি কিউপ্রিক আয়ন ($Cu^{2}+$) রূপে শোষিত হয়। এটি উদ্ভিদের সার্বিক বিপাকক্রিয়ার জন্য আবশ্যক ।আয়রনের মতো কপারও রেডক্স বিক্রিয়ার সাথে জড়িত কোনো কোনো উৎসেচকের সাথে যুক্ত এবং এটি Cu^{+} থেকে Cu^{2+} এ উভয়মুখী জারণ ঘটায়।

বোরন: এই মৌলটি BO_3^{3-}, $B_4O_7^{2-}$হিসাবে শোষিত হয়। Ca^{2+} এর শোষণ এবং ব্যবহারের কোশপর্দার কার্যকারীতায়, পরাগরেণুর অঙ্কুরনে, কোশের দির্ঘীকরণ, কোশের বিভেদীকরণ এবং কার্বোহাইড্রেট স্থানান্তরণে বোরনের প্রয়োজন হয়।

মলিবডেনাম: উদ্ভিদ মলিবডেনামকে মলিবডেট আয়নরূপে (MO_2^{2+}) সংগ্রহ করে। এটি বিভিন্ন উৎসেচক যেমন নাইট্রোজিনেজ এবং নাইট্রেট রিডাকটেজের উপাদান ।এই উভয় উৎসেচকই নাইট্রোজেন বিপাকে অংশগ্রহণ করে।

ক্লোরিন: এই মৌলটি ক্লোরাইড অ্যানায়ন (Cl^{-}) রূপে শোষিত হয়। Na^{+} এবং K^{+} - এর সাথে এটিও কোশে দ্রাবের ঘনত্ব নির্ণয়ে ও অ্যানায়ন- ক্যাটায়নের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এটি সালোকসংশ্লেষকালে জলের বিশ্লেষণ বিক্রিয়ার জন্য আবশ্যক, যার ফলে অক্সিজেনের মুক্তি ঘটে।

12.2.3 অত্যাবশ্যকীয় মৌলের অভাবজনিত লক্ষণসমূহ (Deficiency symptoms of essential Elements)

যখন অত্যাবশ্যকীয় মৌলের সরবরাহ সীমিত হয়ে যায়, তখন উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অত্যাবশ্যকীয় মৌলগুলোর যে ঘনত্বমাত্রার নীচে থাকলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় সেটিকে সংকট ঘনত্ব (critical concentration) বলে। যখন কোনো মৌলের ঘনত্ব সংকট ঘনত্ব থেকে কম হয় তখন মৌলটির ঘাটতি রয়েছে বলা যায়।

যেহেতু উদ্ভিদদেহে প্রতিটি মৌলকে এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট গঠনগত বা কার্যগত ভূমিকা পালন করতে হয় তাই যেকোনো বিশেষ মৌলের অনুপস্থিতিতে উদ্ভিদদেহে নির্দিষ্ট অঙ্গাসংস্থানিক পরিবর্তন দেখা যায়। এই অঙ্গাসংস্থানিক পরিবর্তনসমূহ নির্দিষ্ট মৌলের ঘাটতিকে নির্দেশ করে এবং এই পরিবর্তনসমূহকে অভাববজনিত লক্ষণ বলা হয়। এই অভাবজনিত লক্ষণগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং যে খনিজ পরিপোষকটির ঘাটতি রয়েছে উদ্ভিদটিকে সেটি সরবরাহ করলে ঘাটতিজনিত লক্ষণগুলোর অবলুপ্তি ঘটে। তবে যদি উদ্ভিদে কোনো খনিজ পরিপোষকের ঘাটতি পরিপূরণ না হয়ে থেকেই যায় তাহলে এর পরিণামে উদ্ভিদটির মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। উদ্ভিদদেহের অংশগুলোতে দৃশ্যমান অভাবজনিত লক্ষণগুলো ওই উদ্ভিদদেহে মৌলটির চলাচলের উপরও নির্ভর করে। যে সব মৌলগুলো সক্রিয়ভাবে উদ্ভিদদেহে চলাচল করে এবং তরুণ বর্ধনশীল কলায় প্রেরিত হয় সেই অভাবজনিত লক্ষণগুলো প্রথম পুরোনো কলায় আর্বিভূত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায় ।উদাহরণস্বরূপ , নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণসমূহ সর্বপ্রথম বার্ধক্যগ্রস্থ পাতায় দেখা যায়। পুরোনো পাতায়, এই মৌলসমন্বিত জৈব অণুগুলো ভেঙে যায় এবং এর ফলে তরুণ পাতায় সঞ্চালনের জন্য এই মৌলগুলো সহজলভ্য হয়।

অভাবজনিত লক্ষণসমূহ সর্বপ্রথম তরুণ কলায় আবির্ভূত হওয়ার প্রবণতা তখনই দেখা দেয় যখন মৌলগুলো তুলনামূলকভাবে নিশ্চল হয়ে পড়ে এবং পরিণত অঙ্গাসমূহ পরিবাহিত হয় না, উদাহরণস্বরূপ সালফার ও ক্যালসিয়ামের মতো মৌল কোশের গঠনগত উপাদানের একটি অংশ এবং তাই এরা সহজেই মুক্ত হয়। উদ্ভিদের খনিজ পুষ্টি সংক্রান্ত এই বৈশিষ্ট্যটি কৃষিকার্য ও উদ্যান-পালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

উদ্ভিদদেহে যেসকল অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে— ক্লোরোসিস, নেক্রোসিস, বাধাপ্রাপ্ত উদ্ভিদ-বৃদ্ধি, পত্র ও মুকুলের অকাল-মোচন এবং কোশ বিভাজন রোধ। ক্লোরোসিস হল ক্লোরোফিলের ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটা যার ফলে পাতা হলুদ বর্ণের হয়ে যায়। এই লক্ষণটির কারণ হল N, K, Mg, S, Fe, Mn, Zn এবং Mo মৌলের অভাব , অনুরূপভাবে, নেক্রোসিস বা কলার মৃত্যু, বিশেষত পত্র কলার Ca, Mg, CU, K এগুলোর ঘাটতির ফলে ঘটে। N,K,S, Mo- এর অভাব বা নিম্নমাত্রা কোশ বিভাজনে বাধাপ্রাপ্তির কারণ । N, S, Mo এর মতো কিছু মৌলের ঘনত্ব স্বাভাবিক ঘনত্বের তুলনায় কম হলে উদ্ভিদদেহে পুষ্পোদ্গম বিলম্বিত হয়।

উপরিউক্ত অংশ থেকে তোমরা দেখতে পার যে কোনো মৌলের অভাব বহুবিধ লক্ষণের কারণ হতে পারে এবং একই লক্ষণসমূহ এক বা একাধিক বহু বিভিন্ন মৌলের মধ্যে একটির ঘাটতির কারণেও ঘটতে পারে । সুতরাং, যে মৌলটির ঘাটতি রয়েছে তার শনাক্তকরণের জন্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে সৃষ্ট সব অভাবজনিত লক্ষণগুলোকে অধ্যয়ন করতে হবে এবং এদের সহজলভ্য আদর্শ সারণির সাথে তুলনা করতে হবে। আমাদের এই বিষয়েও অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে যে একই মৌলের ঘাটতিতে বিভিন্ন উদ্ভিদ বিভিন্ন ভাবে সাড়া দেয়।

12.2.4 স্বল্পমাত্রিক পরিপোষকের বিষাক্ততা (Toxicity of Micronutrients)

স্বল্পমাত্রিক পরিপোষকের চাহিদা সব সময়ই কম পরিমাণে থাকে । কখনও কখনও সেগুলোর পরিমাণ স্বল্পমাত্রায় হ্রাস পেলে অভাবজনিত লক্ষণগুলো এবং স্বল্পমাত্রায় বৃদ্ধি পেলে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অন্যভাবে বললে, ঘনত্ব মাত্রার সংকীর্ণ পরিসরেই মৌলগুলো সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হয়। কলায় উপস্থিত যেকোনো খনিজ আয়নের ঘনত্ব যা সেই কলার শুষ্ক ওজন প্রায় 10 শতাংশ কমিয়ে দিতে পারে তাকে সেই কলার জন্য বিষাক্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। এধরনের সংকট ঘনত্ব বিভিন্ন স্বল্পমাত্রিক পরিপোষকের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ভিন্ন ভিন্ন হয়। বিষক্রিয়ার লক্ষণগুলোকে শনাক্ত করা খুবই কঠিন। কোনো মৌলের বিষক্রিয়ার মাত্রাও ভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ভিন্ন হয়। অনেক সময় কোনো মৌলের মাত্রাধিক্য অন্য মৌলের শোষণে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ম্যাঙ্গানিজ বিষক্রিয়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ হল ক্লোরোটিক শিরা পরিবেষ্টিত বাদামি দাগের আর্বিভাব । এটি জেনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ম্যাঙ্গানিজ উদ্ভিদদেহে গৃহীত হওয়ার জন্য আয়রন এবং মাগনেসিয়ামের সাথে তৎসহ উৎসেচকের সাথে ম্যাগনেসিয়াম যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করে। কাণ্ডের অগ্রভাগে ক্যালশিয়ামের স্থানান্তরণে ম্যাঙ্গানিজ বাধাদান করে, সুতরাং ম্যাঙ্গানিজের মাত্রাধিক্য আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, এবং ক্যালসিয়ামের অভাবকে উদ্দীপিত করে। অর্থাৎ ম্যাঙ্গানিজ বিষক্রিয়ার লক্ষণ হিসাবে যা দেখা যায় সেগুলো আসলে আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্যালশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ। একজন চাষি, একজন মালি বা তোমাদের কাছে কিচেন গার্ডেনের জন্য এই জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তো?

12.3 মৌলের শোষণ পদ্ধতি (Mechanism of Absorption of Elements)

উদ্ভিদ দ্বারা মৌলের শোষণ পদ্ধতি অধ্যয়নের বেশিরভাগই ঘটানো হয়েছে পৃথকীকৃত কোশে, কলায় বা অঙ্গে । এই সকল অধ্যয়ন থেকে দেখা যায় যে শোষণের পদ্ধতিকে দুটি মুখ্য দশায় বিভক্ত করা যায়।

প্রথম দশায়, কোশের মুক্ত স্থানে বা বহিঃস্থানে প্রাথমিক ভাবে আয়নের দ্রুত শোষণ - অ্যানোপ্লাস্ট ঘটে, যা হল নিষ্ক্রিয় পদ্ধতি। শোষণের দ্বিতীয় দশায়, আয়নসমূহ ধীর গতিতে কোশের অভ্যন্তরীণ স্থানে গৃহীত হয় - সিমপ্লাস্ট। অ্যাপোপ্লাস্টে আয়নের নিষ্ক্রিয় পরিবহণ সাধারণত সম্পন্ন হয় আয়ন চ্যানেল ও ট্রান্সমেমব্রেন প্রোটিনের মাধ্যমে যা প্রভেদক ছিদ্র হিসাবে কাজ করে। অন্য দিকে, সিমপ্লাস্টে আয়নের প্রবেশ বা নির্গমনে বিপাকীয় শক্তি খরচের প্রয়োজন পড়ে, এটি হল একটি সক্রিয় পদ্ধতি। আয়নের চলাচলকে সাধারণত ফ্লাক্স বা প্রবহন বলা হয়; কোশের ভেতরের দিকে আয়নের চলাচলকে বলা হয় অন্তঃপ্রবহণ (influx) এবং বাইরের দিকে চলাচলকে বলা হয় বহিঃপ্রবহণ (efflux)। উদ্ভিদে খনিজ পরিপোষকের শোষণ ও পরিবহন বিষয়ে তোমরা একাদশ অধ্যায়ে পড়েছ।

12.4 দ্রাবের পরিবহণ (Translocation of Solutes)

খনিজ লবণসমূহ জল প্রবাহের সাথে জাইলেমের মাধ্যমে উর্ধ্বমুখে পরিবাহিত হয়। এই উত্তোলন উদ্ভিদে বাষ্পমোচন টানের ফলে ঘটে। জাইলেম রসের বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে খনিজ লবণের উপস্থিতি দেখা যায়। খনিজ মৌলের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার থেকেও এই অভিমতটি প্রমাণিত হয়েছে যে জাইলেমের মাধ্যমে দ্রাবের পরিবহণ ঘটে। জাইলেমের মাধ্যমে জলের পরিবহণ সম্পর্কে তোমরা ইতিমধ্যেই একাদশ অধ্যায়ে পড়েছ।

12.5 মাটি: অত্যাবশ্যক মৌলের ভাণ্ডার (Soil As Reservoir of Essential Elements)

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বেশিরভাগ পরিপোষকই আবহবিকার এবং শিলার ভাঙনের মাধ্যমে মূলের কাছে পৌঁছায়। এই সকল পদ্ধতিসমূহ মৃত্তিকাকে দ্রবীভূত আয়ন এবং অজৈব লবণে সমৃদ্ধ করে। যেহেতু এগুলো শিলা খনিজ থেকে পাওয়া যায়, তাই উদ্ভিদ পরিপোষণে এদের ভূমিকা খনিজ পরিপোষক হিসাবে গণ্য হয়। মৃত্তিকা বিভিন্ন ধরনের পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। মৃত্তিকা শুধুমাত্র খনিজ পদার্থই সরবরাহ করে না উপরন্তু তা নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটিরিয়া, অন্যান্য আণুবীক্ষণিক জীবদেরও আশ্রয় দেয়, জল ধরে রাখে, মূলে বায়ুর যোগান দেয় এবং ধাত্র হিসাবে কাজ করে যা উদ্ভিদকে সুস্থিত রাখে। যেহেতু অত্যাবশ্যক খনিজের অভাব ফসল উৎপাদনকে প্রভাবিত করে তাই প্রায়শই সারের মাধ্যমে এই খনিজগুলো সরবরাহ করার প্রয়োজন। স্বল্পমাত্রিক পরিপোষক (Cu,Zn, Fe, Mn ইত্যাদি) এবং অতিমাত্রিক পরিপোষক (N,P, K, S ইত্যাদি) উভয়ই সারের উপাদান এবং এগুলো প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহৃত হয়।

12.6 নাইট্রোজেন বিপাক (Metabolism of Nitrogen)

12.6.1 নাইট্রোজেন চক্র (Nitrogen Cycle)

কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের ছাড়া নাইট্রোজেন হল সজীব বস্তুতে থাকা সবচেয়ে বেশি প্রভাবকারী মৌল। নাইট্রোজেন অ্যামাইনো অ্যাসিড, প্রোটিন, হরমোন, ক্লোরোফিল এবং বহু ভিটামিনের গঠনগত উপাদান। মাটিতে সীমিত নাইট্রোজেনের উপস্থিতির কারণে উদ্ভিদ অণুজীবের সাথে প্রতিযোগিতা করে।

তাই প্রাকৃতিক এবং কৃষিকার্য ভিত্তিক বাস্তুতন্ত্র উভয়ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন হল একটি সীমাস্থ পরিপোষক। নাইট্রোজেন অণুগুলো খুবই শক্তিশালী তিনটি সমযোজী বন্ধনী দ্বারা যুক্ত দুটি নাইট্রোজেন পরমাণু (N≡N)। যে প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন (N_2) অ্যামোনিয়ায় রূপান্তরিত হয় তাকে নাইট্রোজেন সংবন্ধন বলে। প্রকৃতিতে বজ্রবিদ্যুৎ এবং অতিবেগুনী রশ্মি নাইট্রোজেনকে নাইট্রোজেনের অক্সাইডে (NO, NO_2, N_2O) রূপান্তরিত হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত শক্তির জোগান দেয়। কারখানায় দহন, দাবানল, যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া এবং শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রও হল বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহের উৎস। মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহস্থিত জৈব নাইট্রোজেন যৌগের বিয়োজনের মাধ্যমে অ্যামোনিয়া যৌগে পরিণত হওয়াকে অ্যামোনিফিকেশন বলে। এই অ্যামোনিয়া যৌগের কিছু অংশ বাষ্পে পরিণত হয়ে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। কিন্তু এর বেশিরভাগ অংশ মৃত্তিকাস্থিত ব্যাকটিরিয়ার প্রভাবে নিম্নলিখিত ধাপে নাইট্রোজেন যৌগে রূপান্তরিত হয়।

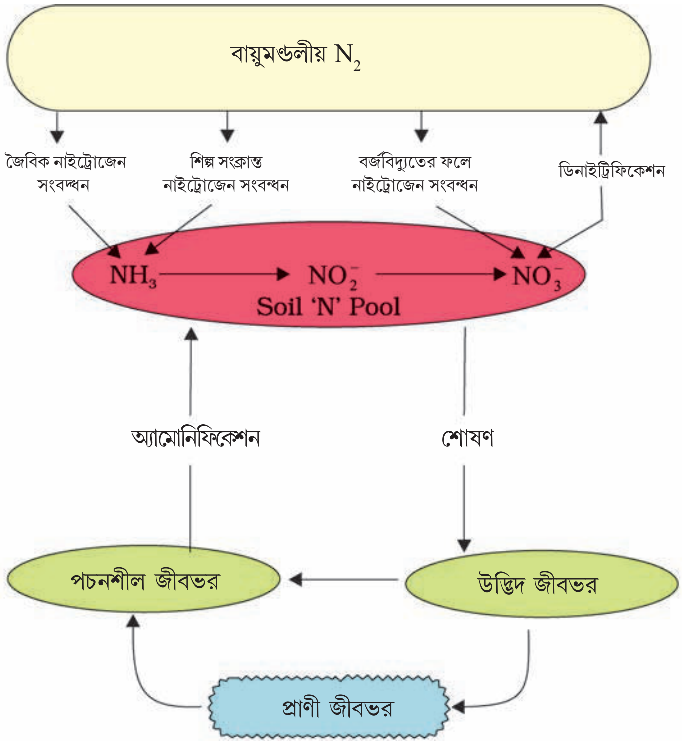

চিত্র 12.3 নাইট্রোজেন চক্র যেখানে তিনটি মুখ্য নাইট্রোজেন পুল- বায়ুমণ্ডল, মৃত্তিকা এবং জীবভরের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

$$2NH_3 + 3O_2 \longrightarrow 2NO_2^- + 2H^+ + 2H_2O \quad \text{..... (i)}$$

$$2NO_2^- + O_2 \longrightarrow 2NO_3^- \quad \text{...... (ii)}$$

নাইট্রোসোমোনাস এবং / অথবা নাইট্রোকক্কাস ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে অ্যামোনিয়া জারিত হয়ে নাইট্রাইট গঠন করে। এই নাইট্রাইট নাইট্রোব্যাক্টর ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যেপুনরায় জারিত হয়ে নাইট্রেট গঠন করে। এই ধাপগুলোকে বলা হয় নাইট্রিফিকেশন (চিত্র 12.3)। এই সকল নাইট্রিফায়িং ব্যাকটিরিয়া হল রাসায়নিক সংশ্লেষকারী (Chemoautotrophs)।

এইভাবে উৎপন্ন নাইট্রেট উদ্ভিদ দ্বারা শোষিত হয় এবং পাতায় পরিবাহিত হয়। পাতায় এটি বিজারিত হয়ে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে যা শেষ পর্যন্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডের অ্যামাইন গ্রুপ গঠন করে। ডিনাইট্রিফিকেশন পদ্ধতির মাধ্যমে মৃত্তিকাস্থিত নাইট্রেটও বিজারিত হয়ে নাইট্রোজেনে পরিণত হয়। ডিনাইট্রিফিকেশন পদ্ধতিটি সিউডোমোনাস এবং থায়োবেসিলাস ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে ঘটে।

12.6.2 জীবজ নাইট্রোজেন সংবন্ধন (Biological Nitrogen Fixation)

খুব কম সজীব বস্তুই বায়ুতে পর্যাপ্ত পরিমাণে উপস্থিত মুক্ত নাইট্রোজেনকে ব্যবহার করতে পারে। শুধুমাত্র কিছু প্রোক্যারিওটিক প্রজাতিই নাইট্রোজেন সংবন্ধনে সক্ষম।

সজীব বস্তুর সাহায্যে নাইট্রোজেন বিজারিত হয়ে অ্যামোনিয়া তৈরির প্রক্রিয়াকে জীবজ নাইট্রোজেন সংবন্ধন বলে। নাইট্রোজেন বিজারণকারী নাইট্রোজিনেজ উৎসেচকটি কেবলমাত্র প্রোক্যারিওটিক জীবেই বর্তমান। এই ধরনের অনুজীবকে বলা হয় N_2 সংবন্ধনকারী।

$$N \equiv N \xrightarrow{\text{নাইট্রোজিনেজ}} NH_3$$

নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী অণুজীবগুলো স্বাধীনজীবী বা মিথোজীবী হতে পারে। স্বাধীনজীবী নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী বায়ুজীবী অণুজীবের উদাহরণ হল *Azotobater* এবং *Beijernickia*, অপরদিকে *Rhodospirillum* হল অবায়ুজীবী এবং *Bacillus* স্বাধীনজীবী। এছাড়া *Anabaena* এবং *Nostoc* এর মতো বেশ কিছু সায়ানো ব্যাকটিরিয়া হল স্বাধীনভাবে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে।

মিথোজীবীয় জীবজ নাইট্রোজেন সংবন্ধন (Symbiotic biological nitrogen fixation)

বিভিন্ন ধরনের মিথোজীবীয় জীবজ নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী সমন্বয় সম্পর্কে আমরা জানি। এদের মধ্যে সবচাইতে সুস্পষ্ট সমন্বয়টি হল শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদ - ব্যাকটিরিয়ার সম্পর্ক। দণ্ডাকৃতি রাইজোবিয়াম প্রজাতির, বেশ কিছু শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদ যেমন আলফা আলফা, সুইট ক্লোভার, মটর, মুসুর, বিন, ত্রিপত্রবিশিষ্ট শিম ইত্যাদির মূলের সাথে এই ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করে। অর্বুদরূপেই উদ্ভিদের মূলে সচরাচর সবচেয়ে বেশি সমন্বয় গঠিত হয়। এই অর্বুদগুলো মূলের ক্ষুদ্র উপবৃদ্ধি। *Frankia* নামক অণুজীব অ-শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদ (যেমন- Alnus) -এর মূলে নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী অর্বুদ গঠন করে । *Rhizobium* এবং *Frankia* উভয়ই মৃত্তিকায় স্বাধীনজীবীরূপে থাকে কিন্তু মিথোজীবীরূপে থেকে বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনকে আবদ্ধ করতে পারে। পুষ্পোদ্গমের ঠিক পূর্বে মূলসহ একটি সাধারণ ডালজাতীয় উদ্ভিদকে মাটি থেকে তুলে নাও, তুমি মূলের উপর প্রায় গোলকাকৃতি উপবৃদ্ধিগুলো দেখতে পাবে। এগুলোই হল অর্বুদ। যদি তুমি এগুলোকে মাঝ বরাবর কাটো তাহলে লাল বা গোলাপি বর্ণের কেন্দ্রীয় অংশটি দেখতে পাবে। অবুর্দগুলো গোলাপি বর্ণের হয় কেন? অর্বুদে লিগোমিনাস হিমোগ্লোবিন বা লেগ হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতিই এর কারণ।

অর্বুদ গঠন (Nodule Formation)

অর্বুদ গঠনকালে রাইজোবিয়াম এবং পোষক উদ্ভিদের মূলের মধ্যে বহুবিধ পর্যায়ক্রমিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে। অর্বুদ গঠনের মূখ্য দশাগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হল:

রাইজোবিয়াম সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়ে মূলের চারিদিকে কলোনি গঠন করে এবং বহিঃত্বক ও মূলরোমের কোশের সাথে যুক্ত হয়। ফলে মূলরোম বেঁকে যায় এবং ব্যাকটিরিয়া মূলরোমের ভিতরে প্রবেশ করে । এরপর একটি সংক্রমণ সূত্র গঠিত হয় যা ব্যাকটিয়াকে বহন করে মূলের কর্টেক্সে নিয়ে যায় এবং এরা মূলের কর্টেক্সের অর্বুদ গঠনের সূচনা করে। এরপর সংক্রমণ সূত্র থেকে ব্যাকটিরিয়া কোশের অভ্যন্তরে মুক্ত হয়, যেগুলো বিশেষিত নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী কোশের বিভেদিকরণ ঘটায়। এইভাবে সৃষ্ট অর্বুদগুলো পোষকের সাথে পরিপোষকের আদান-প্রদানের জন্য একটি প্রত্যক্ষ সংবহনে সহায়ক সংযোগ স্থাপন করে। এই সব ঘটনাবলি চিত্র 12.4 তে বর্ণনা করা হয়েছে।

অর্বুদের মধ্যে সব প্রয়োজনীয় জৈবরাসায়নিক উপাদানগুলো যেমন নাইট্রোজিনেজ উৎসেচক এবং লেগ হিমোগ্লোবিন বর্তমান। নাইট্রোজিনেজ উৎসেচকটি হল একটি Mo-Fe প্রোটিন এবং এটি বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনের অ্যামোনিয়ার রূপান্তরকালে (চিত্র12.5) অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। আমোনিয়া হল নাইট্রোজেন সংবন্ধনের ফলে উৎপন্ন প্রথম স্থায়ী উৎপন্ন পদার্থ।

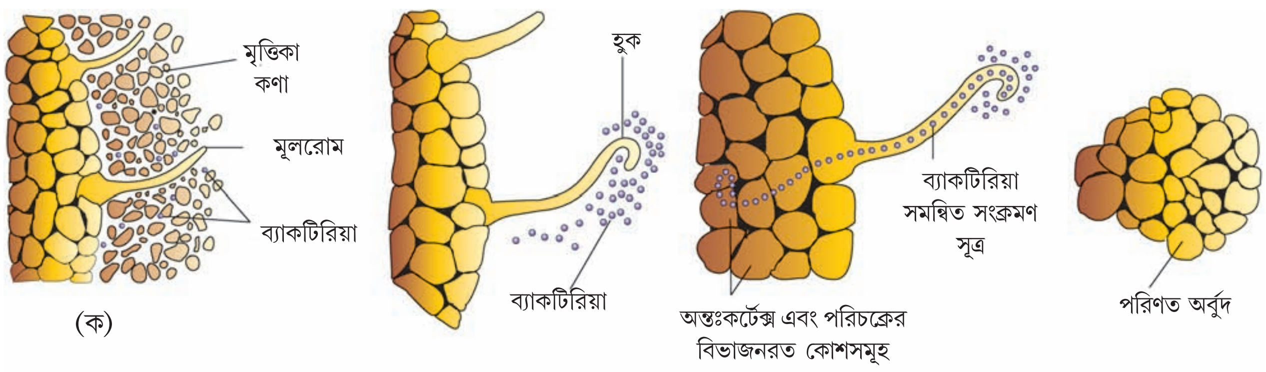

চিত্র 12.4 সয়াবিনের মূলে অর্বুদ গঠন : (ক) রাইজোবিয়াম ব্যাকটিরিয়া একটি সংক্রমণযোগ্য মূলরোমের সংস্পর্শে আসে এবং এর সন্নিকটে বিভাজিত হয় (খ) মূলরোমে সফল সংক্রমণ ঘটার ফলে এটি বেঁকে যায় (গ) সংক্রমণ সূত্র মূলের অন্তকর্টেক্সে ব্যাকটিরিয়া বহন করে নিয়ে যায়। ব্যাকটিরিয়া দণ্ডাকৃতি ব্যাক্টিরিওয়েড-এ রূপান্তরিত হয় এবং অন্তকর্টেক্স ও পরিচক্রের কোশগুলোর বিভাজন ঘটায়। কর্টেক্স ও পরিচক্রের কোশগুলোর বিভাজন ও বৃদ্ধির ফলে অর্বুদ গঠিত হয়। (ঘ) উদ্ভিদের মূলে একটি পরিণত অর্বুদের গঠন মূলের সাথে নিরবচ্ছিন্ন সংবহন কলা তৈরির মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয়।

বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

$$N_2 + 8e^- + 8H^+ + 16ATP \longrightarrow 2NH_3 + H_2 + 16ADP + 16P_i$$

নাইট্রোজিনেজ উৎসেচকটি অক্সিজেন অণুর প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং যার ক্রিয়ার জন্য অবাত পরিবেশের প্রয়োজন হয়। অর্বুদসমূহের অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য অক্সিজেনের হাত থেকে উৎসেচকের সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করে। এই উৎসেচকগুলোর সুরক্ষার জন্য অবুর্দের মধ্যে এক ধরনের অক্সিজেন অপসারণকারী পদার্থ থাকে, একে লেগ্‌হিমোগ্লোবিন বলে। মজার বিষয় এই যে এই সকল অণুজীব স্বাধীনজীবী অবস্থায় সবাত ব্যাকটিরিয়া হিসাবে বসবাস করে (যেখানে নাইট্রোজিনেজ কাজ করে না), কিন্তু নাইট্রোজেন সংবন্ধনকালে তারা অবাত ব্যাকটিরিয়ায় পরিণত হয় (এভাবে নাইট্রোজিনেজ উৎসেচকটিকে সুরক্ষিত করে)। উপরে উল্লিখিত বিক্রিয়াটিতে তুমি নিশ্চয় লক্ষ করেছ যে নাইট্রোজিনেজ-এর প্রভাবে অ্যামোনিয়া সংশ্লেষের জন্য প্রচুর শক্তির (প্রতি অণু NH_3 তৈরিতে 8 অণু ATP) প্রয়োজন।

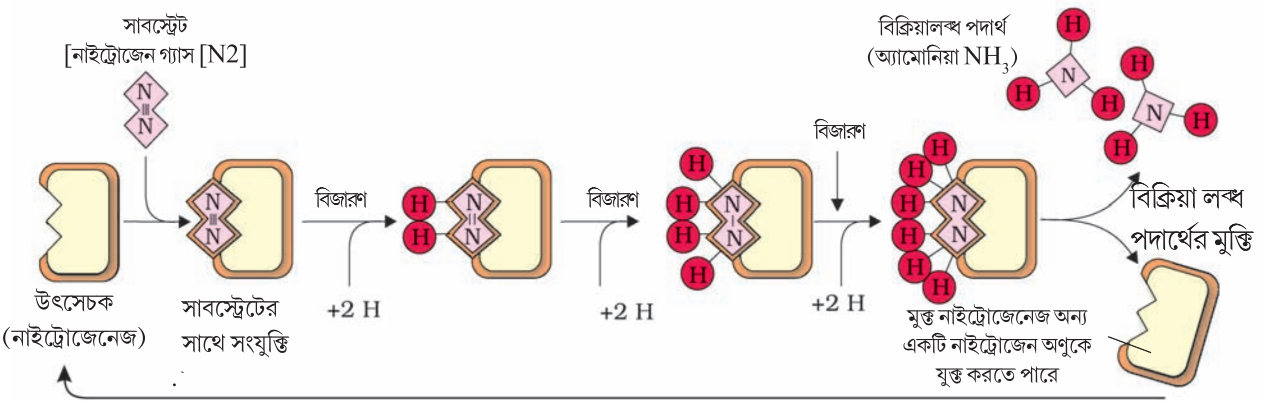

চিত্র: 12.5 নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটিরিয়ায় উপস্থিত নাইট্রোজেনেজ উৎসেচক যৌগ দ্বারা বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়ায় রূপান্তরের ধাপসমূহ।

এই প্রয়োজনীয় শক্তি পোষক কোশের শ্বসনের ফলে উৎপন্ন শক্তি থেকে গৃহীত হয়।

অ্যামোনিয়ার পরিণতি : শারীরবৃত্তীয় P^H এ অ্যামোনিয়া প্রোটন গ্রহণের মাধ্যমে NH_4+ (অ্যামোনিয়াম) আয়নে পরিণত হয়। বেশিরভাগ উদ্ভিদ নাইট্রেট-এর পাশাপাশি অ্যামোনিয়াম আয়ন আত্তিকরণ করলেও পরেরটি অর্থাৎ অ্যামোনিয়াম আয়নটি উদ্ভিদের পক্ষে অত্যন্ত বিষাক্ত হয় এবং তা এটি উদ্ভিদদেহে জমা হতে পারে না। চলো আমরা এখন দেখি, উদ্ভিদে কীভাবে NH_4 অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষে ব্যবহৃত হয়। এটি দুটি মুখ্য পদ্ধতিতে ঘটাতে পারে :

(i) রিডাকটিভ অ্যামাইনেশন (reductive amination)- এই প্রক্রিয়াগুলোতে অ্যামোনিয়া α কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে এবং গ্লুটামিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে, যেমনটা নীচের সমীকরণে দেখানো হয়েছে।

$$\alpha - \text{ কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড } + NH_4^+ + NADPH \xrightarrow[\text{ডিহাইড্রোজিনেজ}]{\text{গ্লুটামেট}} \text{গ্লুটামেট} + H_2O + NADP$$

(II) অ্যামাইনো মূলকের স্থানান্তরণ (transamination) - এই পদ্ধতিতে একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে অ্যামাইনো গ্রুপটি একটি কিটো অ্যাসিডে এবং এই কিটো অ্যাসিডটি থেকে কিটো গ্রুপটি অ্যামাইনো অ্যাসিডে স্থানান্তরিত হয়। গ্লুটামিক অ্যাসিড হল মুখ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড যার অ্যামাইনো মূলকের (NH_2) স্থানান্তরণ ঘটে এবং ট্রান্সঅ্যামাইনেশনের মাধ্যমে অন্যান্য অ্যামাইনো অ্যাসিডসমূহ গঠিত হয়। ট্রান্সঅ্যামাইনেজ উৎসেচক এই ধরনের সকল বিক্রিয়াসমূহের অনুঘটন ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ,

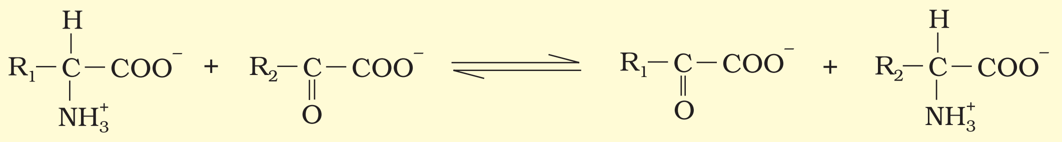

অ্যামাইনো মূলক-দাতা অ্যামাইনো মূলক-গ্রহিতা

অ্যাসপারাজিন ও গ্লুটামিন হল উদ্ভিদদেহে প্রাপ্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যামাইড এবং এগুলো হল প্রোটিনের গঠনগত অংশ। এই অ্যামাইডগুলো যথাক্রমে অ্যাসপারটিক অ্যাসিড ও গ্লুটামিক অ্যাসিড নামক দুটি অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে প্রতিটিতে আরও একটি অ্যামাইনো গ্রুপের সংযুক্তির মাধ্যমে তৈরি হয়। অ্যাসিডের হাইড্রোক্সিল অংশটি অন্য একটি NH_2 মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। যেহেতু অ্যামাইডে অ্যামাইনোর অ্যাসিডের তুলনায় অধিক নাইট্রোজেন থাকে তাই এরা জাইলেম বাহিকার মাধ্যমে উদ্ভিদের অন্যান্য অংশে পরিবাহিত হয়। এছাড়া কিছু উদ্ভিদের (যেমন-সয়াবিন) অর্বুদগুলো আবদ্ধ নাইট্রোজেনকে ইউরাইড রূপে বাষ্পমোচন ক্রিয়ায় নির্গত বাষ্পের সাথে দেহ থেকে বের করে দেয়। এই যৌগগুলোতে বিশেষ করে উচ্চ নাইট্রোজেন-কার্বন অনুপাতও দেখা যায়।

সারসংক্ষেপ

উদ্ভিদ তাদের অজৈব পরিপোষক বায়ু, জল এবং মাটি থেকে গ্রহণ করে । উদ্ভিদরা বিভিন্ন ধরনের খনিজ মৌল শোষণ করে থাকে। উদ্ভিদের শোষিত খনিজের সবগুলোই এদের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত 105- টিরও অধিক মৌলের মধ্যে, 21 টিরও কম মৌল উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য উপযোগী এবং আবশ্যক। যে সকল মৌল অধিকমাত্রায় প্রয়োজন হয় সেগুলোকে অতিমাত্রিক পরিপোষক বলা হয় এবং যেগুলো স্বল্প মাত্রায় প্রয়োজন হয় সেগুলোকে স্বল্পমাত্রিক পরিপোষক বলে। এই সকল মৌল হয় প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, নিউক্লিক অ্যাসিড ইত্যাদির আবশ্যক গঠনগত উপাদান এবং এরা বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এই সকল অত্যাবশ্যক মৌলের যেকোনোটির ঘাটতির জন্য উদ্ভিদদেহে কিছু লক্ষণ দেখা দিতে পারে এবং এগুলোকে অভাবজনিত লক্ষণ বলে। ক্লোরোসিস, ন্যাক্রোসিস, বাধাপ্রাপ্ত বৃদ্ধি কোশ বিভাজনে বিঘ্ন ঘটা ইত্যাদি হল কিছু সুস্পষ্ট অভাবজনিত লক্ষণ ।

উদ্ভিদ মূলে মাধ্যমে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় পদ্ধতিতে খনিজ মৌল শোষণ করে। এই শোষিত মৌলগুলো জাইলেম বাহিকার মাধ্যমে জলের সাথে উদ্ভিদের সব অংশে পরিবাহিত হয়।

জীবনের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে নাইট্রোজেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে সরাসরি ব্যবহার করতে পারে না। কিন্তু কিছু উদ্ভিদ নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটিরিয়ার সাথে যুক্ত থেকে, বিশেষ করে শিম্ব-গোত্রীয় উদ্ভিদের মূল, বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে জীবদেহে ব্যবহার উপযোগী নাইট্রোজেন যৌগরূপে আবদ্ধ করতে পারে। নাইট্রোজেন সংবন্ধনে শক্তিশালী বিজারক দ্রব্য এবং ATP রূপে শক্তির প্রয়োজন হয়। নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু, মুখ্যত রাইজোবিয়ামের সাহায্যে নাইট্রোজেন সংবন্ধন সম্পন্ন হয়। জীবজ নাইট্রোজেন সংবন্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী নাইট্রোজিনেজ উৎসেচক অক্সিজেনের প্রতি খুবই সংবেদনশীল হয়। বেশিরভাগ প্রক্রিয়াগুলো অবাত পরিবেশে ঘটে। এই প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পোষক কোশে সংঘটিত শ্বসনের ফলে উৎপন্ন ATP থেকে সরবরাহ হয়। নাইট্রোজেন সংবন্ধনে উৎপন্ন অ্যামোনিয়া, অ্যামাইনো গ্রুপ হিসাবে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলোতে অঙ্গীভূত হয়।

অনুশীলনী (Exercises)

1. 'উদ্ভিদে উপস্থিত সকল মৌলই তার বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যক নয়', -মন্তব্য করো।
2. হাইড্রোপোনিকস্ পদ্ধতিতে পরিপোষকের ভূমিকা অধ্যয়নে, জল ও খনিজ লবণের বিশুদ্ধিকরণ গুরুত্বপূর্ণ কেন?
3. উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো: অতিমাত্রিক পরিপোষক, স্বল্পমাত্রিক পরিপোষক, উপকারী পরিপোষক, বিষাক্ত মৌলসমূহ, অত্যাবশ্যক মৌলসমূহ।
4. উদ্ভিদদেহে পরিলক্ষিত অভাবজনিত লক্ষণসমূহের মধ্যে অন্তত পাঁচটি উল্লেখ করো। এগুলো ব্যাখ্যা কর এবং কোন্ খনিজের ঘাটতির সাথে তা সম্পর্কিত লিখো।
5. যদি একটি উদ্ভিদে একাধিক পরিপোষকের অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায়, তবে তুমি পরীক্ষার সাহায্যে কীভাবে তা বের করবে যে কোন্ মৌলটির প্রকৃত ঘাটতি রয়েছে?
6. নির্দিষ্ট উদ্ভিদে অভাবজনিত লক্ষণসমূহ প্রথমে উদ্ভিদের তরুণ অংশে দেখা দেয় যেখানে অন্য কিছু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তা পরিণত অঙ্গে দেখা যায়-কেন?
7. উদ্ভিদ কীভাবে খনিজ মৌল উপাদানসমূহ শোষণ করে?
8. রাইজোবিয়াম দ্বারা বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন সংবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলো কী কী? নাইট্রোজেন সংবন্ধনে এদের ভূমিকা কী?
9. একটি মূলে অর্বুদ সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত ধাপগুলো কী কী?
10. নিম্নলিখিত উক্তিগুলোর মধ্যে কোন্গুলো সত্যি? যদি মিথ্যা হয়, তবে সংশোধন করো।
    a) বোরনের অভাব স্থূলকায় কাণ্ডের সৃষ্টি করে।
    b) কোশে উপস্থিত প্রতিটি খনিজ মৌল কোশের জন্য প্রয়োজনীয়।
    c) উদ্ভিদে পরিপোষক মৌল হিসাবে নাইট্রোজেন একেবারে গতিহীন।
    d) স্বল্পমাত্রিক পরিপোষকের আবশ্যিকতা নির্ধারণ করা খুবই সহজ কারণ এগুলো খুবই কম মাত্রায় প্রয়োজন হয়।

অধ্যায় — 13 (Chapter - 13)
উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষ
(Photosynthesis in Higher Plants)

13.1. আমরা কী জানি?
13.2. গোড়ার দিকের পরীক্ষা নিরীক্ষাসমূহ
13.3. সালোকসংশ্লেষ কোথায় ঘটে?
13.4. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কতগুলো রঞ্জক অংশগ্রহণ করে?
13.5. আলোক বিক্রিয়া কী?
13.6. ইলেকট্রন পরিবহণ
13.7. ATP এবং NADPH কোথায় ব্যবহৃত হয়?
13.8. C_4 বিক্রিয়াপথ
13.9. আলোক শ্বসন
13.10. সালোকসংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবকসমূহ

মানুষসহ সব প্রাণীরাই তাদের খাদ্যের জন্য উদ্ভিদদের উপর নির্ভরশীল। তোমরা কখনও ভেবে দেখেছ কি কোথা থেকে উদ্ভিদ তাদের খাদ্য পায়? আসলে সবুজ উদ্ভিদদের তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য তৈরি বা সংশ্লেষ করতে হয় এবং বাকী সব জীব তাদের খাদ্যের জন্য সবুজ উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। সবুজ উদ্ভিদরা সৌরশক্তি ব্যবহার করে একটি ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে জৈব খাদ্য সংশ্লেষ করে। সবশেষে বলা যায়, পৃথিবীর সব সজীব বস্তুই শক্তির জন্য সূর্যালোকের উপর নির্ভরশীল। সালোকসংশ্লেষ কালে উদ্ভিদ কর্তৃক ব্যবহৃত সৌরশক্তিই হল পৃথিবীতে জীবনের মূল ভিত্তি। যে দুটি কারণে সালোক সংশ্লেষ গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হল — এটি পৃথিবীর সব খাদ্যের প্রাথমিক উৎস। সবুজ উদ্ভিদ পরিবেশে যে অক্সিজেন ত্যাগ করে তার জন্যও এই প্রক্রিয়াটি দায়ী। **তুমি কখনও ভেবে দেখেছ কি শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেন না পেলে কী হতে পারে?** এই অধ্যায়ে মূলত সালোকসংশ্লেষীয় যন্ত্রপাতি এবং সৌরশক্তির রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরণে সহায়ক বিভিন্ন বিক্রিয়াগুলো বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

13.1. আমরা কী জানি?

চলো আমরা দেখি, ইতিমধ্যে সালোকসংশ্লেষ সম্পর্কে আমরা কতটা জেনেছি। তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী ক্লাশগুলোতে কিছু সরল পরীক্ষা করেছিলে এবং সেই পরীক্ষাগুলো করতে গিয়ে তোমরা দেখেছিলে যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ঘটার জন্য ক্লোরোফিল (পাতার সবুজ রঞ্জক), আলোক এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রয়োজন হয়।

দুটি ভিন্ন পাতায় শ্বেতসার সংশ্লেষ পর্যবেক্ষণ করার জন্য তোমরা একটি পরীক্ষা করতে পার। এদের মধ্যে একটি নানা বর্ণ রঞ্জিত পাতা বা কালো কাগজ দ্বারা আংশিকভাবে আবৃত সবুজ পাতা, অপরটি সম্পূর্ণভাবে আলোকে উন্মুক্ত। শ্বেতসার সংশ্লেষের জন্য এই পাতাগুলোকে নিয়ে পরীক্ষা করার পর এটা স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি কেবলমাত্র সূর্যালোকের উপস্থিতিতে পাতার সবুজ অংশেই ঘটে।

এরকম অপর যে পরীক্ষাটি করা যেতে পারে সেটি হল হাফ লিফ পরীক্ষা (Half leaf Experiment)। এই পরীক্ষায় সবুজ পাতার একটি অংশ KOH (পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড) সিক্ত তুলা (যা CO_2 শোষণ করে) সমন্বিত পরীক্ষানলের ভেতরে ঢোকানো থাকে এবং অপর অংশটি থাকে বায়ুতে উন্মুক্ত। এইবার সম্পূর্ণ পরীক্ষা ব্যবস্থাটিকে কিছু সময়ের জন্য আলোকিত পরিবেশে রাখা হয়। পরে পাতার ওই দুটি অংশে শ্বেতসার আছে কিনা তা পরীক্ষা করার সময় তুমি অবশ্যই দেখতে পাবে যে পাতার উন্মুক্ত অংশে শ্বেতসারের উপস্থিতি প্রমাণিত এবং পাতার যে অংশটি পরীক্ষানলের ভেতরে ছিল তাতে শ্বেতসারের অনুপস্থিতি প্রমাণিত হয়। এই পরীক্ষা থেকে এটা বোঝা যায় যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ঘটার জন্য CO_2 প্রয়োজন। কীভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল তা কি তুমি ব্যাখ্যা করতে পারবে?

13.2 গোড়ার দিকের পরীক্ষা নিরীক্ষা সমূহ (Early Experiments)

এই সরল পরীক্ষাগুলো থেকে শিক্ষণীয় মজাদার বিষয় এই যে এর থেকে সালোকসংশ্লেষ সম্পর্কে আমাদের ধারণার ক্রমবিকাশ ঘটে।

1770 সালে জোসেফ প্রিস্টলে (1733-1804) একগুচ্ছ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন এবং এই পরীক্ষাগুলো থেকে এটা বেরিয়ে এসেছিল যে সবুজ উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে বায়ুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তোমাদের হয়তো মনে আছে 1774 সালে প্রিস্টলে অক্সিজেন আবিষ্কার করেছিলেন। প্রিস্টলে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, একটি আবদ্ধস্থানে অর্থাৎ একটি বেল জার-এ একটি জ্বলন্ত মোমবাতি রাখলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সেটি নিভে যাবে। (চিত্র 13.1 (ক), (খ), (গ), (ঘ) দেখো)। একইভাবে, একটি ইঁদুরকে একটি আবদ্ধ স্থানে রাখলে সেটিও দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে। তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, একটি জ্বলন্ত মোমবাতি বা একটি প্রাণী যারা বায়ু গ্রহণ করে তারা উভয়ই কোনো না কোনোভাবে বায়ুকে দূষিতও করে। কিন্তু যখন তিনি একটি পুদিনা গাছ একই বেল জারটিতে রাখলেন তখন দেখা গেল যে ইঁদুরটি বেঁচে আছে এবং জ্বলন্ত মোমবাতিটিও জ্বলছে। পরীক্ষা শেষে প্রিস্টলে এটা অনুমান করেছিলেন যে প্রাণীদের শ্বাসকার্যের ফলে এবং মোমবাতির জ্বলনে যে বায়ু অপসারিত হয় তা উদ্ভিদ পুনরুদ্ধার করে।

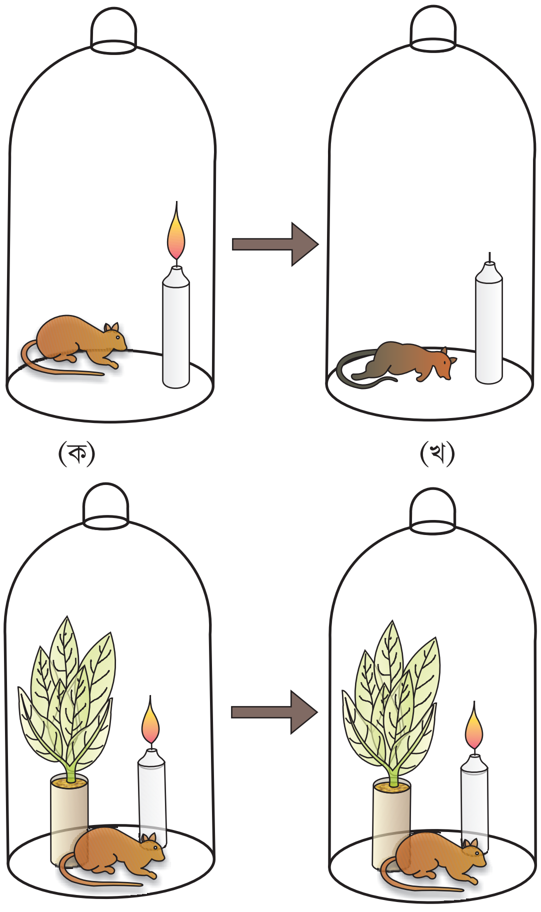

চিত্র 13.1 প্রিস্টলে-এর পরীক্ষা

তোমরা কি ভাবতে পার কীভাবে প্রিস্টলে একটি উদ্ভিদ এবং একটি মোমবাতি নিয়ে এই পরীক্ষাটি করেছিলেন? মনে রেখো, কয়েকদিন পর পরীক্ষায় ব্যবহৃত মোমবাতিটি জ্বলে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য বিজ্ঞানী প্রিস্টলেকে এই মোমবাতিটি পুনরায় জ্বালানোর প্রয়োজন হয়েছিল। পরীক্ষা ব্যবস্থাটির বিঘ্ন না ঘটিয়ে কত ধরনের বিভিন্ন উপায়ে মোমবাতিটি জ্বালানো সম্ভব বলে তুমি মনে কর?

প্রিস্টলে ব্যবহৃত পরীক্ষা ব্যবস্থার মতো একই ব্যবস্থা ব্যবহার করে কিন্তু এটিকে একবার আলোকে ও একবার অন্ধকারে রেখে জান ইনজেনহাউজ (Jan Ingenhousz) (1730-1799) দেখিয়েছিলেন যে ক্যান্ডেলের জ্বলনে বা প্রাণীদের শ্বাসকার্যের ফলে উৎপন্ন দূষিত বায়ুর পরিশোধনে যে উদ্ভিদ প্রক্রিয়াটি সাহায্য করে তার জন্য আলোর উপস্থিতি প্রয়োজন। ইনজেনহাউস একটি জলজ উদ্ভিদকে নিয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন যে উজ্জ্বল সূর্যালোকের উপস্থিতিতে উদ্ভিদের সবুজ অংশকে ঘিরে ছোটো ছোটো

বুদবুদের সৃষ্টি হয়, কিন্তু অন্ধকারে এ রকম কোনো ঘটনা ঘটেনা। অতঃপর তিনি দেখিয়েছিলেন যে উদ্ভিদের কেবলমাত্র সবুজ অংশই অক্সিজেন ত্যাগ করতে পারে। প্রায় 1854 সালে জুলিয়াস ভন স্যাকস (Julius Von Sachs) এটা প্রমাণ করেছিলেন যে উদ্ভিদের বৃদ্ধির সময় গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়। এই গ্লুকোজ সাধারণত শ্বেতসাররূপে সঞ্চিত থাকে। তিনি তার পরবর্তী গবেষণায় এটা দেখিয়েছিলেন যে, উদ্ভিদের সবুজ বস্তু (এখন যাদের ক্লোরোফিল বলা হয়) উদ্ভিদ কোশের অভ্যন্তরে এক বিশেষ অঙ্গাণুর (পরবর্তী সময়ে এদের ক্লোরোপ্লাস্ট নামে অভিহিত করা হয়) মধ্যে অবস্থান করে। তিনি খুঁজে বের করেছিলেন যে উদ্ভিদের সবুজ অংশেই গ্লুকোজ সংশ্লেষিত হয় এবং এই গ্লুকোজ সাধারণত শ্বেতসার রূপে সঞ্চিত থাকে।

এখন আমরা T.W.Engelmann (1843 - 1909) এর মজাদার পরীক্ষাটি নিয়ে আলোচনা করব। একটি প্রিজম ব্যবহার করে তিনি আলোককে তার বিভিন্ন বর্ণালীতে বিশ্লিষ্ট করেন এবং সেই আলোকে ব্যাকটিরিয়ার প্রলম্বনে (Suspension) রাখা **সবুজ শৈবাল ক্ল্যাডোফোরা** (*Cladophora*) কে আলোকিত করেন। এই পরীক্ষা ব্যবস্থায় O_2 উৎপাদনের স্থান চিহ্নিত করণের জন্য এই ব্যাকটিরিয়াগুলো ব্যবহৃত হয়েছিল। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, প্রিজমে বিশ্লিষ্ট বর্ণালীর নীল ও লাল অংশেই ব্যাকটিরিয়াগুলো জড়ো হয়। সালোকসংশ্লেষের কার্যবর্ণালীটি প্রথম এইভাবেই বর্ণনা করা হয়েছিল। কার্যবর্ণালীটি ক্লোরোফিল *a* এবং *b* (13.4 অংশে বর্ণনা করা হয়েছে) এর শোষণ বর্ণালীর প্রায় অনুরূপ।

ঊনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো জানা গিয়েছিল। যেমন, উদ্ভিদরা CO_2 (কার্বন ডাই অক্সাইড) ও জল থেকে খাদ্য তৈরির জন্য আলোকশক্তি ব্যবহার করতে পারে। অক্সিজেন উৎপাদনকারী জীবে সম্পূর্ণ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া প্রকাশকারী স্থূল সূত্রটি তখন যেভাবে বোঝা গিয়েছিল তা হল —

$$CO_2 + H_2O \xrightarrow{\text{আলোক}} [CH_2O] + O_2$$

যেখানে $[CH_2O]$ দ্বারা কার্বোহাইড্রেটকে (যেমন ছয় কার্বনযুক্ত শর্করা গ্লুকোজ) বোঝানো হয়েছিল।

অণুজীববিদ করনেলিয়াস ভন নীল (1897 - 1985) এর অবদান সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি বোঝার ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে। লালচে বেগুনী এবং সবুজ ব্যাকটেরিয়া নিয়ে তার অধ্যয়নের উপর ভিত্তি করে তিনি এটা প্রদর্শন করেছিলেন যে সালোকসংশ্লেষ একটি আবশ্যক আলোক নির্ভর বিক্রিয়া যেখানে একটি উপযুক্ত জারক বস্তু থেকে হাইড্রোজেন মুক্ত হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইডকে বিজারিত করে কার্বোহাইড্রেট যৌগে পরিণত করে। এই ঘটনাটিকে যেভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে তা হল —

$$2H_2A + CO_2 \xrightarrow{\text{আলোক}} 2A + CH_2O + H_2O$$

সবুজ উদ্ভিদে জল (H_2O) হাইড্রোজেন দাতা হিসাবে কাজ করে এবং এটি জারিত হয়ে অক্সিজেন উৎপন্ন করে। কিছু কিছু জীবের ক্ষেত্রে সালোকসংশ্লেষ কালে অক্সিজেন (O_2) উৎপন্ন হয় না। যখন লালচে বেগুনী ও সবুজ সালফার ব্যাকটিরিয়ায় সালোকসংশ্লেষ কালে হাইড্রোজেন দাতা হিসাবে হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) হয় তখন জারনের ফলে উপজাত বস্তু হিসেবে জীব ভেদে সালফার বা সালফেট উৎপন্ন হয়, অক্সিজেন উৎপন্ন হয় না। তাই তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, সবুজ উদ্ভিদ দেহে উৎপন্ন অক্সিজেন (O_2) জল থেকে আসে, কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে আসে না। এটি পরবর্তী সময়ে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে প্রমাণ করা হয়। সুতরাং সামগ্রিক সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে বোঝানোর জন্য যে সঠিক সমীকরণটি হল —

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow{\text{আলোক}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$$

যেখানে $C_6H_{12}O_6$ হল গ্লুকোজ জল থেকে O_2 মুক্ত হয়, এটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে প্রমাণ করা হয়েছিল। মনে রাখতে হবে যে, এটি একটি একক বিক্রিয়া নয় বরং এটি বহুধাপ বিশিষ্ট সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার বিবরণ। উপরের সমীকরণে সাবস্ট্রেট হিসাবে 12 অণু জল ব্যবহৃত হয়েছে কেন তা ব্যাখ্যা করো?

13.3 সালোক সংশ্লেষ কোথায় ঘটে? (Where does Photosynthesis take Place?)

অষ্টম অধ্যায়ে অধীত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তুমি অবশ্যই এই উত্তরটি দিতে পার যে এটি সবুজ পাতায় ঘটে বা তুমি আরও বলতে পার যে এটি ক্লোরোপ্লাস্টে ঘটে। তোমার উত্তর সঠিক হবে। সালোকসংশ্লেষ উদ্ভিদের সবুজ পাতায় ঘটে। তবে এটি উদ্ভিদ দেহের অন্য সবুজ অংশেও ঘটে। তুমি কি উদ্ভিদের পাতা ব্যতিত এমন কিছু অংশের নাম বলতে পার যেখানে সালোকসংশ্লেষ ঘটে?

তুমি পূর্ববর্তী পাঠ একক থেকে মনে করতে পারবে যে পাতার মেসোফিল কোশে বহু সংখ্যক ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টগুলো সাধারণত মেসোফিল কোশের প্রাচীরের গাত্রে এমনভাবে হেলানো থাকে যাতে তারা আপতিত আলোকের সবচেয়ে বেশি অংশ শোষণ করতে পারে। *তুমি কি কখনো ভাবতে পার ক্লোরোপ্লাস্টগুলো তাদের প্রাচীরের গায়ে সমান্তরালে সজ্জিত চ্যাপ্টা তলের সাহায্যে কোশগুলির গায়ে হেলানো থাকে? কখনই বা ক্লোরোপ্লাস্টগুলো আপতিত আলোকের সাথে লম্বভাবে অবস্থান করবে?*

তোমরা অষ্টম অধ্যায়ে ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন পড়েছ। ক্লোরোপ্লাস্টের ভেতরে গ্রাণা সমন্বিত একটি আবতরণীতন্ত্র, স্ট্রোমা ল্যামেলি এবং তরল ধাত্র বা স্ট্রোমা থাকে (চিত্র 13.2)। ক্লোরোপ্লাস্টের ভেতরে সুস্পষ্ট শ্রম বিভাজন দেখা যায়। আবরণীতন্ত্রটি আলোক শক্তির আবদ্ধকরণ এবং ATP এবং NADPH এর সংশ্লেষনের জন্য দায়ী। স্ট্রোমা অংশে উৎসেচক নির্ভর বিক্রিয়ার মাধ্যমে CO_2 উদ্ভিদ দেহে আবদ্ধ হয় এবং এর ফল শ্রুতিতে শর্করা সংশ্লেষিত হয়। এই শর্করাটি পরে শ্বেতসারে পরিণত হয়। আগের বিক্রিয়াগুলো ঘটার জন্য সরাসরি আলোকের প্রয়োজন হয় বলে এদের **আলোক বিক্রিয়া** বলে। পরের বিক্রিয়াগুলো সরাসরি আলোকের উপর নির্ভর করে না কিন্তু আলোক বিক্রিয়ায় উপজাত বস্তুর (ATP এবং NADPH) উপর নির্ভর করে। তাই এই বিক্রিয়াপথকে আলোক বিক্রিয়া থেকে আলাদা করার জন্য প্রথাগতভাবে এদের **অন্ধকার বিক্রিয়া** বলে। যদিও এর অর্থ এই নয় যে, এই বিক্রিয়াগুলো অন্ধকারে ঘটে বা এরা আলোক নির্ভর নয়।

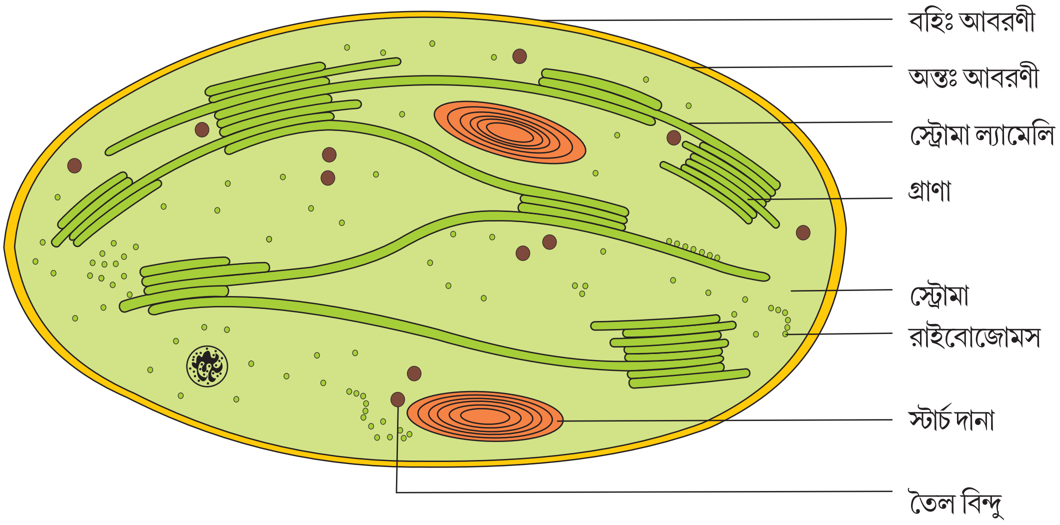

চিত্র 13.2 : ক্লোরোপ্লাস্টের একটি ছেদের ইলেকট্রন আণুবীক্ষণিক চিত্ররূপ।

13.4 সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কতগুলো রঞ্জক অংশ গ্রহণ করে? (How many pigments are involved in photosynthesis?)

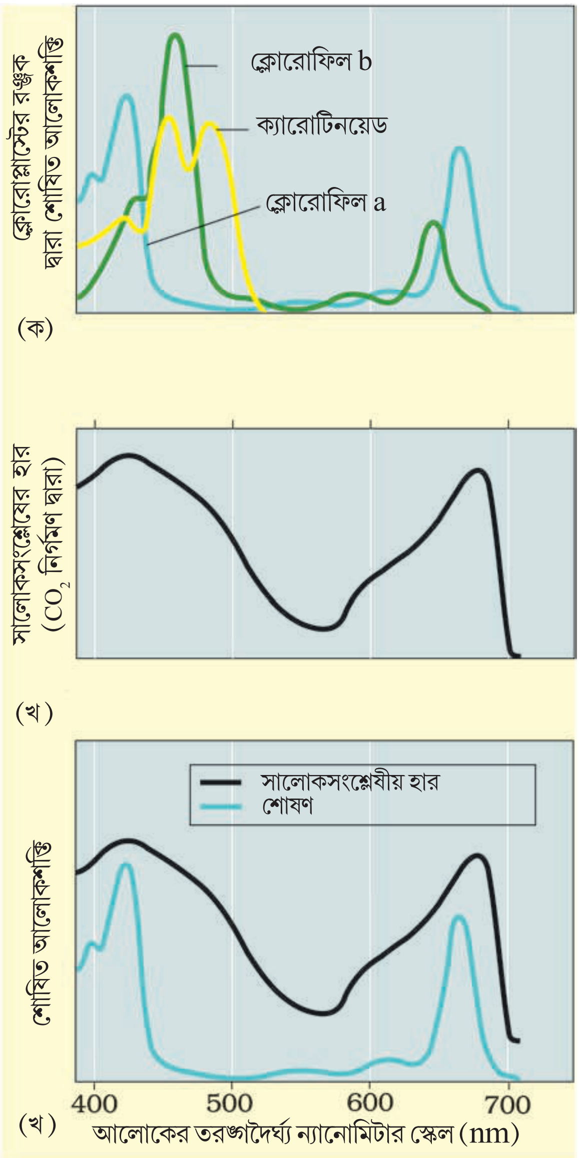

চিত্র 13.3(ক) লেখচিত্রের সাহায্যে ক্লোরোফিল a,b এবং ক্যারোটিনয়েড এর শোষণ বর্ণালী প্রদর্শন।

চিত্র 13.3 (খ) লেখচিত্রের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষের কার্যবর্ণালী প্রদর্শন।

চিত্র 13.3 (গ) লেখচিত্রের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষের কার্যবর্ণালী এবং ক্লোরোফিল a এর শোষন বর্ণালীর পারস্পরিক উপস্থাপন প্রদর্শন।

উদ্ভিদদের দেখে কখনও এটা ভেবে অবাক হয়েছ কি, যে কেন এবং কীভাবে তাদের পাতায়, এমন কি একই উদ্ভিদের পাতার ক্ষেত্রেও, বহু সংখ্যক সবুজ ছোপ দেখা যায়? পেপার ক্রোমোটোগ্রাফির সাহায্যে কোনো একটি সবুজ উদ্ভিদের পাতার রঞ্জকগুলোকে আলাদা করার চেষ্টা করলেই এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে পাব। পাতার রঞ্জকগুলোকে ক্রোমোটোগ্রাফির সাহায্যে আলাদা করলেই এটা বোঝা যায় যে পাতার যে রঙ আমরা দেখি তা একটি কোনো রঞ্জকের জন্য নয়, এটি চারটি রঞ্জকের জন্য হয়। এই রঞ্জকগুলো হল **ক্লোরোফিল a** (ক্রোমোটোগ্রামে উজ্জ্বল বা নীলাভ সবুজ দেখায়), **ক্লোরোফিল b** (হলুদাভ সবুজ), **জ্যান্থাফিল** (হলুদ) এবং **ক্যারোটিনয়েডস্** (হলুদ থেকে হলুদাভকমলা)। এখন আমরা দেখি বিভিন্ন রঞ্জকগুলো সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কী ভূমিকা পালন করে।

রঞ্জকগুলো হল সেইসব বস্তু যারা একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে আলোকশক্তি শোষনে সক্ষম। তুমি কি আন্দাজ করতে পার, পৃথিবীতে কোন রঞ্জকটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পাওয়া যায়? চলো, যে লেখচিত্রে ক্লোরোফিল a রঞ্জকের বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক শোষণের ক্ষমতা দেখানো হয়েছে তা অধ্যয়ন করি (চিত্র 13.3 ক)। তুমি অবশ্যই আলোকের দৃশ্যমান বর্ণালী এবং এর পাশাপাশি VIBGYOR এর সাথে পরিচিত আছ।

চিত্র 13.3 (ক) থেকে তুমি কি বের করতে পারবে কোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটি (আলোকের বর্ণ) ক্লোরোফিল a সবচেয়ে বেশি শোষন করে? এই লেখচিত্রে কি অন্য কোনো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আর একটি শোষন চূড়া দেখা যাচ্ছে? উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তবে কোনটি?

এবার চিত্র 13.3 (খ) পর্যবেক্ষণ করো। এতে কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে উদ্ভিদদেহে সর্বাধিক সালোক সংশ্লেষ ঘটে তা দেখানো হয়েছে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছো, যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলো ক্লোরোফিল a সবচেয়ে বেশি শোষণ করেছে অর্থাৎ বর্ণালীর নীল এবং লাল অঞ্চল, সেখানেই সালোক সংশ্লেষের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সালোকসংশ্লেষের সাথে সম্পর্কিত প্রধান রঞ্জকটি হল ক্লোরোফিল a। চিত্র 13.3 (গ) দেখে তুমি কি বলতে পার যে সালোকসংশ্লেষের কার্যবর্ণালী এবং ক্লোরোফিল a এর শোষণ বর্ণালী একে অপরকে সম্পূর্ণভাবে অধিক্রমণ করে?

এই লেখচিত্রগুলো একসাথে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে বর্ণালীর নীল ও লাল অংশে সালোকসংশ্লেষ সবচেয়ে বেশি হয়। তবে দৃশ্যমান বর্ণালীর অন্যান্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যেও কিছুটা সালোকসংশ্লেষ ঘটে। চলো দেখি, এটা কিভাবে ঘটে? যদিও আলোক শক্তিকে আবদ্ধকারী প্রধান রঞ্জকটি ক্লোরোফিল a, তবে ক্লোরোফিল b, জ্যান্থোফিল এবং ক্যারোটিনয়েড এর মতো থাইলাকয়েড মধ্যস্থ রঞ্জকগুলোও আলোকশক্তি শোষন করে এবং ক্লোরোফিল a অণুতে এই শক্তি স্থানান্তরিত করে। থাইলাকয়েডস্থিত ক্লোরোফিল b, জ্যান্থোফিল ও ক্যারোটিনয়েড এর মতো রঞ্জকগুলোকে **সাহায্যকারী রঞ্জক** বলে। এরা শুধুমাত্র সূর্য থেকে আগত আলোক শক্তি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিস্তৃত অঞ্চল থেকেই শোষণ করে না, **এরা ক্লোরোফিল a কে আলোক জারনের হাত থেকেও রক্ষা করে।**

13.5 আলোক বিক্রিয়া কী? (What is Light Reaction?)

আলোক বিক্রিয়া বা আলোক রাসায়নিক দশার অন্তর্ভুক্ত ঘটনাগুলো হল — আলোক শোষণ, জলের আলোক বিশ্লেষণ, অক্সিজেন নির্গমন এবং উচ্চশক্তি সম্পন্ন অন্তর্বর্তী রাসায়নিক যৌগ ATP ও NADPH গঠন। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের জোট অংশ গ্রহণ করে। রঞ্জক পদার্থগুলো **রঞ্জকতন্ত্র-I (PSI) ও রঞ্জকতন্ত্র - II (PSII)** এর ভেতরে দুটি স্বতন্ত্র **আলোক শক্তি আবদ্ধকারী আলোক রাসায়নিক জোটে** (Light Harvesting Complex) সংগঠিত থাকে। এদের নামকরণ আবিষ্কারের ক্রম অনুযায়ী করা হয়েছিল, আলোক দশা চলাকালীন সময়ে তাদের কাজের ক্রম অনুসারে নয়। আলোক শক্তি আবদ্ধকারী জোটগুলো শতাধিক রঞ্জক অণুর সমন্বয়ে গঠিত। রঞ্জকগুলো প্রোটিনের সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে। ক্লোরোফিল a ব্যতীত প্রতিটি রঞ্জকতন্ত্রের সব রঞ্জকগুলো একত্রিত হয়ে যে আলোকশক্তি আবদ্ধকারী তন্ত্র (Light Harvesting System) গঠন করে তাদের **অ্যান্টিনা** ও বলে (চিত্র 13.4 দেখো)। এই রঞ্জকগুলো বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক শোষণের মাধ্যমে আরও কার্যকরী ভাবে সালোক সংশ্লেষ ঘটাতে সাহায্য করে। একটি একক ক্লোরোফিল a অণু **বিক্রিয়া কেন্দ্র** গঠন করে। উভয় রঞ্জকতন্ত্রেই বিক্রিয়াকেন্দ্র আলাদা হয়। রঞ্জকতন্ত্র-I এ বিক্রিয়া কেন্দ্র ক্লোরোফিল a অণুটির শোষণ চূড়া P_{700} তরঙ্গদৈর্ঘ্যে থাকে এবং এইজন্যই এই ক্লোরোফিল a অণুটিকে P_{700} বলে। অপরদিকে রঞ্জকতন্ত্র-II এ বিক্রিয়াকেন্দ্র ক্লোরোফিল a অণুটির শোষণচুড়া 680nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যে থাকে এবং এই ক্লোরোফিলটিকে $\mathbf{P_{680}}$ বলে।

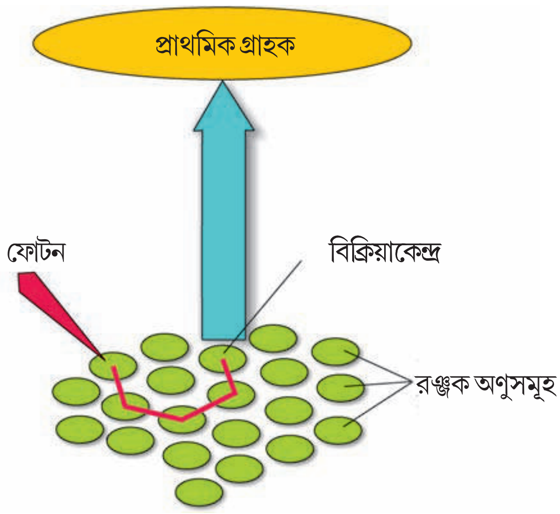

চিত্র 13.4 : আলোকশক্তি আবদ্ধকারী জোট।

13.6 ইলেকট্রন পরিবহন ঃ

রঞ্জকতন্ত্র-II এ বিক্রিয়া কেন্দ্র ক্লোরোফিল a অণুটি 680nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লাল আলোক শোষণ করে এবং এর ফলে ইলেকট্রনগুলো উদ্দীপিত হয় এবং পারমাণবিক নিউক্লিয়াস থেকে তার বাইরের কক্ষপথে উৎক্ষিপ্ত হয়। উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রনগুলো একটি ইলেকট্রন গ্রাহক দ্বারা গৃহীত হয় এবং এর থেকে সাইটোক্রোম সমন্বিত একটি ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্রে প্রেরিত হয়। ইলেকট্রনগুলোর এই পরিবহন একটি জারন বিজারন বা রেডক্স বিভব স্কেল অনুযায়ী নিম্নাভিমুখী হয়। ইলেকট্রন পরিবহন শৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হওয়ার

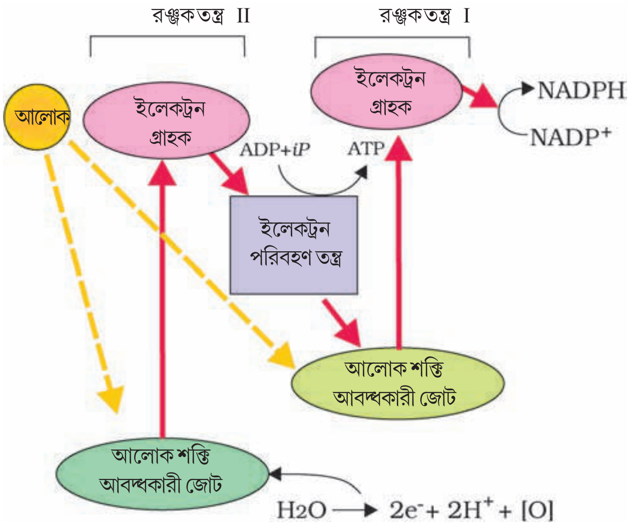

চিত্র 13.5 আলোক বিক্রিয়ায় Z আকৃতির নক্সা

সময় ইলেকট্রনগুলো ব্যবহৃত না হয়ে রঞ্জকতন্ত্র - I (PSI) এর রঞ্জকগুলোতে চলে আসে। একই সময়ে রঞ্জকতন্ত্র - I (PSI) এর বিক্রিয়া কেন্দ্র অধিক রেডক্স বিভব বিশিষ্ট 700nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের লাল আলোক শোষণ করে এবং এর ফলে এর ইলেকট্রনগুলো উদ্দীপিত হয়। এই ইলেকট্রনগুলো তখন আবার নিম্নাভিমুখে পরিবাহিত হয়ে এক্ষেত্রে $NADP^+$ এর কাছে যায়। এই ইলেকট্রনগুলোর সংযুক্তি $NADP^+$ এর বিজারন ঘটায় এবং এর ফলশ্রুতিতে $NADPH + H^+$ গঠিত হয়। এইভাবে রঞ্জকতন্ত্র-II (PSII) থেকে শুরু করে ইলেকট্রনগুলোর উর্ধ্বমুখে ইলেকট্রন গ্রাহকে পৌঁছানো, সেখান থেকে ইলেকট্রন পরিবহন শৃঙ্খলের মাধ্যমে নিম্নাভিমুখে পরিবাহিত হয়ে রঞ্জকতন্ত্র-I এ চলে আসা, রঞ্জকতন্ত্র- I(PSI) এর ইলেকট্রনগুলোর উদ্দীপিত হওয়া ও অন্য একটি ইলেকট্রন গ্রাহকে স্থানান্তরিত হওয়া এবং সবশেষে নিম্নাভিমুখে পরিবাহিত হয়ে $NADP^+$ এর কাছে আসা ও $NADP^+$ এর বিজারনের ফলে $NADPH + H^+$ গঠিত হওয়া ইলেকট্রন পরিবহনের এই সম্পূর্ণ নকশাটিকে তার এইরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকৃতির জন্য **'Z' নকশা (Z-Scheme)** বলে (চিত্র 13.5)। যখন সব ইলেকট্রন বাহকগুলো একটি রেডক্স বিভব স্কেল (Redox Potential Scale) এ একটি ক্রমে সজ্জিত থাকে তখনই এই আকৃতিটি গঠিত হয়।

13.6.1 জলের বিয়োজন (Splitting of Water)

তুমি এখন জিজ্ঞেস করতে পার, **রঞ্জকতন্ত্র-II (PSII) কীভাবে অবিরত ইলেকট্রন সরবরাহ করে?** রঞ্জকতন্ত্র-II (PSII) থেকে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রনগুলোর প্রতিস্থাপন আবশ্যক। জলের বিয়োজনের ফলে উৎপন্ন ইলেকট্রনগুলো রঞ্জকতন্ত্র-II (PSII) এর এই ইলেকট্রন ঘাটতি পূরণ করে। জলের বিয়োজন রঞ্জকতন্ত্র-II(PSII) এর সাথে সম্পর্কিত। জল বিয়োজন প্রক্রিয়ায় জল H^+[O] এবং ইলেকট্রনে বিশ্লিষ্ট হয়। সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন আসল উপজাত বস্তুগুলোর মধ্যে একটি হল জলের বিয়োজনের ফলে উৎপন্ন অক্সিজেন। রঞ্জকতন্ত্র-I(PSI) থেকে নির্গত ইলেকট্রনগুলোর প্রতিস্থাপন রঞ্জকতন্ত্র-II(PSII) থেকে আসা ইলেকট্রন দ্বারা ঘটে।

$$2H_2O \longrightarrow 4H^+ + O_2 + 4e^-$$

আমাদের এখানে এই বিষয়টিতে জোর দেওয়া প্রয়োজন যে জল বিয়োজনকারী জোটটি রঞ্জকতন্ত্র II(PSII) এর সাথে সম্পর্কিত যে নিজেই থাইলাকয়েড পর্দার ভেতরের দিকে অবস্থান করে। **তাহলে উৎপন্ন প্রোটন ও অক্সিজেন কোথায় বেরিয়ে যায় থাইলাকয়েড এর গহ্বরে? না কি পর্দাটির বাইরের দিকে?**

13.6.2. আবর্তাকার এবং অনাবর্তকার ফটোফস্কোরীভবন (Cyclic and Non-cyclic photo-phosphorylation)

জারিত হতে পারে এমন বস্তুসমূহ থেকে সজীব বস্তুর শক্তি আহরণ করার ক্ষমতা রয়েছে এবং এই শক্তিকে এরা বন্ধনী শক্তিরূপে সঞ্চিত করে রাখে। ATP এর মতো বিশেষ বস্তুগুলো তাদের রাসায়নিক বন্ধনীগুলোতে

এই শক্তি বহন করে। যে প্রক্রিয়ায় কোশসমূহ দ্বারা ATP সংশ্লেষিত হয় (মাইটোকনড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্ট এ) তাকে ফটোফস্ফোরীভবন বলে। আলোকের উপস্থিতিতে ADP এবং অজৈব ফসফেট থেকে ATP সংশ্লেষণই হল ফটো-ফস্ফোরীভবন, যখন দুইটি রঞ্জকতন্ত্রই একটি ক্রমে অর্থাৎ প্রথমে রঞ্জকতন্ত্র-(PSII) ওপরে রঞ্জকতন্ত্র I(PSI) এই হিসেবে কাজ করে তখন অনাবর্তকার ফটোফস্ফোরীভবন প্রক্রিয়াটি ঘটে। দুটি রঞ্জকতন্ত্র ইলেকট্রন পরিবহন শৃঙ্খলের মাধ্যমে যুক্ত থাকে (“Z” আকৃতির নক্সায় যেমন দেখেছিলাম)। এই ধরনের ইলেকট্রন প্রবহনের মাধ্যমে ATP এবং NADPH + H^+ উভয়ই সংশ্লেষিত হয়। (চিত্র 13.5 দেখো)।

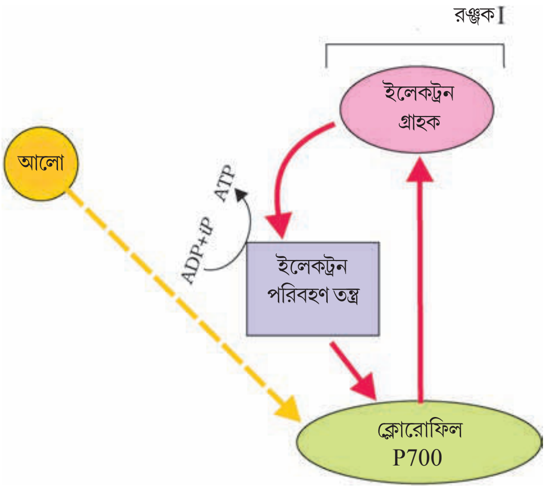

চিত্র 13.6 আবর্তাকার ফটোফস্ফোরীভবন

যখন শুধুমাত্র রঞ্জকতন্ত্র-I(PSI) ই কার্যকরী থাকে তখন ইলেকট্রন ওই রঞ্জকতন্ত্রের মধ্যেই প্রবাহিত হয় এবং ইলেকট্রনের চক্রাকার আবর্তনের ফলেই ফটোফস্ফোরীভবন ঘটে (চিত্র 13.6 দেখো)। যে সম্ভাব্য স্থানে এই ঘটনাটি ঘটতে পারে সেটি হল স্ট্রোমা ল্যামেলি। যেখানে গ্রানার আবরণী বা ল্যামেলিতে রঞ্জকতন্ত্র-I এবং রঞ্জকতন্ত্র-II উভয়ই থাকে, সেখানে স্ট্রোমা ল্যামেলির আবরণীতে রঞ্জকতন্ত্র-II এবং এর পাশাপাশি NADP রিডাক্টেজ উৎসেচকও থাকেনা। উত্তেজিত ইলেকট্রনগুলো $NADP^+$ এ প্রবাহিত না হয়ে চক্রাকারে ইলেকট্রন পরিবহন শৃঙ্খলের মাধ্যমে রঞ্জকতন্ত্র- I(PS-I) এর জোটে ফিরে আসে। তাই এই চক্রাকার আবর্তনের ফলে শুধুমাত্র ATP সংশ্লেষিত হয়, কিন্তু NADPH + H^+ গঠিত হয় না। যখন সক্রিয়করণের জন্য শুধুমাত্র 680nm এর অধিক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক পাওয়া যায় তখন ও আবর্তাকার ফটোফস্ফোরীভবন ঘটে।

13.6.3 কেমিঅসমোটিক মতবাদ (Chemiosmotic Hypothesis) :

এখন আমরা বোঝার চেষ্টা করি আসলে কীভাবে ক্লোরোপ্লাস্টের ভেতরে ATP সংশ্লেষিত হয়। ATP সংশ্লেষ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করার জন্যই কেমিঅসমোটিক মতবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। শ্বসনের মতো সালোকসংশ্লেষও ATP সংশ্লেষ পদ্ধতি পর্দার মধ্য দিয়ে প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট এর সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত। এক্ষেত্রে পর্দাগুলো হল থাইলাকয়েডের আবরণী। খুব একটা পার্থক্য না থাকলেও এক্ষেত্রে থাইলাকয়েড আবরণীর ভেতরের দিকে অর্থাৎ থাইলাকয়েড এর গহ্বরে প্রোটনগুলো সঞ্চিত হয়। অপরদিকে শ্বসন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইলেকট্রন পরিবহণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন পরিবহণের সময় প্রোটনগুলো মাইটোকনড্রিয়ার বহিঃপ্রকোষ্ঠে অর্থাৎ আন্তঃআবরণী স্থানে সঞ্চিত হয়।

এখন আমরা বোঝার চেষ্টা করি পর্দার মধ্য দিয়ে প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট এর সৃষ্টি কীভাবে ঘটে। যে ধাপগুলো প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট সৃষ্টির জন্য দায়ী সেগুলোকে খুঁজে বের করতে হলে আমাদের ওইসব প্রক্রিয়াগুলো নিয়ে ভাবা প্রয়োজন যেগুলো ইলেকট্রনের সক্রিয়করণের ও তাদের পরিবহণের সময় ঘটে (চিত্র 13.7)।

(ক) যেহেতু জলের বিয়োজন থাইলাকয়েডের আবরণীর ভেতরের দিকে ঘটে, জলের বিয়োজনের ফলে উৎপন্ন প্রোটন বা হাইড্রোজেন আয়নগুলো থাইলাকয়েডের গহ্বরে জমা হয়।

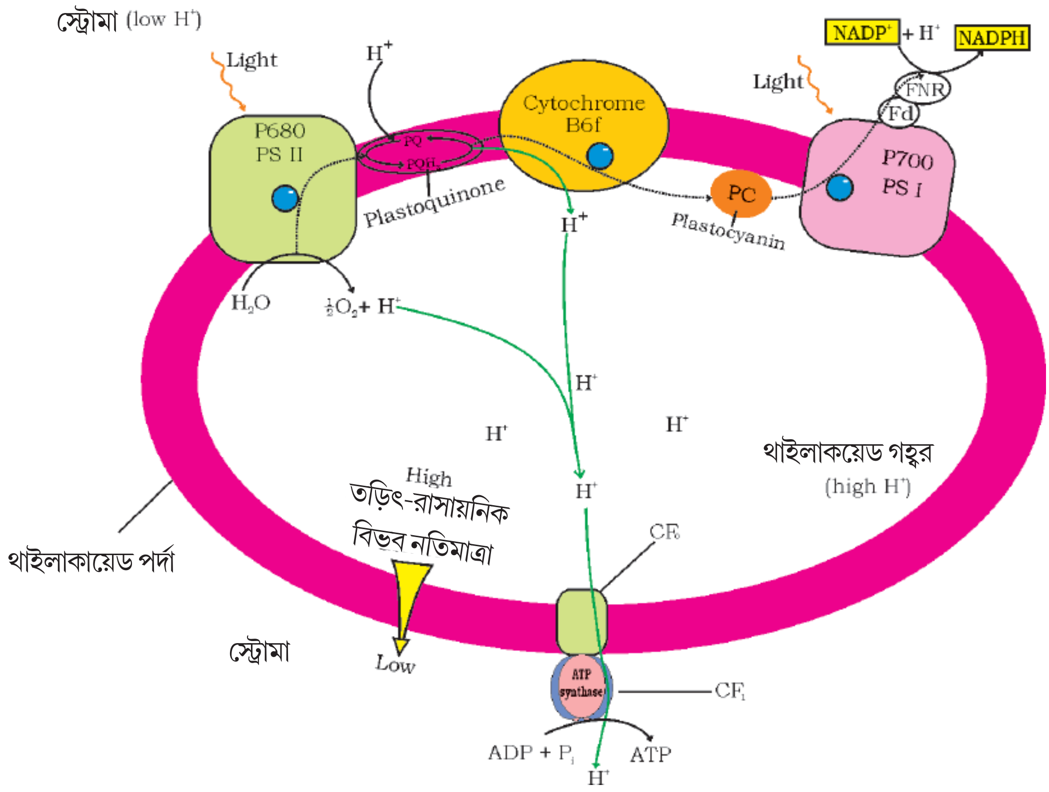

চিত্র 13.7 ঃ কেমিঅসমোসিস এর মাধ্যমে ATP সংশ্লেষ

(খ) যেহেতু ইলেকট্রনগুলো রঞ্জকতন্ত্রগুলোর মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়, তাই প্রোটনগুলো থাইলাকয়েড আবরণীর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। ইলেকট্রনের প্রাথমিক গ্রাহকটি থাইলাকয়েড আবরণীর বাইরের দিকে অবস্থান করায় এবং সেই গ্রাহক থেকে ইলেকট্রন কোনো ইলেকট্রন বাহকের পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্রাহকে পরিবাহিত হয় বলে এইরূপ ঘটনা ঘটে। তাই হাইড্রোজেন গ্রাহক অণুটি ইলেকট্রন পরিবহণ করতে গিয়ে স্ট্রোমা থেকে প্রোটন বের করে নিয়ে আসে। যখন এই ইলেকট্রন গ্রাহক অণুটি থাইলাকয়েড পর্দার ভেতরের দিকে অবস্থিত ইলেকট্রন বাহকে ইলেকট্রন পরিবহণ করে তখন প্রোটনটিকে থাইলাকয়েড আবরণীর ভেতরের দিকে অর্থাৎ থাইলাকয়েড গহ্বরের দিকে পাঠিয়ে দেয়।

(গ) NADP রিডাক্টেজ উৎসেচকটি থাইলাকয়েড আবরণীর স্ট্রোমার দিকে অবস্থান করে। $NADP^+$ বিজারিত হয়ে NADPH + H^+ গঠন করার জন্য রঞ্জকতন্ত্র-I (PSI) এর প্রাথমিক গ্রাহক থেকে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রন সহ প্রোটনগুলোর প্রয়োজন হয়। এই প্রোটনগুলোও স্ট্রোমা থেকে গৃহীত হয়।

তাই ক্লোরোপ্লাস্টের ভেতরে, স্ট্রোমায় প্রোটনের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং থাইলাকয়েডের গহ্বরে প্রোটন জমা হতে থাকে। এর ফলে থাইলাকয়েড পর্দার মধ্য দিয়ে প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট এর সৃষ্টি হয় এবং এর পাশাপাশি থাইলাকয়েড গহ্বরে P^H এর পরিমাপযোগ্য হ্রাসকরণ ঘটে।

প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে আমরা এত উৎসাহী কেন ?

এই গ্রেডিয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ কারণ গ্রেডিয়েন্ট ভেঙে যাওয়ার ফলেই শক্তির মুক্তি ঘটে। ATPase উৎসেচকের F_o অংশের ট্রান্সমেমব্রেন চ্যানেল এর মধ্য দিয়ে স্ট্রোমার দিকে প্রোটনের পর্দা ভেদ করে চলনের ফলেই প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট ভেঙে যায়। ATPase উৎসেচকটি দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। একটি অংশ হল F_o যা

থাইলাকয়েড পর্দার মধ্যে নিহিত থাকে এবং ট্রান্সমেমব্রেন চ্যানেল গঠন করে। এই চ্যানেলের মধ্য দিয়েই প্রোটনগুলোর পর্দা ভেদ করে সহায়ক ব্যাপন ঘটে। অপর অংশটিকে F_1 বলে এবং এটি থাইলাকয়েড আবরণী থেকে স্ট্রোমার দিকে মুখ করে উপবৃদ্ধি রূপে বেরিয়ে আসে। প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট ভাঙনের ফলে শক্তি উৎপন্ন হয় তা ATPase উৎসেচকের F_1 অংশের গঠনগত পরিবর্তন ঘটানোর জন্য যথেষ্ট। এরফলে ATPase উৎসেচকটি বহুসংখ্যক শক্তিধর ATP অণুর সংশ্লেষ ঘটায়।

কেমিঅসমোসিস এর জন্য প্রয়োজন একটি পর্দা বা আবরণী, একটি প্রোটন পাম্প, প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট এর সৃষ্টি এবং ATPase উৎসেচক। পর্দার মধ্য দিয়ে প্রোটনগুলোকে বের করে দেওয়ার জন্য, প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট সৃষ্টির জন্য বা থাইলাকয়েড এর গহ্বরে প্রোটনের উচ্চ ঘনত্বের জন্য শক্তি ব্যবহৃত হয়। ATPase মধ্যস্থ চ্যানেল পর্দার ভেতর দিয়ে প্রোটনের ব্যাপনে সহায়তা করে। এরফলে যথেষ্ট শক্তি মুক্ত হয় যা ATPase উৎসেচককে সক্রিয় করে। ATPase অতঃপর ATP সংশ্লেষণ ঘটায়।

ইলেকট্রনের পরিবহনের ফলে সৃষ্ট NADPH সহ ATP তৎক্ষণাৎ স্ট্রোমায় সংঘটিত জৈব সংশ্লেষ বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। এই জৈব সংশ্লেষ প্রক্রিয়া কার্বন ডাই অক্সাইড এর স্থিতিকরনে ও শর্করা সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে।

13.7 ATP এবং NADPH কোথায় ব্যবহৃত হয়? (Where are ATP and NADPH Used?)

আমরা জেনেছি যে আলোক দশায় উৎপন্ন বস্তুগুলো হল ATP, NADPH এবং অক্সিজেন। এদের মধ্যে অক্সিজেন ক্লোরোপ্লাস্ট থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে যায়। অন্যদিকে ATP এবং NADPH খাদ্য সংশ্লেষ আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে শর্করা সংশ্লেষের এর জন্য প্রক্রিয়াগুলো চালাতে ব্যবহৃত হয়। এটি হল **সালোক সংশ্লেষের জৈব সংশ্লেষ দশা।** এই প্রক্রিয়াটি আলোকের উপস্থিতির উপর সরাসরি নির্ভর করে না কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড ও জল ছাড়াও আলোক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন বস্তুগলো অর্থাৎ ATP এবং NADPH এর উপর নির্ভর করে। তোমরা অবাক হবে কীভাবে তা যাচাই করা যায়; খুব সহজ ঃ যেইমাত্র আলোকের পরিমাণ হ্রাস পায় জৈব সংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি কিছু সময় চলে এবং এরপরই বন্ধ হয়ে যায়। তারপর যখনই পর্যাপ্ত আলো পাওয়া যায় তখন প্রক্রিয়াটি পুনরায় শুরু হয়।

তাহলে সংশ্লেষ দশাটিকে **অন্ধকার দশা** বলা ভুল হবে কি? নিজেদের মধ্যে তোমরা আলোচনা করে দেখতে পার।

চল আমরা এখন দেখি কীভাবে সংশ্লেষ দশায় ATP ও NADPH ব্যবহৃত হয়। আমরা পূর্বেই দেখেছিলাম যে CO_2 ও H_2O সঙ্গে যুক্ত হয়ে $(CH_2O)_n$ বা শর্করা উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়াটি কীভাবে চলে বা কার্বন ডাই অক্সাইড বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করলে বা এর সংবন্ধন ঘটলে প্রথম যৌগ হিসাবে কী উৎপন্ন হয় তা অনুসন্ধান করতে বিজ্ঞানীরা খুব আগ্রহী ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপকে কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করার বিভিন্ন প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যে মেলভিন কেলভিন এর কাজ উল্লেখযোগ্য। তেজস্ক্রিয় কার্বন ^{14}C শৈবালের সালোকসংশ্লেষ অধ্যয়ন কালে তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন যে CO_2 স্থিতিকরণের ফলে উৎপন্ন প্রথম যৌগটি একটি তিন কার্বন বিশিষ্ট জৈব অম্ল। শুধু তাই নয়, সম্পূর্ণ জৈব সংশ্লেষে বিক্রিয়া পথটি বের করার ক্ষেত্রেও তার অবদান ছিল এবং তাই এই প্রক্রিয়াটিকে তার নাম অনুসারে **কেলভিন চক্র** বলা হয়। PGA অথবা **3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডকেই** প্রথম সৃষ্ট যৌগ হিসাবে সনাক্ত করা হয়। এই যৌগটিতে কতগুলো কার্বন পরমাণু রয়েছে?

বৈজ্ঞানিকেরা এটাও জানতে চেষ্টা করেছেন যে সব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে PGA ই কি কার্বন সংবন্ধনের ফলে

উৎপন্ন প্রথম স্থায়ী যৌগ, নাকি অন্য উদ্ভিদদের ক্ষেত্রে অন্য কোন যৌগ উৎপন্ন হয়। বিস্তৃত পরিসরে জন্মানো বিভিন্ন উদ্ভিদদের উপর পরীক্ষা চালানোর ফলে এমন আর এক ধরনের উদ্ভিদ আবিষ্কৃত হল যেখানে কার্বন ডাই অক্সাইডের সংবন্ধনের ফলে উৎপন্ন প্রথম স্থায়ী যৌগটি আবারও একটি জৈব অম্ল কিন্তু এতে 4টি কার্বন পরমাণু বর্তমান। এই জৈব অম্লটিকে **অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড** বা OAA হিসাবে শনাক্ত করা হয়। তখন থেকেই সালোকসংশ্লেষ কালে CO_2 আত্তীকরণ প্রক্রিয়াটিকে দুটি প্রধান ধরনের বলা হত ঃ এদের মধ্যে যেসব উদ্ভিদের CO_2 সংবন্ধনের ফলে উৎপন্ন প্রথম উপজাত বস্তুটি একটি **তিন কার্বন বিশিষ্ট অম্ল** বা C_3 **অম্ল** (PGA) তাদের ক্ষেত্রে CO_2 আত্তীকরণের বিক্রিয়া পথকে **C_3 বিক্রিয়া পথ** বলে এবং অন্যদিকে যেসব উদ্ভিদে CO_2 সংবন্ধনের ফলে উৎপন্ন প্রথম উপজাত বস্তুটি একটি চার কার্বন বিশিষ্ট অম্ল বা C_4 অম্ল (OAA) তাদের ক্ষেত্রে CO_2 আত্তীকরণের বিক্রিয়া পথকে **C_4 বিক্রিয়া পথ** বলে। এই দুই গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদের এ সম্পর্কিত আরও বেশকিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যেগুলি নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

13.7.1 CO_2 এর প্রাথমিক গ্রাহক ঃ (The primary acceptor of CO_2)

সালোকসংশ্লেষের অন্ধকার দশা অধ্যয়ন করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা যে প্রশ্নটির সম্মুখীন হয়েছিলেন চল আমরা নিজেদেরকে সেই প্রশ্নটি করি। CO_2 গ্রহণ (সংবন্ধনের) পর যৌগ অণুটিতে কয়টি কার্বন থাকবে, তিনটি কার্বন কি (PGA অণুর ক্ষেত্রে)?

অধ্যয়নকালে খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে, এটা দেখা গেল যে এই গ্রহীতা অণুটি একটি 5 কার্বন বিশিষ্ট কিটোজ শর্করা রাইবিউলোজ বিস ফসফেট (RuBP)। তোমরা কি কেউ এই সম্ভাবনার কথা ভাবতে পেরেছিলে? চিন্তার কিছু নেই, বিজ্ঞানীরাও অনেক সময় নিয়ে অনেক পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। তারা এটাও বিশ্বাস করেছিলেন যে যেহেতু প্রথম সৃষ্ট উপজাত বস্তুটি একটি C_3 অম্ল তাই প্রাথমিক গ্রাহকটি হয়ত একটি দুই কার্বন বিশিষ্ট যৌগ; তবে 5 কার্বন বিশিষ্ট RuBP কে আবিষ্কারের পূর্বে তারা দুই কার্বনযুক্ত যৌগটিকে সনাক্ত করনের জন্য বহু বছর ধরে চেষ্টা করেছিলেন।

13.7.2 কেলভিন চক্র (Calvin Cycle)

কেলভিন এবং তার সহকর্মীরা এরপর কার্বন ডাই অক্সাইড আত্তীকরণের সম্পূর্ণ বিক্রিয়া পথটি বের করেছিলেন এবং তারা দেখিয়েছিলেন যে, এই বিক্রিয়া পথটি চক্রাকারে সংঘটিত হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় RuBP পুনরুৎপাদিত হয়েছিল। এখন চল আমরা দেখি কীভাবে কেলভিন চক্রটি চলে এবং কোথায় শর্করা সংশ্লেষিত হয়? এটা আমাদের পরিষ্কার বুঝে নিতে হবে যে C_3 অথবা C_4 (অথবা অন্য কোন) নির্বিশেষে সব সালোকসংশ্লেষকারী উদ্ভিদেই কেলভিন চক্র ঘটে (চিত্র 7.8 দেখো)।

সহজভাবে বোঝার জন্য কেলভিন চক্রকে C_3 বা C_4 বা অন্য কোন বিক্রিয়াপথ বিশিষ্ট — তিনটি ধাপে বর্ণনা করা যেতে পারে। এগুলি হলো কার্বন স্থিতিকরণ (Carboxylation) দশা, বিজারন (Reduction) দশা এবং পুনরুৎপাদন (Regeneration) দশা।

1. কার্বন ডাই অক্সাইডের স্থিতিকরণ দশা (Carboxylation) :

কার্বন ডাই অক্সাইড স্থিতিকরণ হল একটি স্থায়ী অন্তর্বর্তী যৌগে CO_2 এর আবদ্ধ হওয়া। কার্বন ডাই অক্সাইড স্থিতিকরণ হচ্ছে কেলভিন চক্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় যেখানে RuBP র কার্বক্সিলেশনের জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহৃত হয়। বিক্রিয়াটি RuBP কার্বক্সিলেজের প্রভাবে ঘটে। এর ফলে দুই অণু

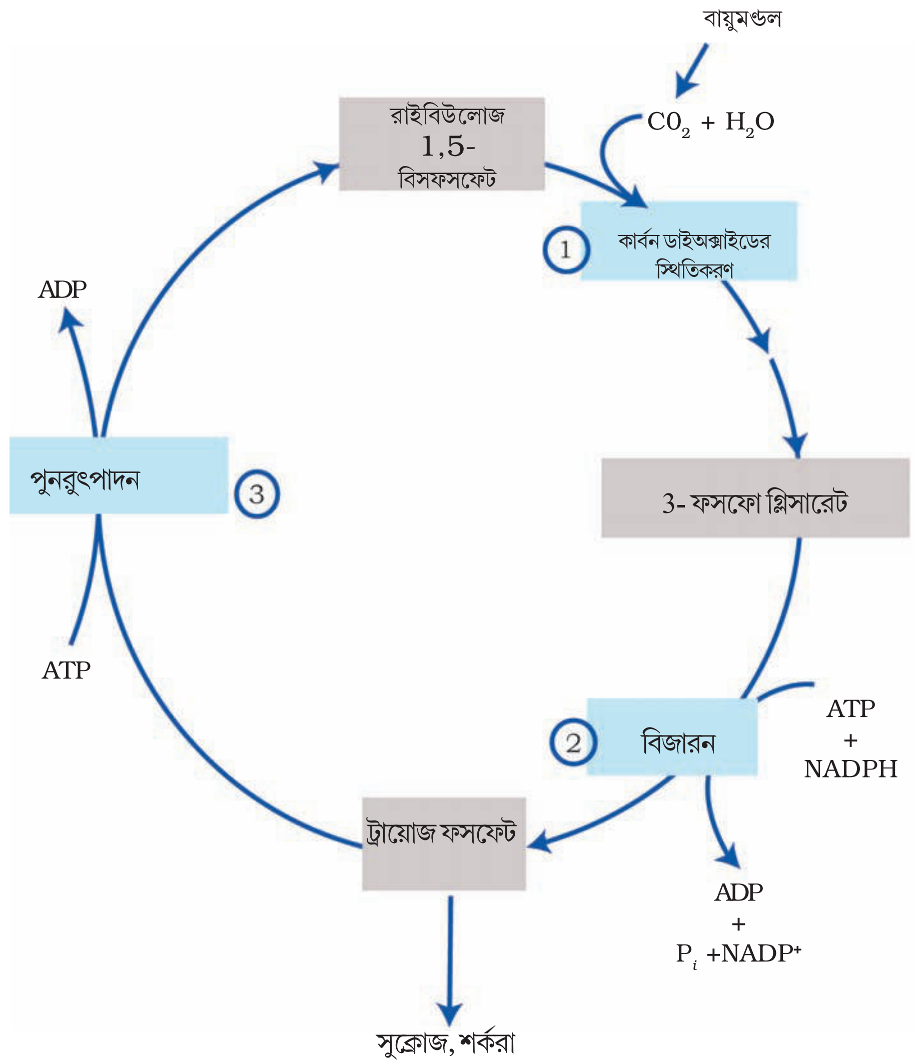

চিত্র 13.8 কেলভিন চক্রটি তিনটি পর্যায়ে সংঘটিত হয় : (1) কার্বন ডাই অক্সাইড এর স্থিতিকরণ — CO_2 এর রাইবিউলোজ 1,5, বিসফসফেটে সংযুক্তি (2) বিজারন-ATP ও NADPH এর উপস্থিতিতে আলোক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ও শর্করা তৈরি (3) পুনরুৎপাদন-রাইবিউলোজ 1.5 বিসফসফেটের পুনরুৎপাদন।

3-PGA (ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড) উৎপন্ন হয়। যেহেতু এই উৎসেচকটি RuBP র সহিত অক্সিজেন সংযুক্তিকেও প্রভাবিত করে, তাই এই উৎসেচকটিকে RuBP কার্বক্সিলেজ অক্সিজিনেজ বা RuBISCO (রাইবিউলোজ বিস ফসফেট কার্বক্সিলেজ অক্সিজিনেজ) বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে।

2. বিজারন (Reduction)

এই ধাপগুলোতে ক্রমানুসারে অনেকগুলো বিক্রিয়া ঘটে এবং এর ফলস্বরূপ গ্লুকোজ তৈরি হয়। এই ধাপগুলোতে ফসস্ফোরীভবনের জন্য 2 অণু ATP এবং যৌগে আবদ্ধ প্রতি অণু CO_2 এর বিজারনের জন্য 2 অণু NADPH ব্যবহৃত হয়। এই বিক্রিয়া পথ থেকে এক অণু গ্লুকোজ পাওয়ার জন্য 6 অণু CO_2 এর স্থিতিকরণ এবং কেলভিন চক্রের 6 বার আবর্তন প্রয়োজন।

3. পুনরুৎপাদন (Regeneration)

এই চক্রটি অবিরত চলতে হলে CO_2 গ্রাহক অণু RuBP র পুনরুৎপাদন খুবই জরুরী। এই পুনরুৎপাদন ধাপে

এক অণু RuBP উৎপন্ন হয় এবং এরজন্য ফস্ফোরীভবনের সাহায্যে এক অণু ATP প্রয়োজন হয়।

সুতরাং কেলভিন চক্রে প্রবিষ্ট প্রতি অণু CO_2 এর আত্তীকরণের জন্য তিন অণু ATP এবং দুই অণু NADPH এর প্রয়োজন হয়। সম্ভবত অন্ধকার দশা বা আলোক নিরপেক্ষ দশায় ব্যবহৃত এই ATP এবং NADPH অণুর সংখ্যার পার্থক্য মেটাতে আবর্তকার ফসফোরীভবন ঘটে।

এক অণু গ্লুকোজ তৈরি করার জন্য চক্রটির 6 বার আবর্তন প্রয়োজন। তাহলে কেলভিন চক্রের মাধ্যমে এক অণু গ্লুকোজ সংশ্লেষনের জন্য কতগুলো ATP ও NADPH প্রয়োজন হবে তা বের করো ?

এ সম্পর্কিত সবকিছু তখনই তুমি বুঝতে পারবে যখন আমরা কেলভিন চক্রে কী কী উপাদান ব্যবহৃত হচ্ছে আর কী উৎপন্ন হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সেদিকে তাকাই।

কেলভিন চক্রে ব্যবহৃত উপাদান	কেলভিন চক্রে উৎপন্ন উপাদান
6 অণু CO_2 18 ATP 12 NADPH	এক অণু গ্লুকোজ 18 ADP 12 NADP

13.8 C_4 বিক্রিয়া পথ (The C_4 Pathway)

যেসব উদ্ভিদেরা শুষ্ক ক্রান্তীয় অঞ্চলে বসবাসের জন্য অভিযোজিত হয় সেইসব উদ্ভিদেই C_4 বিক্রিয়া পথটি দেখা যায়, যে বিক্রিয়া পথটির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এইসব উদ্ভিদে কার্বন ডাই অক্সাইড স্থিতিকরণের ফলে প্রথম যৌগ হিসাবে C_4 অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড (OAA) উৎপন্ন হয়। তবু C_3 চক্র বা কেলভিনচক্রই এদের মূল সংশ্লেষ দশা। তাহলে এসব উদ্ভিদরা C_3 উদ্ভিদ থেকে কোন্ কোন্ দিকে আলাদা হয় ? তোমাদের মনে প্রশ্নটা আসা খুবই স্বাভাবিক।

C_4 উদ্ভিদেরা বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ : এদের পাতায় বিশেষ ধরনের শারীরস্থানিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, এরা অধিক উষ্ণতা সহ্য করতে পারে। আলোকের অধিক তীব্রতায় সাড়া দিতে পারে, আলোক শ্বসন প্রক্রিয়াটি দেখা যায় না এবং এদের দেহে বায়োমাসের অধিক উৎপাদন ঘটে। এবার আমরা এইগুলোকে একে একে বোঝার চেষ্টা করি।

এবার একটি C_3 উদ্ভিদ এবং C_4 উদ্ভিদের পাতার লম্বচ্ছেদ অধ্যয়ন করো। তুমি কি কিছু পার্থক্য লক্ষ করলে ? উভয়ের ক্ষেত্রে কি একই ধরনের মেসোফিল কলা রয়েছে ? এদের নালিকা বান্ডিলকে ঘিরে থাকা আবরণীতে কি একই ধরনের কোশ থাকে ?

C_4 বিক্রিয়া পথ দেখা যায় এমন উদ্ভিদগুলোর নালিকা বান্ডিলকে ঘিরে থাকা প্রধানত বড় কোশগুলিকে **বান্ডিল শিদ্ কোশ** বলে আর যে সমস্ত পাতায় এই ধরনের শারীরস্থানিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাদের এই ধরনের কলাস্থানিক গঠনকে **ক্রাঞ্জ অ্যানাটমি** (Kranz Anatomy) বলে। ক্রাঞ্জ (Kranz) কথার অর্থ হল 'বলয়' বা 'মালা' এবং এটি কোশের সজ্জাক্রমকে নির্দেশ করে। এই বান্ডিল শিদ কোশগুলি নালিকা বান্ডিলকে ঘিরে অনেকগুলি স্তর তৈরি করতে পারে এবং এই স্তরগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল অধিক সংখ্যক ক্লোরোপ্লাস্টের উপস্থিতি, গ্যাসীয় বিনিময়ে অক্ষম এমন পুরো প্রাচীর, কোশান্তর স্থানের অনুপস্থিতি। তোমরা কিছু C_4 উদ্ভিদ যেমন ভুট্টা বা বার্লি প্রভৃতি পাতার ছেদ কেটে এই ক্রাঞ্জ অ্যানাটমি এবং মেসোফিল কোশের বিস্তৃতি দেখতে পার।

তোমরা খুবই মজা পাবে যদি তোমরা তোমাদের চারপাশের বৈচিত্র্যময় প্রজাতির উদ্ভিদের পাতা সংগ্রহ কর এবং এই পাতাগুলোর লম্বচ্ছেদ করে দেখো। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নালিকা বান্ডিলগুলোকে ঘিরে থাকা বান্ডিল শিদ্‌টি খুঁজে দেখো। বান্ডিল শিদের উপস্থিতি তোমাকে C_4 উদ্ভিদের শনাক্তকরণে সাহায্য করবে। এখন চিত্র 13.9 এ প্রদর্শিত বিক্রিয়াপথটি অধ্যয়ন করো। এই বিক্রিয়াপথটিও আবার একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া যাকে হ্যাচ ও স্ল্যাক (Hatch and Slack Pathway) বিক্রিয়াপথ বলে। চলো আমরা নিম্নে বর্ণিত ধাপের ক্রমিক এই বিক্রিয়া পথটি অধ্যয়ন করি।

এই বিক্রিয়া পথে দেখা যাচ্ছে যে প্রাথমিক CO_2 গ্রাহকটি একটি তিন কার্বনযুক্ত যৌগ ফসফোএনল পাইরুভেট (PEP), এটি মেসোফিল কোশেই উপস্থিত। এই স্থিতিকরণ বিক্রিয়াটি PEP কার্বক্সিলেজ (PEP Case) উৎসেচকের প্রভাবে ঘটে। এখানে এটিও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে মেসোফিল কোশে কিন্তু RuBisCO উৎসেচক থাকেনা। C_4 অম্ল অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড (OAA) মেসোফিল কোশেই তৈরি হয়।

OAA বা অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড থেকে পরে মেসোফিল কোশেই ম্যালিক অ্যাসিড বা অ্যাসপারটিক অ্যাসিড এর মতো অন্যান্য চার কার্বন বিশিষ্ট কার্বন যৌগগুলি তৈরি হয় ও পরে বান্ডিল শিদ্‌ কোশে

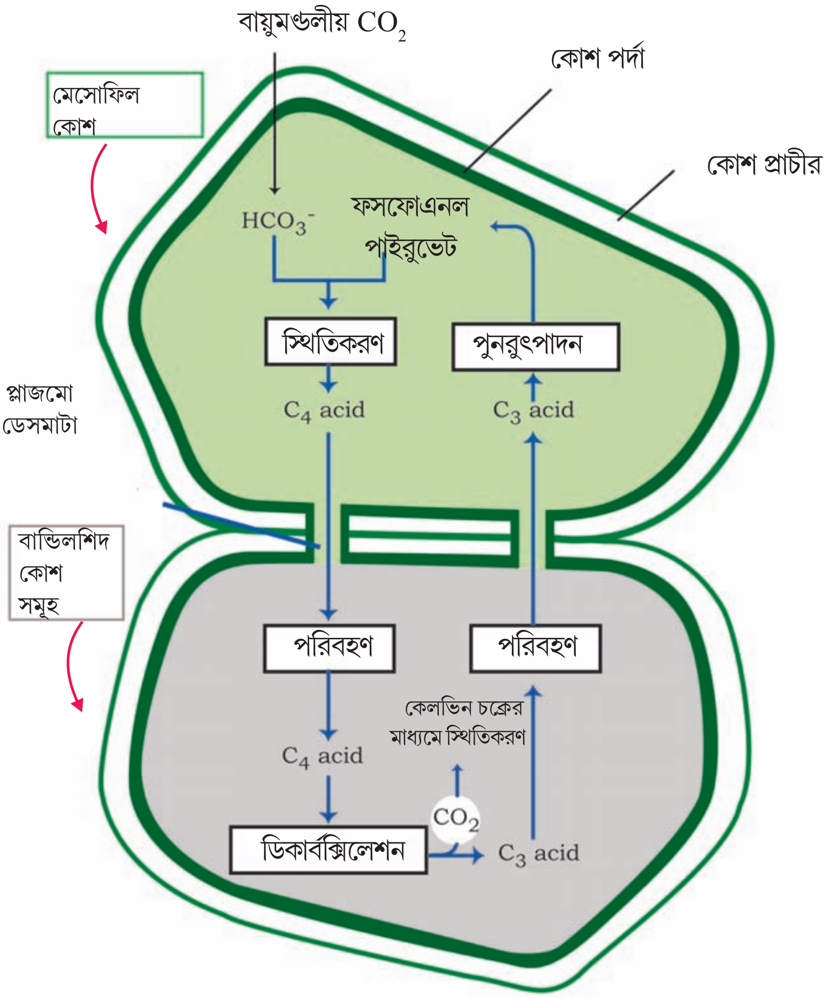

চিত্র 13.9 : হ্যাচ এবং স্ল্যাক পথে-র (Hatch and slack Pathway) চিত্ররূপ

.ঙ

পরিবাহিত হয়। এই বান্ডিল শিদ্ কোশেই C_4 অম্লগুলো ভেঙে CO_2 এবং 3 কার্বনযুক্ত যৌগ উৎপন্ন করে।

তিন কার্বনযুক্ত যৌগটি পুনরায় মেসোফিল কোশে ফিরে আসে এবং আবার ফসফো এনোল পাইরুভেটে পরিণত হয়, এইভাবে চক্রটি সম্পূর্ণ হয়।

বান্ডিল শিদ্ কোশে নির্গত CO_2, C_3 বা কেলভিন চক্রে প্রবেশ করে, যে চক্রটি সচরাচর সব উদ্ভিদেই ঘটে। বান্ডিল শিদ্ কোশগুলি রাইবিউলোজ বিস্ফসফেট কার্বক্সিলেজ অক্সিজিনেজ (RuBisCO) উৎসেচক সমৃদ্ধ হয় কিন্তু এই কোশগুলোতে ফসফো এনোল পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ (PEP Case) থাকে না। তাই শর্করা সংশ্লেষের মূল বিক্রিয়া পথ কেলভিন চক্রটি C_3 এবং C_4 উভয় উদ্ভিদেই দেখা যায়।

তোমরা কি লক্ষ করেছ যে C_3 উদ্ভিদের সব মেসোফিল কোশেই কেলভিন চক্রটি ঘটে? এই চক্রটি মেসোফিল কোশে ঘটেনা, কিন্তু শুধুমাত্র বান্ডিল শিদ কোশসমূহে ঘটে।

13.9 আলোক শ্বসন (Photorespiration) ঃ

চল আমরা অন্য একটি প্রক্রিয়া অর্থাৎ আলোক শ্বসন প্রক্রিয়াটি বোঝার চেষ্টা করি যা C_3 এবং C_4 উদ্ভিদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তৈরি করে। আলোক শ্বসন প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে বুঝতে হলে আমাদের কেলভিন চক্রের প্রথম ধাপটি অর্থাৎ CO_2 র স্থিতিকরণ ধাপটি আরও একটু বিশদে জানতে হবে। RuBP, CO_2 এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে RuBisCO র প্রভাবে 2 অণু 3-PGA উৎপন্ন করে।

$$\text{RuBP} + CO_2 \xrightarrow{\text{RuBisCO}} 2 \times 3\text{PGA}$$

RuBisCO হচ্ছে সেই উৎসেচক যেটি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। (তোমরা কি আশ্চর্য হয়েছ? কেন?) এই উৎসেচকটির সক্রিয়ক স্থানে CO_2 এবং O_2 উভয়ই যুক্ত হতে পারে এবং তাই এরূপ নামকরণ হয়েছে। তোমরা কি ভাবতে পার কিভাবে তা সম্ভব? RuBisCO র O_2 এর তুলনায় CO_2 এর প্রতি অধিক আসক্তি দেখা যায়। কল্পনা করো এমন না হলে কী হত! এই সংযুক্তি প্রতিযোগিতামূলক। এটি O_2 এবং CO_2 এর আপেক্ষিক ঘনত্বের উপর নির্ভর করে এবং এই আপেক্ষিক ঘনত্বই স্থির করে উৎসেচকটি কার সাথে যুক্ত হবে।

C_3 উদ্ভিদে কিছু পরিমাণ O_2 তাই RuBisCO এর সাথে যুক্ত হয় এবং ফলে CO_2 এর স্থিতিকরণ হ্রাস পায়। এখানে RuBP, 2 অণু PGA এ তে পরিণত হওয়ার পরিবর্তে O_2 এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক অণু ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড এবং ফসফোগ্লাইকোলিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। যে বিক্রিয়া পথে এই ঘটনাটি ঘটে তাকে আলোক শ্বসন বলে। এই আলোক শ্বসন পথে যেমন শর্করা সংশ্লেষিত হয় না তেমনি ATPও উৎপন্ন হয় না বরঞ্চ এই প্রক্রিয়াটিতে ATP ব্যবহারের মাধ্যমে CO_2 এর মুক্তি ঘটে। আলোক শ্বসন প্রক্রিয়াটিতে কোনো ATP বা NADPH সংশ্লেষিত হয় না তাই আলোক শ্বসন একটি অপচয়কারী প্রক্রিয়া।

C_4 উদ্ভিদে আলোক শ্বসন ঘটে না এর কারণ হল এই যে তাদের দেহে এমন একটি পদ্ধতি রয়েছে যা উৎসেচক সংলগ্ন স্থানে CO_2 এর ঘনত্ব বৃদ্ধি করে। এই ঘটনাটি সে সময় ঘটে যখন মেসোফিল কোশ থেকে আগত C_4 অম্লটি বান্ডিল শিদ কোশে ভেঙে গিয়ে CO_2 উৎপন্ন করে। তখনই CO_2 এর অন্তঃকোশীয় ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। বিপরীতভাবে এই ঘটনাটি RuBisCO উৎসেচকটির অক্সিজিনেজ কার্যপদ্ধতি কমিয়ে কার্বক্সিলেজ উৎসেচক রূপে কাজ করা সুনিশ্চিত করে।

এখন থেকে তোমরা জান C_4 উদ্ভিদের আলোক শ্বসন ঘটে না, তোমরা সম্ভবত এটাও বুঝে গেছ কেন C_4 উদ্ভিদে উৎপাদনশীলতা ও ফলন ক্ষমতা অধিকতর। এছাড়া এই উদ্ভিদরা উচ্চতাপমাত্রা ও সহ্য করতে পারে।

উপরের আলোচনার উপর ভিত্তি করে তোমরা কি সেই উদ্ভিদ গোষ্ঠীকে তুলনা করতে পারবে যার একটিতে C_3 বিক্রিয়া পথ এবং অপরটিতে C_4 বিক্রিয়া পথ ঘটতে দেখা যায়? সারণি তালিকাটি ব্যবহার করো এবং শূন্যস্থান পূরণ করো।

তালিকা 13.1 - C_3 এবং C_4 উদ্ভিদের পার্থক্য বুঝার জন্য সারণি
তালিকাটির স্তম্ভ 2 এবং স্তম্ভ 3 পূর্ণ করো

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	C_3 উদ্ভিদ	C_4 উদ্ভিদ	সঠিক উত্তরটি বেছে নাও
কোশের ধরন যেখানে কেলভিন চক্র ঘটে			মেসোফিল/বান্ডিলশিদ/উভয়ই
কোশের ধরন যেখানে কার্বন স্থিতিকরণের প্রারম্ভিক বিক্রিয়া ঘটে।			মেসোফিল/বান্ডিলশিদ/উভয়ই
পাতাস্থিত কত ধরনের কোশ CO_2 স্থিতিকরণ ঘটায়			দুই: বান্ডিলশিদ এবং এক: মেসোফিল তিন: বান্ডিলশিদ, প্যালিসেড, স্পঞ্জী মেসোফিল
প্রাথমিক CO_2 গ্রাহক কোনটি			RuBP/PEP/PGA
প্রাথমিক CO_2 গ্রাহকে কার্বন সংখ্যা কত			5/4/3
CO_2 প্রাথমিক স্থিতিকরণে উৎপন্ন বস্তু কোনটি?			PGA/OAA/RuBP/PEP
CO_2 স্থিতিকরণে প্রাথমিক উৎপাদিত যৌগে কার্বন সংখ্যা-			3/4/5
উদ্ভিদদেহে কোনো RuBisCO আছে কি?			হ্যাঁ / না/ সর্বদা নয়
উদ্ভিদদেহে কোনো PEP Case আছে কি?			হ্যাঁ / না/ সর্বদা নয়
উদ্ভিদদেহে কোনো কোশগুলোতে RuBisCO বর্তমান?			মেসোফিল/বান্ডিলশিদ/কোনোটিতেই নয়
উচ্চ আলোকিত অবস্থায় CO_2 স্থিতিকরণের হার RuBisCO বর্তমান?			খুব কম/বেশি/মাঝামাঝি
কম তীব্র আলোতে আলোক শ্বসন হয় কি?			বেশি/ খুব সামান্য/ কখনো
বেশি তীব্র আলোতে আলোক শ্বসন হয় কি?			বেশি/ খুব সামান্য/ কখনো
নিম্ন CO_2 ঘনত্বে আলোক শ্বসন হয় কি?			বেশি/ খুব সামান্য/ কখনো
উচ্চ CO_2 ঘনত্বে আলোক শ্বসন হয় কি?			বেশি/ খুব সামান্য/ কখনো
সর্বাপেক্ষা অনুকূল তাপমাত্রা			30-40^0 C/20-25^{0}C/above 40 C
উদাহরণ সমূহ			বিভিন্ন উদ্ভিদের পাতার লম্বচ্ছেদ করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করো এবং এগুলোতে ক্রাঞ্জ অ্যানাটমি দেখা যায় কিনা দেখো এবং এদের উপযুক্ত স্তম্ভে তালিকা ভুক্ত করো।

13.10 সালোকসংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবক (Factors affecting Photosynthesis)ঃ

সালোকসংশ্লেষকে প্রভাবিত করে এমন প্রভাবকগুলো ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। শস্য উদ্ভিদসহ বিভিন্ন উদ্ভিদের ফলন নির্ধারণে সালোকসংশ্লেষের হার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি অন্তঃস্থ (উদ্ভিদ) এবং বহিঃস্থ উভয় ধরনের বিভিন্ন প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত হয়। উদ্ভিজ্জ প্রভাবকগুলি হলো পাতার সংখ্যা, আকার, বয়স এবং পাতার বিন্যাস, মেসোফিল কোশ সমূহ এবং ক্লোরোপ্লাস্ট, অভ্যন্তরীণ CO_2 এর ঘনত্ব এবং ক্লোরোফিলের পরিমাণ। উদ্ভিজ্জ অথবা অন্তঃস্থ প্রভাবকগুলো উদ্ভিদ কোশের জিনের বৈশিষ্ট্য এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে।

বহিঃস্থ প্রভাবকগুলো হল সূর্যালোকের প্রতুলতা, উষ্ণতা, CO_2 এর ঘনত্ব এবং জল। যখন উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ করে এইসব প্রভাবকগুলো একইসাথে এর হারকে প্রভাবিত করবে। তাই যদিও বহু প্রভাবক পারস্পরিক ক্রিয়া করে এবং একই সাথে সালোকসংশ্লেষ বা CO_2 স্থিতিকরণকে প্রভাবিত করে তথাপি সাধারণত একটি প্রভাবকই প্রক্রিয়াটির হার নিয়ন্ত্রণের মূল কারণ অথবা এর হারকে সীমিত রাখে। সুতরাং সালোকসংশ্লেষীয় হার যে কোনো সময় সেই প্রভাবক দ্বারাই নির্ধারিত হয় যে সর্বাপেক্ষা অনুকূল মানের কাছাকাছি থাকে।

যখন কোনো জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনেকগুলো প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন ব্ল্যাকম্যানের সীমাস্থ সূত্র (1905) মেনে চলে। সূত্রটি হলো "যদি কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া একাধিক প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন এই প্রক্রিয়ার হার সেই প্রভাবক দ্বারাই নির্ধারিত হবে যার মান ন্যূনতম মানের কাছাকাছি থাকবে, এটি হল সেই প্রভাবক যে প্রক্রিয়াটিকে সরাসরি প্রভাবিত করে যখন এর মাত্রার বা পরিমাণের পরিবর্তন ঘটে।"

উদাহরণস্বরূপ সবুজ পাতা, উপযুক্ত আলোক এবং CO_2 এর ঘনত্ব ঠিক থাকলেও উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ নাও করতে পারে, যদি উষ্ণতা খুবই কম হয়। এই পাতাটিকেই যখন সর্বাপেক্ষা অনুকূল উষ্ণতায় রাখা হয়, তখনই সালোকসংশ্লেষ শুরু হবে।

13.10.1 আলোক (Light)

যখন আমরা আলোককে সালোকসংশ্লেষের একটি প্রভাবক হিসাবে আলোচনা করব তখন আমাদের আলোকের গুণমান, আলোকের তীব্রতা এবং আলোকের স্থিতিকালের মধ্যে তুলনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে নিম্ন আলোক তীব্রতায় আপতিত আলো এবং CO_2 স্থিতিকরণের হারের মধ্যে একটি সরলরৈখিক সম্পর্ক পাওয়া যায়। যেহেতু অন্য প্রভাবকগুলো সীমিত মাত্রায় থাকে তাই উচ্চ আলোক তীব্রতায় এই হারের আর ক্রমবৃদ্ধি ঘটেনা। মজার বিষয় হল এই যে পূর্ণ সূর্যালোকের মাত্র ১০ শতাংশ স্থানেই আলোক সম্পৃক্তি ঘটে। সুতরাং যে সমস্ত উদ্ভিদ ছায়া ঘেরা অঞ্চল কিংবা গভীর অরণ্যে জন্মানো উদ্ভিদগুলো ছাড়া কদাচিৎই আলোক সীমাস্থ প্রভাবক হিসাবে কাজ করে। একটি নির্দিষ্ট সীমার পরে আপতিত আলোর পরিমাণ বাড়লে ক্লোরোফিল অণু ভেঙে যায় এবং সালোক সংশ্লেষ হ্রাস পায়।

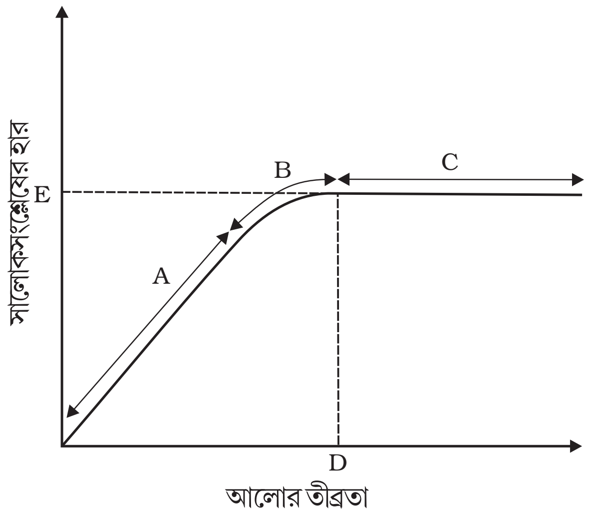

চিত্র 13.10 ঃ সালোকসংশ্লেষীয় হারের উপর আলোকের তীব্রতার প্রভাবের লেখচিত্র

13.10.2 কার্বন ডাই অক্সাইড এর ঘনত্ব (Carbondioxide Concentration) ঃ

কার্বন ডাই অক্সাইড সালোকসংশ্লেষের একটি মুখ্য সীমাস্থ প্রভাবক। বায়ুমন্ডলে CO_2 এর ঘনত্ব খুব কম (0.03% ও 0.04% এর মধ্যে)। যদি CO_2 এর ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়ে 0.05% পর্যন্ত হয়, তখন CO_2 এর স্থিতিকরণের হার বৃদ্ধি পেতে পারে। CO_2 এর ঘনত্ব 0.05% এর বেশি হলে দীর্ঘ সময় ধরে এর ক্ষতিকারক প্রভাব বজায় থাকতে পারে।

C_3 এবং C_4 উদ্ভিদেরা CO_2 ঘনত্বে ভিন্ন ভিন্নভাবে সাড়া দেয়। কম আলোতে C_3 বা C_4 উদ্ভিদের কোনো গোষ্ঠীই উচ্চ CO_2 ঘনত্বে সাড়া দেয় না। আলোকের অধিক তীব্রতায় C_3 এবং C_4 উভয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই সালোকসংশ্লেষের হার বৃদ্ধি পায়। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে C_4 উদ্ভিদের ক্ষেত্রে CO_2 সম্পৃক্তি প্রায় $360\mu lL^{-1}$ ঘনত্বে ঘটে আবার C_3 উদ্ভিদেরা CO_2 এর ঘনত্ব বৃদ্ধিতে সাড়া দেয় এবং কেবলমাত্র $450\mu lL^{-1}$ এর উপরেই CO_2-এর সম্পৃক্তি ঘটে। তাই বায়ুমন্ডলে উপস্থিত CO_2 এর পরিমাণ C_3 উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সীমাস্থ প্রভাবক।

ঘটনাটি হল এই যে C_3 উদ্ভিদেরা উচ্চ CO_2 ঘনত্বে সাড়া দেয় তাই সালোকসংশ্লেষের হার বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলশ্রুতিতে এরা উচ্চফলনশীল হয়। এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে টমেটো এবং ক্যাপসিকাম (বেল পেপার) মতো কিছু গ্রীনহাউস শস্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা হয়। অধিক ফলন পাওয়ার জন্য CO_2 সমৃদ্ধ বায়ুমন্ডলীয় পরিবেশে এই সব উদ্ভিদের চাষ করা হয়।

13.10.3 উষ্ণতা (Temperature)ঃ

অন্ধকার দশার বিক্রিয়াগুলো উৎসেচক নির্ভর হওয়ায় এরা উষ্ণতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যদিও আলোক দশার বিক্রিয়াগুলোও উষ্ণতার প্রতি সংবেদনশীল তবুও এক্ষেত্রে উষ্ণতার প্রভাব অনেকটাই কম। C_4 উদ্ভিদেরা অধিক উষ্ণতায় সাড়া দেয় এবং এদের ক্ষেত্রে সালোকসংশ্লেষের হারও বেশি হয় কিন্তু C_3 উদ্ভিদদের সর্বাপেক্ষা অনুকূল মান অনেকটাই কম হয়।

বিভিন্ন উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের জন্য সর্বাপেক্ষা অনকূল তাপমাত্রা ও বাসস্থানের (অর্থাৎ যে স্থানে এরা বসবাসের উপযোগী) উপর নির্ভর করে। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে বসবাসকারী উদ্ভিদের তুলনায় ক্রান্তীয় অঞ্চলে বসবাসকারী উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষের জন্য অনুকূল তাপমাত্রা অনেকটাই বেশি হয়।

13.10.4 জল (Water)

যদিও আলোক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কগুলোর মধ্যে জলও একটি বিক্রিয়ক, তবুও প্রভাবক হিসাবে সরাসরি সালোকসংশ্লেষের উপর যতটা প্রভাব তার তুলনায় উদ্ভিদদেহের উপর অনেকটাই বেশি। জলের অভাবজনিত কারণে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায় এবং এর ফলে CO_2 এর প্রতুলতা হ্রাস পায়। এছাড়া জলের অভাবে পাতাগুলোও নুইয়ে যায়, তাই পাতাগুলোর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল ও তাদের বিপাকীয় ক্রিয়ার হারও হ্রাস পায়।

সার সংক্ষেপ (Summary)

সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নিজের খাদ্য তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল থেকে পাতার পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে CO_2 পাতায় গৃহীত হয় এবং শর্করা মূলত গ্লুকোজ এবং শ্বেতসার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সালোকসংশ্লেষ কেবলমাত্র উদ্ভিদের সবুজ অংশ প্রধানত পাতাতেই ঘটে। পাতায় মেসোফিল কোশসমূহে উপস্থিত অধিক সংখ্যক ক্লোরোপ্লাস্ট CO_2 স্থিতিকরণের জন্য দায়ী। ক্লোরোপ্লাস্টের ভেতরে উপস্থিত পর্দাগুলোতে আলোক দশা ঘটে। অপরদিকে রাসায়নিক সংশ্লেষ স্ট্রোমা অংশে ঘটে। সালোক সংশ্লেষ দুটি দশায় হয়: আলোক দশা এবং কার্বন স্থিতিকরণ বিক্রিয়া। আলোক দশায় আলোক শক্তি, **অ্যান্টেনাস্থিত** রঞ্জক দ্বারা শোষিত হয় এবং বিশেষ ক্লোরোফিল a অণু অর্থাৎ বিক্রিয়া কেন্দ্র ক্লোরোফিল এ চালিত হয়। এখানে দুটি রঞ্জকতন্ত্র রয়েছে, রঞ্জকতন্ত্র-I এবং রঞ্জকতন্ত্র-II। রঞ্জকতন্ত্র-I এর বিক্রিয়া কেন্দ্রে রয়েছে 700 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক শোষণকারী ক্লোরোফিল a P_{700} অণু এবং অন্যদিকে রঞ্জকতন্ত্র-II এর বিক্রিয়া কেন্দ্রটি হলো P_{680}, ক্লোরোফিল a অণু যা 680nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যে লাল আলোক শোষণ করে। আলোক শোষণের পর ইলেকট্রনগুলো উদ্দীপিত হয় এবং PSII এবং PSI এর মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে পরিশেষে NAD তে পৌঁছায়, এর ফলে NAD, NADH এ পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ায় থাইলাকয়েডের পর্দার মধ্য দিয়ে একটি প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট সৃষ্টি হয়। ATPase উৎসেচকের F_O অংশের মধ্য দিয়ে চলাচলের সময় এই প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট ভেঙে যায় এবং ATP সংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি মুক্ত হয়। জলের অণুর বিয়োজন রঞ্জক তন্ত্র - II এর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এর ফলে O_2, প্রোটন নির্গত হয় এবং ইলেকট্রনগুলো রঞ্জকতন্ত্র-II তে পরিবাহিত হয়।

কার্বন স্থিতিকরণ চক্রে CO_2, 5 কার্বন বিশিষ্ট যৌগ RuBP এর সঙ্গে, RuBisCO উৎসেচকের প্রভাবে যুক্ত হয় এবং এর ফলে RuBP দুই অণু তিন কার্বন বিশিষ্ট যৌগ PGA তে পরিণত হয়। এই PGA তখন কেলভিন চক্রের মাধ্যমে শর্করায় পরিণত হয় ও RuBP র পুনরুৎপাদন ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় আলোক দশায় সংশ্লেষিত ATP এবং NADPH ব্যবহৃত হয়। RuBisCO র প্রভাবে C_3 উদ্ভিদে আরও একটি অপচয়কারী অক্সিজেন সংযুক্তিকরণ বিক্রিয়াও ঘটে যা হল আলোক শ্বসন।

কিছু ক্রান্তীয় অঞ্চলের উদ্ভিদে একটি বিশেষ ধরনের সালোকসংশ্লেষের উপস্থিতি দেখা যায় যাকে C_4 বিক্রিয়া পথ বলে। এই উদ্ভিদগুলোর মেসোফিল কলায় কার্বন স্থিতিকরণের ফলে উৎপন্ন প্রথম যৌগটি একটি 4 কার্বন বিশিষ্ট যৌগ। শর্করা সংশ্লেষণের জন্য এইসব উদ্ভিদের পাতার বান্ডিল শিদ কোশে কেলভিন চক্র ঘটে।

অনুশীলনী

1. কোনো উদ্ভিদের বহিঃস্থ গঠন দেখে তুমি কি বলতে পার উদ্ভিদটি C_3 না C_4 উদ্ভিদ? কেন এবং কীভাবে?
2. কোনো অভ্যন্তরীন গঠন দেখে তুমি বলতে পারবে উদ্ভিদটি কি C_3 না C_4 উদ্ভিদ? ব্যাখ্যা করো।
3. যদিও C_4 উদ্ভিদের খুব অল্প কোশেই সংশ্লেষ দশা অর্থাৎ কেলভিন চক্র ঘটে তবুও এরা ফলনশীল। তোমরা কি

আলোচনা করতে পার কেন এরূপ হয় ?

4. RuBisCO হল এমন একটি উৎসেচক যা কার্বক্সিলেজ এবং অক্সিজিনেজ উভয় রূপেই কাজ করতে পারো তোমরা কেন ভাবছ RuBisCO, C_4 উদ্ভিদে বেশি কার্বক্সিলেশন ঘটায় ?

5. ধরো কোন উদ্ভিদে ক্লোরোফিল b এর ঘনত্ব বেশি কিন্তু ক্লোরোফিল a অনুপস্থিত, এই উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষ ঘটবে কি ? যদি হয় তাহলে উদ্ভিদ দেহে ক্লোরোফিল b এবং অন্যান্য সহায়ক রঞ্জকগুলো থাকে কেন ?

6. অন্ধকারে রাখা হলে পাতার বর্ণ কেন হলুদ বা হলদেটে সবুজ হয়ে যায় ? কোন্ রঞ্জকটি অধিক স্থিতিশীল বলে তুমি মনে কর ?

7. একই উদ্ভিদের একটি পাতাকে আলোকিত স্থানে এবং অপর একটি পাতাকে ছায়া ঘেরা স্থানে রেখে এদের তুলনা করে দেখ বা টবে লাগানো একটি উদ্ভিদকে সূর্যালোকে রেখে তার সাথে ছায়া ঘেরা স্থানে জন্মানো উদ্ভিদের তুলনা করো। কোন্ গাছটির পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণের এবং কেন ?

8. 13.10 চিত্রে সালোকসংশ্লেষের হারের উপর সূর্যালোকের প্রভাব দেখানো হয়েছে। এই লেখচিত্রটি উপর নির্ভর করে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও —

   (ক) এই লেখচিত্রের কোন্ বিন্দু/ বিন্দুগুলোতে (A,B বা C) আলোক একটি সীমাস্থ প্রভাবক।

   (খ) A অঞ্চলের সীমাস্থ প্রভাবক কোনটি হতে পারে ?

   (গ) এই লেখচিত্রে C এবং কী উপস্থাপন করছে ?

9. নিম্নলিখিত গুলোর মধ্যে তুলনা করো ঃ

   (ক) C_3 এবং C_4 বিক্রিয়া পথ

   (খ) আবর্তাকার এবং অনাবর্তকার ফসফোরীভবন।

   (গ) C_3 এবং C_4 উদ্ভিদের পাতার শারীরস্থান।

অধ্যায় 14 (Chapter 14)
উদ্ভিদের শ্বসন (Respiration in Plants)

14.1 উদ্ভিদরা কি শ্বাসকার্য চালায়?
14.2 গ্লাইকোলাইসিস
14.3 সন্ধান
14.4 সবাত শ্বসন
14.5 শ্বসনে ব্যবহৃত ও উৎপন্ন শক্তির উদ্বত্তপত্র (Balance sheet)
14.6 উভয়মুখী বিপাকীয় পথ
14.7 শ্বাস অনুপাত

বেঁচে থাকার জন্য আমাদের সবাইকেই শ্বাসকার্য চালাতে হয়। কিন্তু কেন বেঁচে থাকার জন্য শ্বাসকার্য এতটা জরুরি? আমরা যখন শ্বাসকার্য চালাই, তখন কী ঘটে? উদ্ভিদ এবং অণুজীবসহ সব সজীব বস্তুই কি শ্বাসকার্য চালায়? যদি তাই হয় তবে কীভাবে?

সব সজীব বস্তুরই দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ, যেমন শোষণ, পরিবহণ, চলন, প্রজনন এমনকি শ্বাসকার্য সম্পাদনের জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। এই সব কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি কোথা থেকে আসে? আমরা সবাই জানি শক্তি পাওয়ার জন্যই আমরা খাদ্য গ্রহণ করি। কিন্তু কীভাবে খাদ্য থেকে এই শক্তি পাই এবং কীভাবেই বা এই শক্তি ব্যবহৃত হয়? সব খাদ্য থেকেই কি সমপরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়? উদ্ভিদরা কি 'খাদ্য গ্রহণ' করে? উদ্ভিদরা কোথা থেকে তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি পায়? অণুজীবের ক্ষেত্রে শক্তির চাহিদা কীভাবে পূরণ হয়, এরাও কি খাদ্যগ্রহণ করে?

তোমরা হয়তো বা উপরে উল্লিখিত এতগুলো প্রশ্ন দেখে অবাকই হয়েছ। প্রশ্নগুলো দেখে আপাতদৃষ্টিতে এটাই মনে হয় যে, এরা একে অপরের সাথে একেবারেই সম্পর্কিত নয়। কিন্তু বাস্তবে শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়া এবং খাদ্য থেকে শক্তির মুক্তি ঘটার প্রক্রিয়াটি একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। চলো আমরা বোঝার চেষ্টা করি কীভাবে এই প্রক্রিয়াগুলো ঘটে।

জীবন প্রক্রিয়া চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব শক্তি কিছু বৃহদাকার জৈব অণুর জারণের ফলে পাওয়া যায়, যেগুলোকে আমরা খাদ্য বলি। কেবলমাত্র সবুজ উদ্ভিদ এবং সায়ানো ব্যাকটিরিয়া সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় এরা সৌরশক্তিকে আবদ্ধ করে এবং এই শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে যা গ্লুকোজ, সুক্রোজ এবং শ্বেতসারের মতো শর্করার বন্ধনীগুলোতে সঞ্চিত থাকে। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে— সবুজ উদ্ভিদেরও সব কোশ, কলা এবং অঙ্গ সালোকসংশ্লেষ করতে পারে না, উদ্ভিদের শুধুমাত্র ক্লোরোপ্লাস্ট সমন্বিত কোশগুলোতেই সালোকসংশ্লেষ ঘটে। এই ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত কোশগুলো প্রায়শই উদ্ভিদ অঙ্গের উপরিতলে অবস্থান করে।

তবে এমনকি সবুজ উদ্ভিদের অসবুজ অন্য সব অঙ্গ, কলা এবং কোশের ও জারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। তাই উদ্ভিদের সব অ-সবুজ অংশে খাদ্যের পরিবহণ হওয়ার প্রয়োজন। প্রাণীরা পরভোজী (Heterotrophic) অর্থাৎ এরা উদ্ভিদ থেকে প্রত্যক্ষভাবে (উদাঃ তৃণভোজী) অথবা পরোক্ষভাবে (উদাঃ মাংসাশী) খাদ্য আহরণ করে। ছত্রাকের মতো মৃতজীবীরা খাদ্যের জন্য মৃত এবং পচনশীল জৈববস্তুর উপর নির্ভরশীল। এটা মানতেই হবে যে, জীবন প্রক্রিয়াগুলো চালানোর জন্য যে সব খাদ্যবস্তুর জারণ ঘটে সেগুলোও আসলে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াজাত। এই অধ্যায়ে কোশীয় শ্বসন বা শক্তির মুক্তির জন্য কোশের ভেতরে খাদ্যের ভাঙন পদ্ধতি এবং ATP সংশ্লেষণের জন্য এই শক্তির আবদ্ধকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি অবশ্যই ক্লোরোপ্লাস্টের (ইউক্যারিওটিকদের ক্ষেত্রে) মধ্যে সংঘটিত হয়।

যেখানে শক্তি উৎপাদনের জন্য জটিল অণুগুলোর ভাঙন কোশের সাইটোপ্লাজম এবং মাইটোকনড্রিয়াতে (এটাও শুধুমাত্র ইউক্যারিওটস এর ক্ষেত্রে) ঘটে। জারণ প্রক্রিয়া দ্বারা কোশমধ্যস্থ জটিল অণুগুলোর C-C বন্ধনীর ভাঙনের ফলে প্রভূত পরিমাণ শক্তির মুক্তি ঘটার প্রক্রিয়াকে শ্বসন (Respiration) বলে। এই প্রক্রিয়াটিতে যে সমস্ত যৌগগুলোর জারণ ঘটে তাদের শ্বসন বস্তু (respiratory substrates) বলে। শ্বসন প্রক্রিয়ার সাধারণত শর্করা অণুগুলো জারিত হয়ে শক্তির মুক্তি ঘটায় কিন্তু কোনো কোনো অবস্থায় কিছু কিছু উদ্ভিদে প্রোটিন, স্নেহ পদার্থ এমনকি কিছু জৈব অম্লও (organic acid) শ্বসন বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কোশের ভেতরে জারণকালে শ্বসন বস্তুতে সঞ্চিত সমস্ত শক্তি কোশের ভেতরে বেরিয়ে আসে না বা এটি একটি ধাপেও ঘটে না। এই শক্তি উৎসেচক নিয়ন্ত্রিত ধীরলয়ে ধাপে ধাপে সংঘটিত একগুচ্ছ বিক্রিয়ার মাধ্যমে মুক্ত হয় এবং রাসায়নিক শক্তি রূপে ATP অণু হিসাবে আবদ্ধ হয়। তাই এটা বোঝা জরুরি যে শ্বসনকালে খাদ্যের জারণের ফলে মুক্ত শক্তি সরাসরি ব্যবহৃত হয় না বা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে তা সরাসরি ব্যবহৃত হতে পারে না। কিন্তু এই শক্তি ATP সংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। যখনই কোশে শক্তির প্রয়োজন হয় তখনই এই ATP অণু ভেঙে যায় এবং কোশকে শক্তির জোগান দেয়। এইভাবেই ATP কোশের এনার্জি কারেন্সি হিসাবে কাজ করে। জীবদেহে সংঘটিত যেসব বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলো চালাতে শক্তির প্রয়োজন হয়, সেই প্রক্রিয়াগুলোতে ATP অণুতে আবদ্ধ শক্তি কাজে লাগে এবং কোশের ভেতরে অন্যান্য অণুর জৈব সংশ্লেষের জন্য কাঁচামাল হিসাবে শ্বসনকালে উৎপন্ন কার্বন কাঠামোটি ব্যবহৃত হয়।

14.1 উদ্ভিদ কি শ্বাসকার্য চালায়? (Do Plants Breathe?)

এই প্রশ্নটি সরাসরি উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ উদ্ভিদেরও শ্বসনের জন্য O_2 প্রয়োজন হয় এবং এদেরও শ্বসনকালের CO_2 নির্গত হয়। এটা বলা চলে যে, উদ্ভিদের এমন ব্যবস্থাপনা রয়েছে যা শ্বসনের জন্য উদ্ভিদকে O_2 -এর লভ্যতাকে সুনিশ্চিত করে। প্রাণীদের মতো উদ্ভিদদেহে গ্যাসীয় বিনিময়ের জন্য কোনো বিশেষিত অঙ্গ থাকে না। কিন্তু এদের দেহস্থিত পত্ররন্ধ্র (Stomata) এবং লেন্টিসেল (Lenticels) উদ্ভিদকে এই কাজে সাহায্য করে। উদ্ভিদদেহে কোনো শ্বসন অঙ্গ না থাকার পেছনে কারণ রয়েছে। প্রথমত, উদ্ভিদের প্রতিটি অংশ, এর নিজস্ব গ্যাসীয় আদান প্রদানের চাহিদা নিজেরাই পূরণ করে। খুবই অল্প পরিমাণ গ্যাসীয় বস্তু উদ্ভিদের এক অংশ থেকে অপর কোনো অংশে পরিবাহিত হয়। দ্বিতীয়ত, উদ্ভিদের গ্যাসীয় বিনিময়ের খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না, কারণ উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড এবং পাতায় শ্বসনের হার প্রাণীদের শ্বসনের হারের চাইতে অনেকটাই কম। শুধুমাত্র সালোকসংশ্লেষের সময় অধিক পরিমাণে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে এবং প্রতিটি পাতাই ওই সময়ে তার নিজস্ব চাহিদা পূরণের জন্য বিশেষভাবে অভিযোজিত। যখন কোনো কোশে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ঘটে তখন কোশটিতে O_2 এর যোগানের কোনো সমস্যা হয় না, কারণ এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন O_2 কোশের অভ্যন্তরেই মুক্ত হয়।

তৃতীয়ত, এমনকি বৃহদাকার অত্যধিক স্ফীত কোনো উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন গ্যাসগুলোর ব্যাপনের মাধ্যমে বিস্তারের দূরত্ব খুব বেশি নয়। একটি উদ্ভিদদেহের প্রতিটি সজীব কোশ উদ্ভিদের দেহতলের খুবই কাছাকাছি অবস্থান করে। এই কথাটি পাতার ক্ষেত্রে সত্য। তোমরা একথা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে পারো যে তাহলে পুরু কাষ্ঠল কাণ্ড এবং মূলের ক্ষেত্রে কী হবে? উদ্ভিদের কাণ্ডের সজীব কোশগুলো বাকলের ভেতরের দিকে এবং তলদেশে পাতলা স্তরে বিন্যস্ত থাকে। কাণ্ডে লেন্টিসেল নামক কতকগুলো ছিদ্র বর্তমান। কাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ কোশগুলো মৃত কোশ এবং এরা উদ্ভিদকে শুধুমাত্র যান্ত্রিক সহায়তা প্রদান করে। তাই একটি উদ্ভিদের বেশিরভাগ কোশেরই পৃষ্ঠতলের কোনো না কোনো অংশ বায়ুর সংস্পর্শে থাকে। মূল, কাণ্ড এবং পাতায় উপস্থিত শিথিলভাবে সজ্জিত প্যারেনকাইমা কোশগুলো বায়ুর সংস্পর্শে থাকে, যা পরস্পর যুক্ত হয়ে বায়ুগহ্বর সমন্বিত একটি জালক গঠন করে।

গ্লুকোজ অণুর সম্পূর্ণ জারণে সর্বশেষ উপজাত বস্তু হিসাবে CO_2 এবং জল উৎপন্ন হয় এবং উৎপাদিত শক্তির অধিকাংশই তাপশক্তি রূপে নির্গত হয়।

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{Energy}$$

যদি এই শক্তিকে কোশের ব্যবহারের উপযোগী হতে হয় তবে কোশের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য অণুর সংশ্লেষের জন্য এই শক্তিকে কাজে লাগাতে কোশকে সমর্থ হতে হবে। উদ্ভিদকোশ গ্লুকোজ অণু ভাঙনের কৌশলটিকে এমনভাবে ব্যবহার করে যাতে এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তির সম্পূর্ণটাই তাপশক্তি রূপে কোশ থেকে বেরিয়ে না যেতে পারে। মূলত গ্লুকোজ অণুর জারণ প্রক্রিয়াটি একবারে একটি ধাপে সংঘটিত না হয়ে অনেকগুলো ছোটো ছোটো ধাপে ঘটে। ফলস্বরূপ কিছু কিছু ধাপ এতটাই দীর্ঘ হয় যে এই ধাপে মুক্ত শক্তি ATP সংশ্লেষের কাজে যুক্ত হতে পারে। প্রয়োজন মতো কীভাবে এই প্রক্রিয়াটি ঘটে তাই শ্বসনের উপজীব্য বিষয়।

শ্বসন প্রক্রিয়া চলা কালে O_2 ব্যবহৃত হয় এবং বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ হিসাবে CO_2, জল এবং শক্তি মুক্ত হয়। এই জারণ বিক্রিয়ার জন্য O_2 এর প্রয়োজন হয়, কিন্তু কিছু কিছু কোশ এমন পরিবেশেও বেঁচে থাকতে পারে যেখানে অক্সিজেনের উপস্থিতি থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। তুমি কি এমন কোনো পরিস্থিতির (এবং জীবের) কথা কল্পনা করতে পারছ যেখানে অক্সিজেন অনুপস্থিত? পৃথিবীর বুকে সৃষ্ট প্রথম জীবকোশগুলো এমন পরিবেশে বেঁচে থাকত যেখানে O_2 এর অস্তিত্ব ছিল না এবং এই সত্যটি বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এমনকি বর্তমান কালের সজীব বস্তুর মধ্যে এমন কিছু সজীব বস্তুর কথা আমরা জানি যারা অবাত পরিবেশে বসবাসের জন্য অভিযোজিত। এই জীবগুলোর মধ্যে কিছু হল আংশিক অবায়ুজীবী যেখানে অন্যান্য জীবে শ্বসনের জন্য অক্সিজেন বিহীন পরিবেশ থাকা বাধ্যতামূলক। যাই হোক অক্সিজেনের সাহায্য ছাড়াই গ্লুকোজের আংশিক জারণের জন্য সব সজীব বস্তুতেই উৎসেচক নির্ভর একটি ব্যবস্থা রয়েছে। গ্লুকোজ ভেঙে পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরির এই প্রক্রিয়াটিকেই গ্লাইকোলাইসিস বলে।

14.2 গ্লাইকোলাইসিস (Glycolysis)

গ্লাইকোলাইসিস শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক শব্দ 'গ্লাইকোস' এবং 'লাইসিস' থেকে। যেখানে 'গ্লাইকোস' শব্দটির অর্থ শর্করা এবং 'লাইসিস' হল ভাঙন। গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটি উপস্থাপন করেছিলেন গার্স্টাভ এম্বডেন, ওট্টো মেয়ারহফ এবং জে পারনাস এই প্রক্রিয়াটিকে EMP পথও বলা হয়। অবাত জীবের ক্ষেত্রে এটিই একমাত্র শ্বসন পদ্ধতি। গ্লাইকোলাইসিস সব জীব কোশের সাইটোপ্লাজমে ঘটে এবং সব সজীব বস্তুতেই এই প্রক্রিয়াটি ঘটতে দেখা যায়। এই প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজের আংশিক জারণে দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সবশেষে উৎপন্ন পদার্থ সুক্রোজ বা দেহে সঞ্চিত

শর্করা থেকে এই গ্লুকোজ পাওয়া যায়। ইনভারটেজ উৎসেচকের প্রভাবে সুক্রোজ, গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজে পরিণত হয় এবং এই দুটি একক শর্করা অতঃপর গ্লাইকোলাইসিস বিক্রিয়া পথে প্রবেশ করে। হেক্সোকাইনেজ উৎসেচকের ক্রিয়ায় গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের ফসফরীভবন ঘটে এবং এর ফলে গ্লুকোজ-6 ফসফেট উৎপন্ন করে। গ্লুকোজের ফসফেটযুক্ত এই রূপটি (গ্লুকোজ-6- ফসফেট) এরপর তার আইসোমার ফ্রুক্টোজ -6- ফসফেটে পরিণত হয়। গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের বিপাকের পরবর্তী ধাপগুলো একই রকমের হয়। গ্লাইকোলাইসিসের বিভিন্ন ধাপ চিত্র 14.1 এ দেখানো হয়েছে। গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উৎসেচক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দশটি বিক্রিয়ার একটি শৃঙ্খলের মাধ্যমে গ্লুকোজ থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। গ্লাইকোলাইসিসের বিভিন্ন পর্যায়গুলো অধ্যয়নকালে কোনো কোনো ধাপে ATP অথবা NADPH + H^+ ব্যবহৃত হয় অথবা সংশ্লেষিত হয় তা লক্ষ করো।

দেখা গেছে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় দুইটি ধাপে ATP ব্যবহৃত হয়। প্রথম ধাপটি হল গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ-6 - ফসফেট উৎপাদনের সময় এবং দ্বিতীয় ধাপটি হল ফ্রুক্টোজ-6 - ফসফেট থেকে ফ্রুক্টোজ 1, 6- বিসফসফেট গঠনের সময়। ফ্রুক্টোজ 1, 6 বিসফসফেট ডাই হাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট এবং 3- ফসফোগ্লিসারলডিহাইডে (PGAL) বিশ্লিষ্ট হয়। আমরা লক্ষ করি যে একটি ধাপে NAD^+ থেকে $NADH+H^+$ গঠিত হয়। এই ঘটনাটি তখনই ঘটে যখন 3 ফসফোগ্লিসারলডিহাইড (PGAL) থেকে 1, 3 বিসফসফোগ্লিসারেট (BPGA) তৈরি হয়। PGAL থেকে অপসারিত দুটি রেডক্স সমতুল্য (দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু রূপে) একটি NAD^+ অণুতে স্থানান্তরিত হয়। এর ফলে PGAL জারিত হয় এবং এটি অজৈব ফসফেটের সাথে যুক্ত হয়ে BPGA তে পরিণত হয়। BPGA থেকে 3 ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডে পরিবর্তনও একটি শক্তি উৎপাদক প্রক্রিয়া, এই শক্তি ATP অণুতে আবদ্ধ হয়। PEP থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড গঠিত হওয়ার সময় আরও একটি ATP অণু উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়াপথে 1 অণু গ্লুকোজ থেকে সরাসরি কত ATP অণু সংশ্লেষিত হয় তা কি তুমি হিসাব করতে পারবে?

গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন মুখ্য বস্তু হল পাইরুভিক অ্যাসিড। পাইরুভিক অ্যাসিডের বিপাকীয় পরিণতি কী? এই পরিণতি নির্ভর করে কোশের চাহিদার উপর। গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন পাইরুভিক

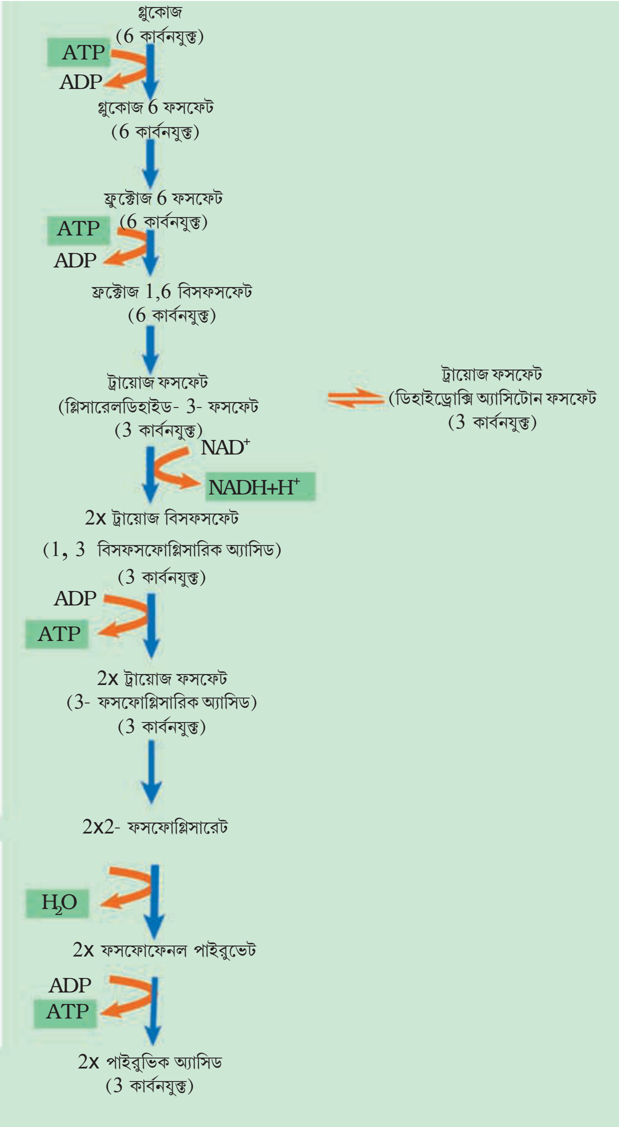

চিত্র 14.1 : গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

অ্যাসিডকে বিভিন্ন কোশ তিনটি প্রধান উপায়ে পরিচালিত করে। এইগুলো হল ল্যাক্টিক অ্যাসিড সন্ধান, কোহল সন্ধান এবং সবাত শ্বসন। বহু প্রোক্যারিওটিক ও এককোশী ইউক্যারিওটিক জীবে সবাত শ্বসন হিসাবে সন্ধান প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। গ্লকোজের সম্পূর্ণ জারণের ফলে CO_2 ও জল (H_2O) উৎপাদনের জন্য জীবকোশে ক্রেবস চক্র সংঘটিত হয় যা সবাত শ্বসন নামে পরিচিত এবং এই প্রক্রিয়াটি চালানোর জন্য অক্সিজেন সরবরাহের প্রয়োজন হয়।

14.3 সন্ধান (Fermentation)

সন্ধান প্রক্রিয়ায় ধরে নেওয়া যাক ইস্টে, অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে কতগুলো বিক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লকোজের অসম্পূর্ণ জারণ ঘটে এবং এর ফলে পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে CO_2 ও ইথানল তৈরি হয়। পাইরুভিক অ্যাসিড ডি কার্বোক্সিলেজ এবং অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচক দুটির প্রভাবে এই বিক্রিয়াগুলো ঘটে। কিছু ব্যাকটিরিয়ার মতো জীবে পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে ল্যাক্টিক অ্যাসিড তৈরি হয়। সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপগুলো চিত্র 14.2 তে দেখানো হল। শারীরিক পরিশ্রমের সময় পেশির মতো প্রাণীকোশেও কোশীয় শ্বসন-এর জন্য যখন প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাবে ঘটে তখন ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের প্রভাবে পাইরুভিক অ্যাসিড বিজারিত হয়ে ল্যাক্টিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়া দুটিতে বিজারক দ্রব্য হল $NADH+H^+$ যা পুনরায় জারিত হয়ে NAD^+ এ পরিণত হয়।

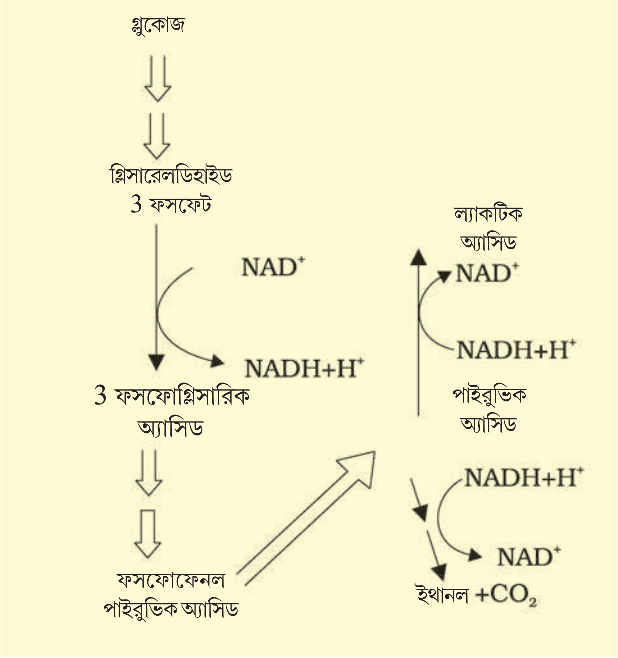

চিত্র 14.2 : অবাত শ্বসনের মুখ্য পথসমূহ

ল্যাকটিক অ্যাসিড সন্ধান এবং কোহল সন্ধান উভয় ক্ষেত্রেই খুব বেশি শক্তির মুক্তি ঘটে না। গ্লুকোজ মধ্যস্থ শক্তির সাত শতাংশেরও কম শক্তি এই প্রক্রিয়াগুলোতে মুক্ত হয় এবং এই শক্তির পুরোটাই ATP এর উচ্চ শক্তি বন্ধনী রূপে আবদ্ধ হয় না। অ্যাসিড বা অ্যালকোহল যাই উৎপন্ন হোক না কেন প্রক্রিয়াগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনকও বটে। যখন এক অণু গ্লুকোজের সন্ধানে অ্যালকোহল বা ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় তখন মোট কত অণু ATP সংশ্লেষিত হয়? (গ্লাইকোলাইসিসের সময় সংশ্লেষিত ATP এর সংখ্যা গণনা করে তার থেকে এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত ATP এর সংখ্যা বাদ দাও) ঈস্টের সন্ধানকালে উৎপন্ন অ্যালকোহলের ঘনত্ব যখন প্রায় 13 শতাংশে পৌঁছায়, তখন বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং এই বিষক্রিয়ার ফলে ইস্টগুলো নিজেরাই মারা যায়। **প্রাকৃতিকভাবে সংঘটিত সন্ধান প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন পানীয়তে অ্যালকোহলের সর্বোচ্চ ঘনত্ব কত হবে?** অ্যালকোহল যুক্ত পানীয়তে অ্যালকোহলের পরিমাণ এই ঘনত্ব অপেক্ষা অধিক ঘনত্বের অ্যালকোহল কীভাবে পাওয়া যেতে পারে বলে তুমি মনে করো।

তাহলে কোন্ প্রক্রিয়া দ্বারা সজীববস্তু গ্লুকোজের সম্পূর্ণ জারণ ঘটাতে পারে এবং খাদ্যস্থ সঞ্চিত শক্তির মুক্তি ঘটিয়ে কোশীয় বিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় অধিক সংখ্যক ATP অণু সংশ্লেষ করতে পারে? ইউক্যারিওটিক কোশের মাইটোকনড্রিয়ার মধ্যে এই বিক্রিয়াগুলো সংঘটিত হয় এবং এর জন্য O_2 প্রয়োজন হয়। সবাত শ্বসন হল সেই প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় O_2 এর উপস্থিতিতে জৈব বস্তুর সম্পূর্ণ জারণ এবং CO_2, জল ও সাবস্ট্রেটে উপস্থিত প্রচুর পরিমাণ শক্তির মুক্তি ঘটে। এই ধরনের শ্বসন সচরাচর উচ্চ শ্রেণির জীবে সবচেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অংশে জানব।

14.4 সবাত শ্বসন (Aerobic Respiration)

কোশের মাইটোকনড্রিয়াতে সবাত শ্বসন সংঘটিত হওয়ার জন্য গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন অন্তপদার্থ পাইরুভিক অ্যাসিড সাইটোপ্লাজম থেকে মাইটোকনড্রিয়াতে পরিবাহিত হয়। সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ার মুখ্য দুটি ধাপ হল:

- পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে ধাপে ধাপে সব হাইড্রোজেন পরমাণুর অপসারণের মাধ্যমে পাইরুভিক অ্যাসিডের সম্পূর্ণ জারণ ঘটে এবং তিন অণু CO_2 বেরিয়ে আসে।
- হাইড্রোজেন পরমাণুর অংশ হিসাবে অপসারিত ইলেকট্রনগুলো O_2 অণু পরিবাহিত হয় এবং একই সঙ্গে ATP সংশ্লেষিত হয়।

মজার বিষয় হল এই যে প্রক্রিয়াটির প্রথম ধাপ সংঘটিত হয় মাইটোকনড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে এবং দ্বিতীয় ধাপটি ঘটে মাইটোকনড্রিয়ার অন্তঃপর্দায়।

গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় সাইটোসলে (সাইটোপ্লাজমীয় ধাত্র) শর্করার ভাঙনের ফলে উৎপন্ন পাইরুভিক অ্যাসিড মাইটোকনড্রিয়ার ধাত্রে প্রবেশ করে সেখানে পাইরুভিক ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের প্রভাবে কয়েকটি জটিল বিক্রিয়ার মাধ্যমে জারণমূলক ডি কার্বোক্সিলেশন (Oxidative decarboxylation) ঘটে। পাইরুভিক ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের প্রভাবে এই জটিল বিক্রিয়াগুলো সংঘটিত হওয়ার জন্য NAD^+ এবং CO- এনজাইম A সহ বহু কো-এনজাইমের অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

$$\text{পাইরুভিক অ্যাসিড} + CoA + NAD^+ \xrightarrow[\text{পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেজ}]{Mg^{2+}} \text{অ্যাসিটাইল } CoA + CO_2 + NADH + H^+$$

এই প্রক্রিয়াটি চলাকালে দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিডের বিপাকের ফলে দুই অণু NADH উৎপন্ন হয় (যা গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াকালে এক অণু গ্লুকোজ থেকে প্রাপ্ত)।

উপরোক্ত বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন অ্যাসিটাইল কো-এ (Acetyl Co-A) এরপর একটি চক্রাকার বিক্রিয়াপথ- ট্রাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড চক্রে প্রবেশ করে। বিজ্ঞানী হেন্স ক্রেবস (Hans Krebs) প্রথম এই চক্রটি ব্যাখ্যা করেন এবং তাই এই চক্রটি তাঁর নামানুসারে ক্রেবস চক্র নামে বহুল পরিচিত।

14.4.1 ট্রাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড চক্র (TCA Cycle)

TCA (ট্রাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড) চক্রটি শুরু হয় অ্যাসিটাইল গ্রুপের সাথে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড (OAA) এবং জলের ঘনীভবনের ফলে সাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদনের মাধ্যমে (চিত্র 14.3)। সাইট্রেট সিন্থেটেজ উৎসেচকের প্রভাবে এই বিক্রিয়াটি ঘটে এবং এক অণু Co-A মুক্ত হয়। সাইট্রেট, তার আইসোমার আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড এ পরিণত হয়। এই বিক্রিয়ার পরই পরপর ডি কার্বোক্সিলেশন ঘটে এবং এর ফলে প্রথম ধাপে α কিটো গ্লুটারিক অ্যাসিড এবং পরের ধাপে সাকসিনাইল Co-A উৎপন্ন হয়।

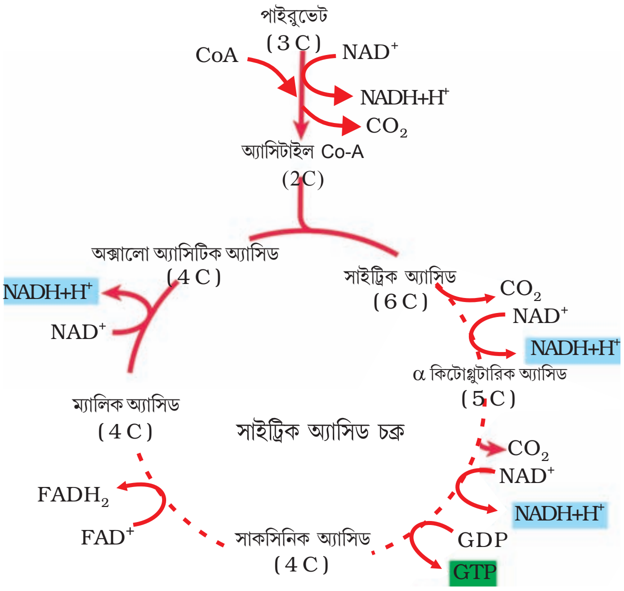

চিত্র **14.3** সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র

সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের বাকি ধাপগুলোতে সাকসিনাইল Co-A জারিত হয়ে OAA (অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড)-এ পরিণত হয় এবং এর ফলে চক্রটি চলতে থাকে। সাকসিনাইল Co-A সাকসিনিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয় এবং এক অণু GTP তৈরি হয়। এটি হল সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফরীভবন। একটি কাপলড বিক্রিয়ায় (Coupled reaction) GTP থেকে GDP উৎপন্ন হয় এবং পাশাপাশি ADP থেকে ATP সংশ্লেষিত হয়। এই চক্রটির তিনটি স্থানে NAD^+ বিজারিত হয়ে $NADH+H^+$ এবং একটি স্থানে FAD^+ বিজারিত হয়ে $FADH_2$ গঠন করে। TCA চক্রের মাধ্যমে অ্যাসিটাইল Co-A এর নিরবচ্ছিন্ন জারণের জন্য এই চক্রের প্রথম সদস্য অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডের অবিরাম যোগান থাকা প্রয়োজন। এছাড়া এর জন্য NADH এবং $FADH_2$ থেকে যথাক্রমে NAD^+ এবং FAD^+ এরও পুনরুৎপাদনও প্রয়োজন। শ্বসনের এই পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত সমীকরণটি নিম্নরূপে লেখা যেতে পারে :

$$\text{পাইরুভিক অ্যাসিড} + 4NAD^+ + FAD^+ + 2H_2O + ADP + Pi \xrightarrow{\text{মাইটোকনড্রিয়াল ম্যাট্রিক্স}} 3CO_2 + 4NADH + 4H^+ + FADH_2 + ATP$$

আমরা এখন পর্যন্ত দেখলাম যে TCA চক্রে গ্লুকোজের ভাঙনের ফলে CO_2 মুক্ত হয় এবং শুধু দুই অণু ATP উৎপন্ন হওয়া ছাড়াও আট অণু $NADH+H^+$ এবং দুই অণু $FADH_2$ সংশ্লেষিত হয়। তোমরা হয়তো এই ভেবে অবাক হবে যে আমরা কেন শ্বসন নিয়ে আলোচনা করছি যেখানে O_2 কে ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে না আবার যে বিশাল সংখ্যক ATP সংশ্লেষিত হওয়ার কথা ছিল তাও হচ্ছে না। এছাড়া এই প্রক্রিয়ায় সংশ্লেষিত $NADH+H^+$ এবং $FADH_2$ এর ভূমিকাই বা কী? চলো আমরা শ্বসনে O_2 এর ভূমিকা এবং ATP সংশ্লেষণ পদ্ধতিটি বোঝার চেষ্টা করি।

14.4.2 ইলেকট্রন পরিবহণতন্ত্র এবং জারণমূলক ফসফোরী ভবন (Electron transport system (ETS) and oxidative phosphorylation)

$NADH+H^+$ এবং $FADH_2$ তে সঞ্চিত শক্তির মুক্তি ঘটাতে এবং এই মুক্ত শক্তির ব্যবহারের জন্য শ্বসন প্রক্রিয়ার নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো সংঘটিত হয়। এই কাজটি তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন এরা ($NADH+H^+$ এবং $FADH_2$) ইলেকট্রন পরিবহণ তন্ত্রের মাধ্যমে জারিত হয় এবং ইলেকট্রনগুলো O_2 অণুতে পরিবাহিত হয় ও ফলস্বরূপ জল উৎপন্ন হয়। যে বিপাকীয় পথের মধ্য দিয়ে একটি বাহক থেকে অন্যবাহকে ইলেকট্রনের পরিবহণ ঘটে, তাকে ইলেকট্রন পরিবহণতন্ত্র বা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম (ETS) বলে। এই তন্ত্রটি মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্তঃপর্দায় উপস্থিত থাকে।

ক্রেবস্ চক্র চলাকালে মাইটোকনড্রিয়ার ধাত্রে উৎপন্ন NADH থেকে অপসারিত ইলেকট্রনগুলোর জারণ NADH ডিহাইড্রোজিনেজ (কমপ্লেক্স I) এর প্রভাবে ঘটে এবং এরপর ইলেকট্রনগুলো মাইটোকনড্রিয়ার পর্দায় অবস্থিত ইউবিকুইনন (ubiquinone) এ স্থানান্তরিত হয়। সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে সাকসিনিক অ্যাসিডের জারণকালে উৎপন্ন $FADH_2$ (কমপ্লেক্স II) এর মাধ্যমে বিজারক সমতুল্যগুলোও ইউবিকুইনন গ্রহণ করে। বিজারিত ইউবিকুইনন (ইউবিকুইনোল) অতঃপর সাইটোক্রোম bc_1 কমপ্লেক্স (কমপ্লেক্স III) এর মধ্য দিয়ে সাইটোক্রোম c তে ইলেকট্রন পরিবহণের মাধ্যমে জারিত হয়। সাইটোক্রোম *c* মাইটোকনড্রিয়া অন্তঃপর্দার বহির্গাত্রে যুক্ত একটি ছোটো প্রোটিন অণু এবং এটি কমপ্লেক্স III থেকে কমপ্লেক্স IV এ ইলেকট্রন পরিবহণের জন্য একটি ভ্রাম্যমান বাহক (Mobile Carrier) হিসেবে কাজ করে। কমপ্লেক্স IV বলতে সাইটোক্রোম a ও a_3 এবং দুইটি কপার কেন্দ্র সমন্বিত সাইটোক্রোম *c* অক্সিডেজ কমপ্লেক্সকে বোঝায়।

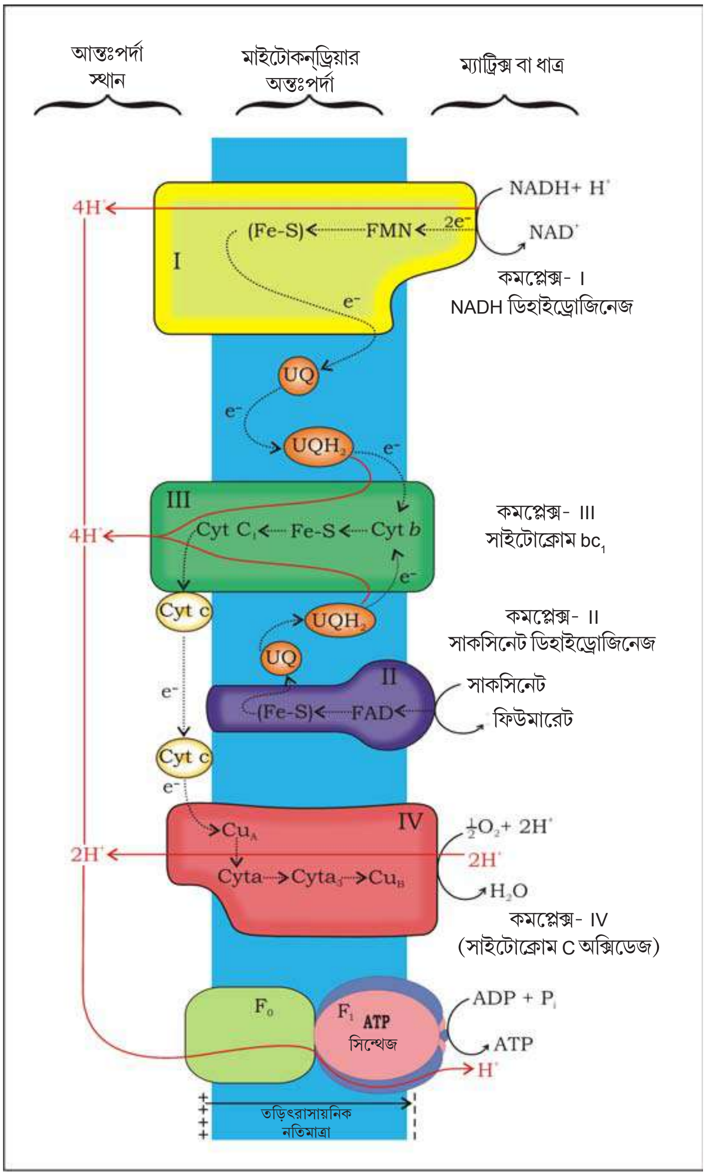

চিত্র 14.4 ইলেকট্রন পরিবহণ তন্ত্র

ইলেকট্রন পরিবহণ তন্ত্রে যখন ইলেকট্রনগুলো একটি বাহক থেকে কমপ্লেক্স I-IV-এর মধ্য দিয়ে অন্য একটি বাহকে বাহিত হয়, তখন তারা ADP ও অজৈব ফসফেট থেকে ATP উৎপাদনের জন্য AT Pase উৎসেচক (কমপ্লেক্স V)-এর সাথে যুক্ত হয়। এক্ষেত্রে সংশ্লেষিত ATP অণুর সংখ্যা কত হবে তা ইলেকট্রন দাতার প্রকৃতির উপর নিভর করে। যদিও সবাত শ্বসন প্রক্রিয়াটি কেবলমাত্র O_2 এর ভূমিকা এই প্রক্রিয়ার অন্তিম দশাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। তবুও O_2 -এর উপস্থিতি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি ইলেকট্রন পরিবহণতন্ত্র থেকে হাইড্রোজেন অপসারণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে চালিত করে। O_2 অন্তিম হাইড্রোজেন গ্রাহক রূপে কাজ করে। ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় আলোকশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ফসফোরাইলেশনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হয়, কিন্তু শ্বসন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে জারণ বিজারণ প্রক্রিয়ায় নির্গত শক্তি এই কাজে ব্যবহৃত হয়। এই কারণে প্রক্রিয়াটিকে জারণমূলক/অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশান বলা হয়।

তোমরা ইতিমধ্যেই পর্দাসংযুক্ত ATP অণু সংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে জেনেছ। আগের অধ্যায়ে এই প্রক্রিয়াটিকে কেমিঅসমোটিক মতবাদ এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে ইলেকট্রন

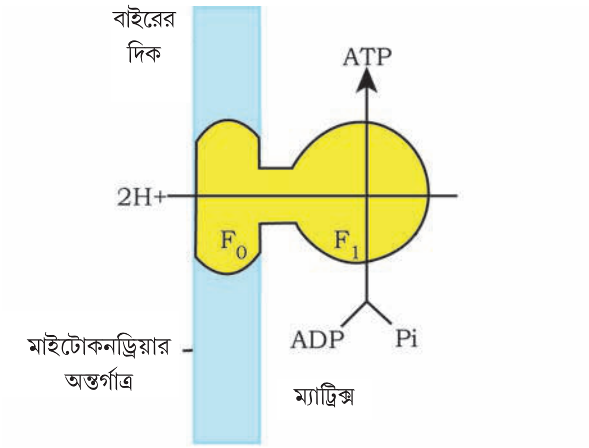

চিত্র 14.5 মাইটোকনড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে ATP সংশ্লেষের চিত্ররূপ।

পরিবহণতন্ত্রে নির্গত শক্তি ATP সংশ্লেষণের কাজে ব্যবহৃত হয়। এই কমপ্লেক্সটি দুটি মূল অংশ নিয়ে গঠিত হয়— F_1 এবং F_0 (চিত্র 14.5)। F_1 মস্তক খণ্ডকটি পরিধিস্থিত মেমব্রেন প্রোটিন কমপ্লেক্স যাতে ADP এবং অজৈব ফসফেট থেকে ATP সংশ্লেষণের স্থানটি বর্তমান।

F_0 অংশটি একটি অন্তস্থ মেমব্রেন প্রোটিন কমপ্লেক্স যা এমন একটি চ্যানেল তৈরি করে, যার মাধ্যমে প্রোটনগুলো অন্তঃপর্দা অতিক্রম করে। চ্যানেলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রোটন, ATP উৎপাদনের জন্য F_1 অংশের ক্যাটালাইটিক স্থানের সাথে যুক্ত হয়। প্রতিটি ATP অণু সংশ্লেষণের জন্য $2H^+$, F_0 অংশ এর মাধ্যমে অন্তঃপর্দা স্থান থেকে তড়িৎ রাসায়নিক প্রোটন গ্র্যাডিয়েন্টের সাপেক্ষে মাইটোকনড্রিয়ার ধাত্রে স্থানান্তরিত হয়।

14.5 শ্বসনে ব্যবহৃত ও উৎপন্ন শক্তির উদ্বত্তপত্র (Respiratory Balance Sheet)

প্রতিটি গ্লুকোজ অণু জারণে মোট কত অণু ATP লাভ হয় তা হিসাব করা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে এটি কেবলমাত্র একটি তাত্ত্বিক হিসাব হতে পারে যে নির্দিষ্ট অনুমানের উপর ভিত্তি করে এই হিসাব করা যেতে পারে সেগুলো হল :

- এটি একটি ধারাবাহিক, নির্দিষ্টক্রমে সংঘটিত বিক্রিয়াপথ যেখানে একটি সাবস্ট্রেট পরবর্তী বিক্রিয়ার জন্য সাবস্ট্রেট গঠন করে এবং এই জারণ পদ্ধতিতে গ্লাইকোলাইসিস, TCA চক্র ও ইলেকট্রন পরিবহণ তন্ত্র— এই ক্রম অনুসারে একটি বিক্রিয়া পথ অপরটিকে অনুসরণ করে।
- গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় সংশ্লেষিত NADH মাইটোকনড্রিয়ায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর এর জারণমূলক ফসফরীভবন ঘটে।
- এই বিক্রিয়াপথে কোনো অন্তর্বর্তী যৌগই অন্য কোনো যৌগ সংশ্লেষে ব্যবহৃত হয় না।
- যখন কেবলমাত্র গ্লুকোজের জারণ ঘটে, তখন অন্য কোনো বিকল্প সাবস্ট্রেটই বিক্রিয়াপথের কোনো অন্তর্বর্তী ধাপে প্রবেশ করে না।

কিন্তু এই ধরনের অনুমানগুলো সজীববস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ জীবকোশে সব বিক্রিয়া পথগুলোই একই সাথে ঘটে, একের পর এক সংঘটিত হয় না। সেই কারণেই প্রয়োজন অনুযায়ী সাবস্ট্রেটগুলো বিক্রিয়াপথে প্রবেশ করে ও বেরিয়ে যায় এবং ATP ও প্রয়োজনমতো বিক্রিয়াপথে ব্যবহৃত হয়। বিক্রিয়ার হারও বহু প্রভাবক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তবুও শক্তি উৎপাদন ও শক্তি সঞ্চয়ে সজীববস্তুর দক্ষতা ও চমৎকারিত্ব উপলব্ধি করার জন্য এই হিসাব নিকাশের প্রয়োজন রয়েছে। তাই হিসাব নিকাশ করে দেখা গেছে যে এক অণু গ্লুকোজের সম্পূর্ণ জারণে 38 অণু ATP লাভ হতে পারে।

চলো এবার সন্ধান প্রক্রিয়ার সাথে সবাত শ্বসনের তুলনা করি—

- সন্ধান প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ অণুর আংশিক জারণ ঘটে কিন্তু সবাত শ্বসনে গ্লুকোজ অণু সম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে CO_2 এবং H_2O পরিণত হয়।

- সন্ধান প্রক্রিয়ায় প্রতি অণু গ্লুকোজ থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন কালে মোট লাভ হয় মাত্র দুই অণু ATP। অপরদিকে সবাত শ্বসন প্রক্রিয়াতে গ্লুকোজের জারণে অধিক সংখ্যক ATP অণু সংশ্লেষিত হয়।

- জারণের মাধ্যমে NADH থেকে NAD^+ তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াটি সন্ধানের সময় খুবই মন্থরগতিতে সম্পন্ন হয়, কিন্তু সবাত শ্বসনের সময় এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ঘটে থাকে।

14.6 অ্যাম্ফিবলিক বা উভয়মুখী বিক্রিয়াপথ (Amphibolic Pathway)

শ্বসনের জন্য গ্লুকোজই হল উপযুক্ত সাবস্ট্রেট। শ্বসন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হওয়ার আগে সমস্ত কার্বোহাইড্রেটই সাধারণত প্রথমে গ্লুকোজে পরিণত হয়। পূর্বে বলা হয়েছে যে অন্যান্য সাবস্ট্রেটও শ্বসন প্রক্রিয়াতে ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু তারা শ্বসনের বিক্রিয়াপথের প্রথম ধাপে প্রবেশ করে না। চিত্র 14.6 দেখো এবং অনুধাবন করার চেষ্টা করো শ্বসনের বিক্রিয়া পথের কোন্ কোন্ ধাপে সাবস্ট্রেটের প্রবেশ ঘটছে। স্নেহজাতীয় খাদ্যবস্তুকে শ্বসন-বিক্রিয়াপথে অংশগ্রহণের জন্য প্রথমে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে ভেঙে যাওয়া প্রয়োজন। ফ্যাটি অ্যাসিড যখন শ্বসনবস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তখন এটি প্রথমে অ্যাসিটাইল Co-A তে পরিণত হয়, এবং এরপর এই অ্যাসিটাইল Co-A বিক্রিয়াপথে প্রবেশ করে। গ্লিসারলের ক্ষেত্রে এটি প্রথম PGAL এ পরিণত হয় এবং PGAL বিক্রিয়া পথে প্রবেশ করে। প্রোটিয়েজ উৎসেচকের প্রভাবে প্রোটিনগুলো ভেঙে যায় এবং একক অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো তাদের গঠনের উপর (ডি অ্যামাইনেশন এরপর) ভিত্তি করে ক্রেবস্চক্রের কিছু ধাপে বা এমনকি পাইরুভিক অ্যাসিড বা অ্যাসিটাইল Co-A রূপে শ্বসন বিক্রিয়াপথে প্রবেশ করে।

যেহেতু শ্বসনকালে সাবস্ট্রেটের ভাঙন ঘটে তাই শ্বসন প্রক্রিয়াকে প্রচলিত ভাবে একটি ভাঙনমূলক প্রক্রিয়া অর্থাৎ অপচিতি মূলক প্রক্রিয়া এবং শ্বসন বিক্রিয়াপথকে একটি অপচিতি মূলক বিক্রিয়া পথ রূপে গণ্য করা হয়। এই ধারণাটি কি সঠিক? আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি যে শ্বসন বিক্রিয়াপথে জারিত হওয়া এবং শক্তি উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য বিভিন্ন সাবস্ট্রেটগুলো বিক্রিয়া পথের কোন্ কোন্ ধাপে অংশগ্রহণ করে। এটি মেনে নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এরা হল সেইসব যৌগ যাদের পূর্বোক্ত সাবস্ট্রেটগুলোর সংশ্লেষের জন্য শ্বসন বিক্রিয়া পথ থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। তাই যখন ফ্যাটি অ্যাসিড শ্বসন বিক্রিয়া পথে সাবস্ট্রেট হিসাবে ব্যবহৃত হয় তখন বিক্রিয়া পথে প্রবেশের পূর্বে এটি ভেঙে গিয়ে অ্যাসিটাইল Co-A গঠন করে। একইভাবে প্রোটিনের সংশ্লেষণ এবং ভাঙনকালেও শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন অন্তর্বর্তী পদার্থগুলো এই সংযোগ স্থাপন করে। জীবদেহে সংঘটিত ভাঙনমূলক প্রক্রিয়াগুলোকে অপচিতি প্রক্রিয়া এবং সংশ্লেষণ মূলক প্রক্রিয়াগুলোকে উপচিতি প্রক্রিয়া বলে। শ্বসনের বিক্রিয়া পথে অপচিতি এবং উপচিতি উভয় প্রক্রিয়াই ঘটে বলে এই বিক্রিয়া পথটিকে ভাঙনমূলক প্রক্রিয়ার পরিবর্তে অ্যাম্ফিবলিক বিক্রিয়া পথ রূপে গণ্য করাই শ্রেয়।

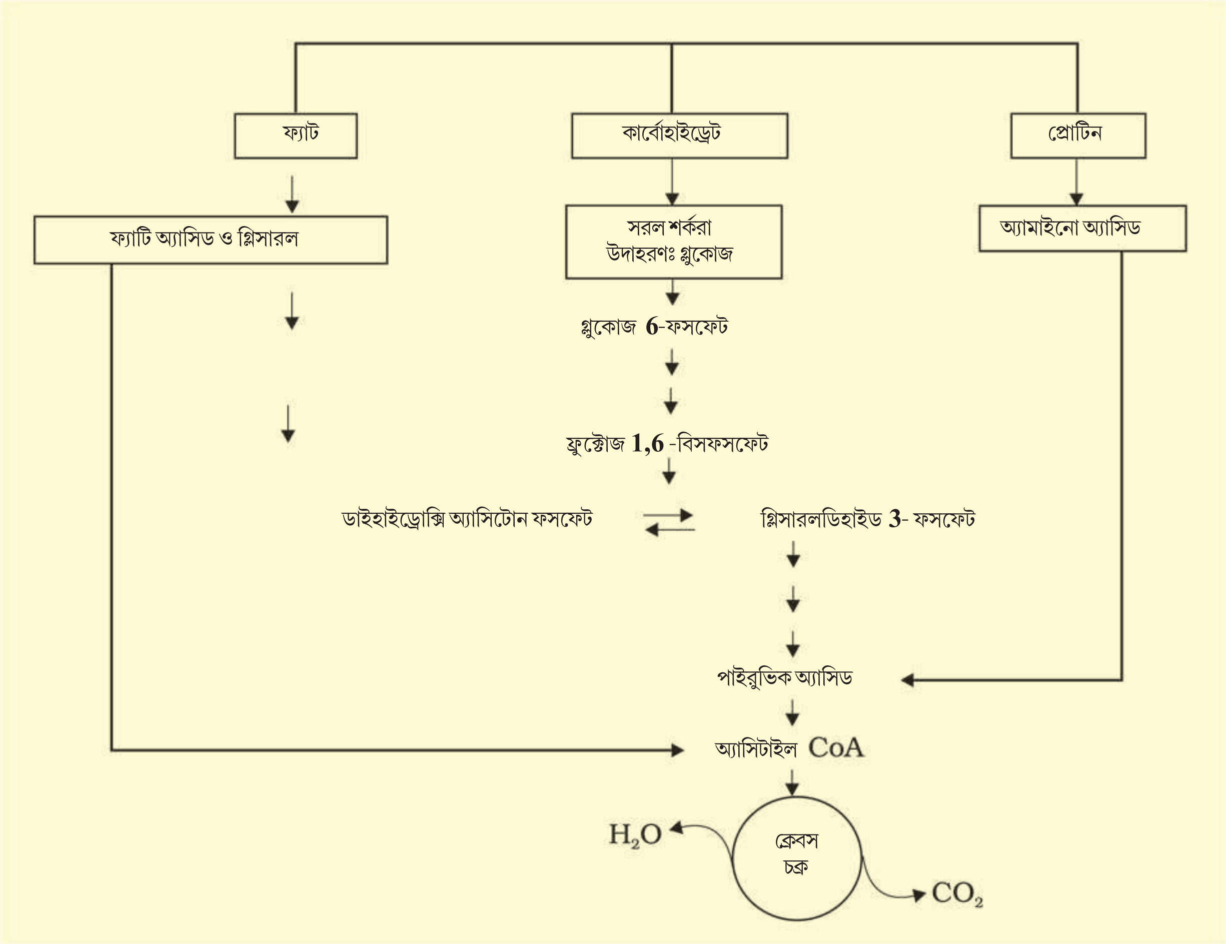

চিত্র 14.6 শ্বসনকালে বিভিন্ন অণুর ভাঙনে CO_2 এবং H_2O উৎপাদন দেখায় এমন বিপাকীয় পথগুলোর মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক।

14.7 শ্বাস অণুপাত (Respiratory Quotient)

চলো এখন আমরা শ্বসন সম্পর্কিত আরও একটি বিষয় লক্ষ করি। তোমরা জান যে সবাত শ্বসনকালে O_2 গৃহীত হয় এবং CO_2 নির্গত হয়। শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন CO_2 এর ঘনমান এবং গৃহীত O_2 এর ঘনমানের অণুপাতকে শ্বাস অনুপাত বা রেসপিরেটরি কোসেন্ট (**Respiratory Quotient**) বা RQ বলে।

$$RQ = \frac{\text{বর্জিত } CO_2 \text{ এর ঘনমান}}{\text{গৃহীত } O_2 \text{ এর ঘনমান}}$$

শ্বসনকালে ব্যবহৃত শ্বসনবস্তুর প্রকৃতির উপর শ্বাস অণুপাত নির্ভর করে।

যখন শ্বসনবস্তুরূপে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট ব্যবহৃত হয় এবং এর সম্পূর্ণ জারণ ঘটে তখন RQ হবে1 কারণ এক্ষেত্রে সমপরিমাণ CO_2 এবং O_2 যথাক্রমে বর্জিত ও গৃহীত হয়, নিম্নের সমীকরণে তা দেখানো হল।

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{শক্তি}$$

$$RQ = \frac{6CO_2}{6O_2} = 1.0$$

শ্বসন প্রক্রিয়ায় যখন স্নেহপদার্থ শ্বসনবস্তু রূপে ব্যবহৃত হয় তখন RQ 1 এর কম হয়। যখন শ্বসনবস্তুটি ট্রাইপালমিটিন নামক ফ্যাটি অ্যাসিড হয় তখন RQ এর হিসাব কীরূপ হবে তা দেখানো হল।

$$\underset{\text{ট্রাইপালমিটিন}}{2(C_{51}H_{98}O_6)} + 145O_2 \longrightarrow 102CO_2 + 98H_2O + \text{শক্তি}$$

$$RQ = \frac{102CO_2}{145O_2} = 0.7$$

শ্বসনকালে যখন প্রোটিন শ্বসনবস্তু রূপে ব্যবহৃত হয় তখন শ্বাস অণুপাত বা RQ হবে প্রায় 0.9, এক্ষেত্রে

এক্ষেত্রে যে বিষয়টি উপলব্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হল সজীব বস্তুর শ্বসনকালে প্রায়শই একাধিক শ্বসনবস্তু ব্যবহৃত হয় এবং বিশুদ্ধ প্রোটিন বা বিশুদ্ধ ফ্যাট কখনোই শ্বসনবস্তু রূপে ব্যবহৃত হয় না।

সারসংক্ষেপ (Summary)

উদ্ভিদের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া চালানোর জন্য গ্যাসীয় আদান প্রদানের জন্য প্রাণীদের মতো কোনো বিশেষ অঙ্গ বা তন্ত্র থাকে না। স্টোমাটা এবং ল্যান্টিসেল উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্যাসীয় বিনিময়ে অংশগ্রহণ করে। উদ্ভিদের বেশিরভাগ কোশের উপরিতল বায়ুর সংস্পর্শে থাকে।

জারণ প্রক্রিয়ার দ্বারা কোশমধ্যস্থ জটিল জৈব অণুগুলোর C-C বন্ধনীর ভাঙন এবং ফলস্বরূপ প্রচুর পরিমাণে শক্তির নির্গমণের প্রক্রিয়াই হল কোশীয় শ্বসন। শ্বসনের জন্য গ্লুকোজই হল সবচাইতে উৎকৃষ্ট শ্বসন বস্তু (substrate)। স্নেহপদার্থ এবং প্রোটিন ভেঙেও শক্তি নির্গত হতে পারে। শ্বসনের প্রাথমিক প্রক্রিয়াটি কোশের সাইটোপ্লাজমেই ঘটে। উৎসেচক প্রভাবিত কতগুলো ধারাবাহিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি গ্লুকোজ অণু ভেঙে দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াটি হল গ্লাইকোলাইসিস। উৎপন্ন পাইরুভিক অ্যাসিডের পরিণতি অক্সিজেনের উপস্থিতি এবং সজীব বস্তুর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। অবাত পরিবেশে ল্যাকটিক অ্যাসিড সন্ধান বা কোহল সন্ধান ঘটে। অঙ্কুরোদগম ঘটছে এমন বীজে, এককোশী ইউক্যারিওট ও বহু প্রোক্যারিওটিক জীবে অবাত পরিবেশে সন্ধান প্রক্রিয়াটি ঘটে। ইউক্যারিওটিক জীবের ক্ষেত্রে সবাত শ্বসন প্রক্রিয়া অক্সিজেনের উপস্থিতিতেই ঘটে। গ্লাইকোলাইসিসে উৎপন্ন পাইরুভিক অ্যাসিড কোশের মাইটোকনড্রিয়াতে প্রবেশ করে এবং সেখানে এটি অ্যাসিটাইল - কো-এ (acetyl CoA) তে পরিণত হয় এবং CO_2 এর নির্গমণ ঘটে। অ্যাসিটাইল কো-এ এরপর ট্রাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড বিক্রিয়াপথে বা যে ক্রেবসচক্রে প্রবেশ করে যা মাইটোকনড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে সংঘটিত হয়। ক্রেবসচক্রে NADH+ H^+ এবং $FADH_2$ উৎপন্ন হয়। এই অণুগুলোতে নিহিত শক্তি এবং গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন NADH+ H^+ ATP সংশ্লেষে ব্যবহৃত হয়। এই ঘটনাটি মাইটোকনড্রিয়ার

অন্তঃপর্দার উপরিস্থ কতগুলো ইলেকট্রন বাহক সমন্বিত একটি তন্ত্র অর্থাৎ ইলেকট্রন পরিবহণতন্ত্রের (ETS) মাধ্যমে ঘটে। ইলেকট্রন পরিবহণ তন্ত্রের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হওয়ার সময় ইলেকট্রনগুলো যথেষ্ট শক্তি মুক্ত করে যা ATP সংশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই প্রক্রিয়াটিকে জারণ মূলক ফসফোরীভবন (Oxidative Phosphorylation) বলে। এটিতে অক্সিজেনই হল চূড়ান্ত ইলেকট্রন গ্রাহক যা বিজারিত হয়ে জলে পরিণত হয়।

শ্বসনকালে উপচিতি এবং অপচিতি উভয় প্রক্রিয়াই সংঘটিত হয় বলে শ্বসন পথটিকে উভমুখী বিক্রিয়াপথ (Amphibolic pathway) বলা হয়। শ্বসনকালে ব্যবহৃত শ্বসনবস্তুর প্রকৃতির উপর শ্বসন হার (RQ) নির্ভর করে।

অনুশীলনী

1. পার্থক্য নিরূপণ করো :
   - (a) শ্বসন এবং দহন
   - (b) গ্লাইকোলাইসিস এবং ক্রেবস চক্র
   - (c) সবাত শ্বসন এবং সন্ধান
2. শ্বসনবস্তুগুলো কী কী ? সর্বাধিক পরিচিত শ্বসনবস্তুটির নাম লেখো।
3. একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটি উপস্থাপন করো।
4. সবাত শ্বসনের প্রধান ধাপগুলো কী কী ? এই প্রক্রিয়াটি কোথায় সংঘটিত হয় ?
5. রেখাচিত্রের সাহায্যে সামগ্রিক ক্রেবসচক্রের প্রক্রিয়াটিকে উপস্থাপন করো।
6. ইলেকট্রন পরিবহণ তন্ত্রটি ব্যাখ্যা করো।
7. নিম্নলিখিতগুলোর তুলনা করো:
   - (a) সবাত এবং অবাত শ্বসন
   - (b) গ্লাইকোলাইসিস এবং সন্ধান
   - (c) গ্লাইকোলাইসিস এবং সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র
8. সবাত শ্বসনে মোট উৎপন্ন ATP অণুর হিসাব করার সময় কী কী বিষয় অনুমান করা যায় ?
9. "শ্বসন বিক্রিয়া পথ একটি অ্যাম্ফিবলিক পথ"— আলোচনা করো।
10. RQ -এর সংজ্ঞা দাও। স্নেহ পদার্থের ক্ষেত্রে এর মান কত ?
11. জারণমূলক ফসফরীভবন বা অক্সিডেটিভ ফসফরাইলেশন কী ?
12. শ্বসন প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে শক্তি নির্গমণের তাৎপর্য কী ?

অধ্যায়-15 (Chapter-15)
উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশ
(Plant growth & development)

15.1 বৃদ্ধি
15.2 বিভেদীকরণ, বিপরীত বিভেদীকরণ ও পুনর্বিভেদীকরণ
15.3 পরিস্ফুরণ বা বিকাশ
15.4 উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক সমূহ
15.5 আলোকপর্যায়বৃত্তি
15.6 বাসন্তীকরণ

তোমরা ইতোমধ্যেই পঞ্চম অধ্যায়ে একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের দেহ সংগঠন অধ্যয়ন করেছ। তোমরা কি কখনো এই বিষয়টি ভেবে দেখেছ যে উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল ও বীজের মতো গঠনসমূহ কোথা থেকে, কীভাবে এবং অবশ্যই একটি সুশৃঙ্খল ধারায় সৃষ্টি হয়? এখন পর্যন্ত তোমরা বীজ, অঙ্কুরিত চারাগাছ, ছোটো চারাগাছ, পরিণত উদ্ভিদ— এই পরিভাষাগুলো জেনেছ। তোমরা এও দেখেছ যে বৃক্ষ একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরেও উচ্চতায় ও পরিধিতে বৃদ্ধি পায়। তবে একই গাছের পাতা, ফুল ও ফলের যে শুধুমাত্র সীমিত বৃদ্ধি ঘটে তাই নয় নির্দিষ্ট সময় অন্তর বা কখনও কখনও বার বার এরা উৎপন্ন হয় এবং ঝরে পড়ে। কেন একটি সপুষ্পক উদ্ভিদে অঙ্গজ দশার অব্যবহিত পরেই পুষ্পোদ্গম ঘটে? সব উদ্ভিদ অঙ্গাই বিভিন্ন ধরনের কলা দ্বারা গঠিত, তবে একটি কোশ, একটি কলা ও একটি অঙ্গের গঠন এবং এদের দ্বারা সম্পাদিত কার্যের মধ্যে কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি? এদের গঠন ও কার্যাবলির কোনো পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব কী? উদ্ভিদের সব কোশই জাইগোট থেকে সৃষ্ট। এখানে একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে এইসব কোশে কেন এবং কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন গঠনগত ও কার্যগত গুণাবলি পরিলক্ষিত হয়? পরিস্ফুরণ হল বৃদ্ধি ও বিভেদীকরণ এই দুটি প্রক্রিয়ার সমষ্টি। পরিস্ফুরণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করতে গেলে এটি জানা যথেষ্ট এবং প্রয়োজনীয় যে জাইগোট থেকে একটি পরিণত উদ্ভিদের পরিস্ফুরণ একটি যথাযথ এবং অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ধারাবাহিক ঘটনাবলি মেনে সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়া চলাকালে একটি জটিল দেহ সংগঠন তৈরি হয় যাতে মূল, পাতা, শাখা-প্রশাখা, ফুল, ফল ও বীজ গঠিত হয় এবং অবশেষে উদ্ভিদগুলোর মৃত্যু ঘটে (চিত্র 15.1)। উদ্ভিদের বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপটি হল বীজের অঙ্কুরোদ্গম। বীজের অঙ্কুরোদ্গম তখনই হয় যখন পরিবেশে বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থা বজায় থাকে। প্রয়োজনীয় অনুকূল পরিবেশের অনুপস্থিতিতে বীজ অঙ্কুরিত হয় না এবং বীজ সুপ্তাবস্থায় থেকে যায়। অনুকূল অবস্থা ফিরে পেলে বীজে বিপাকীয় ক্রিয়া শুরু হয় এবং এর বৃদ্ধি ঘটে।

এই সব পরিস্ফুরণ প্রক্রিয়াগুলোকে কিছু প্রভাবক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই প্রভাবকগুলো আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় প্রকারই হয়।

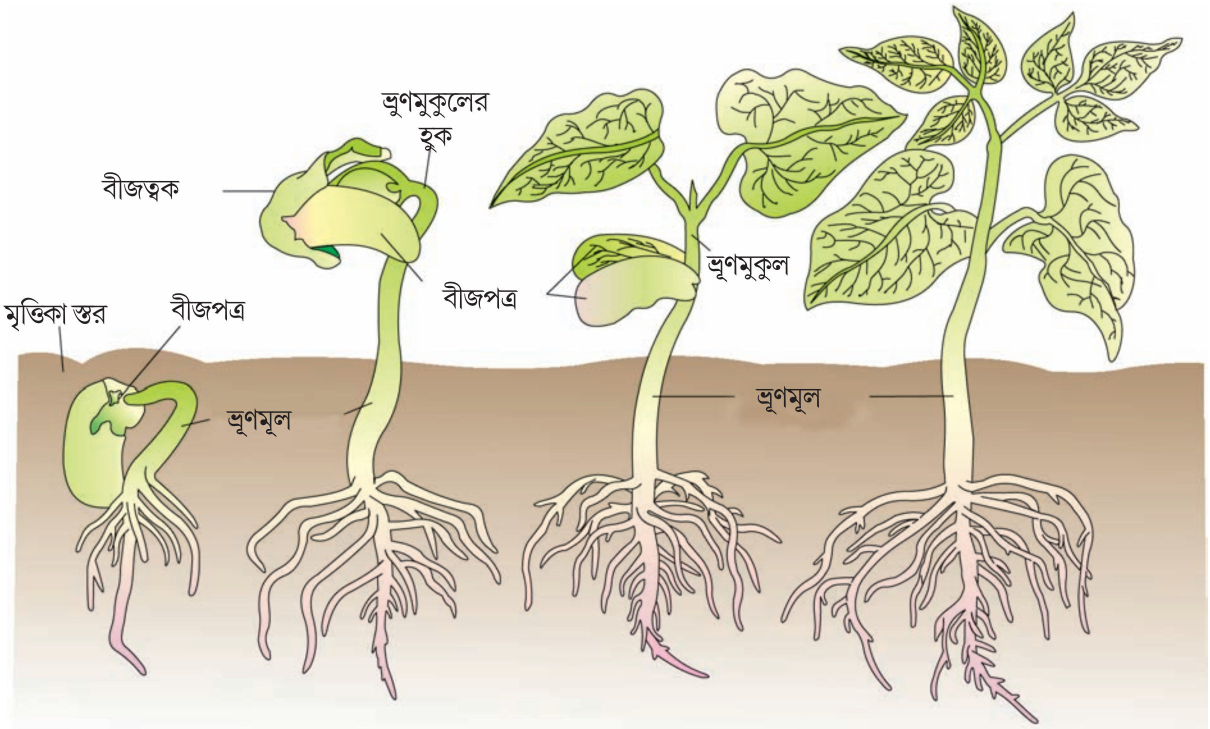

চিত্র 15.1 বিন জাতীয় উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গম এবং পরিস্ফুরণের মাধ্যমে চারাগাছের সৃষ্টি।

15.1 বৃদ্ধি (Growth)

বৃদ্ধি হল সজীব বস্তুর সর্বপেক্ষা মৌলিক ও সুস্পষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে একটি। বৃদ্ধি কী? কোনো অঙ্গ বা এর কোনো অংশ বা এমনকি একটি একক কোশের আকার অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ীভাবে বেড়ে যাওয়াকে বৃদ্ধি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। সাধারণত বৃদ্ধির সাথে (শক্তি ব্যবহার দ্বারা) বিভিন্ন বিপাকীয় প্রক্রিয়াও (উপচিতি এবং অপচিতি উভয়ই) ঘটে। তাই উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে একটি পাতার প্রসারণও বৃদ্ধি। একটি কাঠের টুকরো জলের মধ্যে রাখলে এর স্ফীত হওয়ার ঘটনাকে তুমি কীভাবে বর্ণনা করবে?

15.1.1 উদ্ভিদের বৃদ্ধি সাধারণত অনিয়ত (Plant Growth Generally is Indeterminate)

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি স্বতন্ত্র কারণ উদ্ভিদ এদের সমগ্র জীবনকাল ধরেই সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষমতা রাখে। উদ্ভিদদেহের কিছু নির্দিষ্ট স্থানে ভাজক কলার উপস্থিতির কারণেই উদ্ভিদের এই ক্ষমতা রয়েছে। এ ধরনের ভাজক কলার কোশসমূহের বিভাজন ও নিজের স্থায়িত্ব বজায় রাখার ক্ষমতা রয়েছে। তবে উৎপন্ন কোশগুলো খুব শীঘ্রই বিভাজনের ক্ষমতা হারায় এবং এমন কোশগুলোই উদ্ভিদদেহ গঠন করে। এই ধরনের বৃদ্ধি যেখানে ভাজক কলার ক্রিয়ার ফলে উদ্ভিদদেহে সর্বদা নতুন কোশসমূহ যুক্ত হতে থাকে, সেটিকে বলা হয় মুক্ত বৃদ্ধি। যদি ভাজক কলার বিভাজন থেমে যায় তাহলে কী ঘটবে? এমন ঘটনা কি কখনো ঘটে?

ষষ্ঠ অধ্যায়ে তোমরা মূলের অগ্রস্থ ভাজক কলা এবং বিটপের অগ্রস্থ ভাজক কলা সম্পর্কে পড়েছ। তোমরা জান যে এই ভাজককলাগুলো উদ্ভিদের প্রাথমিক বৃদ্ধির জন্য দায়ী এবং উদ্ভিদের অক্ষ বরাবর দীর্ঘীকরণেও এরা মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

তোমরা এটাও জান যে দ্বিবীজপত্রী ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে এদের জীবদ্দশায় পরের দিকে পার্শ্বীয় ভাজক কলা, ভাসকুলার ক্যাম্বিয়াম ও কর্ক ক্যাম্বিয়ামের আবির্ভাব ঘটে। এই সব ভাজক কলাগুলো সেই সব উদ্ভিদ অঙ্গের পরিধির বৃদ্ধি ঘটায় যেখানে এরা সক্রিয় থাকে। এটিই উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধি (চিত্র 15.2 দেখ)।

15.1.2 বৃদ্ধি পরিমাপযোগ্য (Growth is Measurable)

কোশীয় স্তরে বৃদ্ধি হল কোশের প্রোটোপ্লাজমের পরিমাণগত বৃদ্ধির ফলশ্রুতি। যেহেতু প্রোটোপ্লাজমের বৃদ্ধি সরাসরি পরিমাপ করা খুবই কঠিন সেক্ষেত্রে কোশের প্রোটোপ্লাজমের সাথে কম-বেশি আনুপাতিক পরিমাণে থাকে এমন কোনো পরিমেয় বস্তুর কিছু পরিমাণ নিয়ে এর পরিমাপ করা হয়। এর মধ্যে কিছু হল : সরস ওজন, শুষ্ক ওজন, দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল, আয়তন ও কোশের সংখ্যা— এসবের বৃদ্ধি। তোমরা হয়তো এটা জেনে আশ্চর্য হবে যে ভুট্টা উদ্ভিদের মূলের অগ্রস্থ ভাজক কলার একটি কোশ প্রতি ঘণ্টায় বিভাজিত হয়ে 17,500 এরও অধিক নতুন কোশ সৃষ্টি করতে পারে। পক্ষান্তরে একটি তরমুজের ক্ষেত্রে কোশের আকার 3,50,000 গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে, বৃদ্ধিকে কোশের সংখ্যাগত বৃদ্ধি রূপে এবং পরেরটিকে কোশের আকারগত বৃদ্ধিরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। পরাগনালির বৃদ্ধি এর দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধির সাপেক্ষে পরিমাপ করা হয়। একটি বিষমপৃষ্ঠ পাতার বৃদ্ধি বলতে এর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের বৃদ্ধিকে বোঝায়।

15.1.3 বৃদ্ধির দশাসমূহ (Phases of Growth)

বৃদ্ধির সময়কালকে সাধারণত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যথা বিভাজন দশা, দীর্ঘীকরণ দশা এবং পরিণতির দশা (চিত্র 15.3)। চলো আমরা মূলের অগ্রভাগটি লক্ষ করে এই বিষয়টি বুঝে নিই। মূলের অগ্রভাগ ও বিটপের অগ্রভাগ উভয় স্থানের অবিরাম বিভাজনরত কোশগুলো বৃদ্ধির বিভাজন দশাকে উপস্থাপন করে। এই অঞ্চলের কোশসমূহ প্রোটোপ্লাজম সমৃদ্ধ ও বৃহৎ সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াসযুক্ত হয়। তাদের কোশপ্রাচীর প্রাথমিক প্রকৃতির হয়, এগুলো পাতলা ও সেলুলোজ নির্মিত হয় এবং প্রচুর প্লাজমোডেজমাটা -সংযোগ সমন্বিত হয়। ভাজক কলা অঞ্চলের সন্নিহিত কোশগুলো (অগ্রভাগের ঠিক পেছনে) দীর্ঘীকরণ দশা উপস্থাপন করে।

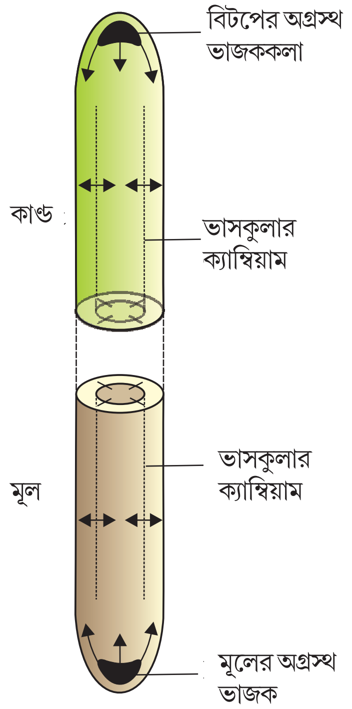

চিত্র 15.2 মূলের অগ্রস্থ ভাজককলা, বিটপের অগ্রস্থ ভাজককলা ও ভাসকুলার ক্যাম্বিয়াম-এর অবস্থানের চিত্ররূপ উপস্থাপন, তির চিহ্ন দ্বারা কোশসমূহ ও অঙ্গের বৃদ্ধির অভিমুখ দেখানো হয়েছে।

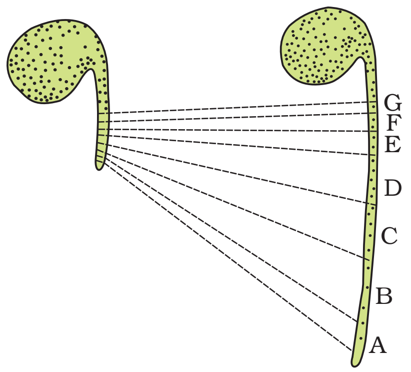

চিত্র 15.3 সমান্তরাল রেখা পদ্ধতির সাহায্যে দীর্ঘীকরণ অঞ্চলসমূহের শনাক্তকরণ অগ্রভাগের ঠিক পেছনের A, B, C, D অঞ্চলসমূহ সবচেয়ে বেশি দীর্ঘীকরণ ঘটেছে।

কোশের সম্প্রসারণ এবং নতুন কোশপ্রাচীর গঠন এই দশার কোশগুলোর প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মূলের অগ্রভাগ থেকে আরও কিছুটা দূরে অর্থাৎ যেখানে দীর্ঘীকরণ দশা ঘটে তার আরও কাছাকাছি অঞ্চলে মূলের অক্ষের যে অংশটি অবস্থান করে, এরই পরিণতির দশা ঘটতে থাকে। প্রাচীরের পুরুত্ব এবং প্রোটোপ্লাজমীয় পরিবর্তনের দিক থেকে এই অঞ্চলের কোশগুলো সর্বাধিক আকার লাভ করে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে তোমরা যে বেশির ভাগ কলা এবং কোশের প্রকৃতি সম্পর্কে পড়েছ তা এই দশাটিকে নির্দেশ করে।

15.1.4 বৃদ্ধির হার (Growth rates)

প্রতি একক সময়ে যতটা বৃদ্ধি হয় তার পরিমাণকে বৃদ্ধির হার বলে। তাই বৃদ্ধির হারকে গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। কোনো একটি জীব বা জীবের কোনো অঙ্গ বিভিন্ন উপায়ে অধিক সংখ্যক কোশ উৎপন্ন করতে পারে।

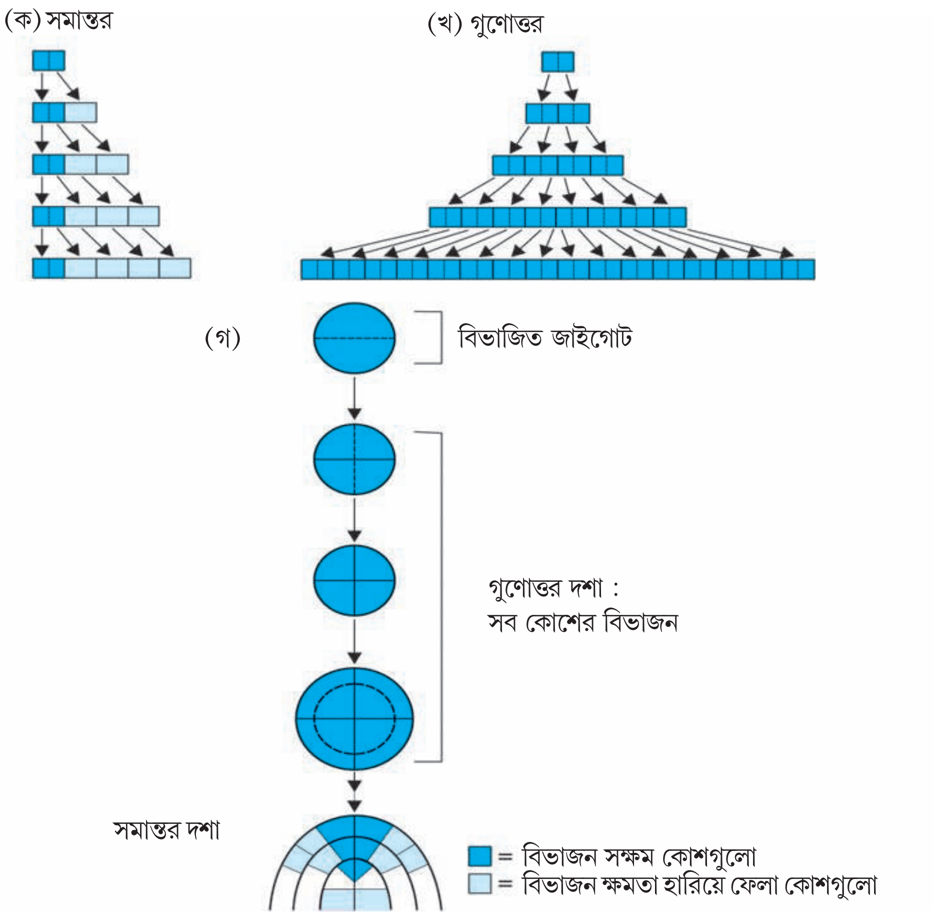

চিত্র 15.4 চিত্ররূপ উপস্থাপনা : (ক) সমান্তর (খ) গুণোত্তর বৃদ্ধি এবং (গ) ভ্রূণের সমান্তর ও গুণোত্তর বৃদ্ধির দশাসমূহ

চিত্র 15.4 -এ বৃদ্ধির হার বেড়ে যাওয়া দেখানো হয়েছে যা সমান্তর বা গুণোত্তর বৃদ্ধিও হতে পারে।

সমান্তর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মাইটোটিক কোশ বিভাজনে সৃষ্ট অপত্য কোশ দুটির মধ্যে একটি অবিরাম বিভাজিত হতে থাকে এবং অপরটি বিভেদিত ও পরিণত হয়। অপরিবর্তনীয় হারে মূলের দীর্ঘীকরণের উদাহরণ হিসেবে সমান্তর বৃদ্ধিকে সবচেয়ে সরলভাবে প্রকাশ করা যায় (চিত্র 15.5 লক্ষ করো)। এখানে সময়ের সাপেক্ষে অঙ্গের দৈর্ঘ্যেকে স্থাপন করলে একটি রৈখিক বক্ররেখা পাওয়া যায়। গাণিতিক ভাবে এটিকে নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশ করা হয়।

$L_t = L_0 + rt$

L_t = t সময়ে অঙ্গের দৈর্ঘ্য

L_0 = শূন্য সময়ে অঙ্গের দৈর্ঘ্য

r = বৃদ্ধির হার/প্রতি একক সময়ে দীর্ঘীকরণ

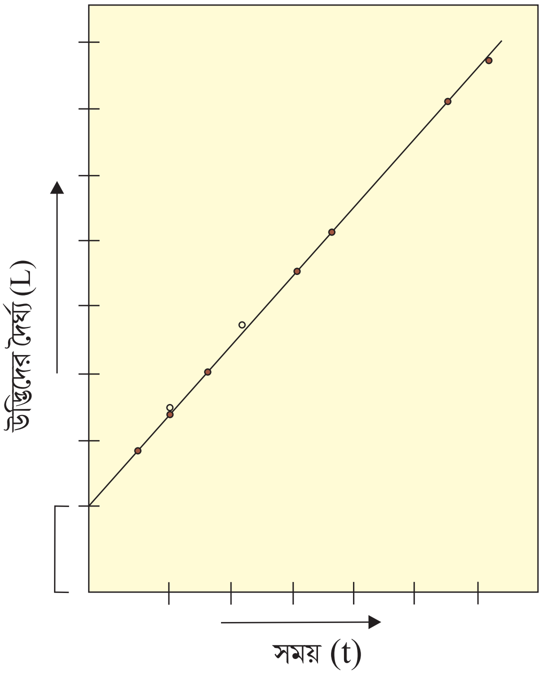

চিত্র 15.5 একটি অপরিবর্তনীয় রৈখিক বৃদ্ধি — যেখানে সময় t -এর সাপেক্ষে কোনো অঙ্গের দৈর্ঘ্য L কে বসানো হয়েছে।

আমরা এখন দেখব গুণোত্তর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কী হয়। বেশির ভাগ জীবজতন্ত্রগুলোতেই প্রারম্ভিক বৃদ্ধি খুব ধীর গতিতে হয় (ল্যাগ দশা বা বিলম্ব কাল) এবং এরপর দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে (লগ বা দ্রুত বৃদ্ধি কাল)। এখানে মাইটোসিস বিভাজনে সৃষ্ট উভয় অপত্য কোশই বিভাজনক্ষম হয় এবং অবিরাম বিভাজিত হতে থাকে। তবে সীমিত পরিপোষক সরবরাহের ফলে বৃদ্ধির হার মন্দীভূত হয়ে ক্রমশ: স্থিতিশীল দশায় (Stationary phases) পৌঁছায়। যদি আমরা বৃদ্ধির মাপকাঠিকে সময়ের সাপেক্ষে স্থাপন করি তাহলে আমরা একটি আদর্শ সিগময়েড বা S- রেখাচিত্র (Sigmoid curve) পাই (চিত্র 15.6)। একটি সিগময়েড রেখচিত্র হল প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা সজীব বস্তুর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। একটি উদ্ভিদের সব কোশ, কলা এবং অঙ্গের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি একটি আদর্শ রেখাচিত্র। তুমি কি আরও এরূপ উদাহরণের কথা চিন্তা করতে পারো? ঋতুভিত্তিক সক্রিয়তা দেখায় এমন উদ্ভিদের বৃদ্ধির রেখাচিত্রটি কী ধরনের হতে পারে বলে তুমি আশা কর?

দ্রুত বৃদ্ধিকে (exponertial growth) নিম্নরূপে প্রকাশ করা যেতে পারে।

$W_1 = W_O e^{rt}$

W_1 = অন্তিম আকার (ওজন, উচ্চতা, সংখ্যা ইত্যাদি)

W_O = বৃদ্ধির শুরুতে প্রারম্ভিক আকার

r = বৃদ্ধির হার

t = বৃদ্ধির সময়কাল

e = প্রাকৃতিক লগারিদমের ভূমি (Base of natural Logarithm)

এখানে r হল আপেক্ষিক বৃদ্ধির হার (relative growth rate) এবং উদ্ভিদের নতুন উদ্ভিজ্জ উপাদান তৈরির ক্ষমতার পরিমাপ, যাকে দক্ষতা সূচক (efficiency index) হিসাবে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অন্তিম আকার (W_1) প্রারম্ভিক আকার (W_O)-এর উপর নির্ভর করে।

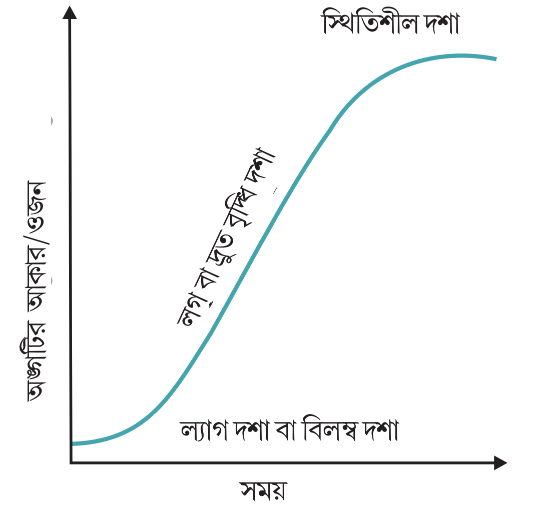

চিত্র 15.6 একটি আদর্শ সিগময়েড বৃদ্ধি- রেখাচিত্র যা পালন মাধ্যমস্থিত কোশসমূহ, বহু উন্নত উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদ অঙ্গসমূহের বৃদ্ধির আদর্শ রেখাচিত্র।

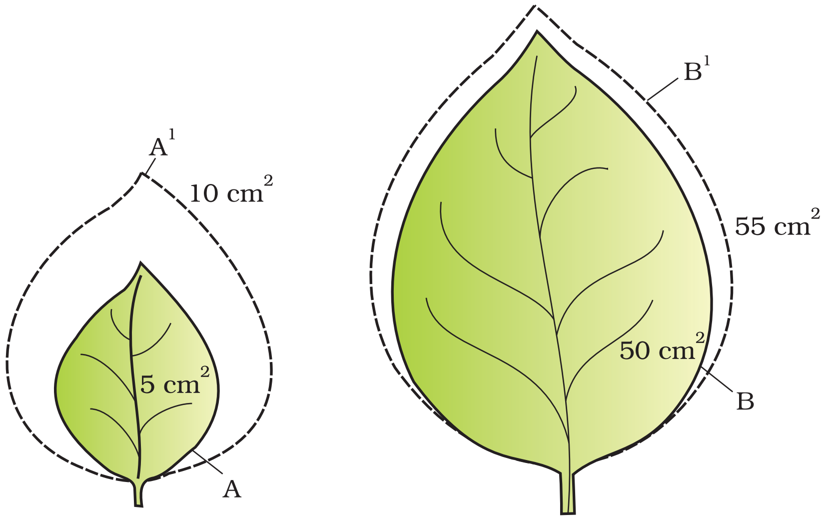

চিত্র 15.7 চিত্রের সাহায্যে চূড়ান্ত ও আপেক্ষিক বৃদ্ধির হারের তুলনা। A এবং B উভয় পাতার ক্ষেত্রফলই প্রদত্ত সময়ের মধ্যে $5cm^2$ করে বৃদ্ধি পেয়ে A^1 ও B^1 পাতা তৈরি করেছে।

জীবজতন্ত্রে দুটি অংশের বৃদ্ধির মধ্যে পরিমাণগত তুলনা এই দুইভাবে করা যেতে পারে ঃ (i) একক সময়ে দুটি অংশের মোট বৃদ্ধির পরিমাপ ও তাদের মধ্যে তুলনাকে চূড়ান্ত বৃদ্ধির হার (Absolute growth rate) বলে। (ii) প্রতি একক সময়ে কোনো প্রদত্ত সজীববস্তুর বৃদ্ধিকে সাধারণ বিষয়ের ভিত্তিতে প্রকাশ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একক কোনো প্রারম্ভিক পরিমাপকের ভিত্তিতে যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে আপেক্ষিক বৃদ্ধির হার (Relative growth rate) বলে। চিত্র 15.7 -এ ভিন্ন আকারের দুটি পাতা A ও B আঁকা রয়েছে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে প্রদত্ত সময়ে এই দুটি পাতার ক্ষেত্রফলের চূড়ান্ত বৃদ্ধির ফলে A পাতা A^1 -এ ও B পাতা B^1 -এ পরিণত হয়েছে। তবে এটা দেখা যাচ্ছে যে একটি পাতার আপেক্ষিক বৃদ্ধির হার অন্যটি অপেক্ষা অনেকটাই বেশি। কোন্ পাতাটির আপেক্ষিক বৃদ্ধির হার বেশি এবং কেন?

15.1.5 বৃদ্ধির শর্তসমূহ (Conditions for Growth)

তোমার মতে বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় শর্তগুলো কী কী হতে পারে তা লেখার চেষ্টা করো তো? বৃদ্ধির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে জল, অক্সিজেন এবং পরিপোষক থাকতে পারে। কোশ-সম্প্রসারণ দ্বারা উদ্ভিদ কোশগুলো আকারে বৃদ্ধি পায় এবং এর জন্য জলের প্রয়োজন হয়। কোশের রসস্ফীতি প্রসারণজনিত বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তাই উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং এর পরবর্তী বিকাশ উদ্ভিদদেহস্থিত জলের পরিমাণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। জল উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচকীয় কার্যাবলির মাধ্যম হিসাবেও কাজ করে। অক্সিজেন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বিপাকীয় শক্তির মুক্তিতে সাহায্য করে। উদ্ভিদদেহে প্রোটোপ্লাজমের সংশ্লেষের জন্য পরিপোষকের (ম্যাক্রো ও মাইক্রো অত্যাবশ্যকীয় মৌল) প্রয়োজন হয় এবং তা শক্তির উৎস হিসেবেও কাজ করে।

এছাড়া প্রতিটি উদ্ভিদের তার বৃদ্ধির জন্য সর্বাপেক্ষা অনুকূল তাপমাত্রার একটি ব্যপ্তি রয়েছে। এই ব্যপ্তির কোনো প্রকার বিচ্যুতি উদ্ভিদটির বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে। আলোক এবং অভিকর্ষ বলের মতো পরিবেশীয় প্রভাবগুলোও উদ্ভিদের বিভিন্ন দশা বা পর্যায়কে প্রভাবিত করে।

15.2 বিভেদীকরণ, বিপরীত বিভেদীকরণ এবং পুনর্বিভেদীকরণ (Differentiation, Dedifferentiation and Redifferentiation)

মূল ও বিটপের অগ্রস্থ ভাজককলা ও ক্যাম্বিয়াম থেকে প্রাপ্ত কোশগুলো সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন করার জন্য বিভেদিত ও পরিণত হয়। পরিণত হওয়ার এই প্রক্রিয়াকে **বিভেদীকরণ** বলে। বিভেদীকরণকালে কোশের কোশপ্রাচীর এবং প্রোটোপ্লাজম উভয়েরই সামান্য পরিবর্তন থেকে শুরু করে মুখ্য গঠনগত পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, ট্রেকিয়ারি এলিমেন্ট তৈরি করতে গিয়ে কোশগুলো প্রোটোপ্লাজমবিহীন হয়ে পড়ে। এমনকি অত্যধিক পীড়নকালে দূরবর্তী স্থানে জল পরিবহণ করার জন্য এরা একটি অত্যন্ত দৃঢ়, স্থিতিস্থাপক, লিগনিন-সেলুলোজ নির্মিত গৌণ কোশপ্রাচীর গঠন করে। তোমরা উদ্ভিদদেহে লক্ষ করেছ এমন বিভিন্ন শারীরস্থানিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং এদের কার্যসমূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করো।

উদ্ভিদে আরেকটি মজাদার ঘটনা দেখা যায়। সজীব বিভেদিত কোশগুলো যারা ইতোমধ্যে বিভাজনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে সেগুলোও নির্দিষ্ট কিছু অবস্থায় পুনরায় বিভাজনের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এই ঘটনাকে **বিপরীত বিভেদীকরণ** বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সম্পূর্ণরূপে বিভেদিত প্যারেনকাইমা থেকে ইন্টারফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম ও কর্ক ক্যাম্বিয়াম নামক ভাজক কলা সৃষ্টি হয়। এই ক্রিয়া চলার সময় দেখা যায় যে এই ধরনের ভাজক কলা বা কলাসমূহ বিভাজনে সক্ষম হয় এবং নতুন কোশ সৃষ্টি করে, যারা পুনরায় বিভাজন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য পরিণত হয় অর্থাৎ কোশগুলো **পুনর্বিভেদিত** হয়। একটি কাষ্ঠল দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কিছু কলার নাম লিপিবদ্ধ করো যেগুলো পুনর্বিভেদীকরণের ফলে উৎপন্ন হয়। একটি টিউমারকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? তোমরা সেই প্যারেনকাইমা কোশগুলোকে কী বলবে, যেগুলোর পরীক্ষাগারে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উদ্ভিদ-কলা পালন মাধ্যমে বিভাজন ঘটানো হয়।

মনে করে দেখো 15.1.1 অনুচ্ছেদে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি মুক্ত প্রকৃতির অর্থাৎ এটি অনিয়ত বা নিয়ত হতে পারে। এখন আমরা বলতে পারি যে উদ্ভিদে বিভেদীকরণ মুক্ত প্রকৃতির কারণ একই ভাজক কলা থেকে উৎপন্ন কোশ/কলা পরিণত অবস্থায় ভিন্ন গঠন তৈরি করে। পরিণত অবস্থায় একটি কোশ বা কলার চূড়ান্ত গঠন কোশের অবস্থানের মাধ্যমেও নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, মূলের অগ্রস্থ ভাজককলা থেকে দূরে অবস্থিত কোশসমূহ বিভেদিত হয়ে মূলত্রের কোশ গঠন করে, অন্যদিকে মূলের অগ্রস্থ ভাজককলার যে কোশগুলো পরিধির দিকে সরে যায় যেগুলো পরিণত হয়ে বহিঃত্বক গঠন করে। তোমরা কি আরও কিছু মুক্ত বিভেদীকরণের উদাহরণ দিতে পারবে যেখানে কোনও অঙ্গের মধ্যে একটি কোশের অবস্থানের সাথে বিভেদীকরণের সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

15.3 পরিস্ফুরণ (Development)

একটি জীবের জীবনচক্র চলাকালে বীজের অঙ্কুরোদ্গম থেকে বার্ধক্য প্রাপ্তি পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সব পরিবর্তনগুলোই পরিস্ফুরণের অন্তর্ভুক্ত। চিত্র 15.8-এ একটি উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদের কোশের পরিস্ফুরণের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াগুলোর চিত্ররূপটি উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি কলাসমূহ/অঙ্গাসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

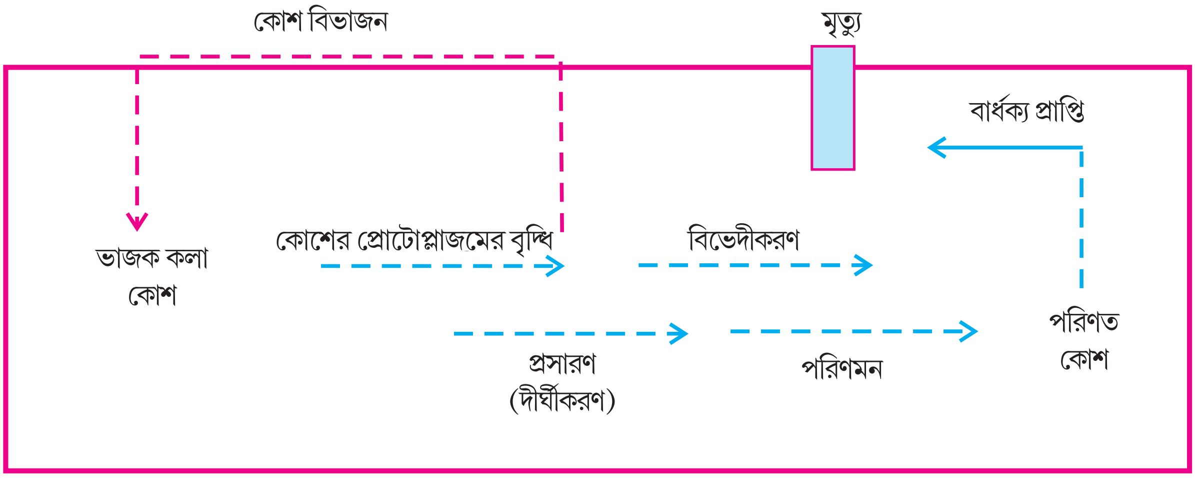

চিত্র 15.8 একটি উদ্ভিদ কোশে পরিস্ফুরণ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক চিত্ররূপ

পরিবেশ বা জীবনের বিভিন্ন দশাসমূহের প্রভাবে বিভিন্ন ধরনের গঠন তৈরি করতে উদ্ভিদসমূহ বিভিন্ন পথ অবলম্বন করে। এই ক্ষমতাকে **প্লাস্টিসিটি (Plasticity)** বলা হয়। উদাহরণ, তুলা, ধনে এবং লার্কস্পুর (দীর্ঘ নীল রঙের ফুল বিশিষ্ট এক ধরনের গুল্ম) উদ্ভিদে হেটেরোফাইলি পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের উদ্ভিদে জুভেনাইল বা তরুণ উদ্ভিদের পাতার আকৃতি পরিণত উদ্ভিদ অপেক্ষা পৃথক হয়। অন্যদিকে, বাটারকার্প উদ্ভিদের বায়ব পাতা ও জলে নিমজ্জিত পাতার আকৃতিগত পার্থক্যও পরিবেশের প্রভাবে বিভিন্ন আকৃতির পাতার সৃষ্টিকে (Heterophyllous development) নির্দেশ করে (চিত্র 15.9)। একই উদ্ভিদে বিভিন্ন ধরনের পাতা সৃষ্টির (Heterophylly) এই ঘটনাটি হল প্লাস্টিসিটি (Plasticity) এর একটি উদাহরণ।

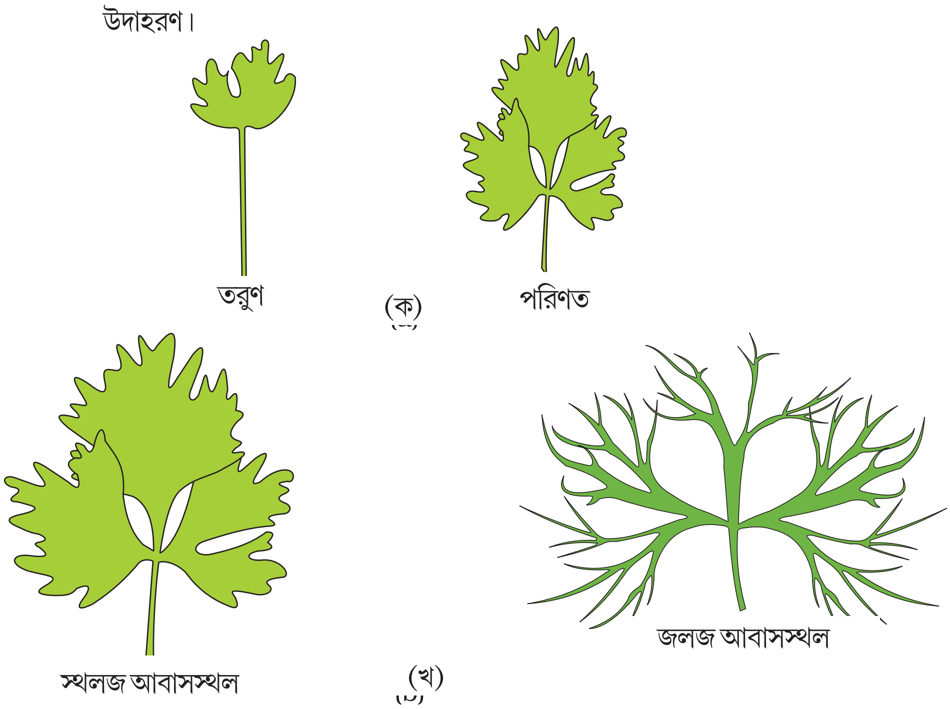

চিত্র 15. 9 (ক) লার্কস্পুর এবং (খ) বাটার কার্পে হেটারোফাইলি

সুতরাং বৃদ্ধি, বিভেদীকরণ এবং পরিস্ফুরণ এই ঘটনাগুলো একটি উদ্ভিদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বিশদভাবে, পরিস্ফুরণকে বৃদ্ধি ও বিভেদনের যোগফল হিসাবে গণ্য করা হয়। উদ্ভিদের পরিস্ফুরণ (অর্থাৎ, বৃদ্ধি এবং বিভেদন উভয়ই) অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক প্রভাবক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অভ্যন্তরীণ প্রভাবকগুলো অন্তঃকোশীয় (জিনগত) বা আন্তঃকোশীয় (যেমন উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রকসমূহের মতো রাসায়নিক দ্রব্য) উভয় ধরনের হয়। অন্যদিকে, বাহ্যিক প্রভাবকগুলোর মধ্যে রয়েছে আলোক, তাপমাত্রা, জল, অক্সিজেন, পরিপোষক ইত্যাদি।

15.4 উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রকসমূহ (Plant growth regulators)

15.4.1 চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি (Characteristics)

উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকসমূহ (PGRs) হল বিচিত্র রাসায়নিক গঠন সমন্বিত সরল ক্ষুদ্র অণু। এগুলো ইন্ডোল যৌগ (ইন্ডোল-3-অ্যাসিটিক অ্যাসিড, IAA); অ্যাডিনিন লব্ধ পদার্থসমূহ (N^6 -ফারফিউরাইল অ্যামিনো পিউরিন, কাইনেটিন), ক্যারোটিন লব্ধ পদার্থসমূহ (অ্যাবসিসিক অ্যাসিড-ABA); টারপিনস (জিব্বেরেলিক অ্যাসিড-GA_3) বা গ্যাসীয় পদার্থসমূহ (ইথিলিন-C_2H_4) হতে পারে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রকসমূহকে উদ্ভিদের বৃদ্ধি সহায়ক বস্তু, উদ্ভিদ হরমোন বা ফাইটোহরমোন হিসেবে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

PGR গুলোকে সজীব উদ্ভিদদেহে তাদের কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে বিস্তৃতভাবে দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যেতে পারে। এদের মধ্যে একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত PGRগুলো কোশবিভাজন, কোশের সম্প্রসারণ, কোশের সজ্জারীতি, দিকনির্ণীত বৃদ্ধি, পুষ্পোদ্গম, ফল ও বীজের উৎপাদনের মতো বৃদ্ধি সহায়ক ক্রিয়াসমূহে অংশগ্রহণ করে। এগুলোকে উদ্ভিদের বৃদ্ধি উদ্দীপকও বলা হয়, যেমন অক্সিন, জিব্বেরেলিন এবং সাইটোকাইনিন। অপর গোষ্ঠীর PGR সমূহ জীবজ এবং অজীবজ কারণঘটিত ক্ষত এবং পীড়নের প্রতি উদ্ভিদের সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরা সুপ্তাবস্থা ও মোচনের মতো উদ্ভিদের বিভিন্ন বৃদ্ধি প্রতিরোধী ক্রিয়ার সাথেও জড়িত। অ্যাবসিসিক অ্যাসিড এই গোষ্ঠীভুক্ত একটি PGR। গ্যাসীয় PGR ইথিলিনকে উপরোক্ত যে-কোনো গোষ্ঠীতেই রাখা যায়, কিন্তু এটি মুখ্যত বৃদ্ধি রোধক হিসেবেই কাজ করে।

15.4.2 উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রকসমূহের আবিষ্কার (The Discovery of Plant Growth Regulators)

মজার বিষয় হল, পাঁচটি মুখ্য PGR-এর প্রতিটির আবিষ্কারই হয়েছে আকস্মিকভাবে। এসবের সূত্রপাত হয়েছিল চার্লস ডারউইন এবং তার পুত্র ফ্রান্সিস ডারউইনের পর্যবেক্ষণের পর থেকে যখন তারা লক্ষ করল যে এক বিশেষ ঘাসজাতীয় উদ্ভিদে (canary grass) ভ্রূণমুকুলাবরণী (coleoptile) আলোর উৎসের অভিমুখে বৃদ্ধির (phototropism) দ্বারা একপার্শ্বীয় আলোকপাতের প্রতি সাড়া দেয়। ধারাবাহিকভাবে একটি পরীক্ষা সম্পাদনের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়েছিল যে ভ্রূণমুকুলাবরণীর শীর্ষ ভাগ হল সেই স্থান যে স্থান থেকে প্রেরিত প্রভাবকের প্রভাবেই সম্পূর্ণ ভ্রূণমুকুলাবরণীটি বেঁকে গিয়েছিল (চিত্র 15.10)। F.W. Went সর্বপ্রথম ওট্ (Oat) এর চারাগাছের ভ্রূণমুকুলাবরণীটির শীর্ষভাগ থেকে অক্সিন নিষ্কাশন করেন।

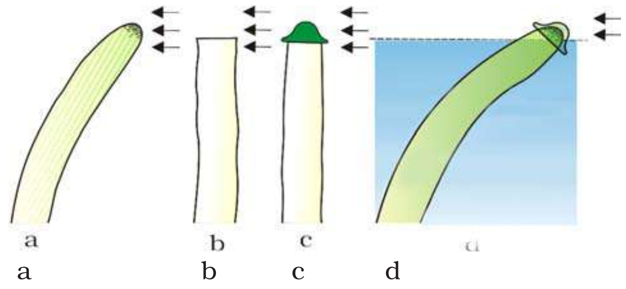

চিত্র 15.10 ভ্রূণমুকুলাবরণীর শীর্ষভাগ অক্সিনের উৎস— তা প্রদর্শনে ব্যবহৃত পরীক্ষা। তিরসমূহ আলোর অভিমুখ নির্দেশ করছে।

Gibberella fujikuroi নামক একটি রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক ধানের চারায় ব্যাকেনি রোগ (foolish seedling) সৃষ্টি করে। E. Kurosawa ধানের চারাগাছের উপর ছত্রাকটির নির্বীজিত পরিস্রুত রস ব্যবহার করে অসংক্রমিত ধানগাছের চারায় রোগের লক্ষণের আবির্ভাব বিবৃত করেছিলেন।

F. Skoog এবং তার সহকর্মীরা লক্ষ করেন যে তামাক গাছের কাণ্ডের পর্বমধ্যের টুকরো থেকে কেলাসের (অবিভেদিত কোশপুঞ্জ) বৃদ্ধি তখনই ঘটে যখন পরিপোষক মাধ্যমে অক্সিনের পাশাপাশি নিম্নোক্ত কোনো একটি উপাদান যথা ভ্যাসকুলার কলার নির্যাস, ইস্টের নির্যাস, নারকেলের দুধ বা DNA যোগ করা হয়। Skoog এবং Miller পরবর্তীকালে সাইটোকাইনেসিস-সহায়ক সক্রিয় বস্তুকে শনাক্ত করেন ও কেলাসিত করেন, যেটিকে তাঁরা কাইনেটিন নামকরণ করেন।

1960 সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনজন গবেষক স্বাধীনভাবে গবেষণা করে তিনটি ভিন্ন ধরনের প্রতিরোধক যথা ইনহিবিটার-B, অ্যাবসিসান II এবং ডরমিনের বিশুদ্ধিকরণ ও রাসায়নিক বৈশিষ্টিকরণ বিবৃত করেন। পরবর্তীকালে এই তিনটি প্রতিরোধকই রাসায়নিকভাবে অভিন্ন বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছিল অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (ABA)।

Cousins এটা সুনিশ্চিত করেছিলেন যে পাকা কমলালেবু থেকে একটি উদ্বায়ী পদার্থ নির্গত হয় এবং এটি গুদামজাত অপক্ক কলার পেকে যাওয়াকে ত্বরান্বিত করে। পরবর্তীকালে এই উদ্বায়ী পদার্থটিকেই একটি গ্যাসীয় PGR ইথিলিন হিসাবে শনাক্ত করা হয়েছিল।

চলো PGR-এর এই পাঁচটি বিভাগের কিছু শারীরবৃত্তীয় প্রভাব সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করি।

15.4.3 উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রকসমূহের শারীরবৃত্তীয় প্রভাব (Physiological Effects of Plant Growth Regulators)

15.4.3.1 অক্সিন (Auxins)

অক্সিন (গ্রিক শব্দ 'auxein' : to grow) সর্বপ্রথম মানব মূত্র থেকে নিষ্কাশন করা হয়েছিল। অক্সিন শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছিল ইন্ডোল-3-অ্যাসিটিক অ্যাসিড (IAA) এবং অন্য কিছু প্রাকৃতিক ও কৃত্রিমভাবে সংশ্লেষিত যৌগের ক্ষেত্রে যাদের নির্দিষ্ট বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক ধর্ম রয়েছে। এই যৌগগুলো সাধারণত কাণ্ড ও মূলের অগ্রভাগের বর্ধনশীল অঞ্চলে উৎপন্ন হয় এবং সেখান থেকে এগুলো এদের ক্রিয়া-স্থানে পরিবাহিত হয়। IAA এবং ইন্ডোল বিউটারিক অ্যাসিড (IBA) এর মত অক্সিনগুলো উদ্ভিদ থেকে নিষ্কাশন করা হয়েছিল। NAA (ন্যাপথলিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড) এবং 2, 4-D (2, 4 ডাইক্লোরোফেনক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড) হল কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষিত অক্সিন। এই অক্সিনগুলোই কৃষিক্ষেত্রে এবং উদ্যান পালন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এগুলো কর্তিত কাণ্ড থেকে মূল সৃষ্টিতে সহায়তা করে। উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে এগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। অক্সিন পুষ্প প্রস্ফুটনকে ত্বরান্বিত করে, যেমন, আনারসের ক্ষেত্রে। এগুলো ফল ও পাতার অকাল মোচন প্রতিরোধে সাহায্য করে কিন্তু পুরোনো ও পরিণত পাতা ও ফলের মোচনে সহায়তা করে।

বেশিরভাগ উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদেই, বর্ধনশীল অগ্রস্থ মুকুলটি পার্শ্ব (কাক্ষিক) মুকুলগুলোর বৃদ্ধিতে বাধা দান করে, এই ঘটনাকে বলা হয় **অগ্রস্থ প্রকটতা (Apical dominance)**। বিটপের শীর্ষভাগের অপসারণ (decapitation) সাধারণত পার্শ্ব মুকুলের বৃদ্ধি ঘটায় (চিত্র 15.11)। চা বাগানে এবং ঝোঁপ তৈরিতে (hedge-making) এর ব্যাপক প্রয়োগ হয়। তুমি কি এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে?

অক্সিন পার্থেনোকার্পি প্রক্রিয়াটিকেও উদ্দীপিত করে, যেমন টমেটোর ক্ষেত্রে। আগাছানাশক হিসাবে এগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। 2, 4-D দ্বিবীজপত্রী আগাছা নির্মূলকরণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় কিন্তু এটি পরিণত একবীজপত্রী উদ্ভিদের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না। আগাছামুক্ত লন (lawn) তৈরি করতে বাগানের মালিরা এটি ব্যবহার করেন। জাইলেমের বিভেদীকরণ নিয়ন্ত্রণে এবং কোশ বিভাজনেও অক্সিন সহায়তা করে।

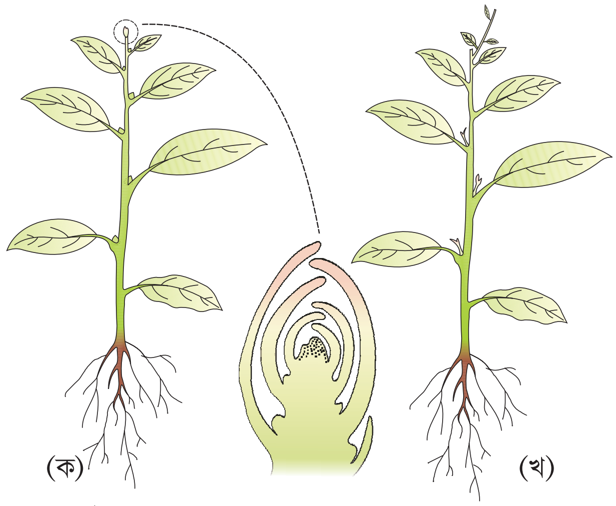

চিত্র 15.11 উদ্ভিদের অগ্রস্থ প্রকটতা: ক) অক্ষত অগ্রমুকুল সহ একটি উদ্ভিদ খ) অগ্রমুকুলটি অপসারণ করা হয়েছে এমন একটি উদ্ভিদ বিটপের শীর্ষভাগ অপসারণ (Decapitation)-এর পর পার্শ্বমুকুলগুলো বৃদ্ধি পেয়ে শাখা সৃষ্টি হওয়া লক্ষ কর।

15.4.3.2 জিব্বেরেলিন (Gibberellins)

অপর এক ধরনের উদ্দীপক PGR হল জিব্বেরেলিন। ছত্রাক এবং উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের মতো ব্যাপকভাবে বিস্তৃত বিভিন্ন সজীব বস্তু থেকে শতাধিক জিব্বেরেলিন পাওয়া গেছে; এগুলোকে GA_1, GA_2, GA_3 এইভাবে চিহ্নিত করা হয়। প্রথম আবিষ্কৃত জিব্বেরেলিনগুলোর মধ্যে একটি হল জিব্বারেলিক অ্যাসিড (GA_3) এবং এটিকেই গভীরভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছে। সব জিব্বেরেলিক অ্যাসিডই আম্লিক। এগুলো উদ্ভিদদেহে ব্যাপক পরিসরে শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এগুলোর কাণ্ডের অক্ষের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটানোর ক্ষমতা রয়েছে, তাই এদের আঙুরের বোঁটার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করতে ব্যবহার করা হয়। জিব্বেরেলিন আপেলের মতো ফলকে দীর্ঘায়ত করে এবং এর আকৃতিও বৃদ্ধি করে। এটি বার্ধক্য প্রাপ্তিকেও বিলম্বিত করে। তাই ফলগুলোকে বহুদিন পর্যন্ত গাছে রাখা যেতে পারে যাতে বাজারজাতকরণের সময়কাল বাড়ানো যায়। বিয়ার বা মদ তৈরির কারখানায় শিরা বা মণ্ড তৈরির প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করতে GA_3 ব্যবহৃত হয়।

আখ তাদের কাণ্ডে কার্বোহাইড্রেটকে শর্করা রূপে সঞ্চয় করে রাখে। আখের ফসলে জিব্বেরেলিন প্রয়োগ করলে কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়, এবং তাই প্রতি একর জমিতে এর ফলন প্রায় 20 টনের মত বৃদ্ধি পায়।

তরুণ পাইন জাতীয় উদ্ভিদে GA প্রয়োগ করলে তা উদ্ভিদের পরিণতির দশাকে ত্বরান্বিত করে, এরফলে যথাসময়ের আগেই বীজের উৎপাদন ঘটে। বিট, বাঁধাকপি এবং রোজেট বৈশিষ্ট্যযুক্ত বহু উদ্ভিদে জিব্বেরেলিন বোল্টিং (পুষ্পোদ্গমের ঠিক পূর্বে পর্বমধ্যের দীর্ঘীকরণ) ঘটায়।

15.4.3.3 সাইটোকাইনিন (Cytokinins)

সাইটোকাইনেসিসের উপর সাইটোকাইনিনের সুনির্দিষ্ট প্রভাব রয়েছে এবং এটি কাইনেটিন (অ্যাডিনিনের একটি পরিবর্তিত রূপ। অ্যাডিনিন একপ্রকার পিউরিন) রূপে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই কাইনেটিন হেরিংমাছের শুক্রাণুর **DNA**কে অটোক্লেভের সাহায্যে (**Autoclaved herring sperm DNA**) নির্বীজিত করার পর এর থেকে পাওয়া গিয়েছিল। কাইনেটিন প্রাকৃতিকভাবে উদ্ভিদে থাকে না। সাইটোকাইনিনের মতো ক্রিয়াশীল প্রাকৃতিক পদার্থ অনুসন্ধানের সময় ভুট্টা বীজের শাঁস এবং নারকেলের দুধ থেকে জিয়াটিনকে পৃথক করা হয়েছিল। জিয়াটিনের আবিষ্কারের পর বিভিন্ন প্রাকৃতিক সাইটোকাইনিন এবং কোশ বিভাজনের উদ্দীপনা প্রদানকারী কিছু কৃত্রিম যৌগের শনাক্তকরণ হয়েছিল। প্রাকৃতিক সাইটোকাইনিন সেসব অঞ্চলে সংশ্লেষিত হয় যেখানে খুব দ্রুত কোশ বিভাজন ঘটে, উদাহরণস্বরূপ, মূলের অগ্রভাগ, বর্ধনশীল বিটপের মুকুল, অপরিণত ফল ইত্যাদি। এটি নতুন পাতা তৈরিতে, পাতায় ক্লোরোপ্লাস্ট তৈরিতে, পার্শ্ব শাখার বৃদ্ধিতে এবং অস্থানিক শাখা তৈরিতেও সাহায্য করে।

সাইটোকাইনিন অগ্রস্থ প্রকটতা রোধে সাহায্য করে। এটি পরিপোষকের স্থানান্তরণকে উদ্দীপিত করে যা পাতার বার্ধক্য প্রাপ্তি বিলম্বিত করতে সহায়তা করে।

15.4.3.4 ইথিলিন (Ethylene)

ইথিলিন হল একটি সরল গ্যাসীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক (PGR)। পাকা ফলে এবং বার্ধক্য দশা চলছে এমন কলায় প্রচুর পরিমাণে ইথিলিন সংশ্লেষিত হয়। উদ্ভিদের উপর ইথিলিনের প্রভাবগুলোর মধ্যে রয়েছে চারাগাছের অনুভূমিক বৃদ্ধি, অক্ষের স্ফীতি এবং দ্বিবীজপত্রী চারাগাছে অগ্রস্থ হুক গঠন। ইথিলিন উদ্ভিদের অঙ্গাসমূহের বিশেষত পাতা এবং ফুলের বার্ধক্যপ্রাপ্তি এবং মোচন প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে। ফলের পরিপক্বতার ক্ষেত্রে ইথিলিন অধিক ক্রিয়াশীল। ফল পাকার সময় এটি কোশের শ্বসন হার বৃদ্ধি করে। শ্বসন হারের এই বৃদ্ধিকে রেসপিরেটরি ক্লাইমেটিক (Respiratory climatic) বলে।

ইথিলিন বীজ ও মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গ করে, বাদামের বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সূচনা করে, আলুর স্ফীত কন্দের মুকুলোদ্গম ঘটায়। ইথিলিন গভীর জলে জন্মানো ধানগাছের পর্বমধ্য/পত্রবৃন্তের দ্রুত দীর্ঘীকরণকে উদ্দীপিত করে। এটি পাতা/বিটপের উপরিভাগের অংশসমূহকে জলের উপরে থাকতে সহায়তা করে। ইথিলিন মূলের বৃদ্ধি এবং মূলরোমের গঠনকেও উদ্দীপিত করে, এইভাবে উদ্ভিদকে এদের শোষণতল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

পুষ্পোদ্গমের সূচনা এবং এর সাথে আনারসে ফল গঠন এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ইথিলিন ব্যবহৃত হয়। এটি আমগাছের পুষ্পোদ্গমকেও উদ্দীপিত করে। ইথিলিন এত সংখ্যক বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করায় এটি কৃষিকার্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত PGR -এর মধ্যে একটি। ইথিলিনের উৎস হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত যৌগটি হল ইথেফন। ইথেফনের জলীয় দ্রবণ সহজেই উদ্ভিদদেহে শোষিত ও পরিবাহিত হয় এবং এর থেকে ধীরে ধীরে ইথিলিনের মুক্তি ঘটে। ইথেফন টমেটো, আপেলের ফল পাকার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং ফুল ও ফলের মোচন (তুলা, চেরি, আখরোটের খসে পড়া) দ্রুততর করে। শশার ক্ষেত্রে এটি স্ত্রী ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়ে এর ফলন বৃদ্ধি করে।

15.4.3.5 অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (Abscisic acid)

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মোচন ও সুপ্তাবস্থা নিয়ন্ত্রণে অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (ABA) ভূমিকা থাকার কারণেই এটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য PGR -এর মতোই, উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং পরিস্ফুরণের উপরও এর সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে। এটি উদ্ভিদের সাধারণ বৃদ্ধি এবং বিপাক ক্রিয়ায় বাধা প্রদানকারী হিসাবে কাজ করে। ABA বীজের অঙ্কুরোদ্গমেও বাধা দান করে। ABA, বহি:ত্বকে উপস্থিত পত্ররন্ধ্রের বন্ধ হওয়ার প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে এবং বিভিন্ন ধরনের পীড়নের প্রতি উদ্ভিদের সহনশীলতা বৃদ্ধি করে। সেই জন্য এটিকে পীড়ন হরমোনও বলা হয়। বীজের বৃদ্ধি, পরিণত হওয়া এবং সুপ্তাবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ABA গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুপ্তাবস্থাকে উদ্দীপিত করার মাধ্যমে ABA বীজগুলোর বিনষ্ট হওয়াকে এবং বৃদ্ধির পক্ষে প্রতিকূল অন্যান্য প্রভাবকগুলোকে প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে। বেশিরভাগ পরিস্থিতিতেই ABA জিব্বেরেলিক অ্যাসিডের বিপরীতধর্মী কাজ করে।

আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, উদ্ভিদের বৃদ্ধি বিভেদীকরণ ও পরিস্ফুরণের যে-কোনোটির প্রতিটি দশার জন্যই এক বা একাধিক PGR কে কিছু ভূমিকা পালন করতে হয়। এ ধরনের ভূমিকাগুলো পরিপূরক বা পরস্পর বিরোধী হতে পারে। এগুলোর ক্রিয়া স্বতন্ত্র বা সমষ্টিগতও হতে পারে।

একইভাবে, একটি উদ্ভিদের জীবনে কিছু সংখ্যক এমন ঘটনা রয়েছে যেখানে একাধিক PGR আন্ত:ক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটনাটিকে প্রভাবিত করে। যেমন বীজ/মুকুলের সুপ্তাবস্থা, মোচন, বার্ধক্যপ্রাপ্তি, অগ্রস্থ প্রকটতা ইত্যাদি।

মনে রেখো, PGR - এর ভূমিকা হল, কেবলমাত্র এক ধরনের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রক রূপে কাজ করা। জিনোমগত নিয়ন্ত্রণ এবং বাহ্যিক প্রভাবক সহযোগে এরা উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বহু বাহ্যিক প্রভাবক, যেমন-তাপমাত্রা এবং আলোক, PGR-এর মাধ্যমে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ ধরনের কিছু ঘটনার উদাহরণ হল: বাসন্তীকরণ, পুষ্পোদ্গম, সুপ্তদশা, বীজের অঙ্কুরোদ্গম, উদ্ভিদের চলন ইত্যাদি।

পুষ্প প্রস্ফুটনের সূচনায় আলোক এবং তাপমাত্রার (এদের উভয়ই হল বাহ্যিক প্রভাবক) ভূমিকা সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

15.5 আলোকপর্যায়বৃত্তি (Photoperiodism)

এটি লক্ষ করা গেছে কিছু কিছু উদ্ভিদে পুষ্পোদ্গম ঘটাতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর উদ্ভিদকে আলোকের উপস্থিতিতে রাখা প্রয়োজন। এটাও দেখা গেছে যে, এ ধরনের উদ্ভিদে পুষ্পোদ্গমের জন্য কত সময় ধরে আলোকের উপস্থিতিতে থাকা প্রয়োজন, তা পরিমাপের ব্যবস্থাও এদের রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কিছু কিছু উদ্ভিদে উপযুক্ত সংকট আলোককাল (**critical duration**) এর অধিক সময়কাল ধরে আলোকপাতের প্রয়োজন হয়। অপরদিকে অন্য উদ্ভিদগুলোতে পুষ্পোদ্গমের সূচনার পূর্বে এদেরকে অবশ্যই এই সংকটকালের চেয়ে কম সময়ব্যাপী আলোকের উপস্থিতিতে রাখতে হবে। প্রথম উল্লেখিত উদ্ভিদগোষ্ঠীকে বলা হয় **দীর্ঘ দিবা উদ্ভিদ (Long day plant)**, যেখানে পরবর্তী গোষ্ঠীটিকে বলা হয় **হ্রস্ব দিবা উদ্ভিদ (Short day plant)**। বিভিন্ন উদ্ভিদের জন্য সংকটকাল ভিন্ন ভিন্ন হয়। এমন বহু উদ্ভিদ রয়েছে যাদের ক্ষেত্রে আলোকপাতের সময়কাল ও পুষ্পোদ্গমের সূচনা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নয়, এ ধরনের উদ্ভিদকে **দিবা নিরপেক্ষ উদ্ভিদ (Day neutral plant)** বলে (চিত্র 5.12)।

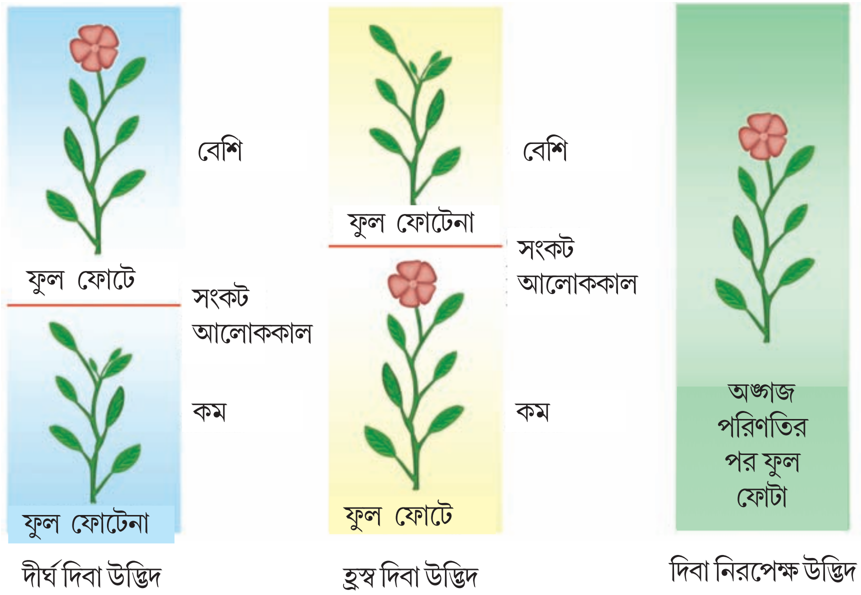

চিত্র 15.12 আলোকপর্যায়বৃত্তি: দীর্ঘ দিবা, হ্রস্ব দিবা এবং দিবা নিরপেক্ষ উদ্ভিদগুলো।

এখন এটিও জানা গেছে যে, কেবলমাত্র আলোককালের স্থিতিকালই নয়, অন্ধকারকালের স্থিতিকালও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ এটি বলা যায় যে কিছু নির্দিষ্ট উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পুষ্পোদ্গম শুধুমাত্র আলোককাল এবং অন্ধকারকালের মিলিত প্রভাবের উপরই নির্ভর করে না, উপরন্তু সেগুলোর আপেক্ষিক স্থিতিকালের উপরও নির্ভর করে। দিবা/রাত্রিকালের প্রতি উদ্ভিদের সাড়া দেওয়ার এই ঘটনাটিকে বলে **আলোকপর্যায়বৃত্তি**। লক্ষ্য করার মতো মজার বিষয় হল এই যে, পুষ্পোদ্গমের পূর্বে যখন বিটপের শীর্ষভাগটি পুষ্প সৃষ্টিকারী বিটপাংশে পরিবর্তিত হয়, তখন এরা (উদ্ভিদের বিটপের শীর্ষভাগ) নিজে থেকে আলোককালটিকে উপলব্ধি করতে পারে না। উদ্ভিদের আলোক/অন্ধকারকাল উপলব্ধির স্থানটি হল- পাতা। এটা অনুমান করা হয়েছে যে একটি হরমোন জাতীয় বস্তু পুষ্পোদ্গমের জন্য দায়ী। এই হরমোন জাতীয় বস্তুটি পুষ্পোদ্গম ঘটানোর জন্য তখনই পাতা থেকে বিটপ শীর্ষে স্থানান্তরিত হয় যখন উদ্ভিদগুলোকে প্রয়োজনীয় আবেশক আলোককালের (inductive photoperiod) উপস্থিতিতে রাখা হয়।

15.6 বাসন্তীকরণ (Vernalisation)

এমন কিছু উদ্ভিদ রয়েছে যাদের ক্ষেত্রে পুষ্পোদ্গমের পরিমাণগত বা গুণগত মান উদ্ভিদকে নিম্ন তাপমাত্রায় রাখার উপর নির্ভর করে। এই ঘটনাটিকে বলা হয় **বাসন্তীকরণ**। এটি গাছপালার বৃদ্ধি মরশুমের শেষদিকে সময়ের পূর্বে জননগত পরিস্ফুরণে বাধা দান করে যার ফলে উদ্ভিদ পরিণত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় পায়। বাসন্তীকরণ বলতে বিশেষভাবে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে নিম্নতাপমাত্রা প্রদানের দ্বারা পুষ্পোদ্গমকে উদ্দীপিত করা। গম, বার্লি, রাই-এসব গুরুত্বপূর্ণ কিছু খাদ্য উৎপাদনকারী উদ্ভিদের দুই ধরনের ভ্যারাইটি রয়েছে: শীতকালীন এবং বসন্তকালীন ভ্যারাইটি। বসন্তকালীন ভ্যারাইটিকে স্বাভাবিকভাবেই বসন্তকালে লাগানো হয় এবং এই মরশুমেই এদের পুষ্পোদ্গম ঘটে এবং বৃদ্ধির মরশুম শেষ হওয়ার পূর্বেই শস্য উৎপন্ন হয়। তবে শীতকালীন ভ্যারাইটিগুলোকে বসন্তকালে লাগানো হলেও এদের ফুল ফোটে না বা ফুল ফোটার মরশুম জুড়ে পরিণত শস্যদানাও উৎপন্ন হয় না। তাই সেই উদ্ভিদগুলোকে শরৎকালে লাগানো হয়। এগুলোর অঙ্কুরোদ্গম ঘটে এবং সমগ্র শীতকাল জুড়ে বৃদ্ধি পেয়ে ছোটো চারাগাছে পরিণত হয়। বসন্তকালে বৃদ্ধি শুরু হয় এবং সাধারণত গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি সময়ে ফসল তোলা হয়।

বাসন্তীকরণের অপর একটি উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদে। দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদগুলো একফসলি হয়, যেগুলো সাধারণত দ্বিতীয় মরশুমে পুষ্পোদ্গম ঘটায় এবং মারা যায়। বিট, বাঁধাকপি, গাজর হল কিছু সাধারণ দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদ। নিম্ন তাপমাত্রা প্রদানের মাধ্যমে একটি দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরবর্তীকালে আলোকপর্যায়ভিত্তিক পুষ্পোদ্গমকে উদ্দীপিত করে।

সারাংশ

বৃদ্ধি হল সজীব বস্তুতে ঘটা সুস্পষ্ট ঘটনাবলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট একটি ঘটনা। এটি হল সজীব বস্তুর অপরিবর্তনীয়ভাবেই বেড়ে যাওয়া যাকে আকার, ক্ষেত্রফল, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, আয়তন, কোশের সংখ্যা ইত্যাদি পরিমাপগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। প্রোটোপ্লাজমীয় বস্তুর বৃদ্ধি সুস্পষ্টভাবে এর অন্তর্গত। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ভাজক কলা হল বৃদ্ধির স্থান। মূল ও কাণ্ডের অগ্রস্থ ভাজকলা কখনো কখনো নিবেশিত ভাজককলা সহযোগে উদ্ভিদ অক্ষের দীর্ঘীকরণে অংশ নেয়। উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি অনিয়ত।

মূল ও কাণ্ডের অগ্রস্থ ভাজককলার কোশে কোশ বিভাজনের ফলে ঘটা বৃদ্ধি সমান্তর বা গুণোত্তর হতে পারে। কোশ/কলা/অঙ্গ/জীবের সমগ্র জীবনকাল ধরে উচ্চহারে বৃদ্ধি সাধারণত স্থায়ী হয় না। বৃদ্ধির তিনটি মুখ্য দশাকে লেগ, লগ্ এবং বার্ধক্য দশা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যখন একটি কোশ বিভাজনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন এটি বিভেদিত হয়। বিভেদীকরণের ফলে বিভিন্ন গঠন তৈরি হয় যা কোন্ কোশ কোন্ কার্য করবে তা নির্ধারণ করে। কোশ, কলা এবং অঙ্গের বিভেদীকরণের সাধারণ নীতি একই প্রকার। একটি বিভেদিত কোশ আবার বিপরীতভাবে বিভেদিত এবং তারপর পুনঃবিভেদিত হতে পারে। যেহেতু উদ্ভিদে বিভেদীকরণ মুক্ত প্রকৃতির তাই পরিস্ফুরণের ক্ষেত্রেও নমনীয়তা দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ পরিস্ফুরণ হল বৃদ্ধি এবং বিভেদীকরণের যোগফল। পরিস্ফুরণকালে উদ্ভিদে প্লাস্টিসিটিও দেখা যায়।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণ প্রক্রিয়া আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় প্রভাবক দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। আন্তঃকোশীয় অভ্যন্তরীণ প্রভাবকগুলো হল রাসায়নিক পদার্থসমূহ যেগুলোকে উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক (PGR) বলা হয়। উদ্ভিদে বিভিন্ন গোষ্ঠীর PGR রয়েছে যেগুলো মুখ্যত পাঁচটি বিভাগের অন্তর্গত— অক্সিন, জিব্বেরেলিন, সাইটোকাইনিন, অ্যাবসিসিক অ্যাসিড এবং ইথিলিন। এই সকল PGR উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে সংশ্লেষিত হয়। এগুলো বিভদীকরণ ও পরিস্ফুরণের বিভিন্ন ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। উদ্ভিদের ওপর যে কোনো PGR এর ব্যাপক শারীরবৃত্তীয় প্রভাব রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের PGR গুলোর প্রভাবও একইরকম হয়। PGR গুলো সম্মিলিতভাবে বা পরস্পরের বিপরীতভাবে কাজ করতে পারে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণ প্রক্রিয়া আলোক, তাপমাত্রা, পরিপোষক, অক্সিজেনের পরিমাণ, অভিকর্ষ-বল এবং এ ধরনের বাহ্যিক প্রভাবক দ্বারাও প্রভাবিত হয়।

কিছু কিছু উদ্ভিদে পুষ্পোদ্গম তখনই ঘটে যখন এদেরকে আলোককালের নির্দিষ্ট স্থিতিকাল ধরে আলোকে রাখা হয়। চাহিদা অনুযায়ী আলোককালের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে উদ্ভিদগুলোকে হ্রস্ব দিবা উদ্ভিদ, দীর্ঘ দিবা উদ্ভিদ এবং দিবা নিরপেক্ষ উদ্ভিদ বলা হয়। নির্দিষ্ট কিছু উদ্ভিদের জীবনকালের পরের দিকে পুষ্পোদ্গম ত্বরান্বিত করতে নিম্ন তাপমাত্রা প্রদানেরও প্রয়োজন হয়। এই ব্যবস্থাকে বাসন্তীকরণ বলা হয়।

অনুশীলনী

1. সংজ্ঞা দাও : বৃদ্ধি, বিভেদীকরণ, পরিস্ফুরণ বা বিকাশ, বিপরীত বিভেদীকরণ, পুনর্বিভেদীকরণ, নিয়ত বৃদ্ধি, মেরিস্টেম, বৃদ্ধির হার।
2. একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের সমগ্র জীবনকাল ধরে ঘটা বৃদ্ধি প্রদর্শনের জন্য যে-কোনো একটি পরিমাপণ পদ্ধতি যথেষ্ট নয় কেন?
3. সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :
   (ক) সমান্তর বৃদ্ধি
   (খ) গুণোত্তর বৃদ্ধি
   (গ) সিগময়েড বৃদ্ধি-লেখচিত্র
   (ঘ) চূড়ান্ত ও আপেক্ষিক বৃদ্ধির হার
4. উদ্ভিদের প্রাকৃতিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রকসমূহের পাঁচটি মুখ্য গোষ্ঠীর তালিকা তৈরি করো। এগুলোর মধ্যে যে-কোনো একটি গোষ্ঠীর আবিষ্কার, শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি এবং কৃষিক্ষেত্রে /উদ্যানপালনে এর প্রয়োগ সম্পর্কে লেখো।

5. আলোকপর্যায়বৃত্তি ও বাসন্তীকরণ বলতে তুমি কী বোঝ? এদের তাৎপর্য লেখো।
6. অ্যাবসিসিক অ্যাসিডকে 'পীড়ন হরমোন' বলে কেন?
7. 'উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদে বৃদ্ধি ও বিভেদীকরণ উভয়ই মুক্ত প্রকৃতির' — মন্তব্য করো।
8. 'নির্দিষ্ট স্থানে রাখা দীর্ঘ দিবা এবং হ্রস্ব দিবা উদ্ভিদ দুটিতে একই সাথে পুষ্পোদ্গম ঘটে' — ব্যাখ্যা করো।
9. নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে যদি তোমাকে বলা হয় তবে তুমি কোন্ উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রকটিকে (PGR) ব্যবহার করবে?
   (ক) কাণ্ডের কাটা অংশ থেকে মূল সৃষ্টি উদ্দীপিত করতে
   (খ) দ্রুত ফল পাকাতে
   (গ) পাতার বার্ধক্য বিলম্বিত করতে
   (ঘ) কাক্ষিক মুকুলের বৃদ্ধি উদ্দীপিত করতে
   (ঙ) রোজেট প্রকৃতির উদ্ভিদের বোল্টিং ঘটাতে
   (চ) পাতার পত্ররন্ধ্রের তৎক্ষণাৎ বন্ধ হওয়া উদ্দীপিত করতে
10. একটি পাতা ঝরে যাওয়া উদ্ভিদ কি আলোকপর্যায়বৃত্তীয় চক্রে সাড়া দেবে? কেন?
11. কী ঘটতে পারে যদি :
   (ক) ধানের চারায় GA_3 প্রয়োগ করা হয়
   (খ) বিভাজনশীল কোশে বিভেদীকরণ বন্ধ হয়ে যায়
   (গ) একটি পচা ফলকে অপরিপক্ক ফলের সাথে মেশানো হয়
   (ঘ) যদি তুমি পালন মাধ্যমে (culture medium) সাইটোকাইনিন দিতে ভুলে যাও

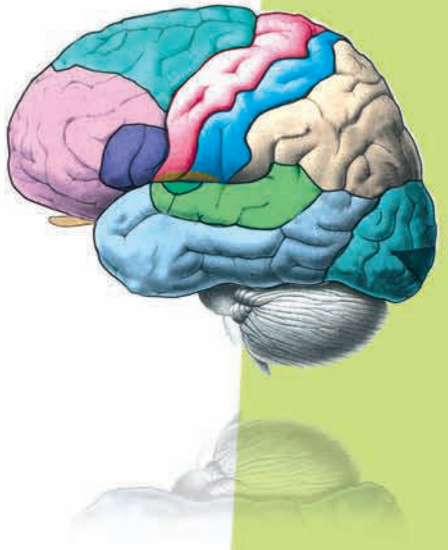

একক — 5

মানব শারীরবিদ্যা (Human Physiology)

অধ্যায় 16

পরিপাক ও শোষণ,

অধ্যায় 17

শ্বাসক্রিয়া ও গ্যাসীয় আদান প্রদান,

অধ্যায় 18

দেহতরল এবং সংবহন,

অধ্যায় 19

রেচন পদার্থসমূহ ও তাদের অপসারণ

অধ্যায় 20

চলন ও গমন

অধ্যায় 21

স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয়,

অধ্যায় 22

রাসায়নিক সমন্বয় সাধন ও একত্রীকরণ

বিশিষ্টকরণ পথে অর্থাৎ জটিল বিষয়কে সরল খণ্ডাংশে বিশ্লিষ্ট করার মাধ্যমে জীবনের ধরনের অধ্যয়নের ফলে ভৌত রাসায়নিক ধারণা ও কৌশলের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধরনের অধ্যয়নের বেশিরভাগই নিয়োজিত হয়েছিল জীবন্ত কলা মডেল-এ বা সরাসরি কোশ মুক্ত পরিবেশে। আণবিক জীববিদ্যায় জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটার পর আণবিক শারীরবিদ্যা অনেকটাই জৈব রসায়ন ও জৈব পদার্থবিদ্যার সমার্থক হয়ে পড়ে। যদিও এখন এটা ক্রমবর্দ্ধমানভাবে বোঝা যাচ্ছে যে বিশুদ্ধ সজীব বস্তু সম্পর্কিত পথ বা বিশুদ্ধ বিশিষ্ট আণবিক পথ (reductionist molecular approach) এর মধ্যে কোনোটিই জৈবিক প্রক্রিয়াসমূহ এবং সজীব ঘটনাবলি সম্পর্কিত সত্যতা বের করতে পারেনি। সিস্টেম বায়োলজি আমাদের বোঝায় যে সকল সজীব ঘটনাবলিই অধ্যয়ন অধীন সিস্টেমের উপাদানগুলোর আন্তঃক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য। অণুগুলোর নিয়ন্ত্রিত নেটওয়ার্ক, অধি আণবিক সমন্বয় কোশসমূহ, কণাসমূহ, সজীব বস্তুগুলো এবং অবশ্যই জনগোষ্ঠী ও সম্প্রদায় প্রত্যেকেই উত্থানশীল বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করে। এই এককের অন্তর্গত অধ্যায়গুলোতে পরিপাক, গ্যাসীয় আদানপ্রদান, রক্ত সংবহন, চলন ও গমন এর মতো মানুষের প্রধান শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলো কোশীয় ও আণবিক পরিভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। এই এককের শেষ দুটো অধ্যায়ে সমন্বয় সাধন এবং দেহে সংঘটিত ঘটনাবলির নিয়ন্ত্রণ সজীববস্তুর স্তরে বর্ণনা করা হয়েছে।

Alfonso Corti
(1822 – 1888)

ইতালীয় শারীরস্থানবিদ্ অ্যালফনসো করটি (Alfonso Corti) 1822 সালে জন্মগ্রহণ করেন। সরীসৃপদের হৃদসংবহনতন্ত্রসমূহ অধ্যয়নের মধ্য দিয়েই তিনি তার বৈজ্ঞানিক কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি স্তন্যপায়ীদের শ্রবণতন্ত্রের উপর মনোনিবেশ করেন। 1851 সালে তিনি একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন এবং এই গবেষণাপত্রে তিনি ককলিয়ার ব্যাসিলার পর্দার উপর অবস্থিত রোমশ কোশ সমন্বিত গঠনের বর্ণনা দেন যা শব্দতরঙ্গাকে স্নায়ুস্পন্দনে রূপান্তরিত করে। 1888 সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

অধ্যায় 16 (Chapter 16)
পরিপাক ও শোষণ (Digestion & Absorption)

16.1 পরিপাক তন্ত্র,

16.2 খাদ্যবস্তুর পরিপাক

16.3 পাচিত খাদ্যবস্তুর শোষণ

16.4 পরিপাক তন্ত্রের গোলযোগ সমূহ

সব সজীব বস্তুর মৌলিক চাহিদার মধ্যে একটি হল খাদ্য। আমাদের খাদ্যবস্তুর প্রধান উপাদানগুলো হল কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ফ্যাট। ভিটামিন এবং খনিজ লবণ খুব স্বল্প মাত্রায় প্রয়োজন হয়। খাদ্যশক্তি এবং জৈবিক পদার্থের যোগান দেয় যা কলার বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণে সাহায্য করে। আমরা যে জল পান করি তা বিপাকীয় ক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং দেহকে জলশূন্যতার হাত থেকেও রক্ষা করে। খাদ্যস্থিত বৃহৎ জৈব অণুগুলো যে রূপে খাদ্যে উপস্থিত থাকে সেই রূপে আমাদের দেহে ব্যবহৃত হতে পারে না। পরিপাক তন্ত্রে এই অণুগুলো ভেঙে যায় এবং সরল উপাদানে পরিণত হয়। এইরূপ জটিল খাদ্যবস্তু সরল শোষণযোগ্য খাদ্য উপাদানে পরিবর্তিত হওয়ার প্রক্রিয়াটিকে 'পরিপাক' বলে এবং এই প্রক্রিয়াটি আমাদের পরিপাক তন্ত্রে যান্ত্রিক ও জৈব রাসায়নিক পদ্ধতি দ্বারা সংগঠিত হয়। চিত্র 16.1 এ মানবদেহের পরিপাক তন্ত্রের সাধারণ সংগঠন দেখানো হল।

16.1 পরিপাকতন্ত্র (Digestive System):

মানবদেহের পরিপাকতন্ত্র পৌষ্টিক নালি এবং এর সাথে যুক্ত গ্রন্থিগুলো নিয়ে গঠিত।

16.1.1 পৌষ্টিকনালি (Alimentary Canal) :

পৌষ্টিকনালি দেহের সম্মুখভাগে উপস্থিত মুখছিদ্র থেকে শুরু হয়ে দেহের পশ্চাদদিকে পায়ুর মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত হয়। মুখছিদ্রটি মুখগহ্বরে উন্মুক্ত থাকে। মুখ গহ্বরে বেশ কিছু দাঁত এবং একটি পেশিবহুল জিহ্বা থাকে। প্রতিটি দাঁত চোয়ালের অস্থির কোটরে প্রোথিত থাকে (চিত্র 16.2)। দাঁতের এই ধরনের সংযুক্তিকে থেকোডোন্ট (thecodont) বলে। মানুষ সহ বেশির ভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জীবদ্দশায় দু'বার দাঁত উঠে অর্থাৎ দুই সেট দাঁত গঠিত হয় যথা দুধের দাঁত ও স্থায়ী দাঁত। নির্দিষ্ট সময়ে দুধের দাঁতের স্থানে স্থায়ী দাঁত প্রতিস্থাপিত হয়।

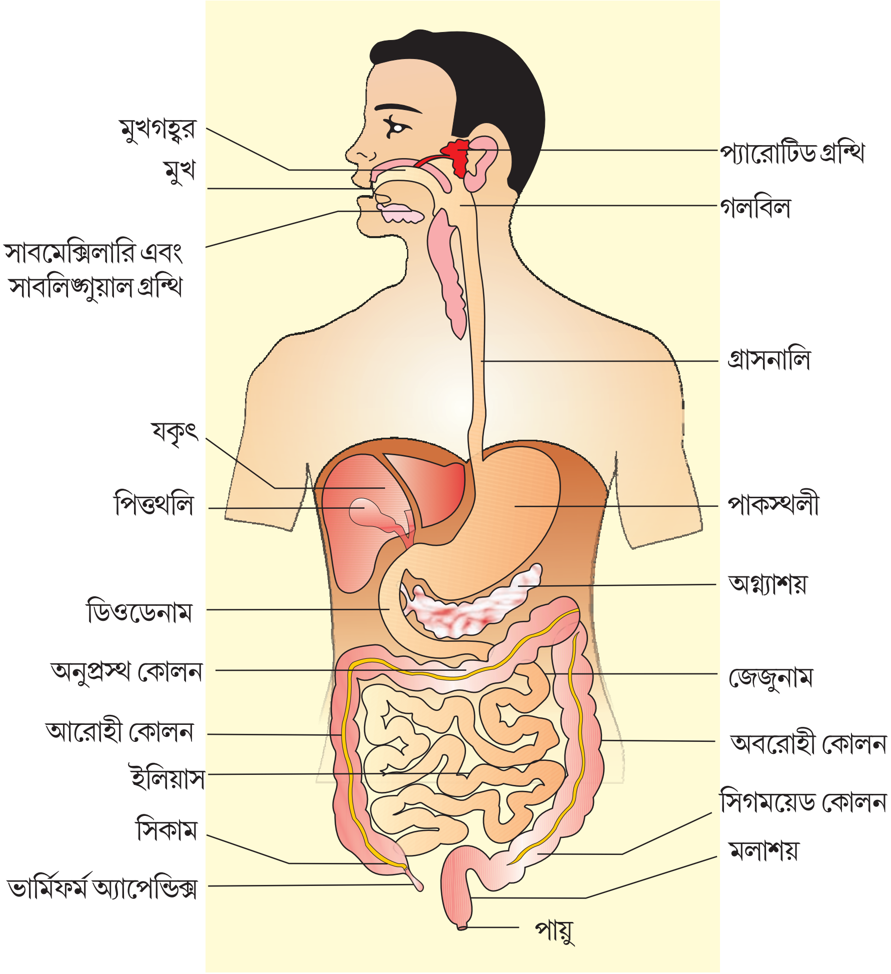

চিত্র 16.1 মানবদেহের পরিপাকতন্ত্র

এই ধরনের দন্তবিন্যাসকে ডাইফিওডন্ট (diphyodont) বলে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের 32টি স্থায়ী দাঁত থাকে। এই দাঁতগুলো চার প্রকারের হয়ে থাকে। একে হেটারোডন্ট (heterodont) দন্ত বিন্যাস বলে। এগুলো হল — কৃন্তক বা ইনসিজার (I), ক্যানাইন বা ছেদক (C) পুরঃপেষক বা প্রিমোলার (PM) এবং পেষক বা মোলার (M)। উর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়ালের প্রতিটি অর্ধাংশে দন্ত বিন্যাস I, C, PM, M এই ক্রমে থাকে এবং মানুষের ক্ষেত্রে একে যে দন্ত সংকেতের সাহায্যে উপস্থাপন করা হয় সেটি হল $\frac{2123}{2123}$। দাঁতের শক্ত চর্বণ উপযোগী উপরের তল এনামেল দ্বারা গঠিত। এই অংশটি খাদ্যবস্তুর চর্বনে সাহায্য করে। পেশীময় ও স্বাধীনভাবে সঞ্চালনক্ষম জিহ্বাটি মুখবিবরের মেঝের মধ্যে ফ্রিনিওলাম (frenulum) দ্বারা সংযুক্ত থাকে। জিহ্বার উপরিতলে ছোটো ছোটো অভিক্ষেপ থাকে তাদের প্যাপিলি বলে। কিছু কিছু প্যাপিলিতে স্বাদকোরক বর্তমান থাকে।

মুখবিবরটি নাতিদীর্ঘ গলবিলে উন্মুক্ত হয় যা খাদ্য ও বায়ুর জন্য সাধারণ পথ হিসেবে কাজ করে। ইসোফেগাস (গ্রাসনালী) এবং ট্র্যাকিয়া (শ্বাসনালি) সরাসরি গলবিলে উন্মুক্ত হয়। এপিগ্লটিস নামক তরুনাস্থি নির্মিত একটি পাত খাদ্যের গলাধ:করণের সময় শ্বাসনালির প্রবেশ পথে অর্থাৎ গ্লটিসে খাদ্যের প্রবেশে বাধা দেয়।

গ্রাসনালিটি একটি সরু লম্বা নলাকার গঠন যা পশ্চাদদিকে বিস্তৃত হয়ে গ্রীবা, বক্ষ, এবং মধ্যচ্ছদার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে J আকৃতি বিশিষ্ট থলির মতো গঠন পাকস্থলীতে উন্মুক্ত হয়। গ্রাসনালি ও পাকস্থলীর সংযোগস্থলটি একটি পেশিবহুল স্ফিংটার (Sphincter) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পাকস্থলীটি উদরগহ্বরের উপরিভাগে বাম দিকের অংশে অবস্থান করে। এর তিনটি প্রধান অংশ হল একটি হৃদ্ অংশ (Cardiac portion) যেখানে গ্রাসনালিটি উন্মুক্ত হয়, একটি ফান্ডাস অঞ্চল এবং একটি পাইলোরিক অংশ যা ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশে উন্মুক্ত হয় (চিত্র 16.3)। ক্ষুদ্রান্ত্রকে তিনটি অংশে পৃথক করা যায়। এগুলো হল — 'U' আকৃতির ডিওডেনাম, একটি দীর্ঘ কুন্ডলীত মধ্যবর্তী অংশ অর্থাৎ জেজুনাম এবং একটি অত্যন্ত কুন্ডলীত ইলিয়াম। ডিওডেনামের যে অংশে পাকস্থলী উন্মুক্ত হয় সেই স্থানটি পাইলোরিক স্ফিংটার (Pyloric Sphincter) দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। ইলিয়াম বৃহদন্ত্রে উন্মুক্ত হয় এবং এটি সিকাম, কোলন এবং মলাশয় সমন্বিত। সিকাম একটি ক্ষুদ্র বদ্ধথলি যার ভেতরে কিছু মিথোজীবী অণুজীব বসবাস করে। সিকাম থেকে একটি সরু আঙুলের মতো অভিক্ষেপ বেরিয়ে আসে যাকে ভার্মিফর্ম অ্যাপেন্ডিক্স (Vermiform Appendix) বলে যা একটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গ। সিকাম কোলনে মুক্ত হয়। কোলনে উপস্থিত তিনটি অংশ হল একটি উর্ধ্বগামী অংশ, একটি অনুপ্রস্থ অংশ এবং একটি অধঃগামী (নিম্নগামী) অংশ। অধঃগামী অংশটি মলাশয়ে মুক্ত হয় যা পায়ুর মাধ্যমে দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয়।

গ্রাসনালি থেকে মলাশয় পর্যন্ত বিস্তৃত উপস্থিত নালির প্রাচীরটি চারটি স্তর বিশিষ্ট হয় (চিত্র 16.4)। স্তরগুলো হল — সেরোসা স্তর, পেশিস্তর, অধঃশ্লেষ্মা এবং শ্লেষ্মাস্তর। সবচেয়ে বাইরের স্তরটি হল সেরোসা স্তর এবং এটি একটি পাতলা মেসোথেলিয়াম (অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহের এপিথেলিয়াম) এবং কিছু যোগকলা নিয়ে গঠিত। পেশি স্তরটি মসৃণ পেশি দ্বারা গঠিত এবং যা সাধারণত ভেতরের দিকে চক্রাকার স্তর এবং বাইরের দিকে অনুদৈর্ঘ্য স্তর হিসেবে সজ্জিত থাকে। কিছু কিছু অঞ্চলে একটি তির্যক পেশিস্তরও থাকতে পারে। শিথিল যোগকলা সমন্বিত স্নায়ু, রক্তবাহ এবং লসিকাবাহ দ্বারা অধঃশ্লেষ্মা স্তরটি গঠিত হয়।

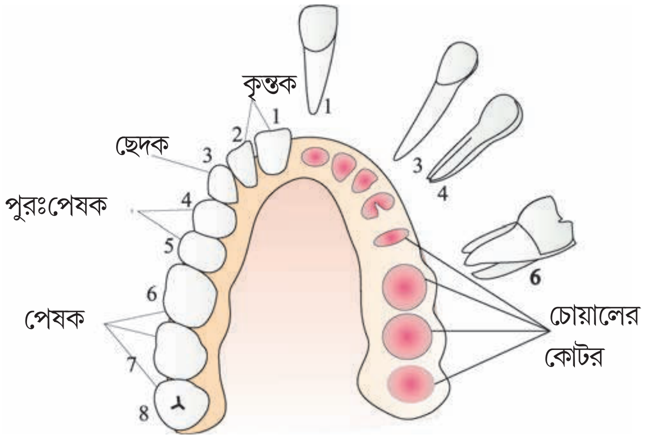

চিত্র 16.2 একদিকে চোয়ালের উপর এবং অন্যদিকে চোয়ালের কোটরে বিভিন্ন প্রকার দাঁতের সজ্জা বিন্যাস।

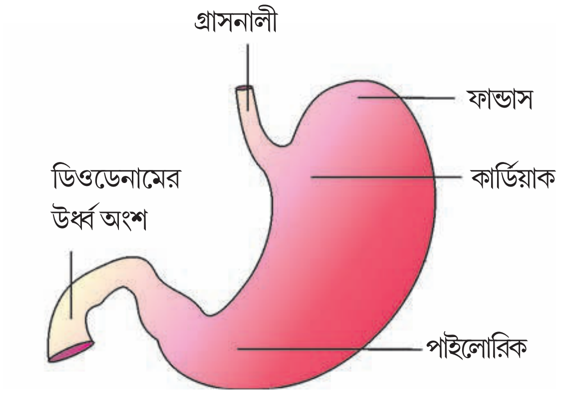

চিত্র 16.3 মানুষের পাকস্থলীর শারীরস্থানিক অঞ্চলসমূহ।

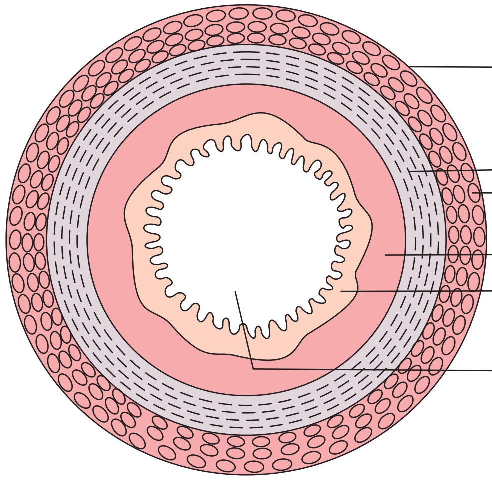

চিত্র 16.4 পৌষ্টিকনালির প্রস্থচ্ছেদের চিত্ররূপ উপস্থাপন

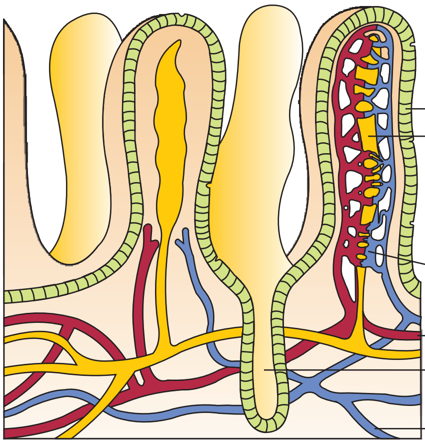

চিত্র 16.5 ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক স্তরের একটি ছেদ যেখানে ভিলাইগুলো দেখানো হয়েছে।

ডিওডেনামের মধ্যে অধঃশ্লেষ্মা স্তরে কিছু গ্রন্থি উপস্থিত থাকে। পৌষ্টিকনালির গহ্বরকে ঘিরে সবচেয়ে ভেতরে যে প্রাচীর স্তরটি থাকে তাকে মিউকাস স্তর বলে। এই স্তরটি পাকস্থলীতে কতগুলো অনিয়মিত ভাঁজ (rugae) এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে ভিল্লি নামক আঙুলের ন্যায় কতগুলো ক্ষুদ্র অন্তর্ভাজ গঠন করে (চিত্র 16.5)। এই ভিলাইগুলোকে ঘিরে থাকা কোশগুলো মাইক্রোভিল্লি নামক অসংখ্য আণুবীক্ষণিক অভিক্ষেপ সৃষ্টি করে এবং এর ফলে প্রান্ত বুরুশ এর আকৃতি ধারণ করে। এই পরিবর্তিত রূপসমূহ পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বহুলাংশে বৃদ্ধি করে। ভিল্লিগুলো একটি রক্তজালক সংগঠন বিশিষ্ট হয় এবং এতে একটি বৃহৎ লসিকাবাহ থাকে। ভিলাইস্থিত এই লসিকাবাহটিকে ল্যাক্টিয়েল বলে। মিউকাস এপিথেলিয়ামটি গব্লেট কোশ সমন্বিত হয় এবং এই কোশ থেকে মিউকাস ক্ষরিত হয় যা পৌষ্টিকনালিকে পিচ্ছিল রাখে। মিউকাস স্তরটিও পাকস্থলীতে কতগুলো গ্রন্থি (gastric gland) এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে ভিলাই এর তলদেশের মধ্যবর্তী স্থানে কতগুলো খাঁজ (লিবারকুনের খাঁজ) গঠন করে। পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে এই চারটি স্তর বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়।

16.1.2 পৌষ্টিক গ্রন্থি (Digestive Gland)

পৌষ্টিক নালির সাথে যুক্ত পৌষ্টিকগ্রন্থিগুলো হল লালাগ্রন্থি, যকৃৎ, এবং অগ্ন্যাশয়।

তিনজোড়া লালাগ্রন্থিতেই প্রধানত লালারস উৎপন্ন হয়। এই লালা গ্রন্থিগুলো হল পেরোটিডগ্রন্থি (চিবুকে), সাব ম্যাক্সিলারী/সাবম্যান্ডিবুলার (নিম্ন চোয়ালে) এবং সাব লিঙ্গুয়াল গ্রন্থি (জিহ্বার নীচে)। এইগ্রন্থিগুলো মুখবিবরের ঠিক বাইরের দিকে অবস্থান করে এবং এইগ্রন্থিগুলো থেকে লালারস ক্ষরিত হয়ে মুখগহ্বরে আসে।

মানবদেহের সবচেয়ে বড়ো গ্রন্থিটি হল যকৃৎ এবং একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষে এর ওজন প্রায় 1.2 থেকে 1.5kg হয়। এটি উদর গহ্বরে মধ্যচ্ছদার ঠিক নীচে অবস্থিত এবং এটি দুটি খণ্ডক বিশিষ্ট। হেপাটিক খণ্ডকগুলো যকৃতের গঠনগত ও কার্যগত একক এবং এই খন্ডক গঠনকারী হেপাটিক কোশগুলি দড়ির আকারে সজ্জিত থাকে। প্রতিটি হেপাটিক খণ্ডক একটি পাতলা যোগকলার আচ্ছাদন দ্বারা আবৃত থাকে। একে গ্লিসন্স ক্যাপসুউল (Glisson's Capsule) বলে। যকৃৎ কোশ থেকে পিত্ত ক্ষরিত হয়ে যকৃৎনালির মাধ্যমে একটি পাতলা পেশিবহুল থলিতে সঞ্চিত হয় এবং এদের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই থলিটিকে

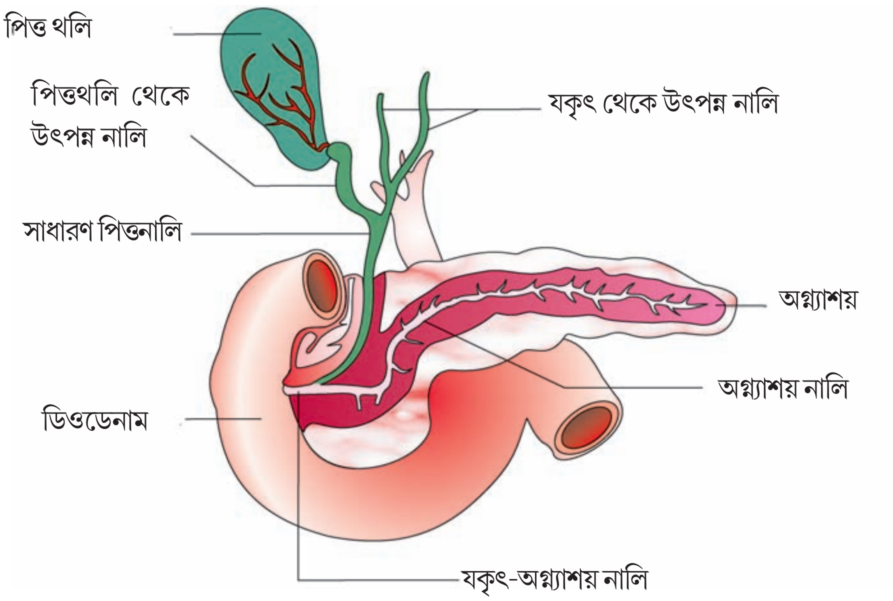

চিত্র 16.6 যকৃৎ, পিত্তথলি এবং অগ্ন্যাশয়ের নালিকাতন্ত্রসমূহ।

পিত্ত থলি (Gall bladder) বলে। যকৃৎ থেকে উৎপন্ন যকৃৎনালি (হেপাটিক নালি) এবং পিত্তথলির নালিটি (সিস্টিক নালি) একসাথে যুক্ত হয়ে সাধারণ পিত্তনালি গঠন করে (চিত্র 16.6)।

যকৃৎনালি এবং অগ্ন্যাশয়নালি দুটি একসাথে একটি সাধারণ হেপাটো পেনক্রিয়াটিক নালি রূপে ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয় এবং এই নালিটি একটি স্ফিংটার দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। এই স্ফিংকারটিকে ওডির স্ফিংটার (Sphincter of Oddi) বলে।

অগ্ন্যাশয় হল একটি লম্বাটে যৌগিক গ্রন্থি (অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা উভয় গ্রন্থি সমন্বিত) যা U আকৃতির ডিওডেনামের দুই বাহুর মাঝখানে অবস্থিত। অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা অংশ কতগুলো উৎসেচক (এনজাইম) সমন্বিত ক্ষারীয় অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণ করে এবং অন্তঃক্ষরা অংশ থেকে ইনসুলিন এবং গ্লুকাগন নামক হরমোন ক্ষরিত হয়।

16.2 খাদ্যের পরিপাক (Digestion of food)

যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্যের পরিপাক পদ্ধতিটি সম্পন্ন হয়।

মুখবিবরে যে দুটি প্রধান কাজ সম্পাদন হয় সেগুলি হল চর্বণ এবং গলাধঃকরণ প্রক্রিয়া। দাঁত এবং জিহ্বা লালারসের সাহায্যে খাদ্যকে চিবোতে এবং ভালোভাবে মিশাতে সাহায্য করে।

লালারসস্থিত শ্লেষ্মা খাদ্যকে পিচ্ছিলকরণে এবং খাদ্যকণাগুলোকে একত্রিত করে খাদ্যমন্ড তৈরিতে সাহায্য করে। এই খাদ্যমন্ড অতঃপর গলবিলে যায় এবং তারপর গলাধঃকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রাসনালিতে পৌঁছায়।

খাদ্যমন্ডটি পরবর্তীতে পেশীয় ক্রম সংকোচনের ফলে গ্রাসনালি দিয়ে নীচের দিকে নেমে আসে। একে পেরিস্টলসিস বলে। গ্যাসট্রো-ইসোফেগাল স্ফিংটার পাকস্থলীতে খাদ্যের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। মুখগহ্বরে ক্ষরিত লালারসের উপাদানগুলি হল ইলেক্ট্রোলাইটস বা তড়িৎ বিশ্লেষ্য (Na^+, Cl^- HCO_3^-) এবং এনজাইম বা উৎসেচক, স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ এবং লাইসোজাইম। মুখগহ্বরে পরিপাকের রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী উৎসেচক স্যালাইভারি অ্যামাইলেজের প্রভাবে সংঘটিত আর্দ্র বিশ্লেষণ ক্রিয়ার দ্বারা শুরু হয়। উৎসেচকটির প্রভাবে (সর্বাপেক্ষা অনুকূল P^H 6.8) এই স্থানে প্রায় ৩০ শতাংশ শ্বেতসার আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে মলটোজ নামক ডাইস্যাকারাইডে পরিণত হয়। লালারসে উপস্থিত লাইসোজাইম, ব্যাকটেরিয়ারোধী বস্তু হিসাবে কাজ করে এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

$$\text{শ্বেতসার} \xrightarrow[P^H\ 6.8]{\text{স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ}} \text{মলটোজ}$$

পাকস্থলীর মিউকাস স্তরে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিগুলো রয়েছে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিগুলোতে প্রধান তিন ধরনের কোশ রয়েছে। যথা —

(i) গ্যাস্ট্রিক খাঁজের গ্রীবা অঞ্চলস্থিত শ্লেষ্মা ক্ষরণকারী কোশ (Mucus neck cells) — এরা শ্লেষ্মা ক্ষরণ করে ।

(ii) পেপটিক বা চিফ্ কোশ সমষ্টি (Chief Cells) — এরা পেপসিনোজেন নামক একটি প্রো এনজাইম ক্ষরণ করে এবং

(iii) প্যারাইটাল বা অক্সিনটিক কোশসমূহ — এরা HCl এবং অভ্যন্তরীণ ফ্যাক্টর (ইনট্রিনসিক) (ভিটামিন B_{12} শোষণের জন্য এই ফ্যাক্টরের প্রয়োজন হয়) ক্ষরণ করে।

খাদ্য পাকস্থলীতে 4 – 5 ঘণ্টা জমা থাকে। পাকস্থলীর খাদ্য আম্লিক পাচক রসের সাথে পাকস্থলীর পেশি গাত্র সঞ্চালনের দ্বারা ভালোভাবে মিশ্রিত হয় তাকে কাইম বলে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে এসে পেপসিনোজেন প্রো এনজাইম প্রোটিন পরিপাককারী এনজাইম পেপসিনে পরিণত হয়। পেপসিন প্রোটিনকে প্রোটিওজ এবং পেপটোনে (পেপটাইড) পরিণত করে। পাচক রসে উপস্থিত শ্লেষ্মা এবং বাই কার্বোনেটস মিউকোসাল এপিথেলিয়ামকে পিচ্ছিল রাখে এবং পাকস্থলীর গাত্রকে অতি ঘনত্বের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্বারা ক্ষয় থেকে রক্ষা করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) পেপসিনের জন্য সর্বাধিক অনুকূল আম্লিক P^H(P^H 1.8) প্রদান করে। শিশুদের পাচক রসে রেনিন নামক প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচক পাওয়া যায় যা দুগ্ধপ্রোটিনের পাচনে সাহায্য করে। সামান্য পরিমাণে লাইপেজও পৌষ্টিক গ্রন্থিগুলো থেকে নিঃসৃত হয়।

ক্ষুদ্রান্ত্রের পেশী-স্তরগুলোর দ্বারা বিভিন্ন ধরনের চলন সৃষ্টি হয়। এই চলন খাদ্যকে অন্ত্রিকরসের সাথে ভালোভাবে মিশ্রিত করে যা খাদ্যের পরিপাকে সহায়ক। পিত্ত, অগ্ন্যাশয় রস এবং আন্ত্রিক রস নিঃসৃত হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে আসে। অগ্ন্যাশয় রস এবং পিত্ত যকৃৎ-অগ্ন্যাশয় নালির মাধ্যমে নিঃসৃত হয়। অগ্ন্যাশয় রসে নিষ্ক্রিয় উৎসেচক ট্রিপসিনোজেন, কাইমোট্রিপসিনোজেন, প্রোকার্বোক্সি-পেপটাইডেজ, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ এবং নিউক্লিয়েজ বর্তমান।

আন্ত্রিক শ্লেষ্মা (mucosa) স্তর থেকে নিঃসৃত এন্টারোকাইনেজ উৎসেচক ট্রিপসিনোজেনকে সক্রিয় ট্রিপসিনে পরিণত করে, যা অগ্ন্যাশয় রসের অন্যান্য উৎসেচকগুলোকেও সক্রিয় করে তোলে। পিত্তরস ডিওডেনামে মুক্ত হয় এবং এর উপাদানগুলো হল পিত্তরঞ্জক (বিলিরুবিন এবং বিলিভারডিন), পিত্ত লবন, কোলেস্টেরল এবং ফসফেলিপিডস, কিন্তু এতে কোনো উৎসেচক থাকে না। পিত্তরস স্নেহজাতীয় পদার্থের অবদ্রব তৈরি করে এবং ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থকে ভেঙে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাইসেলি গঠন করে। পিত্তরস লাইপেজকেও সক্রিয় করে।

আন্ত্রিক শ্লেষ্মাআবরণীস্তর (mucosal epithelium) গবলেট কোশ সমন্বিত হয় এবং এই কোশগুলো মিউকাস ক্ষরণ করে। আন্ত্রিক শ্লেষ্মা স্তরের ব্রাশ বর্ডার কোশসমূহের ক্ষরণ এবং গব্‌লেট কোশের ক্ষরণ একত্রে আন্ত্রিক রস বা সাক্কাস অ্যান্টারিকাস গঠন করে। এই রসে বিভিন্ন ধরনের উৎসেচক বর্তমান যথা — ডাইস্যাকারাইডেজ (উদাহরণ মলটেজ) ডাইপেপটাডেজ, লাইপেজ, নিউক্লিয় সাইডেজ ইত্যাদি। অগ্ন্যাশয় বা প্যানক্রিয়াস থেকে ক্ষরিত বাইকার্বোনেটসহ মিউকাস তন্ত্রের মিউকাস স্তরটিকে অম্লীয় রসের হাত থেকে রক্ষা করে। পাশাপাশি উৎসেচকের ক্রিয়ার জন্য একটি ক্ষারীয় মাধ্যম (P^H 7.8) তৈরি করে। অধঃশ্লেষ্মা (Submucosal) গ্রন্থিগুলোও (ব্রুনারের গ্রন্থি) এই কাজে সাহায্য করে।

অগ্ন্যাশয় রসে উপস্থিত প্রোটিন পরিপাককারী (Proteolytic) উৎসেচক প্রোটিনকে প্রোটিওজ ও পেপটোনে বিশ্লিষ্ট করে একে কাইমে (জলীয় আংশিক পাচিত প্রোটিন) রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া নিম্নে দেওয়া হল।

প্রোটিন
পেপটোন ——(ট্রিপসিন/কাইমোট্রিপসিন; কার্বোক্সিপেপটাইডেজ)——→ ডাইপেপটাইড
প্রোটিয়েজ

'কাইম' এ উপস্থিত কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা অগ্ন্যাশয় রসের অ্যামাইলেজ দ্বারা আর্দ্র বিশ্লিষ্ট হয়ে ডাইস্যাকারাইড বা দ্বিশর্করায় পরিণত হয়।

পলিস্যাকারাইড (শ্বেতসার) ——(অ্যামাইলেজ)——→ ডাইস্যাকারাইড

লাইপেজ উৎসেচক পিত্তরসের সাহায্যে স্নেহপদার্থকে ভেঙে ডাইগ্লিসারাইড এবং মনোগ্লিসারাইডে পরিণত করে।

ফ্যাট (স্নেহ পদার্থ) ——(লাইপেজ)——→ ডাইগ্লিসারাইড ————→ মনোগ্লিসারাইড

অগ্ন্যাশয় রসের নিউক্লিয়েজ নিউক্লিক অ্যাসিডের উপর কাজ করে নিউক্লিয়টাইডস এবং নিউক্লিয়সাইডস গঠন করে।

নিউক্লিক অ্যাসিড ——(নিউক্লিয়েজ)——→ নিউক্লিয়টাইডস ————→ নিউক্লিয়সাইডস

আন্ত্রিক রস বা সাক্কাস এন্টেরিকাস এর উৎসেচকগুলো উপরিউক্ত বিক্রিয়াগুলির সর্বশেষ উৎপাদিত বস্তুগুলির উপর কাজ করে এদেরকে সরল শোষণযোগ্য রূপে পরিণত করে। পাচনের এই সর্বশেষ পর্যায়টি সংগঠিত হয় অন্ত্রের শ্লেষ্মা আবরণী কোশের সন্নিকটে।

ডাইপেপটাইডস $\xrightarrow{\text{ডাইপেপটাইডেজ}}$ অ্যামাইনো অ্যাসিড

মলটোজ $\xrightarrow{\text{মলটেজ}}$ গ্লুকোজ + গ্লুকোজ

লেকটোজ $\xrightarrow{\text{লেকটেজ}}$ গ্লুকোজ + গ্যালাকটোজ

সুক্রোজ $\xrightarrow{\text{সুক্রেজ}}$ গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ

নিউক্লিওটাইডস্ $\xrightarrow{\text{নিউক্লিওটাইডেজ}}$ নিউক্লিওসাইডস্ $\xrightarrow{\text{নিউক্লিওসাইডেজ}}$ শর্করা + নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষার

ডাই ও মনোগ্লিসারাইডস $\xrightarrow{\text{লাইপেজ}}$ ফ্যাটি অ্যাসিড + গ্লিসারল।

ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনাম অঞ্চলে উপরিউক্ত বৃহৎ জৈব অণুগুলো বিশ্লেষিত হয়। এইভাবে উৎপন্ন সরল পদার্থগুলো ক্ষুদ্রান্ত্রের জেজুনাম এবং ইলিয়াম অংশে শোষিত হয়। অপাচ্য এবং অশোষিত পদার্থগুলো বৃহদন্ত্রে চলে আসে।

বৃহদন্ত্রে কোনো প্রকার পাচনক্রিয়া ঘটে না। বৃহদন্ত্রের কাজগুলো হল :

(i) কিছু জল, খনিজ লবণ এবং নির্দিষ্ট কিছু ঔষধের বিশোষন:

(ii) শ্লেষ্মা ক্ষরণ করে যা বর্জ্য পদার্থগুলোকে (অপাচিত) একত্রিত এবং পিচ্ছিল করে এর বহিষ্করণে সহায়তা করে।

অপাচিত ও অশোষিত খাদ্যকে মল বলে যা ইলিওসিকাল কপাটিকার মাধ্যমে বৃহদন্ত্রের সিকামে প্রবেশ করে। এই কপাটিকা বর্জ্য পদার্থের বিপরীত প্রবাহকে বাধা দান করে। দেহ থেকে বহিষ্করণের পূর্ব পর্যন্ত এটি মলাশয়ে সঞ্চিত থাকে।

স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের সঠিক সমন্বয়ে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল নালির বিভিন্ন অংশের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রিত হয়। দর্শন, গন্ধ এবং অথবা মুখবিবরে খাদ্যের উপস্থিতি লালারসের ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে। অনুরূপভাবে পাচক রস এবং আন্ত্রিক রসের ক্ষরণ স্নায়বিক নির্দেশে উদ্দীপিত হয়। স্থানীয় এবং CNS উভয় প্রকার স্নায়বিক পদ্ধতিতেই পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশের পেশীয় কার্যাবলি নিয়ন্ত্রিত হয়। পাচক রসের ক্ষরণ গ্যাস্ট্রিক এবং আন্ত্রিক শ্লেষ্মাস্তর নিঃসৃত স্থানীয় হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

16.3 পাচিত খাদ্যের শোষণ (Absorption of digested Product)

যে প্রক্রিয়ায় পাচনে উৎপন্ন অন্তপদার্থ ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লেষ্মাস্তরের মাধ্যমে রক্ত বা লসিকাতে প্রবেশ করে তাকে শোষণ বলে। এটি নিষ্ক্রিয়, সক্রিয় বা সহায়ক পরিবহণ পদ্ধতি দ্বারা সম্পাদিত হয়। কিছু পরিমাণ মনোস্যাকারাইড যেমন গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং কিছু তড়িৎ বিশ্লেষ্য যথা ক্লোরাইড আয়ন সাধারণ সরল ব্যাপন প্রক্রিয়া দ্বারা শোষিত হয়। রক্তে এই পদার্থগুলোর পরিবহণ ঘনত্বের নতিমাত্রার উপর নির্ভর

করে। যাই হোক কিছু পদার্থ যেমন গ্লুকোজ এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড বাহক প্রোটিন দ্বারা শোষিত হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় সহায়ক পরিবহণ (facilitiated transport)।

জলের পরিবহণ নির্ভর করে অভিস্রবণীয় নতিমাত্রার উপর। সক্রিয় পরিবহণ সংগঠিত হয় নতিমাত্রার বিপরীতে এবং এরজন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন পরিপোষক যেমন অ্যামাইনো অ্যাসিড, গ্লুকোজের মতো মনোস্যাকারাইড, Na^+ এর মতো তড়িৎ বিশ্লেষ্যগুলো রক্তে এই পদ্ধতির দ্বারা শোষিত হয়।

ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল যেহেতু অদ্রাব্য তাই এগুলো রক্তে শোষিত হতে পারে না। এরা প্রথমে কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৈলবিন্দুর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এগুলোকে মাইসেলি (micelles) বলে। মাইসেলিগুলো ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লেষ্মাস্তরের ভেতরে প্রবেশ করে। এরা পুনরায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিন আবরণী যুক্ত ফ্যাট বটিকায় (fat globules) পরিণত হয়। প্রোটিন পরিবৃত এই ফ্যাট বটিকাগুলোকে কাইলোমাইক্রনস (chylomicrons) বলে এবং এরা ভিলাইস্থিত লসিকাবাহে (ল্যাকটিয়াল) স্থানান্তরিত হয়। এই লসিকাবাহগুলো অবশেষে শোষিত খাদ্যবস্তুগুলোকে রক্তপ্রবাহে মুক্ত করে।

পৌষ্টিকনালীর বিভিন্ন অংশ যেমন মুখগহ্বর, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র এবং বৃহদন্ত্রে পাচিত খাদ্যকণা শোষিত হয়। যদিও সবচেয়ে বেশি পরিমাণ শোষণ ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যেই ঘটে। নীচে সংক্ষেপে শোষণের (শোষণের স্থান এবং শোষিত বস্তুগুলো) একটি সারণি দেওয়া হল — 16.1

সারণী 16.1 পৌষ্টিক তন্ত্রের বিভিন্ন অংশে শোষণের সারসংক্ষেপ

মুখগহ্বর	পাকস্থলী	ক্ষুদ্রান্ত্র	বৃহদন্ত্র
মুখের শ্লেষ্মাস্তর এবং জিহ্বার তলদেশে থাকা রক্তজালক দ্বারা কিছু ঔষধ শোষিত হয়।	জল, সরল শর্করা এবং অ্যালকোহল ইত্যাদির শোষণ এই স্থানে ঘটে।	পুষ্টিদ্রব্য শোষণের প্রধান অঙ্গ। এখানে পরিপাক সম্পূর্ণ হয় এবং পরিপাক লব্ধ পদার্থ যথা গ্লুকোজ, ফ্রাকটোজ, ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লিসারল এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড শ্লেষ্মাস্তরদ্বারা শোষিত হয়ে রক্তস্রোতে এবং লসিকাতে পৌঁছায়।	জল, কিছু খনিজ লবণ এবং কিছু ঔষধ এই স্থানে শোষিত হয়।

শোষিত খাদ্যবস্তুগুলো শেষপর্যন্ত কলাতে পৌঁছায় যেখানে সেগুলো কার্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় আত্তীকরণ।
পাচিত বর্জ্য একত্রিত হয়ে কঠিন মল হিসাবে মলাশয়ে থাকে যা স্নায়ুজ প্রতিক্রিয়ার ফলে উত্তেজনা বা ইচ্ছা অনুসারে দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয়। পায়ুর মাধ্যমে দেহ থেকে মলের বহিষ্করণ একটি ঐচ্ছিক প্রক্রিয়া যা দলবদ্ধ ক্রমসংকোচন চলন (Peristaltic movement)দ্বারা ঘটে।

16.4 পরিপাকতন্ত্রের গোলযোগসমূহ (Disorders of digestive system)

অন্ত্রনালির প্রদাহজনিত রোগ হল একটি অতি সাধারণ অসুস্থতা যা ব্যাকটিরিয়া অথবা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয়। বিভিন্ন পরজীবী দ্বারাও সংক্রমিত হতে পারে। যেমন ফিতাকৃমি, গোলকৃমি, থ্রেডওয়ার্ম, হুকওয়ার্ম, পিন ওয়ার্ম ইত্যাদি।

জন্ডিস (Jaundice) : যকৃৎ আক্রান্ত হয়, পিত্ত রঞ্জকের জমা হওয়ার ফলে ত্বক ও চোখ হলুদ বর্ণ ধারণ করে।

বমন (Vomiting) : বমন হচ্ছে মুখের মাধ্যমে পাকস্থলীর উপাদানের বহিষ্করণ। এই প্রতিবর্ত ক্রিয়াটি মেডুলার বমনকেন্দ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বমনের পূর্বে বমি বমি ভাবের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

ডায়রিয়া (Diarrhoea) : অন্ত্রনালির অস্বাভাবিক চলন, মলের তরলতা বৃদ্ধি এবং এর বহিষ্করণকে বলা হয় ডায়রিয়া। এটি খাদ্যের শোষন হ্রাস করে।

কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation) : কোষ্ঠকাঠিন্যের ফলে মলাশয়ে মল জমে থাকায় অন্ত্রের চলন অনিয়মিত হয়।

বদহজম (indigestion) : এই অবস্থায় খাদ্য সঠিকভাবে পাচিত হয়না। ফলে পেট ভর্তি হয়ে আছে বলে মনে হয়। বদহজমের কারণগুলি হল অপর্যাপ্ত উৎসেচক ক্ষরণ, দুঃশ্চিন্তা, খাদ্যের বিষাক্ততা, অত্যধিক এবং মশলাদার খাদ্য গ্রহণ।

সারসংক্ষেপ

মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্র পৌষ্টিকনালি এবং এর সাথে যুক্ত পৌষ্টিক গ্রন্থি নিয়ে গঠিত। পৌষ্টিকনালি মুখ, মুখবিবর, গলবিল, খাদ্যনালি, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, মলাশয় এবং পায়ু নিয়ে গঠিত। সহকারী পৌষ্টিক গ্রন্থিগুলো হল লালাগ্রন্থি, যকৃৎ (পিত্তথলিসহ) এবং অগ্ন্যাশয়। মুখের ভিতর দাঁত খাদ্যকে বিচুর্ণ করে, জিহ্বা খাদ্যের স্বাদ অনুভব করায় এবং লালারসের সাথে খাদ্যকে ভালোভাবে মেশাতে সাহায্য করে। লালারসে শ্বেতসার বা স্টার্চ পরিপাককারী উৎসেচক স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ শ্বেতসারকে মলটোজে (ডাইস্যাকারাইড বা দ্বিশর্করা) পরিণত করে। তারপর খাদ্য গলবিলের মাধ্যমে গ্রাসনালিতে খাদ্যমন্ড হিসাবে প্রবেশ করে যা পুনরায় খাদ্যনালির ক্রমসংকোচনের ফলে নীচে নেমে আসে এবং পাকস্থলীতে পৌঁছায়। পাকস্থলীতে প্রধানত প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের পরিপাক ঘটে। সরল শর্করা, অ্যালকোহল এবং কিছু ঔষধও পাকস্থলীতে শোষিত হয়।

কাইম (পাচক রস মিশ্রিত) ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনাম অংশে পৌঁছায়, যেখানে অগ্ন্যাশয় রস, পিত্তরস এবং সর্বশেষে সাক্কাস এন্টেরিকাস মিশ্রিত কিছু উৎসেচক কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ফ্যাটের পরিপাক সম্পূর্ণ করে। তারপর খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রে জেজুনাম ও ইলিয়াম অংশে পৌঁছায়। কার্বোহাইড্রেট পাচিত হয়ে মনোস্যাকারাইড যেমন গ্লুকোজে পরিণত হয়। প্রোটিন বিশ্লিষ্ট হয়ে সর্বশেষে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত হয়। ফ্যাট পরিবর্তিত হয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারলে পরিণত হয়। পরিপাক লব্ধ বস্তুগুলো আন্ত্রিক ভিলাই এপিথেলিয়াম আবরণীর মাধ্যমে দেহে শোষিত হয়। অপাচ্য খাদ্যবস্তু (মল) ইলিওসিকাল কপাটিকার মাধ্যমে বৃহদন্ত্রের সিকামে প্রবেশ করে, যা বর্জ্য পদার্থের বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়। বেশিরভাগ জলের শোষণ বৃহদন্ত্রে ঘটে। অপাচ্য খাদ্যবস্তু অর্ধকঠিন প্রকৃতির এবং এটি মলাশয়ে প্রবেশ করে। মলাশয় থেকে এই অপাচ্য খাদ্যবস্তু মলনালিতে আসে এবং সবশেষে পায়ুর মাধ্যমে দেহ থেকে বহিষ্কৃত হয়।

অনুশীলনী

1. **নিম্নলিখিত উত্তরগুলো থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো।**

(ক) পাচক রসের উপাদানগুলো হল —
(i) পেপসিন, লাইপেজ এবং রেনিন (Rennin)
(ii) ট্রিপসিন, লাইপেজ এবং রেনিন (Renin)
(iii) ট্রিপসিন, পেপসিন এবং লাইপেজ
(iv) ট্রিপসিন, পেপসিন এবং রেনিন।

(খ) সাক্কাস এন্টেরিকাস
(i) ইলিয়াম ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থল
(ii) আন্ত্রিক রস
(iii) পৌষ্টিকনালির স্ফীতি
(iv) অ্যাপেনডিক্স।

2. **স্তম্ভ I এর সাথে স্তম্ভ II মেলাও**

স্তম্ভ I	স্তম্ভ II
(ক) বিলিরুবিন ও বিলিভারডিন	(i) প্যারোটিড
(খ) শ্বেতসারের আর্দ্রবিশ্লেষণ	(ii) পিত্ত
(গ) ফ্যাটের পরিপাক	(iii) লাইপেজ
(ঘ) লালাগ্রন্থি	(iv) অ্যামাইলেজ

3. **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

(ক) 'ভিলাই' অন্ত্রে থাকে কিন্তু পাকস্থলীতে থাকে না কেন?
(খ) পেপসিনোজেন কীভাবে এর সক্রিয় রূপে পরিণত হয়?
(গ) পৌষ্টিকনালির প্রাচীরের মৌলিকস্তরগুলো কী কী?
(ঘ) স্নেহ পরিপাকে পিত্ত কীভাবে সাহায্য করে?

4. প্রোটিন পরিপাকে অগ্ন্যাশয় রসের ভূমিকার উল্লেখ করো।
5. পাকস্থলীতে প্রোটিন পরিপাক পদ্ধতিটি বর্ণনা করো।
6. মানুষের দন্ত সংকেত লিখো।
7. পিত্তরসে কোনো পরিপাককারী উৎসেচক থাকে না, তথাপি এটি পরিপাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন?
8. পরিপাকে কাইমোট্রিপসিনের ভূমিকা বর্ণনা করো। এর উৎসগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত সমগোত্রীয় দুটি পরিপাককারী উৎসেচকের নাম কী?
9. ডাইস্যাকারাইডস এবং পলিস্যাকারাইডস কীভাবে পাচিত হয়?
10. যদি পাকস্থলী থেকে HCl ক্ষরণ না হয় তাহলে কী ঘটবে?
11. তোমার খাদ্যে থাকা মাখন দেহে কীভাবে পাচিত ও শোষিত হয়?
12. পৌষ্টিক নালির বিভিন্ন অংশে প্রোটিন পরিপাকের প্রধান ধাপগুলি বর্ণনা করো।
13. থেকোডন্ট ও ডাইফিয়োডন্ট এই শব্দ দুটির ব্যাখ্যা করো।
14. একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বিভিন্ন প্রকার দাঁতের নাম ও তাদের সংখ্যার উল্লেখ করো।
15. যকৃতের কাজগুলো কী কী?

অধ্যায় -17 (Chapter -17)
শ্বাসকার্য এবং গ্যাসীয় বস্তুর আদানপ্রদান
(Breathing and Exchange of gases)

17.1 শ্বসন অঙ্গসমূহ
17.2 শ্বাসক্রিয়ার পদ্ধতি
17.3 গ্যাসীয় আদান-প্রদান
17.4 গ্যাসীয় বস্তুর পরিবহণ
17.5 শ্বসন নিয়ন্ত্রণ
17.6 শ্বসনতন্ত্রের গোলযোগ

তোমরা পূর্বে পড়েছ যে সজীববস্তু গ্লুকোজের মতো পুষ্টিদ্রব্যগুলোকে পরোক্ষভাবে ভাঙার জন্য এবং বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য শক্তি আহরণ করতে অক্সিজেন (O_2) ব্যবহার করে। ক্ষতিকারক গ্যাস কার্বন ডাইঅক্সাইডও (CO_2) উপরোক্ত অপচিতি বিপাকের সময় নির্গত হয়। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে কোশসমূহে অক্সিজেনের অবিরাম সরবরাহ এবং কোশে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইডের নির্গমণ প্রয়োজন। পরিবেশ থেকে গৃহীত O_2 এবং কোশে উৎপন্ন CO_2 -এর এই আদান প্রদান প্রক্রিয়াকে শ্বাসকার্য বলে, যাকে সচরাচর শ্বসন বলা হয়। তোমার হাতগুলো বুকের উপর রাখলে, তুমি অনুভব করতে পারবে যে তোমার বুক উপর-নীচ উঠানামা করছে. তুমি জান যে এটি শ্বাসকার্যের ফলে হচ্ছে। আমরা কীভাবে শ্বাসকার্য চালাই ? এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলোতে শ্বসন অঙ্গ এবং শ্বাসকার্যের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

17.1 : শ্বসন অঙ্গসমূহ (Respiratory organs) :

প্রাণীদের শ্বাসকার্য পদ্ধতি মূলত তাদের বাসস্থান এবং দেহ সংগঠন স্তরের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন হয়। স্পঞ্জ, সিলেন্টারেটস, চ্যাপ্টাকৃমি ইত্যাদির মতো নিম্নশ্রেণির অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে O_2 এবং CO_2- এর আদানপ্রদান তাদের সমগ্র দেহতল জুড়ে সহজ ব্যাপনের মাধ্যমে ঘটে। কেঁচো তাদের সিক্ত দেহত্বক এবং পতঙ্গারা একটি নালিকাজালকের (শ্বাসনালী) সাহায্যে বায়ুমণ্ডলীয় বায়ু দেহের ভেতর পরিবহণ করে। বেশিরভাগ জলজ সন্ধিপদী এবং কম্বোজ গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণীরা বিশেষ রক্তজালক সম্পন্ন গঠন ফুলকার সাহায্যে এবং স্থলজ প্রাণীরা রক্তবাহ সমন্বিত থলি অর্থাৎ ফুসফুসের সাহায্যে গ্যাসীয় আদানপ্রদান করে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মাছ ফুলকার সাহায্যে আবার সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীরা ফুসফুসের মাধ্যমে শ্বাসকার্য চালায়। ব্যাঙের মতো উভচর প্রাণীরাও তাদের সিক্ত দেহত্বকের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালাতে পারে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দেহে সুগঠিত শ্বসনতন্ত্র দেখা যায়।

17.1.1 : মানুষের শ্বসনতন্ত্র (Human Respiratory system) : আমাদের দেহে একজোড়া বহিঃনাসারন্ধ্র রয়েছে যা উর্ধ্ব ওষ্ঠের উপরিভাগে উন্মুক্ত থাকে। এটি নাসাপথের মাধ্যমে নাসিকা প্রকোষ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। নাসিকা প্রকোষ্ঠটি গলবিলে উন্মুক্ত হয়, গলবিলের একটি অংশ খাদ্য এবং বায়ু প্রবেশের জন্য একটি সাধারণ প্রবেশপথ হিসাবে কাজ করে। গলবিলটি স্বরযন্ত্রের মধ্য দিয়ে শ্বাসনালীতে উন্মুক্ত হয়। স্বরযন্ত্র হল তরুণাস্থিত নির্মিত একটি বাক্স-আকৃতির গঠন যা শব্দ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে, তাই একে শব্দ উৎপন্নকারীযন্ত্র বলা হয়। খাদ্য গলাধঃকরণের সময় শ্বাসছিদ্র বা গ্লটিসটি একটি পাতলা স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থিত নির্মিত পাত দ্বারা আবৃত থাকতে পারে। এই পাতলা পাতটিকে এপিগ্লটিস বলে এবং এটি স্বরযন্ত্রে খাদ্য প্রবেশে বাধা দেয়। শ্বাসনালী হল একটি সোজা নালাকার গঠন যা মধ্য বক্ষগহ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত; শ্বাসনালীটি পঞ্চম (5^{th}) বক্ষদেশীয় কশেরুকাস্থলে বিভক্ত হয়ে ডান ও বাম প্রাথমিক ক্লোমশাখা (Bronchi) গঠন করে। প্রতিটি ক্লোমশাখা বারবার বিভক্ত হয়ে গৌণ ক্লোমশাখা এবং প্রগৌণ ক্লোমশাখা গঠন করে। প্রগৌণ ক্লোমশাখা আবার বিভক্ত হয়ে বহু উপক্লোমশাখা গঠন এবং অবশেষে উপক্লোমশাখাগুলো খুবই পাতলা প্রান্তীয় উপক্লোমশাখায় শেষ হয়। শ্বাসনালী, প্রাথমিক, গৌণ এবং প্রগৌণ ক্লোমশাখা এবং প্রারম্ভিক উপক্লোমশাখাগুলো অসম্পূর্ণ, তরুণাস্থিত নির্মিত বলয় দ্বারা গঠিত। প্রতিটি প্রান্তীয় উপক্লোমশাখা থেকে বেশ কিছু খুবই পাতলা অসম প্রাকারবিশিষ্ট এবং রক্তবাহ সমন্বিত থলির মতো গঠন তৈরি হয় এদের অ্যালভিওলাই বা বায়ুথলি বলে। ক্লোমশাখার শাখান্বিত জালক, উপক্লোমশাখা এবং বায়ুথলি মিলে ফুসফুস গঠন করে (চিত্র 17.1)। আমাদের দুটি ফুসফুস দ্বিস্তরীয় প্লুরা দ্বারা আবৃত থাকে।

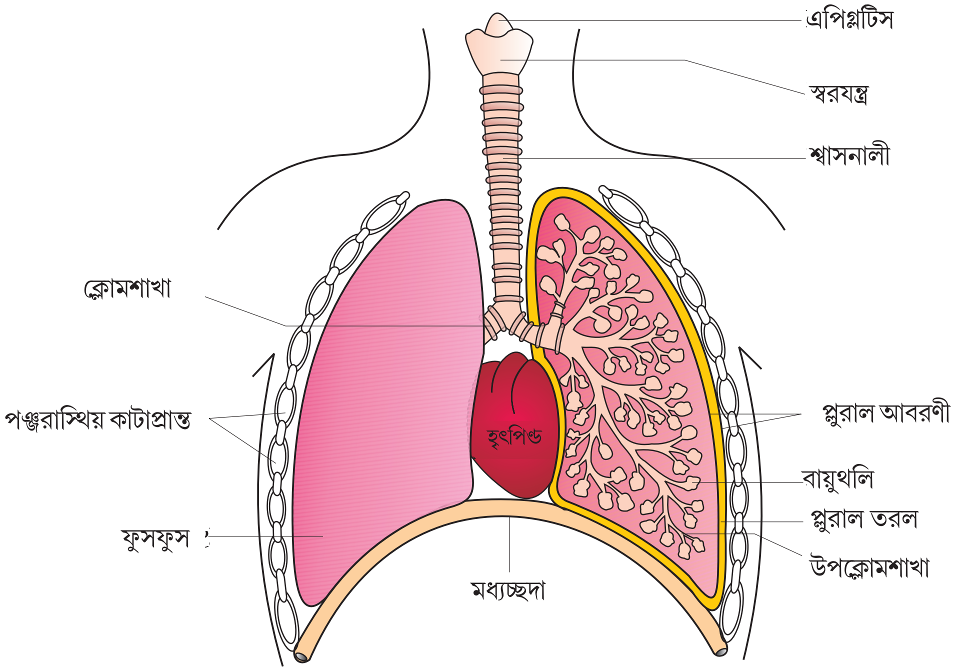

চিত্র 17.1 ঃ মানুষের শ্বসনতন্ত্রের চিত্ররূপ (বাম ফুসফুসের অন্তর্গঠনও দেখানো হয়েছে)

প্লুরাস্তর দুটোর মাঝখানে প্লুরা তরল থাকে। এই তরলটি ফুসফুসীয় তলে ঘর্ষণ হ্রাস করে। দ্বিস্তরীয় প্লুরার বহিরাবরণীটি বক্ষ আবরণীর সাথে নিবিড়ভাবে সংলগ্ন থাকে এবং অন্তঃআবরণীটি ফুসফুসীয়তলের সংস্পর্শে থাকে। শ্বসনতন্ত্রের বহিঃনাসারন্ধ্র থেকে ক্লোমশাখা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলটি পরিবাহী অংশ গঠন করে, অন্যদিকে বায়ুথলি এবং তাদের নালিকাগুলো শ্বসনতন্ত্রের গ্যাসীয় বিনিময়ের অঞ্চল গঠন করে। পরিবাহী অংশটি বায়ুমণ্ডলীয় বায়ুকে বায়ুথলিতে পরিবহণ করে। এই পরিবাহী অংশের মধ্য দিয়ে বাহিত হওয়ার সময় বায়ু থেকে বিজাতীয় বস্তুর অপসারণ ঘটে, বায়ু আর্দ্র হয় এবং বায়ুর তাপমাত্রা দেহের তাপমাত্রার সমান হয়। গ্যাসীয় বিনিময়কারী অংশ হল সেই স্থান যেখানে রক্ত ও বায়ুমণ্ডলীয় বায়ুর মধ্যে O_2 এবং CO_2 এর প্রকৃত ব্যাপন ঘটে।

ফুসফুস দুটি বক্ষগহ্বরের মধ্যে অবস্থিত যা শারীরস্থানীকভাবে একটি বায়ুনিরুদ্ধ প্রকোষ্ঠ। বক্ষগহ্বরটির পৃষ্ঠদেশ মেরুদণ্ড দ্বারা, অঙ্কদেশ উরুফলক দ্বারা পার্শ্বদেশ পাঁজর এবং নিম্ন অঞ্চল গম্বুজাকৃতি মধ্যচ্ছদা দ্বারা গঠিত। বক্ষগহ্বরে ফুসফুসের শারীরস্থানীয় অবস্থান এমন হয় যাতে বক্ষগহ্বরের আয়তনের যে-কোনো পরিবর্তন ঘটলেই তা ফুসফুসীয় গহ্বরে (পালমোনারি) প্রতিফলিত হবে। এই ধরনের সজ্জাক্রম শ্বাসকার্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কারণ আমরা সরাসরি ফুসফুসের আয়তনের পরিবর্তন ঘটাতে পারি না।

শ্বসনের নিম্নলিখিত ধাপসমূহ ঃ

(i) শ্বাসকার্য বা ফুসফুসীয় বায়ুচলাচল যার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল থেকে বায়ু ভেতরে প্রবেশ করে এবং CO_2 সমৃদ্ধ বায়ুথলির বায়ু বাইরে নির্গত হয়।

(ii) বায়ুথলির পর্দার মধ্য দিয়ে গ্যাসীয় বস্তুর (O_2 এবং CO_2) ব্যাপন।

(iii) রক্তের মাধ্যমে গ্যাসীয় বস্তুর পরিবহণ।

(iv) রক্ত এবং কলাকোশের মধ্যে (O_2 এবং CO_2) ব্যাপন।

(v) অপচিতি বিপাকের জন্য কোশে O_2 এর ব্যবহার এবং এই বিপাক ক্রিয়ায় উৎপন্ন CO_2 এর নির্গমণ (অধ্যায় 14 তে কোশীয় শ্বসন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে)।

17.2 : শ্বাসক্রিয়ার পদ্ধতি (Mechanism of Breathing) :

শ্বাসকার্য দুটি ধাপে ঘটে যথা প্রশ্বাস এবং নিঃশ্বাস। প্রশ্বাসকালে বায়ুমণ্ডলীয় বায়ু দেহের ভেতর প্রবেশ করে এবং নি:শ্বাসকালে ফুসফুসীয় বায়ুথলি থেকে বায়ু দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়। ফুসফুস ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে চাপের নতিমাত্রা সৃষ্টির মাধ্যমে ফুসফুসে বায়ুর প্রবেশ ও ফুসফুস থেকে বায়ুর নির্গমণ ঘটে। যখন ফুসফুস মধ্যস্থ চাপ (অন্তঃফুসফুসীয় চাপ) বায়ুমণ্ডলীয় চাপের তুলনায় কম হয় তখনই প্রশ্বাস প্রক্রিয়াটি ঘটে। অর্থাৎ পরিবেশীয় চাপের সাপেক্ষে ফুসফুসের ভেতরে একটি ঋণাত্মক চাপ সৃষ্টি হলে তবেই প্রশ্বাস প্রক্রিয়াটি ঘটতে পারে। একইভাবে নিঃশ্বাস প্রক্রিয়াটি তখনই ঘটে যখন অন্তঃফুসফুসীয় চাপ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের চাইতে বেশি হয়। মধ্যচ্ছদা এবং একটি বিশেষিত পেশির সমষ্টি — পাঁজর মধ্যস্থ বহিঃস্থ এবং অন্তঃস্থ পঞ্জরাস্থি পেশি এই ধরনের নতিমাত্রা সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

মধ্যচ্ছদার সংকোচনের মাধ্যমে প্রশ্বাস ক্রিয়ার সূচনা হয় এবং এর ফলে বক্ষ গহ্বরের আয়তন সম্মুখ-পশ্চাৎ অক্ষ বরাবর বৃদ্ধি পায়। বহিঃস্থ আন্তর পঞ্জরাস্থিত পেশির সংকোচনে পাঁজর ও উরূফলকের উত্তোলন ঘটে এবং এর ফলে বক্ষগহ্বরের আয়তন অঙ্কীয়পৃষ্ঠ অক্ষ বরাবর বৃদ্ধি পায়। বক্ষগহ্বরের আয়তনের এই সামগ্রিক বৃদ্ধি ফুসফুসীয় আয়তনেরও একইরকম বৃদ্ধি ঘটায়। ফুসফুসীয় আয়তনের বৃদ্ধির ফলে ফুসফুসীয় চাপ বায়ুণ্ডলের চাপের তুলনায় কমে যায় যার প্রভাবে বায়ুমণ্ডল থেকে বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে অথাৎ প্রশ্বাস ক্রিয়াটি ঘটে (চিত্র 17.2 ক) মধ্যচ্ছদা এবং আন্তর পঞ্জরাস্থি পেশির শিথিলায়নের ফলে মধ্যচ্ছদা ও উরূফলক তাদের নিজ নিজ স্থানে ফিরে আসে এবং বক্ষগহ্বরের আয়তন ও সেই সাথে ফুসফুসের আয়তনও হ্রাস পায়। এর ফলে অন্তঃফুসফুসীয় চাপ বায়ুণ্ডলীয় চাপের তুলনায় সামান্য বেশি হয়। চাপের এই পার্থক্যের জন্য ফুসফুস থেকে বায়ু দেহের বাইরে বেরিয়ে যায় অর্থাৎ নিঃশ্বাস ক্রিয়াটি ঘটে (চিত্র 17.2 খ)। উদরস্থিত অতিরিক্ত পেশিসমূহের সাহায্যে আমরা প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস ক্ষমতা বাড়াতে পারি। একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ প্রতি মিনিটে গড়ে 12-16 বার শ্বাসকার্য চালায়। স্পাইরোমিটার যন্ত্র ব্যবহার করে শ্বাসক্রিয়ায় ব্যবহৃত বায়ুর আয়তন পরিমাপ করা যেতে পারে যা চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ফুসফুসীয় কার্যাবলি নিরূপণে সাহায্য করে।

17.2.1 : শ্বাসকার্যের আয়তন এবং ক্ষমতা (Respiratory volumes and capacities) :

টাইডাল ভলিউম বা প্রবাহী বায়ুর পরিমাণ (TV): স্বাভাবিক প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাসকালে যে পরিমাণ বায়ু গ্রহণ বা বর্জন করা হয়। তা হল প্রবাহী বায়ুর পরিমাণ এর পরিমাণ প্রায় 500 মিলিলিটার। অর্থাৎ একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ প্রতি মিনিটে প্রশ্বাস বা নিশ্বাসকালে প্রায় 6000 থেকে 8000 মিলিলিটার বায়ু গ্রহণ বা ত্যাগ করতে পারে।

ইনসপিরেটেরি রিজার্ভ ভলিউম বা প্রশ্বাসক্রিয়ার অতিরিক্ত বায়ু পরিমাণ (IRV) : একজন মানুষ প্রশ্বাসক্রিয়ায় অতিরিক্ত যে পরিমাণ বায়ু বলপূর্বক গ্রহণ করতে পারে তা প্রশ্বাসক্রিয়ার অতিরিক্ত বায়ু পরিমাণ। এর পরিমাণ গড়ে 2500 মিলিলিটার থেকে 3000 মিলিলিটার পর্যন্ত হয়।

এক্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম বা নিঃশ্বাস ক্রিয়ার অতিরিক্ত বায়ুর পরিমাণ (ERV): একজন মানুষ নিঃশ্বাস ক্রিয়ায় অতিরিক্ত যে পরিমাণ বায়ু বলপূর্বক ত্যাগ করতে পারে তা হল নিঃশ্বাস ক্রিয়ার অতিরিক্ত বায়ুপরিমাণ। এর পরিমাণ গড়ে 1000 মিলিলিটার থেকে 1100 মিলিলিটার পর্যন্ত হয়।

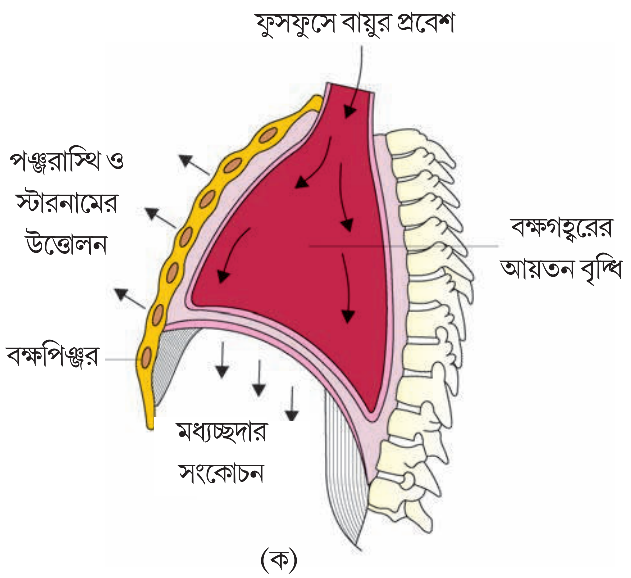

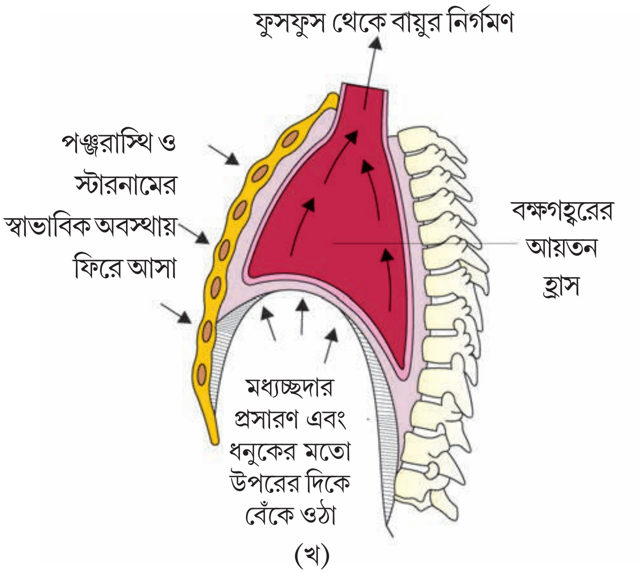

চিত্র 17.2: শ্বসনকার্যের কোশল ঃ (ক) প্রশ্বাস (খ) নিঃশ্বাস দেখানো হয়েছে।

রেসিডিউয়াল ভলিউম বা অবশিষ্ট বায়ুর পরিমাণ (RV): বলপূর্বক নিঃশ্বাসের পরও যে পরিমাণ বায়ু ফুসফুসে থেকে যায় , তাই হল অবশিষ্ট বায়ুর পরিমাণ। এর পরিমাণ 1100 মিলিলিটার থেকে 1200 মিলিলিটার।

উপরে বর্ণিত শ্বসনবায়ুর পরিমাণ নির্ণায়ক কিছু পদ্ধতির সাহায্যে যে- কোনো ফুসফুসীয় বায়ুর ধারকত্ব নির্ণয় করা যায়, যা চিকিৎসা সম্পর্কীয় শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়।

ইনসপিরেটরি ক্যাপাসিটি বা প্রশ্বাস ক্ষমতা (IC) : স্বাভাবিক নিঃশ্বাস ক্রিয়ার পর একজন ব্যক্তি প্রশ্বাস ক্রিয়ার দ্বারা যে পরিমাণ বায়ু গ্রহণ করতে পারে তার মোট আয়তন হল প্রশ্বাস ক্রিয়ার বায়ুধারণ ক্ষমতা। প্রবাহী বায়ু ও প্রশ্বাসক্রিয়ার অতিরিক্ত বায়ুর পরিমাণ এতে যুক্ত থাকে (TV + IRV)।

এক্সপিরেটরি ক্যাপাসিটি বা নিঃশ্বাস ক্ষমতা (EC): স্বাভাবিক প্রশ্বাসের পর কোনো ব্যক্তি যে পরিমাণ বায়ু ত্যাগ করতে পারে তার মোট পরিমাণ হল নিঃশ্বাস ক্ষমতা। এটি প্রবাহী বায়ু ও নিঃশ্বাস ক্রিয়ার অতিরিক্ত বায়ুর পরিমাণের সমষ্টি (TV + ERV)।

ফাংশন্যাল রেসিডিউল ক্যাপাসিটি বা ক্রিয়াপযোগী অবশিষ্ট বায়ুর পরিমাণ (FRC): স্বাভাবিক নি:শ্বাসকার্যের পর যে পরিমাণ বায়ু ফুসফুসে অবশিষ্ট থাকে তাকে কার্যকরী অবশিষ্ট বায়ু ধারণ ক্ষমতা বলে। এটিকে প্রকাশ করা হয় ERV + RV দ্বারা।

ভাইটাল ক্যাপাসিটি বা বায়ু ধারকত্ব (VC) : বলপূর্বক নিঃশ্বাসের পর একজন ব্যক্তি সর্বাধিক যে পরিমাণ বায়ু গ্রহণ বা পরিত্যাগ করতে পারে তাই হল বায়ু ধারকত্ব। ERV, TV এবং IRV -এর অন্তর্ভুক্ত বা এটি হল বলপূর্বক প্রশ্বাসের পর কোনো ব্যক্তি সর্বাধিক যে পরিমাণ বায়ু পরিত্যাগ করতে পারে তার মোট পরিমাণ।

টোটাল লাং ক্যাপাসিটি বা ফুসফুসের মোট বায়ু ধারণ ক্ষমতা : বলপূর্বক প্রশ্বাসের পর মোট যে পরিমাণ বায়ু ফুসফুসে থাকতে পারে তাই হল ফুসফুসের মোট বায়ু ধারণ ক্ষমতা। RV, ERV, TV, এবং IRV এর অন্তর্ভুক্ত বা ফুসফুসের মোট বায়ু ধারণ ক্ষমতা হল বায়ু ধারকত্ব এবং অবশিষ্ট বায়ুর পরিমাণের যোগফল।

17.3 : গ্যাসীয় আদানপ্রদান (Exchange of gases) :

বায়ুথলিগুলো হল গ্যাসীয় আদানপ্রদানের প্রাথমিক স্থান। রক্ত এবং কলাকোশের মধ্যেও গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে। এই স্থানগুলোতে O_2 এবং CO_2 এর আদানপ্রদান মূখ্যত চাপ/ঘনত্বের নতিমাত্রা নির্ভর সরল ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ঘটে। ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী গ্যাসীয় বস্তুগুলোর দ্রাব্যতা এবং এর পাশাপাশি পদার্থসমূহের স্থূলত্বও হল কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক যা ব্যাপনের হারকে প্রভাবিত করতে পারে।

বায়ু মিশ্রণের একটি একক গ্যাস যে চাপ প্রদান করে তাকে ঐ গ্যাসের আংশিক চাপ বলে এবং অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের আংশিক চাপকে PO_2 এবং PCO_2 দ্বারা প্রকাশ করা হয়। বায়ুমণ্ডলের বায়ুতে এই দুটি গ্যাসের আংশিক চাপ এবং ব্যাপনের স্থান দুটিকে সারণি 17.1 ও চিত্র 17.3-তে দেখানো হয়েছে। সারণিতে দেওয়া তথ্যগুলো স্পষ্টভাবে বায়ুথলি থেকে রক্তে এবং রক্ত থেকে কলাকোশে অক্সিজেনের ঘনত্বের নতিমাত্রা নির্দেশ করে।

সারণি 17.1: বায়ুমণ্ডলের সাপেক্ষে ব্যাপনের সাথে যুক্ত বিভিন্ন অংশগুলোতে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের আংশিক চাপসমূহ (mm Hg)

শ্বসন বায়ু	বায়ুমণ্ডলীয় বায়ু	বায়ুথলী	রক্ত (অক্সিজেন হ্রাসপ্রাপ্ত)	রক্ত (অক্সিজেন যুক্ত)	কলাকোশ
O_2	159	104	40	95	40
CO_2	0.3	40	45	40	45

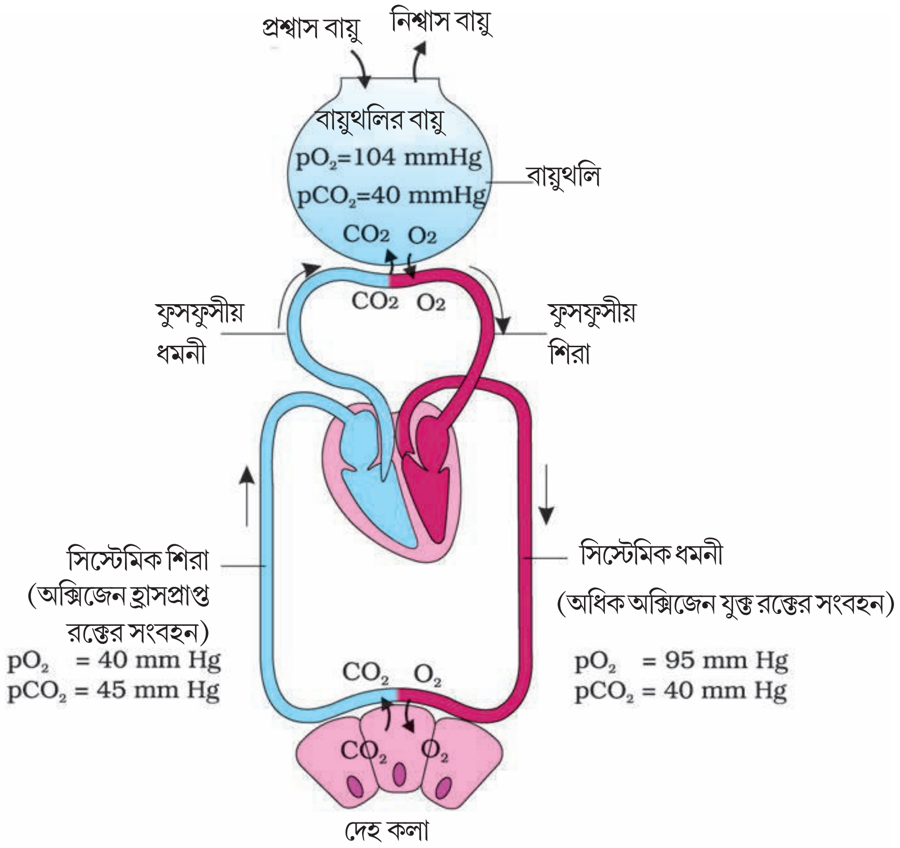

চিত্র 17.3: চিত্রের মাধ্যমে বায়ুথলি এবং দেহ কলাকোশে রক্তের সাথে শ্বসনবায়ুর গ্যাসীয় বিনিময় এবং O_2 ও CO_2 পরিবহণ দেখানো হয়েছে।

একইভাবে কলাকোশ থেকে রক্তে এবং রক্ত থেকে বায়ুথলীতে CO_2 নতিমাত্রাটি বিপরীতমুখী হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইডের দ্রাব্যতা অক্সিজেনের দ্রাব্যতার তুলনায় 20-25 গুণ বেশি হওয়ায় পার্শ্বচাপের প্রতি একক পার্থক্যে ব্যাপনপর্দার মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ CO_2 ব্যাপিত হতে পারে তা O_2 এর তুলনায় অনেকটাই বেশি। ব্যাপন পর্দাটি প্রধানত তিনটি স্তর দ্বারা গঠিত হয়, এগুলো হল বায়ুথলির পাতলা আঁইশাকার আবরণী কলা, বায়ুথলির রক্তজালকের এন্ডোথেলিয়াম এবং এই দুই স্তরের মধ্যবর্তী ভিত্তিবস্তু। তবে এর সর্বাধিক পুরুত্ব এক মিলিমিটারেরও অনেকটা কম হয়। তাই আমাদের দেহের সব প্রভাবকগুলোই বায়ুথলি থেকে কলাকোশে এবং কলাকোশ থেকে বায়ুথলিতে যথাক্রমে O_2 এবং CO_2 এর ব্যাপনের অনুকূল।

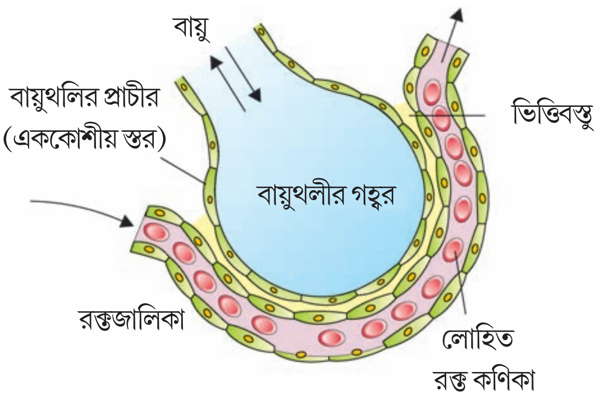

চিত্র 17.4: একটি বায়ুথলির সাথে ফুসফুসীয় রক্তজালকার ছেদচিত্র দেখানো হল।

17.4 : গ্যাসীয় বস্তুর পরিবহণ (Transport of Gases) :

রক্তের মাধ্যমে O_2 এবং CO_2 এর পরিবহণ ঘটে। প্রায় 97 শতাংশ O_2 রক্তে RBC দ্বারা পরিবাহিত হয়। অবশিষ্ট 3 শতাংশ O_2 রক্তরসে দ্রবীভুত অবস্থায় পরিবাহিত হয়। 20-25 শতাংশের কাছাকাছি CO_2 পরিবাহিত হয় RBC দ্বারা এবং 70 শতাংশ পরিবাহিত হয় বাইকার্বোনেট রূপে, প্রায় 7 শতাংশ CO_2 রক্তরসে দ্রবীভূত অবস্থায় পরিবাহিত হয়।

17.4.1 : অক্সিজেনের পরিবহণ (Transport of Oxygen) :

হিমোগ্লোবিন হল লোহিত রক্ত কণিকাস্থিত লৌহগঠিত লালবর্ণের রঞ্জক পদার্থ। অক্সিজেন হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন গঠন করে এবং এই বিক্রিয়াটি উভমুখী হয়। প্রতি অণু হিমোগ্লোবিন সর্বাধিক চার অণু অক্সিজেন পরিবহণ করতে পারে। হিমোগ্লোবিনের সাথে অক্সিজেনের সংযুক্তি প্রাথমিকভাবে O_2 এর আংশিক চাপের সাথে সম্পর্কিত। এছাড়া অন্যান্য যেসব প্রভাবকগুলো হিমোগ্লোবিনের সাথে অক্সিজেনের সংযুক্তিকে প্রভাবিত করে সেগুলো হল CO_2 এর পার্শ্বচাপ, H^+এর ঘনত্ব এবং দেহের তাপমাত্রা। যখন হিমোগ্লোবিনের সাথে অক্সিজেনের শতকরা সম্পৃক্তিকে অক্সিজেনের আংশিক চাপের সাপেক্ষে স্থাপন করা হয় তখন একটি সিগময়েড লেখচিত্র পাওয়া যায়। এই লেখচিত্রকে অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভ বলে (চিত্র 17.5) এবং এটি হিমোগ্লোবিনের সাথে অক্সিজেনের সংযুক্তিতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পার্শ্বচাপ, হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব ইত্যাদি প্রভাবকের প্রভাব সম্পর্কিত অধ্যয়নে খুবই উপযোগী। ফুসফুসীয় বায়ুথলিতে অক্সিজেনের উচ্চ আংশিক চাপ (pO_2),(কার্বন ডাঅক্সাইডের নিম্ন আংশিক চাপ (pCO_2), H^+ এর অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্ব এবং কম তাপমাত্রা এই প্রভাবকগুলোই অক্সিহিমোগ্লোবিন তৈরির জন্য অনুকূল হয়। অপরদিকে কলাকোশে অক্সিজেনের নিম্ন আংশিক চাপ (pO_2), উচ্চ pCO_2, হাইড্রোজেন আয়নের (H^+) অপেক্ষাকৃত বেশি ঘনত্ব এবং উচ্চ তাপমাত্রা থাকার অক্সিহিমোগ্লোবিন থেকে অক্সিজেনের পৃথকীকরণের জন্য অনুকূল হয়। এর থেকে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে ফুসফুসীয়তলে O_2 হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয় এবং কলাকোশে এটি হিমোগ্লোবিন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় অবস্থায় প্রতি 100 মিলিলিটার অধিক অক্সিজেন যুক্ত রক্ত প্রায় 5 মিলিলিটার O_2 কলাকোশে পরিবাহিত করে।

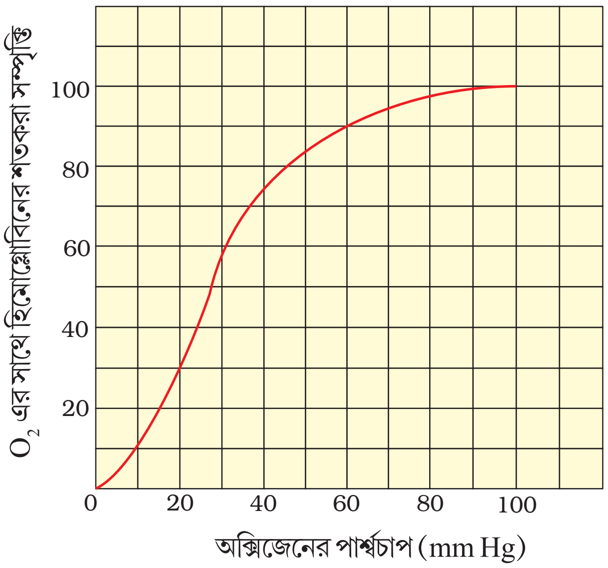

চিত্র 17.5 : অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন লেখচিত্র

17.4.2 : কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহণ (Transport of Carbondioxide) :

CO_2 হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে কার্বোমিনোহিমোগ্লোবিন যৌগ রূপে পরিবাহিত হয় (প্রায় 20-25 শতাংশ)। এই সংযুক্তি CO_2 এর আংশিক চাপের সাথে সম্পর্কিত। অক্সিজেনের আংশিক চাপ হল প্রধান প্রভাবক যা এই সংযুক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। কলাকোশে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উচ্চ আংশিক চাপে এবং অক্সিজেনের নিম্ন আংশিক চাপে CO_2 এর অধিক সংযুক্তি ঘটে।

অপরদিকে, ফুসফুসীয় বায়ুথলিতে CO_2 এর নিম্ন আংশিক চাপ এবং O_2 এর উচ্চ আংশিক চাপ থাকায় কার্বোমিনোহিমোগ্লোবিন থেকে CO_2 এর বিমুক্তি ঘটে। অর্থাৎ, যে CO_2 কলাকোশে হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়েছিল তা ফুসফুসীয় বায়ুথলিতে মুক্ত হয়। RBC -তে কার্বোনিক অ্যানহাইড্রেজ উৎসেচকের ঘনত্ব খুব বেশি হয় এবং কলাকোশেও উৎসেচকটি খুব অল্প পরিমাণে থাকে। এই উৎসেচকটি নিচের বিক্রিয়াটিকে উভয় দিকেই প্রভাবিত করে।

$$CO_2 + H_2O \underset{}{\overset{\text{কার্বোনিক অ্যানহাইড্রেজ}}{\rightleftharpoons}} H_2CO_3 \underset{}{\overset{\text{কার্বোনিক অ্যানহাইড্রেজ}}{\rightleftharpoons}} HCO_3^- + H^+$$

কলাকোশে অপচিতি বিপাক ঘটায় সেখানে CO_2 -এর উচ্চ আংশিক চাপ বজায় থাকে। তাই CO_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তে (লোহিত রক্তকণিকা এবং রক্তরস) প্রবেশ করে এবং HCO_3^- ও H^+ আয়ন গঠন করে। ফুসফুসীয় বায়ুথলিতে CO_2 এর নিম্ন আংশিক চাপ থাকায় বিক্রিয়াটি বিপরীত অভিমুখে ঘটে এবং এর ফলে CO_2 এবং H_2O উৎপন্ন হয়। এইভাবে CO_2 কলাকোশে বাইকার্বোনেটরূপে আবদ্ধ হয় এবং পরিবাহিত হয়ে বায়ুথলিতে আসে এবং সেখান থেকে CO_2 রূপে নির্গত হয় (চিত্র 17.4)। প্রতি 100 ml O_2 হ্রাসপ্রাপ্ত রক্ত থেকে প্রায় 4 ml CO_2 ফুসফুসীয় বায়ুথলিতে মুক্ত হয়।

17.5 : শ্বসন নিয়ন্ত্রণ (Regulation of Respiration) :

মানুষের দেহকলার চাহিদা অনুযায়ী শ্বসনের ছন্দ বজায় রাখার এবং পরিবর্তন করার একটি বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। এটি স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মস্তিষ্কের মেডুলা অঞ্চলে বর্তমান যে বিশেষিত কেন্দ্রটি শ্বসন নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে তাকে শ্বসনের ছন্দ নিয়ামক কেন্দ্র বলা হয়। এটি এই নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখ্যত দায়ী।

মস্তিষ্কের পনস্ অঞ্চলে উপস্থিত অপর একটি কেন্দ্র শ্বসনের ছন্দ নিয়ামক কেন্দ্রের কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, একে নিউমোটেক্সিক কেন্দ্র বলে। এই স্নায়ুকেন্দ্র থেকে আগত স্নায়বিক সংকেত প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার সময়কালকে হ্রাস করতে পারে। এর ফলে শ্বসন হারের পরিবর্তন ঘটতে পারে। শ্বসনের ছন্দ নিয়ামক কেন্দ্রের নিকটে অবস্থিত রাসায়নিক সংবেদী অঞ্চলটি CO_2 এবং হাইড্রোজেন আয়নের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়। এই বস্তুগুলোর পরিমাণ বৃদ্ধি এই কেন্দ্রটিকে সক্রিয় করতে পারে যা পরবর্তীতে শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধনের জন্য শ্বসনের ছন্দনিয়ামক কেন্দ্রে স্নায়বিক সংকেত পাঠাতে পারে এবং এর ফলে এই বস্তুগুলো দেহ থেকে অপসারিত হতে পারে। ক্যারোটিড ধমনী এবং অ্যাওর্টিক আর্চের সাথে সংযুক্ত গ্রাহকগুলো CO_2 এবং H^+ এর ঘনত্বের পরিবর্তনকে শনাক্ত করতে পারে এবং এদের দেহ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় স্নায়বিক সংকেত শ্বসনের ছন্দ নিয়ামক কেন্দ্রে পাঠায়। শ্বসনের ছন্দ নিয়ন্ত্রণে অক্সিজেনের ভূমিকা খুবই নগন্য।

17.6 : শ্বসন তন্ত্রের গোলযোগ (Disorders of Respiratory System) :

হাঁপানি (Asthma) হল শ্বাসকার্যের বাধা বা কষ্ট। যা ক্লোমশাখা ও উপক্লোম শাখার প্রদাহজনিত কারণে গড়গড় শব্দ সহ রোগ সৃষ্টি করে।

ইমফাইসিমা (Emphysema) হল দীর্ঘ স্থায়ী রোগ যার ফলে বায়ুথলির প্রাচীরগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে শ্বসনতল হ্রাস পায়। এই রোগের বিভিন্ন কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ হল ধূমপান।

পেশাগত শ্বসন রোগ সমূহ (Occupational Respiratory Disorder) কিছু কারখানার মধ্যে বিশেষত যেখানে পাথরভাঙা অথবা পাথরগুঁড়ো করা হয় সেখানে এত বেশি পরিমাণ ধুলো উৎপন্ন হয় যে দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এর মোকাবিলা করতে পারে না। দীর্ঘ সময় ধরে ধুলোর সংস্পর্শে থাকলে প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। যার কারণে পরবর্তী সময়ে ফাইব্রোসিস (তন্তুময় কলার বৃদ্ধি) হতে পারে, যা ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি করে। তাই এ ধরনের কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তামূলক মুখোশ পরা আবশ্যক।

সারসংক্ষেপ (Summary) :

কোশ বিপাকের জন্য অক্সিজেনকে ব্যবহার করে এবং এর থেকে শক্তি উৎপন্ন করে ও কিছু ক্ষতিকারক পদার্থ যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসও উৎপন্ন করে। কোশসমূহে অক্সিজেন পরিবহনের জন্য এবং সেখান থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড অপসারণের জন্য প্রাণীদের মধ্যে বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। আমাদের শ্বসন পদ্ধতিটি খুবই উন্নতমানের যা দুটি ফুসফুস এবং শ্বাসনালী দ্বারা গঠিত হয়ে কার্য সম্পন্ন করে।

শ্বসনের প্রথম পর্যায় হল শ্বাসকার্য যার দ্বারা বায়ুমণ্ডলের বায়ু দেহের ভেতর প্রবেশ করে (প্রশ্বাস) এবং বায়ুথলি থেকে বায়ু দেহের বাইরে নির্গত হয় (নিঃশ্বাস)। বায়ুথলি এবং O_2 বিহীন রক্তের মধ্যে O_2 এবং CO_2 এর বিনিময়, সারাদেহে রক্তের মাধ্যমে গ্যাসীয় পরিবহণ, O_2 সমৃদ্ধ রক্ত এবং কলায় O_2 ও CO_2 এর বিনিময় এবং কোশের অভ্যন্তরে O_2 এর ব্যবহার (অন্তঃকোশীয় শ্বসন) এই ধাপগুলো শ্বসন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত।

প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস প্রক্রিয়া দুটি বিশেষিত পেশির সাহায্যে বায়ুমণ্ডল এবং বায়ুথলির মধ্যে চাপের নতিমাত্রা সৃষ্টির মাধ্যমে ঘটে। এই বিশেষিত পেশিগুলো হল - মধ্যচ্ছদা বা ডায়াফ্রাম এবং বিশেষ ধরনের আন্তর পঞ্জরাস্থি, পেশিকলা শ্বাসকার্যে সহায়তা করে। স্পাইরোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে শ্বাস কার্যে ব্যবহৃত শ্বাস বায়ুর ঘনমান (পরিমাণ) নির্ণয় করা হয় যা চিকিৎসাক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ।

অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের বিনিময় বায়ুথলি ও কলাকোশের মধ্যে ব্যাপন প্রক্রিয়ার দ্বারা সংগঠিত হয়। ব্যাপনের হার নির্ভর করে অক্সিজেন (pO_2) এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড (pCO_2) আংশিক চাপের নতিমাত্রার উপর, তাদের দ্রাব্যতার উপর, এর সাথে তাদের ব্যাপন স্থানের তলের বিস্তৃতি বা পুরুত্বের উপর। আমাদের দেহের এই প্রভাবকগুলো বায়ুথলি থেকে অক্সিজেনকে অক্সিজেন হ্রাসপ্রাপ্ত রক্তে পরিবাহিত করে এবং একইরকমভাবে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত কলাকোশে পরিবাহিত হয়। এই প্রভাবকগুলো CO_2 এর বিপরীতমুখী ব্যাপন প্রক্রিয়ায় সহায়ক হয় অর্থাৎ কলাকোশ থেকে বায়ুথলিতে CO_2 পরিবাহিত হয়।

অক্সিজেন প্রধানত অক্সিহিমোগ্লোবিন হিসাবে পরিবাহিত হয়। বায়ুথলির মধ্যে যেখানে pO_2 অধিক থাকে সেখানে O_2 হিমোগ্লোবিনের সাথে সংযুক্ত হয়। ফলে O_2 কলাকোশে সহজেই বিয়োজিত হয়। কারণ সেখানে pO_2 , pCO_2 এবং H^+ এর ঘনত্ব খুব উচ্চমাত্রায় থাকে। প্রায় 70% এর কাছাকাছি কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস কার্বোনিক অ্যানহাইড্রেজ উৎসেচকের সাহায্যে বাইকার্বোনেট (HCO_3^-) হিসাবে পরিবাহিত হয়ে থাকে। 20-25 শতাংশ কার্বন ডাইঅক্সাইড (কার্বোমিনো হিমোগ্লোবিন রূপে হিমোগ্লোবিন দ্বারা পরিবাহিত হয়। দেহকলাকোশে যেখানে CO_2 এর আংশিক চাপ (pCO_2) উচ্চ মাত্রায় থাকে সেখানে রক্তের সাথে CO_2 সংযুক্ত হয় এবং বায়ুথলিতে যেখানে pCO_2 নিম্নমাত্রায় এবং pO_2 উচ্চমাত্রায় থাকে সেখানে CO_2 রক্ত থেকে বাইরে নির্গত হয়।

মস্তিষ্কের মেডুলা অঞ্চলের শ্বসন কেন্দ্রটি শ্বসনের ছন্দময়তা বজায় রাখে। মস্তিষ্কের পন্‌স অঞ্চলের নিউমোট্যাক্সিক কেন্দ্র এবং মেডুলার রসায়ন সংবেদী অঞ্চল শ্বসন পদ্ধতিকে প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করতে পারে।

অনুশীলনী (Exercise)

1. বায়ু ধারকত্ব বা ভাইটাল ক্যাপাসিটির সংজ্ঞা লেখো। এর গুরুত্ব কী?
2. স্বাভাবিক শ্বাসকার্যের পর ফুসফুসে যে পরিমাণ বায়ু অবশিষ্ট থাকে তার ঘনমান নির্ণয় করো।
3. শ্বসন বায়ুর ব্যাপন শ্বসনতন্ত্রের শুধুমাত্র বায়ুথলি (অ্যালভিওলাই) অঞ্চলেই সংঘঠিত হয়, অন্য কোনো অংশে নয়— কেন?
4. CO_2 গ্যাস পরিবহনের প্রধান বা উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগুলি কি কি? ব্যাখ্যা করো।
5. **বায়ুথলির বায়ুর তুলনায় বায়ুমণ্ডলীয় বায়ুর pO_2 এবং pCO_2 নীচের কোন্‌টি হবে?**
   i) pO_2 কম, pCO_2 অধিক
   ii) pO_2 অধিক, pCO_2 কম
   iii) pO_2 অধিক, pCO_2 অধিক
   iv) pO_2 কম , pCO_2 কম
6. স্বাভাবিক অবস্থায় প্রশ্বাস প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করো।
7. শ্বসন প্রক্রিয়া কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়?
8. অক্সিজেন পরিবহণে কার্বন ডাইঅক্সাইড-এর পার্শ্বচাপ (pCO_2) এর প্রভাব কী?
9. একজন মানুষ যখন পর্বতে আরোহণ করতে থাকে তখন তার শ্বসন পদ্ধতিতে কী ঘটে?
10. পতঙ্গো দেহে কোথায় শ্বাসবায়ুর আদানপ্রদান ঘটে?
11. অক্সিজেন ডিসোসিয়েশনলেখচিত্রটির সংজ্ঞা দাও। তুমি কি এর সিগময়ডাল আকৃতির কোনো কারণ দেখাতে পারো?
12. তুমি কি হাইপোক্সিয়া বা অক্সিজেনের অভাব-এর সম্পর্কে শুনেছ? এই সম্পর্কিত তথ্য জোগাড় করার চেষ্টা করো এবং তা তোমার বন্ধুদের সাথে আলোচনা করো।
13. পার্থক্য লেখো ঃ
   ক) IRV এবং ERV
   খ) প্রশ্বাস ক্ষমতা এবং নিঃশ্বাস ক্ষমতা।
   গ) বায়ু ধারকত্ব এবং ফুসফুসের মোট বায়ু ধারণ ক্ষমতা।
14. প্রবাহী বায়ুর পরিমাণ বা টাইডাল ভলিউম কী? একজন সুস্থ মানুষের টাইডাল ভলিউম এক ঘণ্টায় কত তা নির্ণয় করো (প্রায় মান)।

অধ্যায় 18 (CHAPTER 18)

দেহ তরল এবং সংবহন (BODY FLUIDS AND CIRCULATION)

18.1 রক্ত

18.2 লসিকা (কলারস)

18.3 সংবহন পথসমূহ

18.4 দ্বিচক্রী সংবহন

18.5 হৃৎপিণ্ডের কার্যাবলির নিয়ন্ত্রণ

18.6 সংবহনতন্ত্রের গোলযোগ

তোমরা জেনেছ যে, সব সজীব কোশেই পরিপোষক, অক্সিজেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ হওয়া প্রয়োজন। একই সাথে কলাকোশের কার্যাবলি যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য কোশে উৎপন্ন বর্জ্য বা ক্ষতিকর বস্তুগুলোরও প্রতিনিয়ত অপসারণ প্রয়োজন। সুতরাং কোশে এবং কোশ থেকে এইসব বস্তুগুলোর পরিবহণের জন্য একটি কার্যকরী ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই পরিবহণের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণীতে বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। স্পঞ্জ এবং একনালীদেহী বা সিলেনটারেটা গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণীদের মতো সরল জীবসমূহে তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে এদের দেহগহ্বরের মাধ্যমে জলসংবহন ঘটে যাতে কোশসমূহে এই বস্তুগুলোর আদান প্রদান ঘটে। মানুষসহ বেশিরভাগ উন্নতজীবে এই কাজের জন্য সবচেয়ে বেশি যে দেহতরলটি ব্যবহৃত হয় সেটি হল রক্ত। লসিকা হল অন্য একটি দেহ তরল যা কিছু বস্তুর পরিবহণেও সাহায্য করে। এই অধ্যায়ে তোমরা রক্ত ও লসিকার গঠন ও ধর্ম সম্পর্কে জানবে এবং রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতিও এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

18.1 রক্ত (Blood) ঃ

রক্ত একটি তরল ধাত্র, প্লাজমা এবং সাকার উপাদান সমন্বিত একটি বিশেষ যোগকলা।

18.1.1 প্লাজমা/রক্তরস (Plasma) ঃ

প্লাজমা একটি হালকা হলুদ বর্ণের সান্দ্র তরল যা রক্তের প্রায় 55 শতাংশ গঠন করে। রক্তরসের 90-92 শতাংশ হল জল এবং 6-8 শতাংশ হল প্রোটিন। রক্তরসের মুখ্য প্রোটিনগুলো হল ফাইব্রিনোজেন, গ্লোবিউলিন এবং অ্যালবুমিন। ফাইব্রিনোজেন রক্ততঞ্চনের জন্য প্রয়োজন হয়।

গ্লোবিউলিন প্রোটিন প্রাথমিকভাবে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে এবং অ্যালবুমিন প্রোটিন অভিস্রবনজনিত ভারসাম্য রক্ষা করে। রক্তরসে Na^+, Ca^{++}, Mg^{++}, HCO_3^-, cl^- ইত্যাদির মতো খনিজও অল্প পরিমাণে থাকে। গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, লিপিড ইত্যাদিও রক্তরসে উপস্থিত থাকে এবং এরা দেহে সবসময় পরিবহণযোগ্য অবস্থায় থাকে। রক্ততঞ্চনের সহায়ক ফ্যাক্টরগুলোও নিষ্ক্রিয় রূপে রক্তরসে উপস্থিত থাকে। রক্ততঞ্চনের সহায়ক ফ্যাক্টর ব্যতীত রক্তরসকে সিরাম বলে।

18.1.2 সাকার উপাদান (Formed elements) ঃ

লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অনুচক্রিকা — রক্তের এই তিনটি উপাদানকে এক সাথে রক্তের সাকার উপাদান বলে (চিত্র 18.1)। রক্তের প্রায় 45 শতাংশই এই সাকার উপাদান নিয়ে গঠিত।

এরিথ্রোসাইট বা লোহিত রক্ত কণিকার পরিমাণ রক্তে সবচাইতে বেশি থাকে। একজন সুস্থ প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রতি ঘন মিলিলিটার রক্তে 5-5.5 মিলিয়ন লোহিত রক্ত কণিকা থাকে। প্রাপ্ত বয়স্কদের দেহে লোহিত রক্তকণিকা লাল অস্থিমজ্জা থেকে উৎপন্ন হয়। বেশিরভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের লোহিত রক্তকণিকা নিউক্লিয়াসবিহীন এবং দ্বিঅবতল আকৃতি বিশিষ্ট হয়। লোহিত রক্তকণিকাতে লাল বর্ণের লৌহ গঠিত এক ধরনের জটিল প্রোটিন থাকে, একে হিমোগ্লোবিন বলে এবং হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতির কারণেই লোহিত রক্ত কণিকা লাল বর্ণের হয়। একজন সুস্থ ব্যক্তির প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তে 12-16 গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে। এই হিমোগ্লোবিন দেহের শ্বাসবায়ু পরিবহণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লোহিত রক্ত কণিকার গড় আয়ু 120 দিন। এই সময় পর এরা প্লীহাতে (লোহিত কণিকার কবরস্থান) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

হিমোগ্লোবিনের অনুপস্থিতির কারণে লিউকোসাইট বর্ণহীন হওয়ায় এরা শ্বেত রক্তকণিকা (WBC) নামেও পরিচিত। এরা নিউক্লিয়াস যুক্ত হয় এবং অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যায়, গড়ে 6000-8000 mm^{-3} সংখ্যায় রক্তে উপস্থিত থাকে। শ্বেত রক্তকণিকা সাধারণত স্বল্পায়ু হয়। রক্তে প্রধানত দুই ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা রয়েছে— দানাদার শ্বেতরক্ত কণিকা এবং অদানাদার শ্বেতরক্ত কণিকা। বিভিন্ন প্রকার দানাদার শ্বেতরক্তকণিকাগুলো হল নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল ও বেসোফিল এবং লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট হল অদানাদার শ্বেতরক্ত কণিকা। লিউকোসাইটগুলোর (WBC) মধ্যে নিউট্রোফিলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (60-65 শতাংশ) এবং বেসোফিল সবচেয়ে কম সংখ্যায় (0.5-1 শতাংশ) থাকে। নিউট্রোফিল ও মনোসাইটগুলো (06-08 শতাংশ) হল আগ্রাসী কোশ যারা দেহে প্রবিষ্ট বিজাতীয় অণুজীবগুলোকে ধ্বংস করে। বেসোফিল কোশগুলো হিস্টামিন, সেরোটোনিন, হেপারিন ইত্যাদি ক্ষরণ করে এবং প্রদাহজনিত বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ইওসিনোফিল (2-3%) সংক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং এলার্জি সম্পর্কিত বিক্রিয়াগুলোর সাথেও যুক্ত থাকে। লিম্ফোসাইটগুলো (20-25%) প্রধানত দুই ধরনের হয় —

চিত্র 18.1 রক্তের সাকার উপাদানগুলোর সচিত্র উপস্থাপন

B এবং T গঠন। B এবং T লিম্ফোসাইট উভয়ই দেহের অনাক্রম্য প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী। অনুচক্রিকাগুলোকে আবার থ্রম্বোসাইটও বলে এবং এই কোশীয় উপাংশগুলো মেগাকেরিওসাইট (অস্থি মজ্জাস্থিত বিশেষ কোশ) কোশ থেকে উৎপন্ন হয়। সাধারণত প্রতি ঘন মিলিলিটার রক্তে 150000- 38000 সংখ্যক অনুচক্রিকা থাকে। অনুচক্রিকা বিভিন্ন ধরনের পদার্থ নিঃসরণ করতে পারে এবং এদের বেশিরভাগই রক্ততঞ্চনে অথবা রক্ত জমাট বাঁধার কাজে অংশগ্রহণ করে। রক্তে অনুচক্রিকার সংখ্যা হ্রাস পেলে রক্ততঞ্চন জনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং যার ফলে দেহ থেকে অত্যধিক রক্ত বেরিয়ে যেতে পারে।

18.1.3 রক্তের শ্রেণিবিভাগ (Blood Groups) ঃ

তোমরা জান যে বিভিন্ন মানুষের রক্ত দেখতে একরকম হলেও কিছু কিছু বিষয়ে এর মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ধরনের রক্তের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। সারা পৃথিবীতে বহুলভাবে ব্যবহৃত এরূপ রক্তের শ্রেণিবিভাগের এরূপ দুটি পদ্ধতি হল ABO পদ্ধতি এবং Rh পদ্ধতি।

18.1.3.1 রক্তের ABO শ্রেণিবিভাগ (ABO Grouping) ঃ

রক্তের ABO শ্রেণিবিভাগ লোহিত কণিকার গাত্রস্থিত দুইটি পৃষ্ঠীয় অ্যান্টিজেন যথাক্রমে A এবং B (রাসায়নিক পদার্থ যেগুলো অনাক্রম্যতাকে উদ্দীপিত করতে পারে) এর উপস্থিত বা অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে করা হয়। একইভাবে, বিভিন্ন ব্যক্তির রক্তরসে দুটি স্বাভাবিক অ্যান্টিবডি (প্রোটিনগুলো অ্যান্টিজেনের প্রভাবে উৎপন্ন হয়) থাকে। সারণি 18.1 এ A, B, AB ও O শ্রেণির রক্তে অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির বণ্টন দেখানো হয়েছে। তোমরা সম্ভবত জান যে রক্ত সঞ্চারণকালে (Blood Transfusion) যে কোনো রক্তই ব্যবহৃত হতে পারে না। যে কোনো রক্ত, সঞ্চারণের পূর্বে রক্তকণিকার জমাট বাধা (লোহিত কণিকার ধ্বংস হওয়া)- জনিত তীব্র সমস্যা এড়াতে দাতার রক্তের সাথে গ্রহীতার রক্তকে যত্নসহকারে মিলিয়ে নিতে বা ম্যাচিং করাতে হয়। সারণি 18.1তে দাতার রক্তের সঙ্গতি দেখানো হয়েছে।

চিত্র 18.1 রক্তের শ্রেণিসমূহ এবং দাতার রক্তের সঙ্গতি

রক্তের শ্রেণি	RBCsতে উপস্থিত অ্যান্টিজেন	রক্তরসে উপস্থিত অ্যান্টিবডি	রক্তদাতার শ্রেণি
A	A	anti-B	A, O
B	B	anti-A	B, O
AB	A, B	nil	AB, A, B, O
O	nil	anti-A, B	O

উপরে বর্ণিত সারণি থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে ‘O’ শ্রেণির রক্ত অন্য যে কোনো রক্ত শ্রেণির মানুষের দেহে সঞ্চারিত করা যায়। ‘O’ শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের সর্বজনীন দাতা বলে। ‘AB’ শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিরা ‘AB’ শ্রেণি এবং এর পাশাপাশি অন্য শ্রেণির রক্তও গ্রহণ করতে পারে। এই কারণে ‘AB’ শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের সর্বজনীন গ্রহিতা বলে।

18.1.3.2 Rh শ্রেণি বিভাগ

রেসাস প্রজাতির বানরের দেহে উপস্থিত (সেই নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন) অ্যান্টিজেনের অনুরূপ অপর একটি অ্যান্টিজেন বেশির ভাগ (প্রায় 80%) মানুষের রক্তের লোহিত রক্ত কণিকার পৃষ্ঠতলে দেখতে পাওয়া যায়। এসব ব্যক্তিদের Rh পজিটিভ (Rh+Ve) এবং যাদের রক্তে এই অ্যান্টিজেন অনুপস্থিত তাদের Rh নেগেটিভ (Rh-Ve) বলে। একজন Rh-Ve ব্যক্তির রক্ত যদি Rh+Ve রক্তের সংস্পর্শে আসে তবে Rh--Ve ব্যক্তির দেহে Rh অ্যান্টিজেনের বিরোধী বিশেষ অ্যান্টিবডি তৈরি হবে। তাই Rh-Ve গর্ভবতী মাতার রক্ত ও তার গর্ভস্থ Rh+Ve শিশুভ্রূণের রক্তের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের Rh অসঙ্গাতি পরিলক্ষিত হয়। মাতার প্রথমবার গর্ভাবস্থায় শিশুভ্রূণের Rh অ্যান্টিজেন মাতার Rh-Ve রক্তের সংস্পর্শে আসে না কারণ মাতা ও শিশুভ্রূণের রক্ত অমরা বা প্লাসেন্টা দ্বারা পৃথক থাকে। তবে প্রথম সন্তান প্রসবকালে শিশুভ্রূণের অল্প পরিমাণ Rh+Ve রক্ত মাতার Rh-Ve রক্তের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা থাকে। এরকম ক্ষেত্রে মাতার রক্তে Rh অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি হতে শুরু করে। মাতার পরবর্তী গর্ভাবস্থার ক্ষেত্রে মাতার (Rh^-) রক্তের Rh অ্যান্টিবডি শিশুভ্রূণের (Rh^+) রক্তের Rh অ্যান্টিবডির সংস্পর্শে চলে আসতে পারে। যার ফলে শিশুভ্রূণের লোহিত রক্তকণিকাগুলো RBC ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এটি শিশুভ্রূণের মৃত্যুর কারণ হতে পারে বা এটি সদ্যোজাত শিশুর মারাত্মক রক্তাল্পতা বা জন্ডিসের কারণ হতে পারে। এই অবস্থাকে এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস (Erythroblastosis foetalis) বলে। প্রথম সন্তানের জন্মের পরপরই মাতার দেহে অ্যান্টি Rh অ্যান্টিবডি প্রয়োগ করে এই বিষয়টিকে এড়ানো যেতে পারে।

18.1.4 রক্ত-তঞ্চন (Coagulation of Blood)

তোমরা জান যে যখন তোমাদের আঙুল কেটে যায় বা তোমরা আঘাত পাও তখন তোমাদের ক্ষতস্থান থেকে দীর্ঘসময় ধরে রক্ত ক্ষরণ হয়। সাধারণত কিছু সময় পরেই ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। তোমরা কি জান কেন এরূপ হয়? কোনো আঘাত বা আঘাতজনিত অসুস্থতার প্রভাবে রক্ত তঞ্চিত হয় বা জমাট বাঁধে। এটি হল সেই পদ্ধতি যা আমাদের দেহ থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ রোধ করে। তোমরা হয়তো দেখেছ যে কেটে যাওয়া স্থান বা আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে একটি গাঢ় লালচে বাদামি বর্ণের পিণ্ড অবস্থান করে। এটি একটি তঞ্চন পিণ্ড যা মূলত ফাইব্রিন নামক একটি তন্তুময় জালক, যেখানে রক্তের মৃত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত সাকার উপাদানগুলো আবদ্ধ হয়। রক্তরসে উপস্থিত থ্রম্বিন উৎসেচকের ক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয় ফাইব্রিনোজেন ফাইব্রিনে পরিণত হয়। থ্রম্বিন আবার রক্তরসে উপস্থিত অন্য একটি নিষ্ক্রিয় বস্তু প্রোথ্রম্বিন থেকে তৈরি হয়। থ্রম্বোকাইনেজ নামক একটি উৎসেচক জোট উপরোক্ত বিক্রিয়াটি ঘটাতে প্রয়োজন হয়।এই জোটটি রক্তরসে নিষ্ক্রিয় রূপে উপস্থিত কতকগুলো ফ্যাক্টরের সহায়তায় পরস্পর যুক্ত কতকগুলো পর্যায়ক্রমিক উৎসেচক নির্ভর বিক্রিয়ার (Cascade Process) মাধ্যমে গঠিত হয়। কোনো আঘাত বা আঘাতজনিত অসুস্থতা বা ট্রমা রক্তস্থিত অনুচক্রিকাগুলোকে উদ্দীপিত করে যাতে উদ্দীপিত অনুচক্রিকা থেকে নির্দিষ্ট কিছু ফ্যাক্টর বেরিয়ে এসে রক্ততঞ্চন পদ্ধতিটিকে সক্রিয় করে। আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে কলাকোশ থেকে বেরিয়ে আসা কিছু ফ্যাক্টরও রক্ত তঞ্চনের সূচনা করতে পারে। Ca^{++} রক্ত তঞ্চনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

18.2 লসিকা বা লিম্ফ (কলারস) Lymph (Tissuefluid)

কলাকোশে রক্তবাহের মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় জলে দ্রাব্য বহু ক্ষুদ্রবস্তু সহ কিছু পরিমাণ জল কলাস্থিত কোশগুলোর আন্তঃকোশীয় ফাঁকা স্থানে বেরিয়ে আসে এবং অপেক্ষাকৃত বড়ো প্রোটিন অণুগুলো ও বেশিরভাগ সাকার উপাদান রক্তবাহে থেকে যায়। নিঃসৃত এই তরলকে আন্ত:কোশীয় রস বা কলারস বলে। রক্তরসে উপস্থিত খনিজ উপাদানগুলোর মত একইভাবে লসিকাতেও খনিজ উপাদানগুলো উপস্থিত থাকে। রক্ত এবং কোশের মধ্যে সর্বদাই পুষ্টিদ্রব্য ও গ্যাসের বিনিময় এই তরল অর্থাৎ লসিকার মাধ্যমেই ঘটে। লসিকাবাহের বিস্তৃত জালক এই তরল সংগ্রহ করে এবং পুনরায় তা প্রধান শিরা সমূহে পাঠিয়ে দেয়। তাকে লসিকাতন্ত্র বলে। লসিকা হল বিশেষিত লিম্ফোসাইট সমন্বিত একটি বর্ণহীন তরল যা আমাদের দেহে অনাক্রম্যপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য দায়ী। লসিকা পুষ্টিদ্রব্য বা পরিপোষক, হরমোন ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ বাহকও বটে। অন্ত্রের ভিলাই এ উপস্থিত ল্যাকেটিয়েল সমূহে লসিকার মাধ্যমে ফ্যাটের শোষণ ঘটে।

18.3 সংবহন পথসমূহ (Circulatory Pathways)

প্রাণীদেহে দুই ধরনের সংবহন পথ দেখা যায়- মুক্ত বা বন্ধ সংবহন। সন্ধিপদী এবং কম্বোজ পর্বভুক্ত প্রাণীদের দেহে মুক্ত সংবহনতন্ত্র বর্তমান। এক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড থেকে উত্থিত রক্ত রক্তবাহ সমূহের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে ফাঁকা স্থান বা দেহ গহ্বরে উন্মুক্ত হয়। এই দেহ গহ্বরগুলোকে সাইনাস বলে। অঙ্গুরীমাল এবং কর্ডাটা পর্বভুক্ত প্রাণীদের দেহে রয়েছে বন্ধ সংবহনতন্ত্র যেখানে হৃৎপিণ্ড থেকে উত্থিত রক্ত সবসময়ই রক্তবাহ সমন্বিত বন্ধ জালকের মধ্য দিয়ে সংবাহিত হয়। যেহেতু এই পদ্ধতিতে তরলের প্রবাহ অধিকতর সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকতে পারে তাই সংবহনের এই ধরনটিকে অধিক সুবিধাজনক বলে বিবেচনা করা হয়।

সব মেরুদণ্ডী প্রাণীদেরই একটি পেশিময় প্রকোষ্ঠ সমন্বিত হৃৎপিন্ড রয়েছে। মাছেদের হৃৎপিণ্ড একটি অলিন্দ ও একটি নিলয় সমন্বিত দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হয়। উভচর ও সরীসৃপদের (কুমীর ব্যতীত) দুইটি অলিন্দ ও একটি নিলয় নিয়ে গঠিত তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত হৃৎপিন্ড রয়েছে। আবার কুমীর, পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ড দুইটি অলিন্দ ও দুইটি নিলয় নিয়ে গঠিত অর্থাৎ চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হয়। মাছের হৃৎপিন্ড থেকে অক্সিজেন হ্রাসপ্রাপ্ত রক্ত উৎক্ষিপ্ত হয় এবং ফুলকার সাহায্যে তা অধিক অক্সিজেন যুক্ত হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশসমূহে যায় সেখান থেকে অক্সিজেন হ্রাসপ্রাপ্ত রক্ত পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে (একচক্রী সংবহন)। উভচর এবং সরীসৃপদের ক্ষেত্রে বাম অলিন্দটি ফুলকা/ফুসফুস/ত্বক থেকে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত গ্রহণ করে এবং দেহের অন্যান্য অংশ থেকে অক্সিজেন হ্রাসপ্রাপ্ত রক্ত ডান অলিন্দে প্রবেশ করে। যদিও একমাত্র নিলয়ের মধ্যেই এদের মিশ্রণ ঘটে এবং এই মিশ্রিত রক্ত নিলয় থেকে উৎক্ষিপ্ত হয় (অসম্পূর্ণ দ্বৈত সংবহন)। পক্ষী এবং স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে বাম অলিন্দ এবং ডান অলিন্দ যথাক্রমে অধিক অক্সিজেন যুক্ত রক্ত ও অক্সিজেন হ্রাস প্রাপ্ত রক্ত গ্রহণ করে। রক্ত ডান অলিন্দ থেকে ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। কোনো ধরনের মিশ্রণ ছাড়াই নিলয়দ্বয় থেকে রক্ত উৎক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ এই সমস্ত জীবে দুইটি পৃথক সংবহন পথ বর্তমান থাকে তাই এদের মধ্যে দ্বৈত বা দ্বিচক্রী সংবহন সংঘটিত হয়। চল আমরা মানুষের সংবহনতন্ত্র অধ্যয়ন করি।

18.3.1 মানুষের সংবহনতন্ত্র (Human Circulatory System)

মানুষের সংবহনতন্ত্রকে রক্ত সংবহনতন্ত্র বলে এবং এটি একটি পেশিবহুল প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড বন্ধ শাখান্বিত রক্তবাহসমূহের জালক ও রক্ত নিয়ে গঠিত। উল্লেখ্য, রক্ত হচ্ছে সেই তরল যোগকলা যা সংবাহিত হয়।

হৃৎপিন্ড, মেসোডার্ম স্তর থেকে উৎপন্ন হয় এবং এটি বক্ষগহ্বরে দুটি ফুসফুসের মাঝখানে বাঁদিকে সামান্য হেলানো অবস্থায় অবস্থান করে। এর আকার বন্ধ মুষ্ঠির মতো। এটি পেরিকার্ডিয়াল তরলকে ঘিরে অবস্থিত একটি দ্বিস্তরী পর্দাবৃত থলির দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। একে পেরিকার্ডিয়াম বলে। আমাদের হৃৎপিন্ডটি চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। উপরের অপেক্ষাকৃত ছোটো প্রকোষ্ঠ দুটিকে অলিন্দ এবং নীচের অপেক্ষাকৃত বড়ো প্রকোষ্ঠ দুটিকে নিলয় বলে। আন্তঃঅলিন্দ ব্যবধায়ক নামক একটি পাতলা পেশিবহুল প্রাচীর ডান অলিন্দকে বাম অলিন্দ থেকে পৃথক করে রাখে। অপরদিকে পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট আন্তঃনিলয় ব্যবধায়ক ডান নিলয়কে বাম নিলয় থেকে পৃথক রাখে (চিত্র 18.2 দেখো)। একইদিকের অলিন্দ ও নিলয় অলিন্দ-নিলয় ব্যবধায়ক নামক একটি পুরু তন্তুময় কলার দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক থাকে। তবে এরূপ প্রতিটি ব্যবধায়ক ছিদ্রযুক্ত হয় যার মধ্য দিয়ে একইদিকে প্রকোষ্ঠদ্বয় পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে। ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের ছিদ্রপথ পেশিবহুল তিনটি পাল্লাবিশিষ্ট একটি কপাটিকা অর্থাৎ ত্রিপত্র কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। অপরদিকে, বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মধ্যকার ছিদ্রপথ একটি দ্বিপত্র বা মিট্রাল কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে।

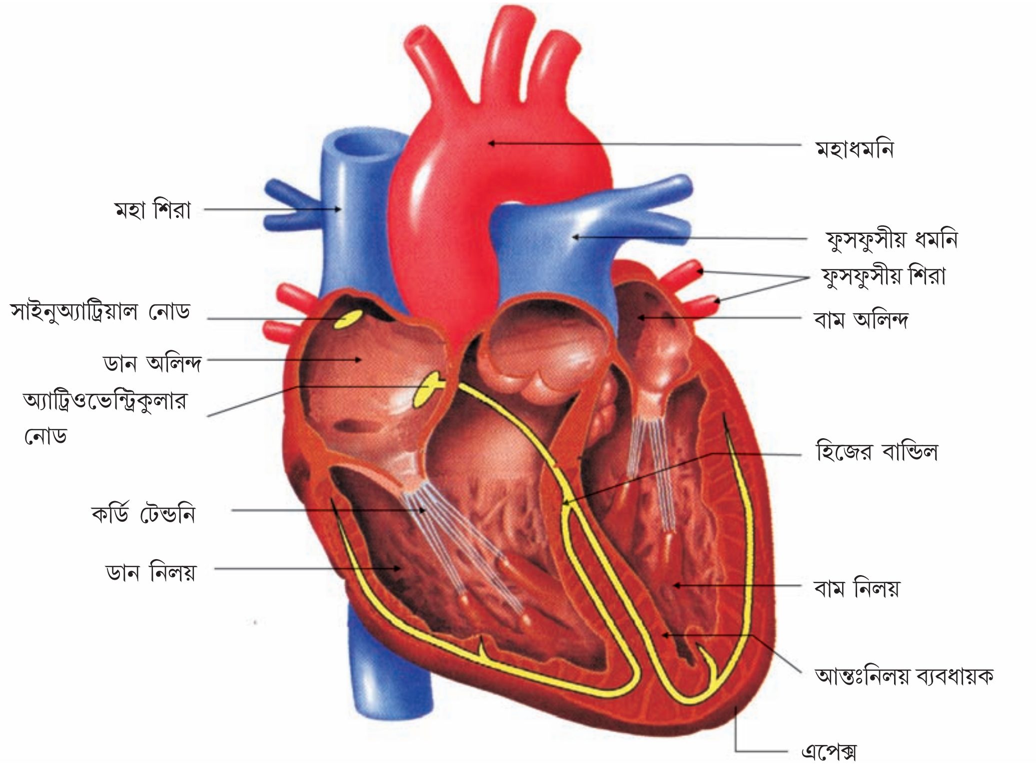

চিত্র **18.2** মানুষের হৃৎপিন্ডের ছেদ দৃশ্য

ডান নিলয় ও ফুসফুসীয় ধমনী এবং বাম নিলয় ও মহাধমনীর সংযোগস্থলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা বর্তমান। হৃৎপিন্ডে কপাটিকার উপস্থিতির জন্য রক্তপ্রবাহ কেবলমাত্র একমুখী হয় অর্থাৎ অলিন্দ থেকে নিলয়ের দিকে এবং নিলয় থেকে ফুসফুসীয় ধমনী ও মহাধমনীর দিকে রক্তপ্রবাহ ঘটে। এই কপাটিকাগুলো বিপরীতমুখী রক্ত প্রবাহে বাধা দেয়।

সম্পূর্ণ হৃৎপিণ্ডটি হৃৎপেশি দ্বারা গঠিত। নিলয়ের প্রাচীর অলিন্দের প্রাচীরের তুলনায় অনেকটা পুরু হয়। নোডাল কলা নামক একটি বিশেষিত হৃৎপেশিতন্তুও হৃৎপিন্ডের প্রাচীরে বিস্তৃত থাকে। এই কলার এক অংশ ডান অলিন্দের প্রাচীরের ডান দিকে উপরের কোণায় অবস্থান করে। একে সাইনোঅ্যাট্রিয়ালনোড (SAN) বলে। এই কলার অপর এক অংশ ডান অলিন্দের নীচের দিকে বাম কোণায় অলিন্দ নিলয় ব্যবধায়কের সন্নিকটে অবস্থান করে। একে অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার নোড (AVN) বলে। নোডালতন্তুর একটি বান্ডেল অর্থাৎ অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোড থেকে বেরিয়ে অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার ব্যবধায়কের মধ্য দিয়ে গিয়ে বিস্তৃত হয়ে আন্তঃনিলয় ব্যবধায়কের শীর্ষদেশে উঠে আসে এবং তৎক্ষণাৎ বিভক্ত হয়ে ডান ও বাম বান্ডিল গঠন করে। এই শাখাগুলো যে কোনো প্রান্তের নিলয়ের পেশিতন্তুর জুড়ে কতগুলো ক্ষুদ্র তন্তুর সৃষ্টি করে এবং এদের পারকিনজি তন্তু বলে। ডান ও বাম বান্ডিল সহ এই তন্তুগুলোকে হিজের তন্তুগুচ্ছ (Bundle of His) বলে। কোনো বাহ্যিক উদ্দীপক ছাড়াই এই নোডাল পেশিতন্তুগুলো ক্রিয়াবিভব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় অর্থাৎ এটি স্বউদ্দীপিত হয়। তবে নোডালতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে প্রতি মিনিটে সৃষ্ট ক্রিয়াবিভবের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ক্রিয়াবিভবের সৃষ্টি করতে পারে অর্থাৎ প্রতি মিনিটে 70-75টি এবং এটি হৃৎপিন্ডের ছান্দিক সংকোচনশীল কার্যকলাপ শুরু করা এবং তা বজায় রাখার জন্য দায়ী। তাই সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোডকে পেসমেকার বলে। আমাদের হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে 70-75 বার স্পন্দন সৃষ্টি করতে পারে (গড়ে 72টি স্পন্দন/মিনিট)।

18.3.2 হৃদচক্র (Cardiac Cycle)

হৃৎপিণ্ড কীভাবে কাজ করে? চলো দেখা যাক। হৃৎপিন্ডের চারটি প্রকোষ্ঠের সবকটিই যখন শিথিলাবস্থায় থাকে অর্থাৎ যখন তারা জয়েন্ট ডায়াস্টোল (যৌথ প্রসারণ) অবস্থায় থাকে, সেই অবস্থা থেকেই হৃৎপিন্ডের কার্যাবলি সংক্রান্ত আলোচনাটি শুরু করা যাক। এই অবস্থায় যেহেতু ত্রিপত্র এবং দ্বিপত্র কপাটিকাগুলো উন্মুক্ত থাকে, ফুসফুসীয় শিরা এবং উর্ধ্ব/অধঃ মহা শিরা থেকে রক্ত যথাক্রমে বাম অলিন্দ ও ডান অলিন্দের মধ্য দিয়ে বাম নিলয় ও ডান নিলয়ে আসে। এই অবস্থায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলো বন্ধ থাকে। SA নোড এই সময় একটি ক্রিয়া বিভবের সৃষ্টি করে; যা একই সাথে সংকুচিত হওয়ার জন্য হৃৎপিন্ডের অলিন্দদ্বয়কে উদ্দীপিত করে— এটিই হল অলিন্দ সংকোচন। এর ফলে নিলয়ে রক্তপ্রবাহ প্রায় 30 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এই ক্রিয়াবিভবটি অতঃপর AV নোড এবং AV বান্ডিলের মধ্য দিয়ে নিলয়ের দিকে পরিবাহিত হয়। AV বান্ডিল থেকে এই ক্রিয়া বিভবটি নিলয়ের সমগ্র পেশিতে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে নিলয়ের পেশির সংকোচন ঘটে (নিলয় সংকোচন), নিলয়ের সংকোচনের সাথে মিলিয়ে অলিন্দগুলোও শিথিল হয়। বান্ডিল অফ হিজের মাধ্যমে AV নোড এং AV বান্ডিল থেকে এই ক্রিয়াবিভবটি নিলয়ের সমগ্র পেশিতে ছড়িয়ে পড়ে; এর ফলে নিলয়ের পেশির সংকোচন ঘটে (নিলয় সংকোচন)। নিলয় সংকোচনের সাথে অলিন্দগুলোও শিথিল হয়।

নিলয়ের সিস্টোল নিলয় মধ্যস্থ চাপ বৃদ্ধি করে বেং এর ফলে নিলয় থেকে বিপরীতমুখী রক্তপ্রবাহ অলিন্দে প্রবেশের চেস্টা করার ফলে ত্রিপত্র ও দ্বিপত্র কপাটিকাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। নিলয় মধ্যস্থ চাপ আরও বৃদ্ধি পেলে ডান নিলয় ও ফুসফুসীয় ধমনী (ডান দিকে) এবং বাম নিলয় ও মহাধমনির (বাম দিকে) সংযোগস্থলে অবস্থিত অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলো সবেগে উন্মুক্ত হয়। এর ফলে নিলয়দ্বয় থেকে উৎক্ষিপ্ত রক্ত রক্তবাহগুলোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সংবহন পথে পৌঁছায়। নিলয়দ্বয় এই সময় শিথিল অবস্থায় থাকে (নিলয়ের ডায়াস্টোল) এবং নিলয় মধ্যস্থ চাপ হ্রাস পাওয়ায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিগুলো বন্ধ হয়ে যায় ফলে নিলয়ের দিকে রক্তের প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। নিলয় মধ্যস্থ চাপ আরও হ্রাস পেলে শিরাবাহিত রক্ত অলিন্দে মুক্ত হয় এবং এর ফলে রক্ত অলিন্দে যে চাপের সৃষ্টি করে তার প্রভাবে ত্রিপত্র ও দ্বিপত্র কপাটিকাগুলো সবেগে খুলে যায়। রক্ত এখন পুনরায় বাধাহীনভাবে নিলয়ে প্রবেশ করে। নিলয়দ্বয় এবং অলিন্দদ্বয় পুনরায় শিথিল অবস্থায় (যৌথ প্রসারণ) পৌঁছায়। SA নোড (SA node) খুব তাড়াতাড়ি একটি নতুন ক্রিয়াভিবের সৃষ্টি করে এবং উপরে বর্ণিত ঘটনাবলীর একইক্রমে পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং এই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে।

হৃৎপিণ্ডে সংঘটিত এই ধারাবাহিক ঘটনাবলি যা চক্রাকারে পুনরাবৃত্ত হয়, তাকে হৃৎচক্র বলে। নিলয়দ্বয় ও অলিন্দদ্বয় উভয়েরই সিস্টোল ও ডায়াস্টোলের মাধ্যমেই হৃৎচক্রটি সংঘটিত হয়। আগেই বলা হয়েছে যে হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে 72 বার স্পন্দিত হয়। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে একটি হৃদচক্রের সময়কাল 0.4 সেকেন্ড। হৃৎচক্র চলাকালে প্রতিটি নিলয় থেকে 70 মিলিলিটার রক্ত সংবহনতন্ত্রে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং একে ঘাত পরিমাণ বলে। ঘাত পরিমাণকে হৃৎস্পন্দনের হার (প্রতি মিনিটে স্পন্দনের সংখ্যা) দিয়ে গুণ করলে হার্দ উৎপাদ পাওয়া যায়। তাই হৃদপিণ্ডের প্রতিটি নিলয় থেকে প্রতি মিনিটে যে পরিমাণ রক্ত ধমনীতন্ত্রে উৎক্ষিপ্ত হয় তাকেই হৃৎ উৎপাদ রূপে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। এবং একজন সুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে হার্দ উৎপাদের পরিমাণ হল গড়ে 5000 মিলিলিটার বা 5 লিটার। আমাদের দেহ ঘাত পরিমাণ এবং এর পাশাপাশি হৃদ স্পন্দনের হারের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। যার ফলে হার্দ উৎপাদেরও পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ একজন অ্যাথলেটের হার্দ উৎপাদ একজন সাধারণ মানুষের হার্দ উৎপাদের তুলনায় অনেকটাই বেশি।

হৃদচক্র চলাকালে দুটি সুস্পষ্ট শব্দ সৃষ্টি হয় যেগুলো স্টেথোস্কোপের সাহায্যে সহজেই শোনা যায়। ত্রিপত্র ও দ্বিপত্র কপাটিকাগুলো বন্ধ হওয়ার ফলে প্রথম হৃদ্‌শব্দের (lub) সৃষ্টি হয়। অপরদিকে, অধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলো বন্ধ হওয়ার ফলে দ্বিতীয় হৃদ্‌শব্দের (dub) সৃষ্টি হয়। চিকিৎসাক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ে এই হৃদ্‌শব্দ দুটির গুরুত্ব অপরিসীম।

18.3.3 ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ (Electrocardiograph) ECG):

তোমরা সম্ভবত আদর্শ চিকিৎসাকেন্দ্রে টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো এমন দৃশ্যের সাথে পরিচিত আছ যেখানে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে এমন রোগীর দেহের সাথে তারের সাহায্যে মনিটারিং মেশিনটি যুক্ত রয়েছে এবং যন্ত্রটির পর্দায় তড়িৎবিভবের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে এবং পিপ পিপ ... পি ই ই ই ই শব্দটি শোনা যাচ্ছে। এই ধরনের মেশিন বা যন্ত্র (ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ) একটি ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (ECG) পাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। হৃদচক্র চলাকালে হৃদপিণ্ডে সৃষ্ট তড়িৎ প্রবাহের লেখচিত্রের উপস্থাপন হল ECG। একটি আদর্শ ECG পাওয়ার জন্য (যেমন চিত্র 18.3 তে দেখানো হয়েছে)।

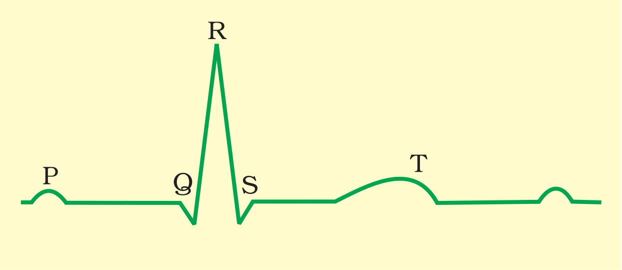

চিত্র 18.3 ঃ একটি আদর্শ ECG এর চিত্ররূপ।

একজন রোগীকে তিনটি তড়িৎদ্বারের (প্রতিটি কব্জিতে একটি করে এবং বাম গোড়ালিতে একটি) সাহায্যে মেশিন বা যন্ত্রের সাথে যুক্ত করা হয়। এই মেশিনের সাহায্যে অবিরত হৃদপিণ্ডের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করা হয়। বিশদভাবে হৃৎপিণ্ডের কার্যাবলি মূল্যায়নের জন্য অনেকগুলো তড়িৎদ্বার রোগীর বক্ষ অঞ্চলে লাগানো হয়। এখানে আমরা কেবলমাত্র একটি আদর্শ ECG সম্পর্কে আলোচনা করব।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াপদ্ধতিগুলোর সাথে মিলিয়ে ECG এর প্রতিটি চূড়াকে ইংরেজি বর্ণমালার P-T বর্ণ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

P তরঙ্গটি হৃৎপিণ্ডের অলিন্দের তড়িৎ সক্রিয়তাকে (বিসমবর্তন) নির্দেশ করে। যার ফলে উভয় অলিন্দের সংকোচন ঘটে।

QRS কমপ্লেক্স দ্বারা নিলয়ের বিসমর্তনকে বোঝানো হয় যা নিলয়ের সংকোচনের সূচনা করে। Q তরঙ্গের কিছু পরে নিলয়ের সংকোচন শুরু হয় এবং একটি নিলয়ের সিস্টোলের সূচনাকে নির্দেশ করে।

T তরঙ্গটি দ্বারা হৃৎপিণ্ডের নিলয়গুলোর সক্রিয় অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসাকে (পুনঃসমবর্তন) নির্দেশ করে। যেখানে T তরঙ্গটি শেষ হয় তা সিস্টোলের সমাপ্তি নির্দেশ করে।

অবশ্যই প্রদত্ত সময়ে ঘটা QRS কমপ্লেক্স এর সংখ্যা গণনা করে কোনো ব্যক্তির হৃদস্পন্দনের হার নির্ণয় করা যেতে পারে। যদিও বিভিন্ন ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত ECGগুলো প্রদত্ত তড়িৎদ্বারে কনফিগারেশন (Configuration) মোটামুটি একইরকমের হয় এবং তরঙ্গগুলোর আকৃতির যে কোনো পরিবর্তন সম্ভাব্য অস্বাভাবিকতা বা রোগকে নির্দেশ করে, তাই চিকিৎসা শাস্ত্রে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

18.4 দ্বি-চক্রী সংবহন (Double Circulation):

রক্ত যথাযথভাবে একটি নির্দিষ্ট পথে ধমনি ও শিরা এই দুই ধরনের রক্তবাহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। মূলত, প্রতিটি ধমনি ও শিরা ত্রিস্তরী হয়। রক্তবাহের সবচেয়ে ভিতরের স্তরটি স্কোয়ামাস এন্ডোথেলিয়ামের স্তর এবং একে টিউনিকা ইনটিমা বলে। মাঝের স্তরটি মসৃণ পেশি ও স্থিতিস্থাপকতন্তুর দ্বারা গঠিত একে টিউনিকা মিডিয়া বলে এবং সবচেয়ে বাইরের স্তরটি কোলাজেন তন্তুসহ তন্তুময় যোগগকলা দ্বারা গঠিত, এবং একে টিউনিকা এক্সটারনা বলে। শিরায় টিউনিকা মিডিয়াস্তরটি অপেক্ষাকৃতভাবে পাতলা হয়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ডান নিলয় থেকে উৎক্ষিপ্ত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনিতে উৎক্ষিপ্ত হয়। ফুসফুসীয় ধমনিতে উৎক্ষিপ্ত অক্সিজেন হ্রাসপ্রাপ্ত রক্ত ফুসফুসে গিয়ে পৌঁছায়, যেখান থেকে অধিক অক্সিজেনযুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। এই সংবহন পথই ফুসফুসীয় সংবহবনতন্ত্র গঠন করে। মহাধমনিতে উৎক্ষিপ্ত অধিক অক্সিজেন যুক্ত রক্ত ধমনিজালক, ধমনিকা এবং রক্তজালকের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে কলাকোশে পৌঁছায় এবং সেখান থেকে অক্সিজেন হ্রাসপ্রাপ্ত রক্ত উপশিরাতন্ত্র, শিরা, মহাশিরা দ্বারা গৃহীত হয়ে হৃদপিণ্ডের ডান অলিন্দে প্রবেশ করে। এই ধরনের সংবহনকে সিস্টেমিক সংবহন বলে (চিত্র 18.4 দেখো)। সিস্টেমিক সংবহনের মাধমে পুষ্টিদ্রব্য, অক্সিজেন এবং অন্যান্য আবশ্যক উপাদান সমূহ কলাকোশে পৌঁছায় এবং এই সংবহন কলাকোশ থেকে CO_2 এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক বস্তুসমূহকে দেহ থেকে বহন করে নিয়ে আসে। পৌষ্টিকনালী এবং যকৃতের মধ্যে একটি অনন্য রক্তবাহ সংযোগ বর্তমান একে হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র বলে। হেপাটিক পোর্টাল শিরা অন্ত্র থেকে রক্তকে বহন করে যকৃতে নিয়ে আসে। এরপর যকৃৎ থেকে এই রক্ত সিস্টেমিক সংবহনে প্রবেশ করে। আমাদের দেহে একটি বিশেষ করোনারি সংবহন রয়েছে যা কেবলমাত্র হৃৎপিণ্ড থেকে হৃদপেশিতে এবং হৃদপেশি থেকে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সংবহন করে।

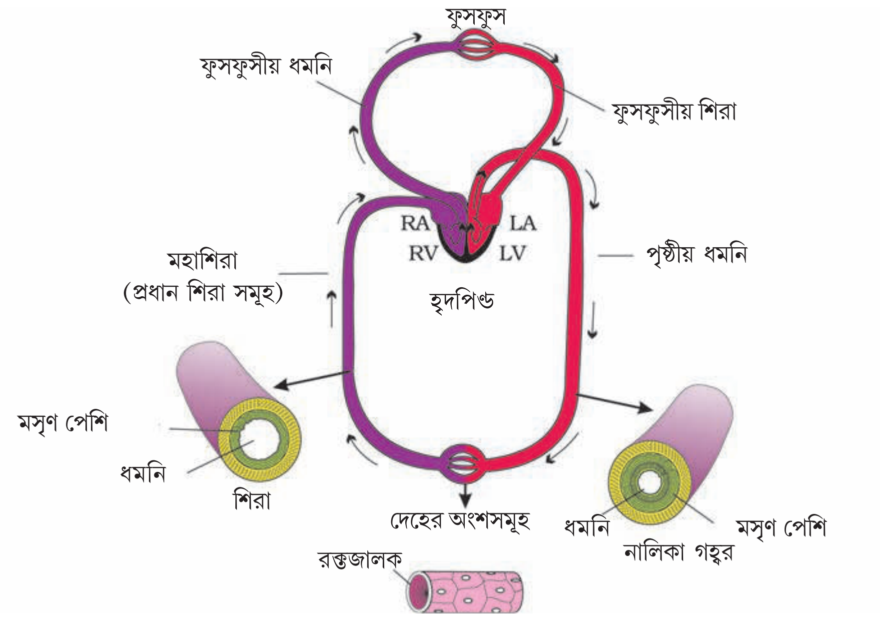

চিত্র 18.4 মানবদেহে রক্ত সংবহনের নকশা

18.5 হৃৎপিণ্ডের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ (Regulation of Cardiac Activity):

হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ অভ্যন্তরীণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থাৎ এর ক্রিয়াকলাপ বিশেষিত পেশি (নোডাল টিস্যু) দ্বারা স্বনিয়ন্ত্রিত)। তাই হৃৎপিণ্ডকে মায়োজেনিক বলে। সুষুম্নাশীর্ষক (medulla oblongata) স্থিত একটি বিশেষ স্নায়কেন্দ্র স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের (Autonolic nervous system বা ANS) মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের কার্যাবলি পরিমিত রাখতে পারে। সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুর (ANS এর অংশ) মাধ্যমে বাহিত স্নায়বিক বার্তা হৃদস্পন্দনের হার ও নিলয় সংকোচন-বলের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে এবং এইভাবে হার্দ উৎপাদ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুর (ANS এর অপর একটি অংশ) মাধ্যমে বাহিত স্নায়বিক বার্তা হৃদস্পন্দনের হার ও ক্রিয়াবিভব পরিবহণের গতি হ্রাস করে এবং এইভাবে হার্দ-উৎপাদ হ্রাস পায়। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির মেডালা অংশ থেকে ক্ষরিত হরমোনগুলোও হার্দ উৎপাদ বাড়াতে পারে।

18.6 হৃৎপিণ্ডের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ (Disorders of Circulation System):

উচ্চ রক্তচাপ (হাইপারটেনশন) ঃ রক্তচাপ স্বাভাবিকের (120/80) চেয়ে বেশি হলে তখন যে পরিভাষা দ্বারা এটি বোঝানো হয় তা হল হাইপারটেনশন। এই পরিমাপের ক্ষেত্রে, 120 mm Hg (মিলিমিটার পারদস্তম্ভের সমান) হল সিস্টোলিক বা পাম্পিং চাপ এবং 80 mm Hg হল ডায়াস্টোলিক বা রেস্টিং চাপ। কোনো ব্যক্তির রক্তচাপ বার বার পরিমাপের পরও যদি তা 140/90 (সিস্টোলিক চাপ 140 mm Hg /ডায়াস্টোলিক চাপ 90 mm Hg) বা এর থেকে বেশি হয় তখন এটি হাইপারটেশন নির্দেশ করে। উচ্চ রক্তচাপের ফলে হৃৎপিণ্ডের রোগ দেখা দেয় এবং এটি মস্তিষ্ক, বৃক্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাগুলোরও ক্ষতিসাধন করে।

করোনারী ধমনি রোগ (Coronary Artery Disease / CAD) ঃ করোনারী ধমনির রোগকে প্রায়শই অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস বলে। এই রোগে সেই রক্তবাহগুলোই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেগুলো হৃদপেশীতে রক্ত সরবরাহ করে। ধমনির গাত্রে ক্যালসিয়াম, ফ্যাট, কোলেস্টেরল এবং তন্তুময় কণা সঞ্চিত হওয়ার কারণে ধমনিগুলোর গহ্বর সরু হয়ে যায় এবং এই রোগ হয়।

এনজাইনা (Angina) ঃ একে এনজাইনা পেক্টোরিসও বলে। যখন পর্যাপ্ত অক্সিজেন হৃৎপেশিতে পৌঁছায় না তখন বুকে তীব্র ব্যাথার উপসর্গ দেখা যায়। যে কোনো বয়সের পুরুষ ও মহিলাদের এনজাইনা হতে পারে কিন্তু এটি সচরাচর মধ্যবয়স্ক এবং বৃদ্ধদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। যে অবস্থাসমূহ রক্তপ্রবাহে বিঘ্ন ঘটায় তাদের কারণেই এই রোগ হতে পারে।

হার্ট ফেলিওর (Heart failure) ঃ হার্ট ফেলিওর বলতে হৃৎপিণ্ডের সেই অবস্থাকে বোঝায় যখন দেহের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে উৎক্ষিপ্ত হয় না। একে মাঝে মাঝে কনজেসটিভ হার্ট ফেলিওর বলে। কারণ এই রোগের একটি প্রধান উপসর্গ হল ফুসফুসের রক্তবাহগুলোর প্রসারণ ও বায়ুথলিগুলোর রক্তে পূর্ণ হওয়া। হার্ট ফেলিওর কিন্তু কার্ডিয়াক এরেস্ট (যখন হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়) বা হার্ট অ্যাটাকের (প্রয়োজনমতো রক্তসরবরাহ না হওয়ায় হৃদপেশির হঠাৎ করে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া) মতো নয়।

সারসংক্ষেপ
(Summary)

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে রক্ত, যা একটি তরল যোগকলা তা কোশে কোশে প্রয়োজনীয় বস্তু এবং কোশ থেকে বর্জ্য পদার্থ সমূহের পরিবহণের জন্য সংবাহিত হয়। লসিকা (কলারস) হল অপর একটি তরল যার মাধ্যমেও কিছু বস্তুর পরিবহণ ঘটে।

রক্ত একটি তরল ধাত্র এবং সাকার উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। রক্তের তরল ধাত্রকে প্লাজমা বলে। লোহিত রক্ত কণিকা (RBC গুলো, এরেথ্রোসাইটস) শ্বেত রক্তকণিকা (WBC লিউকোসাইট) এবং প্লেটলেটস্ বা অনুচক্রিকা (থ্রম্বোসাইট) হল রক্তের সাকার উপাদান। মানুষের রক্তকে RBC এর দুটি পৃষ্ঠীয় অ্যান্টিজেন A এবং B এর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উর ভিত্তি করে A, B, AB, O শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। RBC এর পৃষ্ঠতলে উপস্থিত রেসাস ফেক্টর নামক অন্য একটি অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপরভিত্তি করেও রক্তের একটি শ্রেণি বিভাগ করা হয়। কলাস্থিত কোশগুলোর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান যে রক্তলব্ধ একটি তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে, তাকে কলারস বলে। এই কলারসকে বলা হয় লসিকা। প্রোটিন ও রক্তের সাকার উপাদান ব্যতীত এটি অনেকটাই রক্তের মতো হয়।

সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং কিছু সংখ্যক অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে বদ্ধসংবহনতন্ত্র রয়েছে। আমাদের সংবহনতন্ত্র একটি পেশিবহুল পাম্পিং অঙ্গ অর্থাৎ হৃদপিণ্ড, রক্তবাহের একটি জালক এবং একটি তরল অর্থাৎ রক্ত নিয়ে গঠিত। হৃদপেশিতন্তুসমূহ স্বউদ্দীপক হয়। সাইনো এন্ট্রিয়াল নোড (SA নোড) সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ক্রিয়াবিভব (প্রতি মিনিটে 70-75) সৃষ্টি করে। তাই এটি হৃৎপিণ্ডের কার্যসমূহের গতি বজায় রাখে। এই কারণে SA নোডকে পেসমেকার বলে। ক্রিয়া বিভবের ফলে প্রথমে অলিন্দ এবং পরে নিলয়ের সংকোচন (সিস্টোল) হয়। এরপরই এদের শিথিলায়ন (ডায়াস্টোল) ঘটে। সিস্টোলের ফলে রক্ত সবেগে অলিন্দ থেকে নিলয়ে এবং নিলয় থেকে রক্ত ফুসফুসীয় ধমনি এবং মহাধমনিতে প্রবেশ করে। হৃৎপিণ্ডে সংঘটিত ধারাবাহিক ঘটনাবলি হৃদচক্র সৃষ্টি করে এই ঘটনাবলির চক্রাকার পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং একে হৃদচক্র বলে (কার্ডিয়াক চক্র) একজন সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রতি মিনিটে 72 বার এই ধরনের আবর্তন ঘটে। একটি হৃদচক্র চলাকালে প্রতিটি নিলয় থেকে প্রায় 70 ml রক্ত উৎক্ষিপ্ত হয় এবং একে ঘাত পরিমাণ বা স্পন্দন পরিমাণ বলে।

প্রতি মিনিটে প্রতিটি নিলয় থেকে যে পরিমাণ রক্ত উৎক্ষিপ্ত হয় তাকে হার্দ উ ৎপাদ বলে এবং এটি ঘাত পরিমাণ ও হৃদ্স্পন্দন হারের গুণফলের সমান হয়। হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ দেহতল থেকে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফের সাহায্যে লেখচিত্ররূপে নথিভুক্ত করা যেতে পারে এবং এই লেখচিত্রটিকে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (ECG) বলে। চিকিৎসাক্ষেত্রে (ECG) এর গুরুত্ব রয়েছে।

আমাদের দেহে একটি সম্পূর্ণ দ্বিচক্রী সংবহন ঘটে। এই সংবহন ফুসফুসীয় এবং সিস্টেমিক এই দুটি সংবহনপথ নিয়ে গঠিত। ডান নিলয় থেকে অক্সিজেন হ্রাসপ্রাপ্ত রক্ত উত্থিত হলে ফুসফুসীয় সংবহন শুরু হয় এবং এই রক্ত ফুসফুসে বাহিত হয়। ফুসফুসে বাহিত এই রক্ত অক্সিজেন যুক্ত হয়ে বাম অলিন্দে ফিরে আসে। বাম নিলয় থেকে অধিক অক্সিজেনযুক্ত রক্ত উত্থিত হলেই সিস্টেমিক সংবহন শুরু হয় এবং এই রক্ত বাম নিলয় থেকে মহাধমনিতে উত্থিত হয় এবং সেখান থেকে দেহের সব কলাকোশে পরিবাহিত হয়। কলাকোশ থেকে অক্সিজেন হ্রাস প্রাপ্ত রক্ত শিরাসমূহ দ্বারা সংগৃহীত হয় এবং ডান অলিন্দে ফিরে আসে। যদিও হৃৎপিণ্ড স্বউদ্দীপক তবুও এর কার্যাবলি স্নায়ুজ ও হরমোন নির্ভর পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকতে পারে।

অনুশীলনী (Exercises)

1. রক্তে উপস্থিত সাকার উপাদনগুলোর নাম লিখো এবং তাদের প্রতিটির একটি করে প্রধান কার্যের উল্লেখ করো।
2. প্লাজমা প্রোটিন সমুহের গুরুত্ব কী কী?
3. স্তম্ভ - I এর সাথে স্তম্ভ - II মেলাও ঃ

স্তম্ভ - I	**স্তম্ভ - I**
(ক) ইওসিনোফিল	(i) রক্ততঞ্চন
(খ) RBC	(ii) সর্বজননীন গ্রহিতা
(গ) AB গ্রুপ	(ii) সংক্রমণ প্রতিরোধকারী
(ঘ) অনুচক্রিকা	(iv) হৃৎপিণ্ডের সংকোচন
(ঙ) সিস্টোল	(v) গ্যাসীয় বস্তুর পরিবহণ

4. রক্তকে যোগকলা রূপে গণ্য করা হয় কেন?
5. রক্ত এবং লসিকার মধ্যে পার্থক্য লিখো।
6. দ্বিচক্রী সংবহন বলতে কি বোঝায়? এর তাৎপর্য উল্লেখ করো।
7. পার্থক্য লিখো
   ক) রক্ত ও লসিকা
   খ) বদ্ধ ও মুক্ত সংবহনতন্ত্র
   গ) সিস্টোল ও ডায়াস্টোল
   ঘ) P তরঙ্গ ও T তরঙ্গ
8. মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের গঠনের বিবর্তনজনিত পরিবর্তন আলোচনা করো।
9. আমাদের হৃৎপিণ্ডকে আমরা মায়োজেনিক বলি কেন?
10. SA নোডকে আমাদের হৃৎপিণ্ডের পেসমেকার বলা হয় কেন?
11. হৃৎপিণ্ডের কাজে অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোড এবং অ্যাট্রিও ভেন্টিকুলার বান্ডিলের গুরুত্ব কী?
12. হৃৎচক্র এবং হার্দ উৎপাদ এর সংজ্ঞা লিখো।
13. হৃদধ্বনিগুলো ব্যাখ্যা করো।
14. একটি আদর্শ ECG এর চিত্র অঙ্কন করো এবং এর বিভিন্ন অংশ ব্যাখ্যা করো।

অধ্যায় — 19 (Chapter - 19)

রেচন পদার্থসমূহ এবং এদের নিষ্কাশন
(Excretory Products and their Elimination)

19.1. মানুষের রেচনতন্ত্র

19.2. মূত্র উৎপাদন

19.3. বৃক্কীয় নালিকার কার্যাবলি

19.4. পরিশ্রুত তরলের গাঢ়করণ প্রক্রিয়া,

19.5. বৃক্কের কাজ নিয়ন্ত্রণ

19.6. মূত্র ত্যাগ পদ্ধতি

19.7. রেচনে অন্যান্য অঙ্গাসমূহের ভূমিকা

19.8 রেচনতন্ত্রের গোলযোগসমূহ

প্রাণীদেহে বিপাকক্রিয়ার ফলে অথবা অন্য কারণ যেমন অধিক খাদ্য গ্রহণের ফলে অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জল এবং Na^+, K^+, Cl^- ফসফেট, সালফেট ইত্যাদি আয়নগুলো জমা হয়। এইসব পদার্থগুলো সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে দেহ থেকে অপসারণ করা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে তোমরা এই পদার্থগুলো বিশেষ করে সাধারণ নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থগুলোর অপসারণের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবে। অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া এবং ইউরিক অ্যাসিড হল প্রাণীর দ্বারা রেচিত প্রধান নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থসমূহ। এদের মধ্যে অ্যামোনিয়া সবচাইতে বিষাক্ত হওয়ায় এর অপসারণের জন্য প্রচুর পরিমাণ জলের প্রয়োজন। অপরপক্ষে, ইউরিক অ্যাসিড কম বিষাক্ত হওয়ায় সামান্য পরিমাণ জলের মাধ্যমেই এর অপসারণ সম্ভব।

অ্যামোনিয়া রেচনের প্রক্রিয়াকে অ্যামোনোটেলিসম বলা হয়। বহু অস্থিযুক্ত মাছ, জলজ উভচর প্রাণী এবং জলজ পতঙ্গাসমূহ **অ্যামোনোটেলিক** প্রকৃতির হয়। অ্যামোনিয়া যেহেতু সহজেই দ্রবণীয় তাই সাধারণত ব্যাপন প্রক্রিয়ায় দেহতল অথবা ফুলকার মাধ্যমে (মাছে) অ্যামোনিয়াম আয়ন রূপে রেচিত হয়। অ্যামোনিয়া অপসারণে বৃক্ক দুটি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না। স্থলজ অভিযোজনের প্রয়োজনে জীব দেহে জল সংরক্ষণের জন্য ইউরিয়া এবং ইউরিক অ্যাসিডের মতো কম বিষাক্ত নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থসমূহ তৈরি হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণী, বহু স্থলজ উভচর এবং সামুদ্রিক মাছ রেচন পদার্থ হিসাবে প্রধানত ইউরিয়া ত্যাগ করে এবং এদের **ইউরিওটেলিক প্রাণী** বলে। এসব প্রাণীদের বিপাকের ফলে উৎপন্ন অ্যামোনিয়া, যকৃতে ইউরিয়ায় পরিণত হয় এবং রক্তে প্রবেশ করে বৃক্কের মাধ্যমে পরিস্রুত ও রেচিত হয়। দেহে যথোপযুক্ত অভিস্রবণ ঘনত্ব (Osmolarity) বজায় রাখার জন্য এ ধরনের কিছু কিছু প্রাণীর বৃক্কের ধাত্রে কিছুটা ইউরিয়া সঞ্চিত থাকতে পারে। সরীসৃপ, পক্ষী, স্থলজ শামুক এবং পতঙ্গারা কম জল ব্যবহার করে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থসমূহ ইউরিক

অ্যাসিডের ক্ষুদ্র বটিকা অথবা লেই রূপে ত্যাগ করে এবং এদের ইউরিওটেলিক প্রাণী বলা হয়।

সমীক্ষায় প্রাণীজগতে ভিন্ন ভিন্ন গঠন বিশিষ্ট রেচন অঙ্গের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বেশীরভাগ অমেরুদন্ডী প্রাণীর রেচন অঙ্গাগুলো সরল নালিকা সমন্বিত হয়, অন্যদিকে মেরুদন্ডী প্রাণীদের রেচন অঙ্গ জটিল নালিকা সমন্বিত হয়, একে বৃক্ক বলে। এখানে এমন কিছু গঠনের উল্লেখ করা হয়েছে। প্লাটিহেলমিনথিস (চ্যাপ্টাকৃমি, উদা : প্ল্যানেরিয়া), রটিফার, কিছু অঙ্গুরীমাল (অ্যানিলিডস্) পর্বভুক্ত প্রাণী এবং সেফালোকর্ডেট-অ্যাম্ফিঅক্সাস-এর রেচন অঙ্গ হল প্রোটোনেফ্রিডিয়া অথবা শিখা কোশ (ফ্লেম সেল)। প্রোটোনেফ্রিডিয়া প্রাথমিকভাবে আয়ন এবং দেহ তরলের আয়তন নিয়ন্ত্রণ করে, এবং এই ঘটনাটিকে **অসমোরেগুলেশন** (osmoregulation) বলে। কেঁচো এবং অন্যান্য অঙ্গুরীমাল পর্বভুক্ত প্রাণীদের রেচন অঙ্গ হল **নেফ্রিডিয়া** যা নলাকার গঠন বিশিষ্ট হয়। নেফ্রিডিয়া নাইট্রোজেনঘটিত রেচন পদার্থ অপসারনে সাহায্য করে এবং দেহতরল ও আয়নের ভারসাম্য বজায় রাখে। আরশোলা সহ বেশীর ভাগ পতঙ্গদের রেচন অঙ্গ হল **ম্যালপিজিয়ান টিউবিউল**। ম্যালপিজিয়ান টিউবিউল নাইট্রোজেনঘটিত রেচন পদার্থ অপসারনে এবং অসমোরেগুলেশানে (osmoregulation) সাহায্য করে। চিংড়ির মতো শ্রেণিভুক্ত প্রাণীরা অ্যান্টিনাল গ্রন্থি বা **সবুজগ্রন্থির** মাধ্যমে রেচনকার্য সম্পন্ন করে।

19.1. মানুষের রেচনতন্ত্র (Human Excretory System)

মানুষের রেচনতন্ত্রটি এক জোড়া বৃক্ক, একজোড়া গবিনী, একটি মূত্রাশয় ও একটি মূত্রনালী নিয়ে গঠিত (চিত্র 19.1 দেখো)। লালচে বাদামী ও অনেকটা শিম বীজ আকৃতি বিশিষ্ট বৃক্ক দুটি শেষ থোরাসিক কশেরুকা এবং তৃতীয় লাম্বার কশেরুকার মধ্যবর্তী স্থানে উদর গহ্বরের পৃষ্ঠদেশীয় অন্ত:প্রাকারের সন্নিকটে অবস্থান করে। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিটি বৃক্কের দৈর্ঘ্য 10 - 12 সেমি, প্রস্থ 5-7 সেমি, পুরুত্ব 2-3 সেমি সহ গড় ওজন প্রায় 120 - 170 গ্রাম হয়। বৃক্কের ভেতরের অবতল পৃষ্ঠের কেন্দ্র বরাবর একটি খাঁজ রয়েছে, একে হাইলাম বলে। হাইলামের মধ্য দিয়ে গবিনী, রক্তবাহ এবং স্নায়ুগুলো প্রবেশ করে। হাইলামের ভেতরের দিকে একটি প্রশস্থ ফানেল আকৃতির অঞ্চল রয়েছে। একে বৃক্কীয় পেলভিস বলে। রেনাল পেলভিসের সঙ্গে যুক্ত অভিক্ষেপগুলোকে ক্যালিক্স বলে। বৃক্কের বাইরের স্তরে দৃঢ় ক্যাপসুল রয়েছে। বৃক্কের ভিতরে দুটি অঞ্চল আছে, বহি:স্থ কর্টেক্স এবং অন্ত:স্থ মেডালা। মেডালা কিছু সংখ্যক শাঙ্কবাকার অংশে (মেডুলারী পিরামিড) বিভক্ত হয়ে কেলিসেস-এ (একবচন ক্যালিক্স) উন্মুক্ত হয়। কর্টেক্স মেডুলারী পিরামিডগুলোর মধ্যবর্তীস্থানে

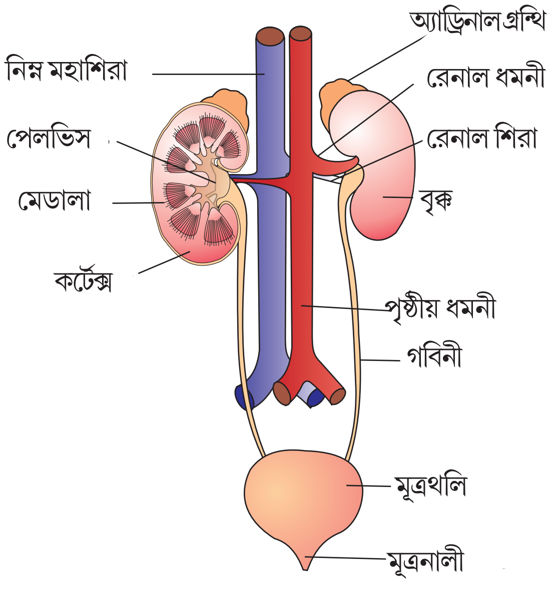

চিত্র 19.1. ঃ মানুষের রেচনতন্ত্র

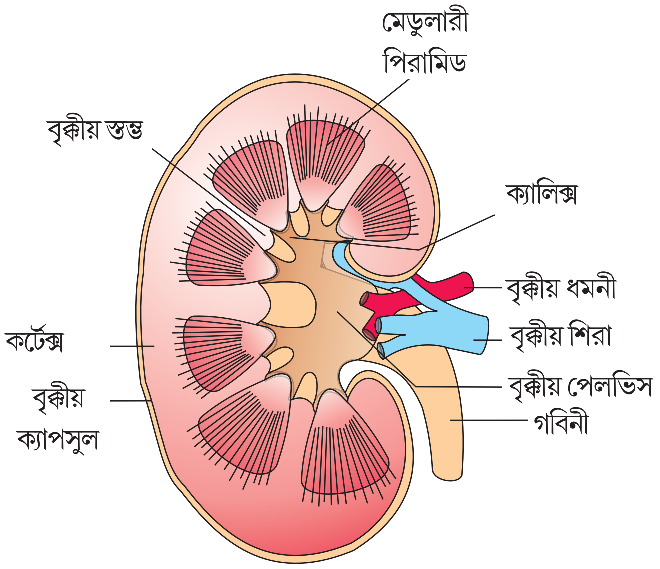

চিত্র 19.2. বৃক্কের লম্বচ্ছেদ (চিত্ররূপ)

বিস্তৃত হয়ে বৃক্কীয় স্তম্ভের আকারে অবস্থান করে, এদের **বারটিনির স্তম্ভ** (Columns of Bertini) (চিত্র 19.2দেখো) বলে।

প্রতিটি বৃক্কে প্রায় এক মিলিয়ন জটিল নালিকা সমন্বিত গঠন থাকে, এদের **নেফ্রন** বলা হয় (চিত্র 19.3 দেখো)। নেফ্রনগুলো হল বৃক্কের কার্যগত একক। প্রতিটি নেফ্রন দুটি অংশে বিভক্ত- গ্লোমেরুলাস এবং বৃক্কীয় নালিকা। বৃক্কীয় ধমনীর একটি সূক্ষ্ম শাখা অর্থাৎ অর্ন্তমুখী উপধমনী যে রক্তজালক কুন্ডলী গঠন করে তাকে গ্লোমেরুলাস বলে। গ্লোমেরুলাস থেকে রক্ত বহির্মুখী উপধমনীর মাধ্যমে বেরিয়ে যায়।

গ্লোমেরুলাসকে ঘিরে থাকা একটি দ্বিস্তরী কাপ সদৃশ গঠন রয়েছে একে **বাত্তমেনস ক্যাপসুল** বলে এবং বাত্তমেনস ক্যাপসুলের আবরন থেকেই বৃক্কীয় নালিকা শুরু হয়। বাত্তমেনস ক্যাপসুল সহ গ্লোমেরুলাসকে একত্রে ম্যালপিজিয়ান বডি অথবা

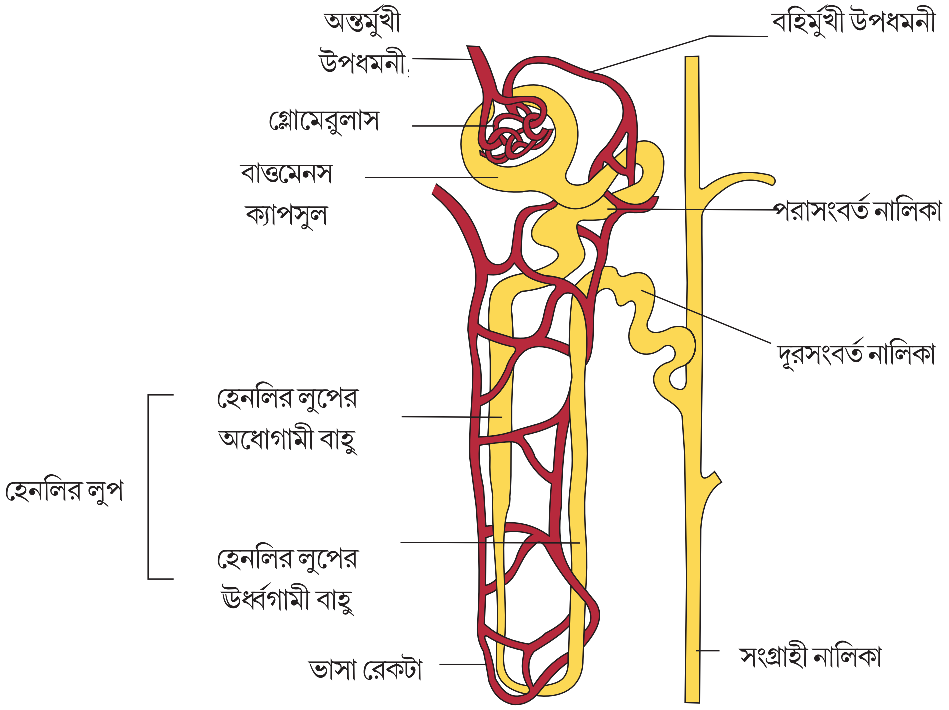

চিত্র 19.3. ঃ রক্তবাহ, নালী এবং নালিকাসহ একটি নেফ্রনের চিত্ররূপ উপস্থাপন :

বৃক্কীয় করপাসল (চিত্র 19.4 দেখো) বলে। বৃক্কীয় নালিকা কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আরও কুন্ডলীকৃত প্যাঁচানো **পরাসংবর্ত নালিকা** (PCT) গঠন করে। এই নালিকার পরবর্তী অংশটি চুলের কাঁটার আকৃতি বিশিষ্ট **হেনলির লুপ** গঠন করে যার একটি অধোগামী ও একটি উর্ধ্বগামী বাহু থাকে। হেনলির লুপের উর্ধ্বগামী বাহুটি কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আরো কুন্ডলীকৃত নালিকাকার অঞ্চল গঠন করে একে **দূরসংবর্ত নালিকা** (DCT) বলা হয়। বেশীরভাগ নেফ্রনে দূরসংবর্ত নালিকাগুলো একটি সোজা অকুন্ডলীত নালিকায় উন্মুক্ত হয়, একে সংগ্রাহী নালিকা বলে। সংগ্রাহী নালিকাগুলোর মধ্যে অনেকগুলো নালিকা একসঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্যালিক্সের মেডুলারী পিরামিডের মধ্য দিয়ে বৃক্কের পেলভিসে উন্মুক্ত হয়।

নেফ্রনের ম্যালপিজিয়ান কণিকা, পরাসংবর্ত নালিকা এবং দূরসংবর্ত নালিকা বৃক্কের কর্টেক্স অঞ্চলে অবস্থান করে, অপরপক্ষে হেনলির লুপ মেডালার গভীরে প্রবেশ করে।

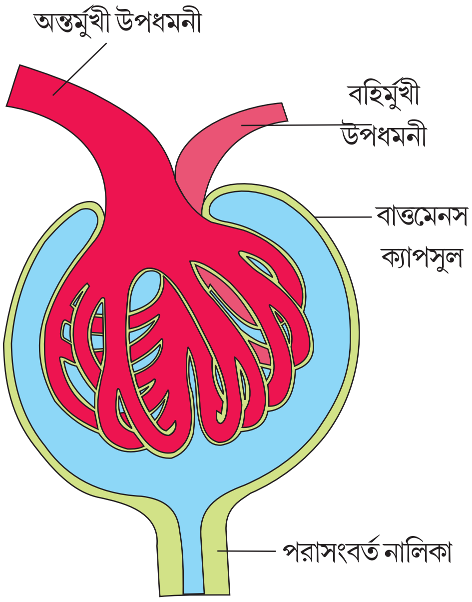

(চিত্র 19.4) ঃ ম্যালপিজিয়ান বডি (বৃক্কীয় কণিকা বা রেনাল করপাসল)

বেশীরভাগ নেফ্রনের ক্ষেত্রে হেনলির লুপ খুব ছোট হয় এবং তাদের সামান্য অংশ মেডালাতে অবস্থান করে। এ সমস্ত নেফ্রনসমূহকে কর্টিকেল নেফ্রন বলা হয়। কিছু কিছু নেফ্রনের ক্ষেত্রে, হেনলির লুপ খুব লম্বা হয় এবং মেডালার অনেক গভীরে প্রবেশ করে। এদের জাক্সটামেডুলারী নেফ্রন বলে।

বহির্মুখী উপধমনী গ্লোমেরুলাস থেকে বের হয়ে বৃক্কীয় নালিকার চারপাশে সূক্ষ্ম জালিকাকার গঠন তৈরি করে, এদের পেরিটিউবিউলার ক্যাপিলারী বলা হয়। এই জালিকাকার গঠন থেকে একটি ক্ষুদ্র রক্তবাহ হেনলির লুপের সাথে সমান্তরালে থেকে 'U' আকৃতির **ভাসা রেক্টা** (Vasa recta) গঠন করে। কর্টিকেল নেফ্রনগুলোতে ভাসা রেক্টা অনুপস্থিত থাকে অথবা খুবই সংক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে।

19.2 মূত্র উৎপাদন (Urine Formation)

মূত্র উৎপাদন তিনটি প্রধান প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে ঘটে। যথা:- গ্লোসেরুলাস দ্বারা পরিস্রাবণ, পুন:শোষণ এবং ক্ষরণ। এই প্রক্রিয়াগুলো নেফ্রনের বিভিন্ন অংশে ঘটে।

মূত্র উৎপাদনের প্রথম ধাপটি হল রক্তের পরিস্রাবণ, যা গ্লোমেরুলাস দ্বারা সংঘটিত হয় এবং একে **গ্লোমেরুলাসের পরিস্রাবণ** (Glomerular filtration) বলে। এক মিনিটে হৃদপিন্ডের প্রতিটি নিলয় থেকে উৎক্ষিপ্ত রক্তের প্রায় পাঁচ ভাগের এক অংশ অর্থাৎ গড়ে 1100-1200 ml রক্ত প্রতি মিনিটে বৃক্ক দুটির মাধ্যমে পরিস্রুত হয়। গ্লোসেরুলাসের রক্তজালকের রক্তচাপ, তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে রক্তের পরিস্রাবণ ঘটায়। এই স্তরগুলো হল — গ্লোমেরুলাসে রক্তবাহের এন্ডোথেলিয়াম স্তর, বাওমেনস ক্যাপসুলের এপিথেলিয়াম স্তর এবং এই দুই স্তরের মধ্যবর্তী ভিত্তিপর্দা বাওমেনস ক্যাপসুলের এপিথেলিয়াম কোশ সমূহকে **পোডোসাইট** বলে। এই পোডোসাইটগুলো জটিলভাবে বিন্যস্ত থাকার ফলে কিছু ফাঁকা স্থানের সৃষ্টি হয়, এদের স্লিটপোর (Slit Pore) বা পরিস্রাবণ ছিদ্র বলে। **রক্ত পরিস্রাবণ ঝিল্লির** মাধ্যমে এত সূক্ষ্মভাবে পরিস্রুত হয় যে প্রোটিন ছাড়া রক্তরসের

প্রায় সব উপাদানই বাওমেনস ক্যাপসুলের গহ্বরে প্রবেশ করে। এজন্য এই প্রক্রিয়াকে **পরা পরিস্রবণ** (Ultra filtration) বলে।

প্রতি মিনিটে বৃক্ক দ্বারা পরিস্রুত তরলের পরিমানকে **গ্লোমেরুলাসের পরিস্রাবণ হার** (GFR) বলে। একজন সুস্থ ব্যক্তির GFR প্রতি মিনিটে প্রায় 125 মিলিলিটার বা প্রতিদিনে 180 লিটার হয়।

বৃক্ক তার নিজস্ব পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে গ্লোমেরুলাসের পরিস্রাবণ হার নিয়ন্ত্রণ করে। এই ধরনের একটি কার্যকরী পদ্ধতি গ্লোমেরুলাস সন্নিহিত যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হয়। যে স্থানে দূরসংবর্ত নালিকাটি অন্তর্মুখী উপধমনীর সংস্পর্শে আসে সে স্থানে কোশগুলো পরিবর্তিত হয়ে একটি বিশেষ সংবেদনশীল অঞ্চল গঠন করে একে জাক্সটাগ্লোমেরুলার যন্ত্র বলে। GFR এর পরিমান হ্রাস পেলে জাক্সটাগ্লোমেরুলার কোশ সক্রিয় হয় ও রেনিন ক্ষরণ করে। এই **রেনিন** গ্লোমেরুলাসের রক্ত সরবরাহের পরিমান বৃদ্ধি করে ও GFR স্বাভাবিক মানে ফিরে আসে।

গ্লোমেরুলাসে যে পরিমান পরিস্রুত তরল প্রতিদিন তৈরি হয় (180 লিটার/ দিন) ও প্রতিদিন যে পরিমাণ মূত্র (1.5 লিটার) রেচিত হয় তাদের তুলনা করে বোঝা যায়, প্রায় 99 শতাংশ পরিস্রুত তরল বৃক্কীয় নালিকা দ্বারা **পুনঃশোষিত হয়**। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় পুনঃশোষণ। নেফ্রনের বিভিন্ন অংশের নালিকাকার এপিথেলিয়াম কোশ সমূহ সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় পদ্ধতিতে পুনঃশোষণ ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ, পরিস্রুত তরল থেকে গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, Na^+ ইত্যাদি বস্তুসমূহের সক্রিয় শোষণ ঘটে। অন্যদিকে নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য সমূহের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রি য় শোষণ সংঘটিত হয়। নেফ্রনের বৃক্কীয় নালিকার প্রথম অংশে জলের নিষ্ক্রিয় পুনঃশোষণ ঘটে (চিত্র 19.5)।

মূত্র উৎপাদনের সময়, বৃক্কীয় নালিকার কোশগুলো পরিস্রুত তরলে H^+, K^+ এবং অ্যামোনিয়ার মতো বস্তুসমূহ ক্ষরণ করে। দেহতরলের অম্ল ক্ষার ও আয়নের সমতা বজায় রাখার জন্য বৃক্কীয় নালিকার এই ক্ষরণ মূত্র উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

19.3 — বৃক্কীয় নালিকার কার্যাবলী (Function of the Tublues):

পরাসংবর্ত নালিকা (PCT) : পরাসংবর্ত নালিকার অন্ত:প্রাকার সরল ব্রাশ বর্ডারযুক্ত ঘনকাকার সরল আবরণী কলা দ্বারা আবৃত যা পুনঃশোষণের জন্য নালিকার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি করে। এই অংশে প্রায় সব অপরিহার্য পরিপোষক এবং শতকরা 70 - 80 ভাগ তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ ও জল পুনঃশোষিত হয়। পরাসংবর্ত নালিকা পরিস্রুত তরলে হাইড্রোজেন আয়ন, অ্যামোনিয়া এবং পটাশিয়াম আয়নের মতো কিছু নির্বাচিত বস্তু ক্ষরণের মাধ্যমে এবং এই তরল থেকে বাই কার্বোনেট আয়ন (HCO_3^-) শোষণের মাধ্যমে দেহ তরলের P^H এবং আয়নের সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

হেনলির লুপ (Henle's Loop) : হেনলির লুপের উর্দ্ধগামী বাহুতে খুব সামান্য পুনঃশোষণ ঘটে। যদিও এই অঞ্চলটি মেডালা মধ্যস্থ তরলের উচ্চ অভিস্রবণ চাপ বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হেনলির লুপের অধোগামী বাহু জলভেদ্য কিন্তু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের ক্ষেত্রে প্রায় অভেদ্য হয়। এরফলে অধোগামী বাহু দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় পরিস্রুত তরলের গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি পায়। উর্দ্ধগামী বাহু জল অভেদ্য কিন্তু এর মধ্য দিয়ে সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয় পদ্ধতিতে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থগুলোর পরিবহন ঘটে। তাই হেনলির লুপের উর্দ্ধগামী বাহুর মধ্য দিয়ে যখন গাঢ় পরিস্রুত তরল পরিবাহিত হয়, তখন সেখান থেকে তড়িৎ বিশ্লেষ্যগুলো মেডালাস্থিত তরলে বেরিয়ে যায়, ফলে পরিস্রুত তরলের তরলীকরণ ঘটে অর্থাৎ এর গাঢ়ত্ব হ্রাস পায়।

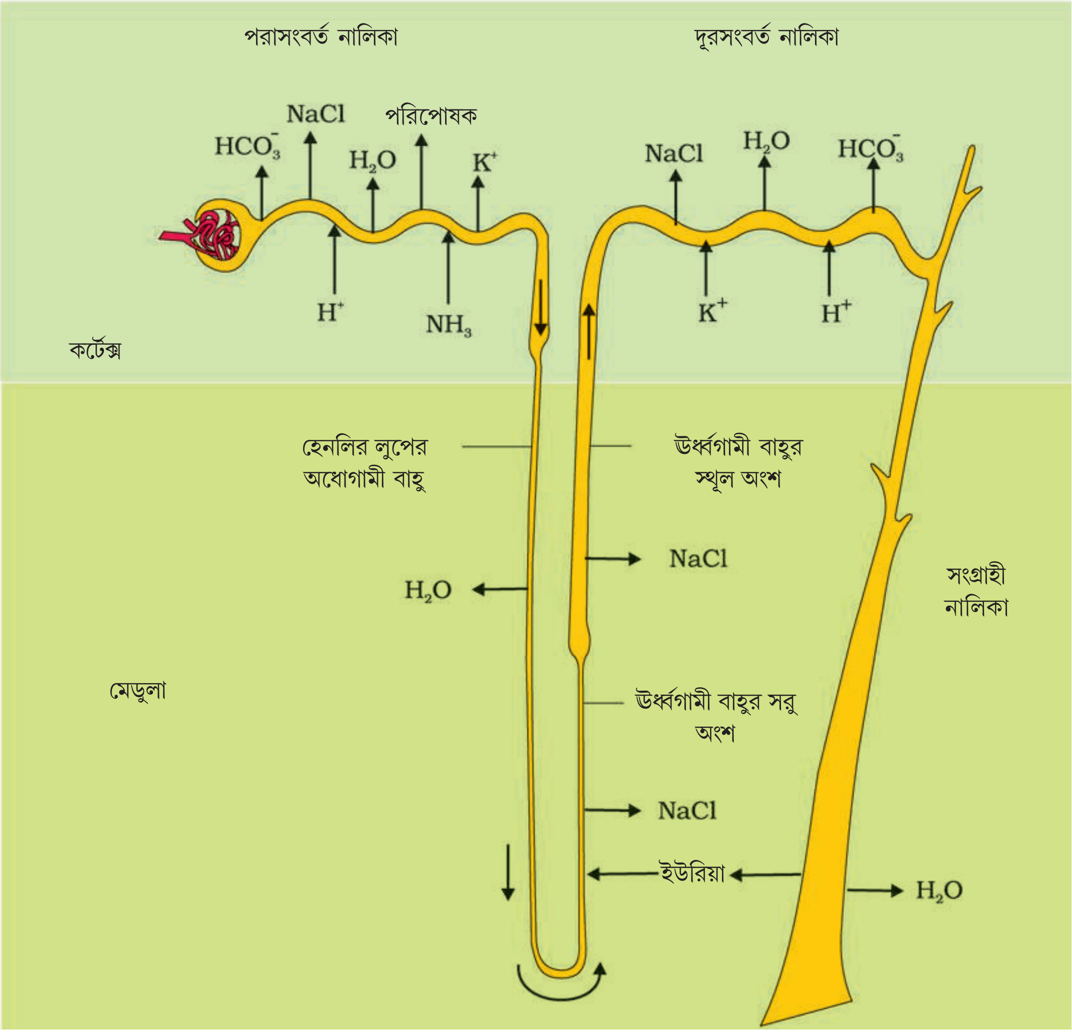

চিত্র **19.5** নেফ্রনের বিভিন্ন অংশে প্রধান বস্তুসমূহের পুনঃশোষণ এবং ক্ষরণ (তীর চিহ্নের সাহায্যে পদার্থসমূহের বিচলন/ গতিবিধির দিক নির্দেশ করা হয়েছে।)

দূরসংবর্ত নালিকা (DCT) : বৃক্কীয় নালিকার এই অংশে Na^+ এবং জলের শর্তসাপেক্ষ পুনঃশোষণ ঘটে। দূরসংবর্ত নালিকা বাই কার্বনেট আয়নও (HCO_3^-) পুনঃশোষণ করে। রক্তের P^H এবং সোডিয়াম পটাশিয়ামের ভারসাম্য বজায় রাখতে এই অংশে হাইড্রোজেন ও পটাশিয়াম আয়ন এবং অ্যামোনিয়া ক্ষরিত হয়।

সংগ্রাহী নালিকা (Collecting Duct) : এই লম্বা নালিকাটি বৃক্কের কর্টেক্স থেকে মেডালার ভিতরের অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে জল পুনঃশোষিত হওয়ার ফলে এখানে গাঢ় মূত্র উৎপন্ন হয়। মেডালা অংশে অভিস্রবণ ঘনত্ব বজায় রাখার জন্য সংগ্রাহী নালিকা থেকে কিছু পরিমাণ ইউরিয়া বেরিয়ে মেডালার অন্তরবর্তী স্থানে আসে। এই অংশ রক্তের P^H এবং আয়নের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কিছু নির্বাচিত পদার্থ যেমন H^+ এবং K^+ আয়নের ক্ষরণ ঘটায় (চিত্র 19.5)।

19.4 পরিস্রুত তরলের গাঢ়করণ প্রক্রিয়া : (Machanism of Concentration of the filtrate)

স্তন্যপায়ী প্রাণীরা গাঢ় মূত্র উৎপাদনে সক্ষম। এই প্রক্রিয়ায় হেনলির লুপ এবং ভাসা রেক্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হেনলির লুপের দুই বাহুতে পরিস্রুত তরল বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় এবং এজন্য প্রতি প্রবাহ

(Counter Current) সৃষ্টি হয়। ভাসা রেক্টার দুই বাহুর মধ্য দিয়ে রক্তপ্রবাহও প্রতিপ্রবাহ পদ্ধতিতে হয়। হেনলির লুপ ও ভাসা রেক্টার পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থান এবং তাদের মধ্যে সৃষ্ট প্রতিপ্রবাহ মেডালার ভেতরের দিকের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অভিস্রবণ চাপ বজায় রাখতে সাহায্য করে। যেমন : কর্টেক্সে (300m $OsmolL^{-1}$, থেকে শুরু করে মেডালার অন্ত:স্তরে প্রায় 1200 m $OsmolL^{-1}$ এই নতিমাত্রা প্রধানত সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) ও ইউরিয়ার কারণে ঘটে। হেনলির লুপের উর্দ্ধগামী বাহুর মধ্য দিয়ে NaCl পরিবাহিত হয়ে ভাসা রেক্টার নিম্নগামীবাহুর সঙ্গে বিনিময় ঘটে। এই NaCl আবার ভাসা রেক্টার উর্দ্ধগামী বাহুর মাধ্যমে ইন্টারস্টিসিয়ামে ফিরে আসে। একইভাবে সামান্য পরিমাণ ইউরিয়া হেনলির লুপের উর্দ্ধগামী বাহুর পাতলা অংশে প্রবেশ করে এবং পরে সংগ্রাহী নালিকার মধ্য দিয়ে ইন্টারস্টিসিয়ামে ফিরে আসে। হেনলির লুপ ও ভাসা রেক্টার বিশেষ সজ্জাক্রমের জন্য উপরে বর্ণিত বস্তুগুলো সহজে পরিবাহিত হতে পারে। একে বলা হয় প্রতি প্রবাহী প্রক্রিয়া

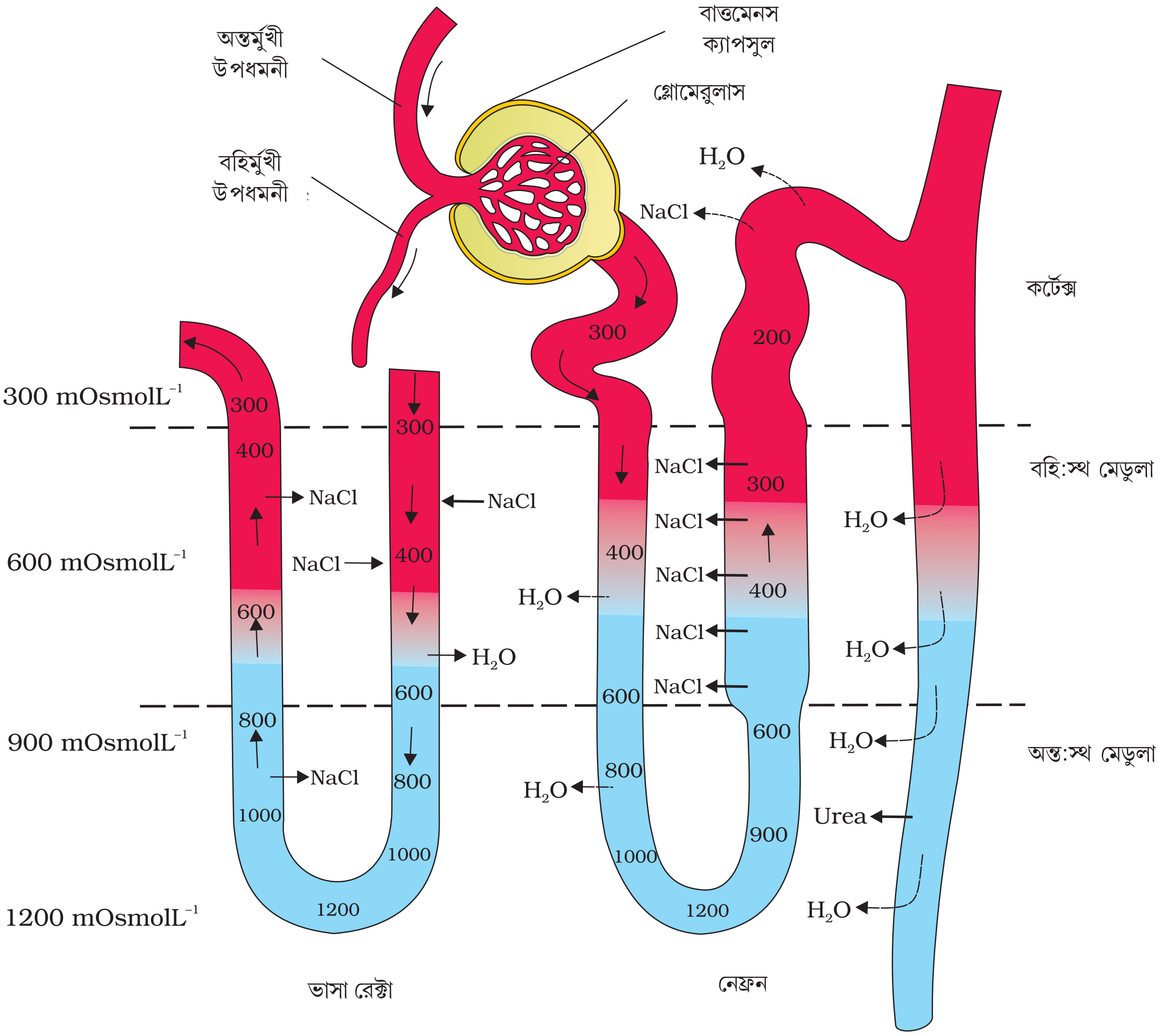

চিত্র 19.6 নেফ্রন ও ভাসা রেক্টার মধ্য দিয়ে প্রতি প্রবাহী প্রক্রিয়া চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল।

(Counter Current Mechanism) (চিত্র 19.6 দেখো)। এই প্রক্রিয়া মেডুলার ইন্টারস্টিসিয়াম অঞ্চলে ঘনত্বের নতিমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। মেডুলারী ইন্টারস্টিসিয়ামে এই ধরনের নতিমাত্রার উপস্থিতি সংগ্রাহী নালিকা থেকে সহজেই জলের পুনঃশোষণে সাহায্য করে এবং সেইসাথে পরিস্রুত তরল (মূত্র) এর গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি পায়। মূত্র উৎপাদন প্রক্রিয়ার শুরুতে যে পরিস্রুত তরল উৎপন্ন হয়, তার তুলনায় প্রায় 4 গুণ ঘন মূত্র মানুষের বৃক্ক দুটি তৈরি করতে পারে।

19.5 বৃক্কের কাজ নিয়ন্ত্রণ : (Regulation of kidney function)

হাইপোথ্যালামাস, জাক্সটাগ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস (JGA) এবং কিছুক্ষেত্রে হৃদপিন্ডের প্রভাবে হরমোনের ফীড ব্যাক পদ্ধতি দ্বারা বৃক্কের কার্যাবলী সুদক্ষভাবে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়।

রক্তের পরিমাণ, দেহতরলের পরিমাণ ও আয়নের ঘনত্বের পরিবর্তন দ্বারা আমাদের দেহের অভিস্রবণ গ্রাহকগুলো (Osmo receptors) সক্রিয় হয়। দেহ থেকে অতিরিক্ত তরল বেরিয়ে গেলে এই গ্রাহকগুলো সক্রিয় হতে পারে এবং এরা হাইপোথ্যালামাসকে উদ্দীপিত করে, ফলে নিউরোহাইপোফাইসিস থেকে অ্যান্টিডাই ইউরেটিক হরমোন (ADH) বা ভেসোপ্রেসিন ক্ষরিত হয়। ADH বৃক্ক নালিকার শেষ অংশগুলো থেকে জলের পুনঃশোষণে সহায়তা করে ও ডাইইউরেসিস অর্থাৎ দেহ থেকে অত্যধিক জলের অপসারণ রোধ করে। দেহ তরলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে এই অভিস্রবণ গ্রাহকগুলো নিষ্ক্রিয় হতে পারে (Switch off) এবং ADH এর ক্ষরণ মন্দীভূত হয় এবং এইভাবে হরমোনের ফীড ব্যাক সম্পূর্ণ হয়। ADH রক্তবাহের সংকোচন ঘটিয়ে বৃক্কের কাজকেও প্রভাবিত করতে পারে। এরফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলে গ্লোমেরুলাসে রক্তপ্রবাহও বৃদ্ধি পায় এবং এরফলে গ্লোমেরুলাসের পরিস্রাবণের হার (GFR) ও বৃদ্ধি পায়।

জাক্সটাগ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস (JGA) একটি জটিল নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। গ্লোমেরুলাসে রক্তপ্রবাহ/ গ্লোমেরুলাসে রক্তচাপ/ গ্লোমেরুলাসের পরিস্রাবণ হার (GFR) হ্রাস পেলে JG (Juxta Glomerular cell) কোশসমূহ সক্রিয় হয়ে রেনিন ক্ষরণ করে। এই **রেনিন** (renin) রক্তের অ্যাঞ্জিওটেনসিনকে অ্যাঞ্জিওটেনসিন I এবং পরে অ্যাঞ্জিওটেনসিন II তে পরিণত করে। অ্যাঞ্জিওটেনসিন II একটি শক্তিশালী রক্তবাহ সংকোচক হিসাবে কাজ করায় গ্লোমেরুলাসের রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং সেইসঙ্গে GFR ও বৃদ্ধি পায়। অ্যাঞ্জিওটেনসিন II অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সও উদ্দীপিত করে এবং এর ফলে সেখান থেকে অ্যালডোস্টেরন হরমোনের ক্ষরণ ঘটে। অ্যালডোস্টেরন হরমোনের প্রভাবে দূরসংবর্ত নালিকায় Na^+ এবং জলের পুনঃশোষণ ঘটে। এর ফলে রক্তচাপ এবং GFRও বৃদ্ধি পায়। এই জটিল পদ্ধতিকে সাধারণত: **রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন** পদ্ধতি বলে।

হৃৎপিন্ডের অলিন্দে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পেলে হৃৎপিন্ড **এট্রিয়াল ন্যাট্রিইউরেটিক ফ্যাক্টর** (ANF) ক্ষরন করতে পারে। ANF রক্তবাহের প্রসারণ (Vasodilation) ঘটায় এবং এর ফলে রক্তচাপ হ্রাস পায় ANF পদ্ধতি এইভাবে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন এর কার্যপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

19.6 মূত্র ত্যাগ পদ্ধতি (Micturition)

নেফ্রনের বিভিন্ন অংশের ক্রিয়ায় উৎপন্ন মূত্র পরিশেষে মূত্রথলিতে এসে জমা হয় এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রভাবে একটি ঐচ্ছিক উদ্দীপনা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত মূত্র মূত্রথলিতে জমা থাকে। যে মুহূর্তে মূত্রথলি সম্পূর্ণভাবে মূত্র পূর্ণ হয়, তখনই মূত্রথলির প্রসারণ ঘটে এবং এর ফলেই এই উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে মূত্রথলির প্রাচীরস্থিত টানগ্রাহকগুলো এই উদ্দীপনাটিকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরণ করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে প্রেরিত আজ্ঞাবহ বার্তা মূত্রথলির মসৃণ পেশির সংকোচনের সূচনা করে এবং একই সাথে মূত্রনালীর স্ফিংটার পেশির শিথিলায়ণ ঘটায় এবং এর ফলেই মূত্রথলি থেকে মূত্রের নির্গমণ ঘটে। মূত্রনির্গমনের এই পদ্ধতিকে **মূত্রত্যাগ পদ্ধতি** বলে এবং যে স্নায়বিক পদ্ধতি মূত্র নির্গমণকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে **মূত্রত্যাগ প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (Micturition Reflex) বলে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ দৈনিক 1–1.5 লিটার মূত্র ত্যাগ করে। মূত্র সাধারণ হালকা হলুদ বর্ণের জলীয় তরল, যা সামান্য আম্লিক (P^H 6.0) এবং বিশেষ গন্ধযুক্ত। প্রতিদিন গড়ে প্রায় 25 – 30 গ্রাম ইউরিয়া দেহ থেকে রেচিত হয়। বিভিন্ন অবস্থা মূত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করতে পারে। বহু বিপাকীয় ত্রুটি এবং এর পাশাপাশি বিপাকজনিত ত্রুটি এবং বৃক্কের ত্রুটিপূর্ণ কার্যাবলী জনিত রোগসমূহ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মূত্র বিশ্লেষণ সাহায্য করে। **উদাহরণ স্বরূপ :** মূত্রে গ্লুকোজের উপস্থিতি (গ্লাইকোসুরিয়া) এবং কিটোন বডির উপস্থিতি (কিটোনুরিয়া) মধুমেহ (Diabetes mellitus) রোগের সূচক হিসাবে কাজ করে।

19.7 রেচনে অন্যান্য অঙ্গের ভূমিকা : (Role of other organs in excretion) :

বৃক্ক ছাড়া ফুসফুস, যকৃৎ এবং ত্বকও রেচন পদার্থের অপসারণে সাহায্য করে।

প্রতিদিন আমাদের ফুসফুসগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইডের (CO_2) (গড়ে প্রায় 80 liters/day) এবং যথেষ্ট পরিমাণ জলের দেহ থেকে অপসারণ ঘটায়। আমাদের দেহে সবচেয়ে বড় **গ্রন্থি হল যকৃৎ** (Liver) এটি পিত্তরস সমন্বিত বস্তু যেমন বিলিরুবিন, বিলিভারডিন, কোলেস্টরল, স্টেরয়েড হরমোনের ভগ্নাংশ, ভিটামিন এবং ড্রাগ ক্ষরণ করে। পরিশেষে এই পদার্থগুলোর বেশিরভাগই পাচন বর্জ্যের সাথে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।

ত্বকের **ঘর্মগ্রন্থি** এবং **তৈলগ্রন্থি** তাদের ক্ষরণের মাধ্যমে দেহ থেকে কিছু পদার্থের অপসারণ ঘটাতে পারে। ঘর্মগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন ঘর্ম সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl), সামান্য পরিমাণ ইউরিয়া, ল্যাকটিক অ্যাসিড ইত্যাদি সমন্বিত জলীয় তরল। দেহতলকে শীতল রাখা ঘর্মের মুখ্য কাজ হলেও এটি উপরোক্ত বর্জ্য পদার্থগুলোর মধ্যে কিছু বর্জ্য পদার্থের অপসারণেও সাহায্য করে। তৈলগ্রন্থি স্টেরল, হাইড্রোকার্বন এবং মোমের মতো কিছু পদার্থের অপসারণ ঘটায়। এই ক্ষরণ ত্বকের উপর একটি সুরক্ষা প্রদাণকারী তৈলাক্ত আবরণ গঠন করে। তোমরা জান কি লালারসের মাধ্যমেও কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য অপসারিত হয়?

19.8 রেচনতন্ত্রের গোলযোগ : (Disorders of the excretory System)

বৃক্কের কার্যগত ত্রুটির কারণে, রক্তে ইউরিয়া জমতে পারে, এই অবস্থাকে **ইউরেমিয়া** বলে, যা অত্যন্ত ক্ষতিকারক এবং এর ফলে বৃক্কের কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে (kidney failure)। এই সব রোগীর ক্ষেত্রে, **হিমোডায়ালাইসিস** প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইউরিয়া অপসারণ করা যেতে পারে। দেহের একটি সুবিধাজনক ধমনী থেকে রক্তকে বের করে নিয়ে এসে তাতে হেপারিন নামক তঞ্চন নিরোধক যোগ করার পর রক্তকে ডায়ালাইজিং ইউনিটে চালনা করা হয়। এই ইউনিটটিতে একটি প্যাঁচানো সেলোফেন নালিকাকে ঘিরে ডায়ালাইসিসে সাহায্যকারী (dialysing fluid) একটি তরল থাকে। নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য ব্যাতিরেকে এই তরলের উপাদানগুলো রক্তরসের উপাদানের মতোই হয়। ঘনত্বের নতিমাত্রার উপর ভিত্তি করে এই নালিকার ছিদ্রযুক্ত সেলোফেন পর্দা বিভিন্ন অণুর চলাচলে সাহায্য করে। ডায়ালাইসিসে সাহায্যকারী তরলে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য না থাকায়, এই বস্তুগুলো

সহজে বেরিয়ে আসে, এবং এইভাবে রক্ত পরিস্রুত হয়। এই পরিস্রুত রক্তের সাথে অ্যান্টি হেপারিন মিশিয়ে একটি শিরার মাধ্যমে দেহে পাঠানো হয়। সমস্ত বিশ্বের হাজার হাজার **ইউরিমিক রোগী** অর্থাৎ কিডনীর সমস্যায় ভুগছে, এমন রোগীদের জন্য এই পদ্ধতি আশীর্বাদ স্বরূপ।

তীব্র **রেনাল ফেলিওর** (Kidney failure) জনিত সমস্যা সমাধান বৃক্ক প্রতিস্থাপন করাই হল সর্বশেষ পথ। বৃক্ক প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে একজন দাতার, বিশেষত গ্রহীতার কোন নিকট আত্মীয়ের দান করা একটি কর্মক্ষম বৃক্ক ব্যবহৃত হয় যাতে গ্রহীতার অনাক্রম্যতন্ত্র কর্তৃক ঐ প্রতিস্থাপিত বৃক্কের বর্জনের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। আধুনিক উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতির কারণে এই ধরনের জটিল প্রক্রিয়ার সাফল্যের হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৃক্ক পাথর (Renal Calculi) : বৃক্কে উৎপন্ন পাথর অথবা জলে অদ্রবণীয় কেলাসাকার লবন (অক্সালেট ইত্যাদি)।

গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস (Glomerulonephritis) : বৃক্কের গ্লোমেরুলাসের প্রদাহ জনিত রোগ।

সার সংক্ষেপ
(Summary)

দেহে সঞ্চিত নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ, আয়ন, কার্বন ডাই অক্সাইড, জল ইত্যাদি অপসারণ করা প্রয়োজন। নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থের প্রকৃতিও তাদের রেচন পদ্ধতি বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক হয়। এটি তাদের বাসস্থানের ও জলের সহজলভ্যতার উপর নির্ভর করে। অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া এবং ইউরিক অ্যাসিড হচ্ছে প্রধান নাইট্রোজেনঘটিত রেচন পদার্থ।

প্রাণীদের প্রধান রেচন অঙ্গগুলো হল — প্রোটোনেফ্রিডিয়া, নেফ্রিডিয়া, ম্যালপিজিয়ান নালিকা, সবুজ গ্রন্থি এবং বৃক্ক। এই সমস্ত রেচন অঙ্গগুলো নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ অপসারণ ছাড়াও, দেহ তরলের আয়ন ও অম্ল ক্ষারের ভারসাম্য বজায় রাখে।

মানুষের রেচনতন্ত্রটি একজোড়া বৃক্ক, একজোড়া গবিনী, একটি মূত্রথলি এবং একটি মূত্রনালি নিয়ে গঠিত। প্রতিটি বৃক্কে প্রায় এক মিলিয়ন নালিকা সমন্বিত গঠন থাকে, এদের নেফ্রন বলা হয়। বৃক্কের কার্যগত একককে নেফ্রন বলে এবং এর দুটি অংশ থাকে-গ্লোমেরুলাস ও বৃক্কীয় নালিকা। বৃক্কীয় ধমনীর সূক্ষ্ম শাখা থেকে উৎপন্ন অন্তর্মুখী উপধমনী একটি রক্তজালক সংগঠন তৈরি করে। তাকে গ্লোমেরুলাস বলে। বৃক্কীয় নালিকাটি দ্বিস্তরীয় বাওমেনস ক্যাপসুল দিয়ে শুরু হয়ে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়। যথা — পরাসংবর্ত নালিকা, হেনলির লুপ এবং দূরসংবর্ত নালিকা। অনেক নেফ্রনের ক্ষেত্রে দূরসংবর্ত নালিকাগুলো সংগ্রাহী নালিকাতে যুক্ত হয় এবং পরবর্তী সময় এটি মেডুলারী পিরামিডের মাধ্যমে রেনাল পেলভিসে মুক্ত হয়। বাওমেনস ক্যাপসুল গ্লোমেরুলাসকে পরিবেষ্টন করে ম্যালপিজিয়ান কণিকা অথবা রেনাল করপাসল গঠন করে।

মূত্র উৎপাদন তিনটি প্রধান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয় — **পরিস্রাবন, পুনঃশোষন** এবং **ক্ষরণ**। পরিস্রাবণ একটি অনির্বাচনী প্রক্রিয়া (non selective), যা গ্লোমেরুলাসের রক্ত জালকের রক্তচাপের সহায়তায় সম্পন্ন হয়। গ্লোমেরুলাসে প্রতি মিনিটে প্রায় 1200ml রক্ত পরিস্রুত হয় এবং প্রতি মিনিটে বাওমেনস ক্যাপসুলে 125 ml পরিস্রুত তরল জমা করে (GFR)।

গ্লোমেরুলাসের পরিস্রাবন হার নিয়ন্ত্রণে নেফ্রনের একটি বিশেষ অংশ জাক্সটাগ্লোমেরুলাস অ্যাপারেটাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নেফ্রনের বিভিন্ন অংশে প্রায় শতকরা 99 ভাগ পরিস্রুত তরলের পুনঃশোষণ ঘটে। পরাসংবর্ত নালিকায় সবচেয়ে বেশি পুনঃশোষণ এবং কিছু নির্দিষ্ট পদার্থের ক্ষরণ ঘটে। হেনলির লুপ প্রধানত বৃক্কের মেডালার অন্তর্বর্তী স্থানে অভিস্রবণ চাপের নতিমাত্রা (300m $OsmolL^{-1}$ – 1200m$OsmolL^{-1}$) বজায় রাখতে সাহায্য করে। দূরসংবর্তনালিকা ও সংগ্রাহী নালিকা জল এবং কিছু তড়িৎ বিশ্লেষ্যের পুনঃশোষণ ঘটায় এবং অভিস্রবণ চাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। বৃক্কীয় নালিকা পরিস্রুত তরলে H^+, K^+, এবং অ্যামোনিয়া ক্ষরণ করেঃ দেহতরলের P^H এবং আয়নের ভারসাম্য বজায় রাখে।

হেনলির লুপের দুটি বাহু ও ভাসা রেক্টার (হেনলির লুপের সমান্তরালে রক্তজালক) মধ্যে প্রতি প্রবাহী প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয়। হেনলির লুপের অধোগামী বাহু দিয়ে পরিস্রুত তরল প্রবাহিত হবার সময় তরলের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় ও ঊর্ধ্বগামী বাহু দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় এর ঘনত্ব হ্রাস পায়। এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বৃক্কের মেডালার অন্তর্বর্তী স্থানে তড়িৎ বিশ্লেষ্য এবং ইউরিয়া সঞ্চিত থাকে। দূরসংবর্তনালিকা ও সংগ্রাহী নালিকা পরিস্রুত তরলের ঘনত্বকে প্রায় 4 গুণ বৃদ্ধি করে (300m $OsmolL^{-1}$ থেকে 1200m $OsmolL^{-1}$)। এটি দেহে জল সংরক্ষণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে ঐচ্ছিক স্নায়বিক উদ্দীপনা না আসা পর্যন্ত মূত্র মূত্রথলিতে সঞ্চিত থাকে। এই স্নায়বিক উদ্দীপনার জন্য মূত্রনালীর মধ্য দিয়ে মূত্র নি:সরণ হয়। এই প্রক্রিয়াকে মূত্রত্যাগ বলা হয়। ত্বক, ফুসফুস এবং যকৎ ও রেচনে সাহায্য করে।

অনুশীলনী

1. গ্লোমেরুলাসের পরিস্রাবণ হারের (GFR) সংজ্ঞা দাও।
2. গ্লোমেরুলাসের পরিস্রাবণ হারের স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি ব্যাখ্যা কর।
3. নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলোর মধ্যে কোনটি সত্য এবং কোনটি মিথ্যা লিখ :

   (a) মূত্রত্যাগ একটি প্রতিবর্তের মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

   (b) ADH জল অপসারণে সাহায্য করে মূত্রকে লঘুসারক করে।

   (c) রক্তের প্লাজমা থেকে প্রোটিনমুক্ত তরল পরিস্রাবিত হয়ে বাওমেনস ক্যাপসুলে জমা হয়।

   (d) মূত্রের গাঢ়করণ প্রক্রিয়ায় হেনলির লুপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

   (e) পরাসংবর্ত নালিকায় গ্লুকোজের সক্রিয় পুন:শোষণ ঘটে।
4. প্রতি প্রবাহী প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
5. রেচন ক্রিয়ায় যকৃৎ, ফুসফুস এবং ত্বকের ভূমিকা আলোচনা কর।
6. মূত্র ত্যাগ পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর।
7. স্তম্ভ I এর সাথে স্তম্ভ II মেলাও ঃ

স্তম্ভ I		**স্তম্ভ II**
a)	অ্যামোনোটেলিজম	i) পাখী
b)	বাওমেনস ক্যাপসুল	ii) জলের পুন:শোষণ
c)	মূত্রত্যাগ পদ্ধতি	iii) অস্থিযুক্ত মাছ
d)	ইউরিওটেলিজম	iv) মূত্রথলি
e)	ADH	v) বৃক্কীয় নালিকা

8. অসমোরেগুলেশান বা অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বোঝ?

9. স্থলজ প্রাণীরা সাধারণত ইউরিওটেলিক অথবা ইউরিকোটেলিক, কিন্তু অ্যামোনোটেলিক নয়, কেন?

10. বৃক্কের কার্য নিয়ন্ত্রণে জাক্সটাগ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাসের গুরুত্ব কি?

11. নিম্নলিখিতগুলোর নাম লিখ:

a) একটি কর্ডেট প্রাণী যার রেচন অঙ্গ ফ্লেমকোশ।

b) মানুষের বৃক্কের কর্টেক্সের অংশ যা মেডুলারি পিরামিডের ভিতরে প্রবিষ্ট থাকে।

c) হেনলির লুপের সমান্তরালে উপস্থিত রক্তজালক কুন্ডলী।

12. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) হেনলীর লুপের ঊর্ধ্বগামী বাহু জল ——— কিন্তু এর অধোগামী বাহুটি জল ———।

(খ) বৃক্কীয় নালিকার দূরবর্তী অংশে জলের পুন:শোষণ ——— হরমোনটির প্রভাবে ঘটে।

(গ) ডায়ালাইসিসে সাহায্যকারী তরলের ——— উপাদানটি ছাড়া বাকী সব উপাদানই রক্তরসের উপাদানের মতো হয়।

(ঘ) একজন সুস্থ প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি প্রতিদিন গড়ে প্রায় ——— গ্রাম ইউরিয়া রেচন করে।

অধ্যায় ২০ (Chapter 20)
চলন ও গমন
(Locomotion and Movement)

20.1 চলনের প্রকার
20.2 পেশি
20.3 কঙ্কালতন্ত্র
20.4 অস্থিসন্ধি
20.5 পেশি ও কঙ্কালতন্ত্রের গোলযোগসমূহ

চলন হল জীবের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে বিস্তৃত পরিসরে বিভিন্ন ধরনের চলন দেখা যায়। অ্যামিবার মতো এককোশী জীবের প্রোটোপ্লাজমের প্রবাহ (streaming of protoplasm) একটি সরল চলনের ধরন। বহু প্রাণীতে সিলিয়া, ফ্ল্যাজেলা এবং টেন্টাকল এর চলন লক্ষ করা যায়। মানুষ তার দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ, চোয়াল, চোখের পাতা, জিহ্বা ইত্যাদি নাড়াচাড়া করতে পারে। কিছু কিছু চলনের ফলে অবস্থান অথবা স্থান পরিবর্তন ঘটে। এই ধরনের ঐচ্ছিক চলনকে **গমন** বলে। হাঁটা, দৌড়ানো, আরোহণ, ওড়া, সাঁতার কাটা হল কিছু গমন সহায়ক চলনের উদাহরণ। অন্য ধরনের চলনগুলোকে প্রভাবিত করে এমন সমস্ত গঠনগুলোর গমন সহায়ক গঠনগুলোর থেকে আলাদা হওয়ার প্রয়োজন হয় না। উদাহরণস্বরূপ প্যারামেসিয়ামের ক্ষেত্রে সিলিয়া সাইটোফ্যারিংক্সের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুর চলনে সাহায্য করে এবং একইভাবে গমনেও অংশগ্রহণ করে। হাইড্রা তাদের টেন্টাকল বা কর্ষিকাগুলোকে শিকার ধরার কাজে ও গমনের জন্য ব্যবহার করতে পারে। আমরা আমাদের প্রত্যঙ্গগুলোকে দেহভঙ্গির পরিবর্তন এবং পাশাপাশি গমনের কাজেও ব্যবহার করতে পারি। উপরের পর্যবেক্ষণ থেকে এই ধারণা লাভ করা যায় যে, চলন ও গমন পৃথকভাবে অধ্যয়ন সম্ভব নয়। যে বক্তব্যের মাধ্যমে চলন ও গমনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় তা হল 'সব গমনই চলন কিন্তু সব চলনই গমন নয়'।

প্রাণীর গমন পদ্ধতি তাদের বাসস্থান এবং অবস্থার সাপেক্ষে ভিন্ন ভিন্ন হয়। যা হোক জীবের গমন সাধারণত খাদ্য, আশ্রয়, সঙ্গী, উপযুক্ত প্রজনন ক্ষেত্র ও অনুকূল জলবায়ু সন্ধানের জন্য বা শত্রু/শিকারি জীবের হাত থেকে পালানোর জন্য ঘটে।

20.1 চলনের প্রকার (Types of Movement)

মানবদেহের কোশগুলোতে প্রধানত তিন প্রকারের চলন দেখা যায়, যথা- অ্যামিবয়েড চলন, সিলিয়ারি চলন এবং পেশিজ চলন।

আমাদের দেহে রক্তস্থিত ম্যাক্রোফাজ এবং লিউকোসাইটের মতো কিছু বিশেষিত কোশে অ্যামিবয়েড চলন দেখা যায়। প্রোটোপ্লাজমের প্রবাহ দ্বারা সৃষ্ট ক্ষণপদের সাহায্যে এই ধরনের চলন প্রভাবিত হয় (অ্যামিবায়ও এই ধরনের চলন দেখা যায়)। অনুতন্তুর মতো সাইটোস্কেলিটনের উপাদানগুলোও অ্যামিবয়েড চলনে অংশগ্রহণ করে।

সিলিয়াযুক্ত আবরণী কলা দ্বারা আবৃত আমাদের দেহের বেশির ভাগ অভ্যন্তরীণ নলাকার অঙ্গ সমূহে সিলিয়ারি চলন দেখা যায়। শ্বাসনালীতে সিলিয়ার সমন্বায়িত চলন প্রশ্বাসের সময় বায়ুমণ্ডলের বায়ুর সাথে গৃহীত ধূলিকণা এবং কিছু বিজাতীয় বস্তুর অপসারণে সাহায্য করে। স্ত্রীজনন নালিটির মধ্য দিয়ে ডিম্বাণুর চলনও সিলিয়ারী চলনের মাধ্যমে সহজেই ঘটে।

আমাদের প্রত্যঙ্গগুলো, চোয়াল, জিহ্বা ইত্যাদির চলনের জন্য পেশিজ চলনের প্রয়োজন হয়। মানুষ এবং বেশির ভাগ বহুকোশী জীবগুলোতে গমন এবং অন্যান্য চলনের জন্য পেশির সংকোচন ধর্মটি কার্যকরীভাবে ব্যবহৃত হয়। গমনের জন্য পেশিতন্ত্র, কঙ্কালতন্ত্র এবং স্নায়ুতন্ত্রের একটি সঠিক কার্যকরী সমন্বায়িত ক্রিয়ার প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে তোমরা পেশির প্রকারভেদ, তাদের গঠন, তাদের সংকোচন পদ্ধতি এবং কঙ্কালতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সম্পর্কে জানবে।

20.2 পেশি (Muscle)

তোমরা অষ্টম অধ্যায়ে পড়েছ যে, সিলিয়া এবং ফ্লাজেলা কোশপর্দারই প্রবর্ধিত অংশ। স্পার্মাটোজোয়ার সন্তরণে, স্পঞ্জের নালিকাতন্ত্রের জলপ্রবাহ বজায় রাখতে এবং ইউগ্লিনার মতো আদ্যপ্রাণীদের গমনে ফ্ল্যাজেলিয় চলন সাহায্য করে। পেশি মেসোডার্ম স্তর থেকে উৎপন্ন একটি বিশেষিত কলা। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের দেহের মোট ওজনের 40-50 শতাংশ হল তার দেহস্থিত পেশির ওজন। পেশির কতগুলো বিশেষ ধর্ম রয়েছে - এগুলো হল উত্তেজিতা, সংকোচনশীলতা, প্রসার্যতা এবং স্থিতিস্থাপকতা অবস্থান, বাহ্যিক রূপ এবং তাদের কার্য নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি এইসব বিভিন্ন অণুমাপক ব্যবহার করে পেশির শ্রেণি বিভাগ করা হয়। অবস্থানের উপর ভিত্তি করে তিন ধরনের পেশি শনাক্ত করা হয়েছে। এগুলো হল : (i) অস্থি পেশি (ii) আন্তরযন্ত্রীয় পেশি (iii) হৃদপেশি।

দেহের অস্থিময় অংশের সাথে **অস্থিপেশি** ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করলে এই পেশিগুলোতে রেখাঙ্কন লক্ষ করা যায়, তাই এদের **সরেখ পেশি** বলে। এই পেশির ক্রিয়াকলাপ যেহেতু স্নায়তন্ত্রের ঐচ্ছিক অংশের নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই এই পেশিকে **ঐচ্ছিক পেশিও** বলা হয়। এই পেশিগুলো মুখ্যত দেহভঙ্গির পরিবর্তন ও গমন ক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকে। পৌষ্টিকনালি, জনননালি ইত্যাদির মতো দেহের ফাঁপা আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গগুলোর অন্তঃপ্রাকারে আন্তরযন্ত্রীয় পেশিগুলো অবস্থান করে। এদের গায়ে কোনো রেখাঙ্কন থাকে না এবং এদের মসৃণ দেখায়। তাই এদের **মসৃণ পেশি (অরেখ পেশি)** বলে। এই পেশিগুলোর কার্যাবলি স্নায়ুতন্ত্রের ঐচ্ছিক অংশের নিয়ন্ত্রণাধীন নয় এবং এজন্য এদের অনৈচ্ছিক পেশি বলে। উদাহরণস্বরূপ পৌষ্টিকনালির মধ্য দিয়ে খাদ্যের স্থানান্তরণ এবং জনননালির মধ্য দিয়ে জনন কোশের স্থানান্তরণে এই পেশি সাহায্য করে।

হৃদপেশি হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে অবস্থান করায় এর এরূপ নামকরণ হয়েছে। বহু হৃদপেশিকোশ শাখার ন্যায় একত্রিত হয়ে হৃদপেশি গঠন করে।

বাহ্যিক দিক থেকে হৃদপেশিগুলো রেখাঙ্কিত হয়। যেহেতু এদের কার্যাবলি স্নায়তন্ত্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, তাই এরা অনৈচ্ছিক প্রকৃতির হয়।

অস্থিপেশির গঠন এবং সংকোচন পদ্ধতি বোঝার জন্য চলো একে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করি। আমাদের দেহে প্রতিটি সংঘটিত অস্থি পেশি অনেকগুলো **পেশিতন্তুগুচ্ছ (Fascicles)** নিয়ে গঠিত। এই ফেসিকেল বা পেশিতন্তুগুলো একটি সাধারণ কোলাজেন নির্মিত যোগকলার স্তরের সাহায্যে একত্রিত থাকে, এই স্তরটিকে **ফ্যাসিয়া (Fascia)** বলে। প্রতিটি পেশিতন্তুগুচ্ছ অনেকগুলো পেশিতন্তু নিয়ে গঠিত (চিত্র 20.1 দেখো)।

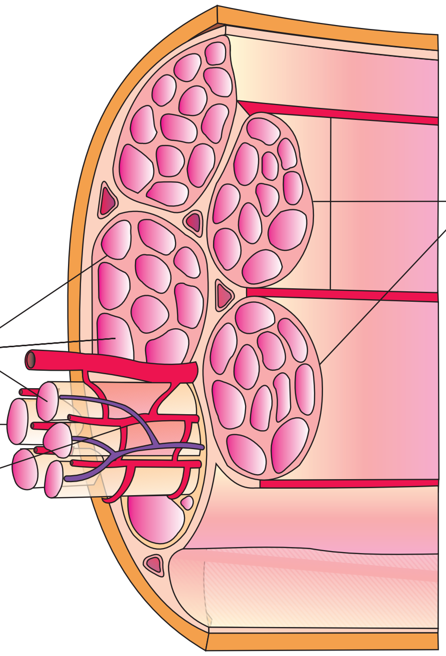

চিত্র 20.1 ঃ পেশির প্রস্থছেদের চিত্ররূপের মাধ্যমে পেশিতন্তুগুচ্ছ এবং পেশিতন্তু দেখানো হল।

প্রতিটি পেশিতন্তু যে প্লাজমা পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে তাকে সারকোলেমা বলে। সারকোলেমা সারকোপ্লাজমকে ঘিরে অবস্থান করে। সারকোপ্লাজমে অসংখ্য নিউক্লিয়াস থাকায় পেশিতন্তুগুলো সিনসিটিয়াম প্রকৃতির অর্থাৎ বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়। পেশিতন্তুর এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম অর্থাৎ সারকোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ক্যালশিয়াম আয়নের সঞ্চয় ভান্ডার। পেশিতন্তুর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এদের সারকোপ্লাজমে সমান্তরালভাবে অসংখ্য ফিলামেন্ট উপস্থিত থাকে। এই ফিলামেন্টগুলোকে মায়ো ফিলামেন্ট বা **মায়োফাইব্রিল** বলে। প্রতিটি মায়োফাইব্রিলের উপর পর্যায়ক্রমিকভাবে গাঢ় ও হালকা ব্যান্ড দেখা যায়। একটি মায়োফাইব্রিলের বিস্তৃত অধ্যয়ন থেকে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় যে **অ্যাক্টিন** ও **মায়োসিন** নামক দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিনের সজ্জাক্রমের ধরনের জন্যই মায়োফাইব্রিলকে রেখাঙ্কিত দেখায়। হালকা ব্যান্ডগুলোতে অ্যাক্টিন প্রোটিন থাকে এবং এদেরকে I ব্যান্ড বা আইসোট্রোপিক ব্যান্ড বলে।

অপরদিকে গাঢ় ব্যান্ডগুলোকে অ্যানাইসোট্রপিক ব্যান্ড বলে, এতে মায়োসিন বর্তমান। উভয় প্রোটিন পরস্পরের সাথে এবং মায়োফাইব্রিলের অনুদৈর্ঘ্য অক্ষের সাথেও সমান্তরালে থেকে দণ্ডের ন্যায় গঠনরূপে সজ্জিত থাকে। মায়োসিন ফিলামেন্টের তুলনায় অ্যাক্টিন ফিলামেন্টগুলো পাতলা হয়, তাই এদের যথাক্রমে পাতলা ও পুরু ফিলামেন্ট বলে। প্রতিটি I ব্যান্ডের কেন্দ্রে একটি স্থিতিস্থাপকতন্তু থাকে, তাকে Z রেখা বলে। এই রেখা I ব্যান্ডকে দ্বিখণ্ডিত করে। পাতলা ফিলামেন্টগুলো Z রেখার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে। A ব্যান্ডে পুরু ফিলামেন্টগুলোও ওই ব্যান্ডের মাঝখানে একটি পাতলা তন্তুময় পর্দার সাহায্যে একত্রিত থাকে। এই পাতলা তন্তুময় পর্দাটিকে M রেখা বলে। A ব্যান্ড ও I ব্যান্ডগুলো পর্যায়ক্রমে মায়োফাইব্রিলের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য বরাবর সজ্জিত থাকে। পরপর অবস্থিত দুটো Z রেখার মধ্যবর্তী মায়োফাইব্রিলের অংশটিকে পেশি সংকোচনের কার্যকরী একক রূপে গণ্য করা হয়, একে সারকোমিয়ার (Sarcomere) বলে (চিত্র 20.2 দেখো)। পেশির বিশ্রামরত অবস্থায় পুরু ফিলামেন্টের উভয়দিকে বর্তমান পাতলা ফিলামেন্টের প্রান্তগুলো পুরু ফিলামেন্টের মুক্ত প্রান্তগুলোকে আংশিকভাবে অধিক্রম করে কিন্তু পুরু ফিলামেন্টের কেন্দ্রীয় অংশটিকে অধিক্রম করে না। পুরু ফিলামেন্টের যে কেন্দ্রীয় অংশটি পাতলা ফিলামেন্টটি অধিক্রম করে না, তাকে H অঞ্চল বলে।

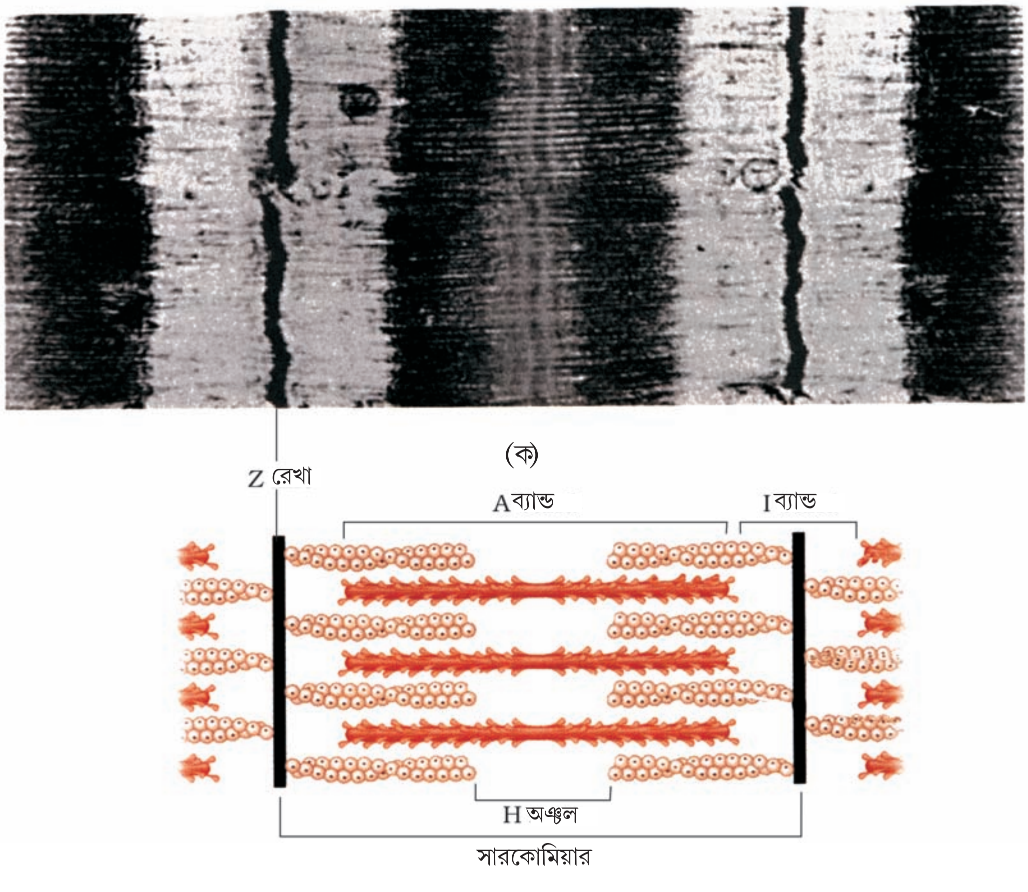

চিত্র 20.2 ঃ চিত্ররূপ প্রদর্শন (ক) একটি পেশিতন্তুর শারীরস্থান যেখানে একটি সারকোমিয়ারকে দেখানো হয়েছে (খ) একটি সারকোমিয়ার

20.2.1. সংকোচী প্রোটিনগুলোর গঠন (Structure of Contractile Protein) ঃ

প্রতিটি অ্যাক্টিন ফিলামেন্ট (পাতলা ফিলামেন্ট) দুটি 'F' অ্যাক্টিনের সমন্বয়ে গঠিত যেখানে অ্যাক্টিনদ্বয় পরস্পরের সঙ্গো প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে। প্রতিটি 'F' অ্যাক্টিন মনোমারিক 'G' (গ্লোবিউলার বা বটিকাকার) অ্যাক্টিনগুলোর একটি পলিমার। ট্রোপোমায়োসিন, অন্য একটি প্রোটিনের দুটি ফিলামেন্টও 'F' অ্যাক্টিনের সন্নিকটে এর সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য বরাবর অবস্থান করে। ট্রোপোনিন নামক একটি জটিল প্রোটিন পোমায়োসিনের উপর নিয়মিত ব্যবধানে অবস্থান করে। বিশ্রামরত অবস্থায় ট্রোপোনিন প্রোটিনের একটি অধঃএকক অ্যাক্টিন ফিলামেন্টের উপর মায়োসিনের সক্রিয় সংযুক্তি স্থানগুলোকে ঢেকে রাখে (চিত্র 20.3 (ক) দেখো)।

প্রতিটি মায়োসিন (পুরু) ফিলামেন্টও প্রোটিনের পলিমার। প্রতিটি পুরু ফিলামেন্ট বহু মনোমারিক প্রোটিনের সমন্বয়ে তৈরি। এই প্রোটিনগুলোকে মেরোমায়োসিন বলে (চিত্র 20.3 খ দেখো)। প্রতিটি মেরোমায়োসিনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে, ছোটো বাহু সমন্বিত গ্লোবিউলার (বটিকাকার) মস্তক এবং একটি ল্যাজ। ছোটো বাহু যুক্ত গ্লোবিউলার মস্তককে বলা হয় ভারী মেরোমায়োসিন এবং ল্যাজ অংশকে বলা হয় হালকা মেরোমায়োসিন। ভারী মেরোমাটোসিনের অংশ অর্থাৎ মস্তক ও ছোটো বাহুটি পলিমারযুক্ত মায়োসিনের তল থেকে পরস্পরের সঙ্গো একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব এবং কোণে বাইরের দিকে অভিক্ষিপ্ত থাকে, যাকে ক্রস বাহু (Cross arm) বলে। গ্লোবিউলার মস্তকটি একটি সক্রিয় ATPase উৎসেচক, যাতে ATP সংযুক্তি স্থান এবং অ্যাক্টিনের সক্রিয় স্থান রয়েছে।

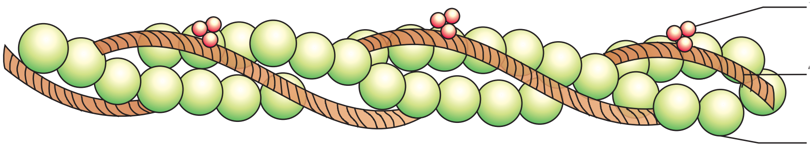

(ক)

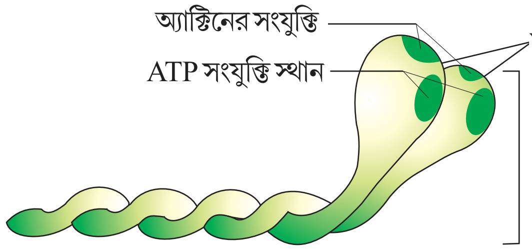

(খ)

চিত্র 20.3 ঃ (ক) একটি অ্যাক্টিন (পাতলা) ফিলামেন্ট (খ) মায়োসিন মনোমার (মেরোমায়োসিন)

20.2.2. পেশি সংকোচন পদ্ধতি (Mechanism of muscle contraction)

পেশির সংকোচন পদ্ধতি স্লাইডি ফিলামেন্ট তত্ত্বের সাহায্যে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই তত্ত্ব অনুসারে পুরু ফিলামেন্টের উপর দিয়ে সরু ফিলামেন্টের গড়িয়ে চলার ফলে পেশি সংকুচিত হয়।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে আজ্ঞাবহ বা চেষ্টীয় নিউরোনের মধ্যে প্রেরিত উদ্দীপনা পেশি সংকোচনের সূচনা করে। একটি চেষ্টীয় নিউরোন ও তার সঙ্গে যুক্ত পেশিতন্তু একত্রে একটি মোটর ইউনিট গঠন করে। চেষ্টীয় নিউরোন ও পেশিতন্তুর সারকোলেমার সংযোগস্থলকে স্নায়ুপেশির সংযোগস্থল বা মোটরতন্তু প্লেট (Motor endplate) বলে। স্নায়ুস্পন্দন এই সংযোগস্থলে পৌঁছালে সেখান থেকে নিউরোট্রান্সমিটার (অ্যাসিটাইলকোলিন) ক্ষরিত হয়, যা সারকোলেমা অঞ্চলে একটি ক্রিয়াবিভব সৃষ্টি করে। এই ক্রিয়াবিভব পেশিতন্তুর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর ফলে সারকোপ্লাজমে ক্যালশিয়াম আয়নের (Ca^{++}) মুক্তি ঘটে। Ca^{++} এর মাত্রা বৃদ্ধি পেলে, অ্যাক্টিন ফিলামেন্টের উপরিস্থিত ট্রপোনিনের একটি অধঃএককের সাথে ক্যালশিয়াম আয়নের সংযুক্তি ঘটে এবং এরফলে অ্যাক্টিনস্থিত মায়োসিনের সংযুক্তি স্থানটি উন্মুক্ত হয়। ATP এর আর্দ্রবিশ্লেষণের ফলে উৎপন্ন শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মায়োসিনের মস্তকটি এখন অ্যাক্টিনের উন্মুক্ত সক্রিয় স্থানের সাথে যুক্ত হয়ে একটি ক্রস ব্রিজ (চিত্র 20.4 দেখো) গঠন করে।

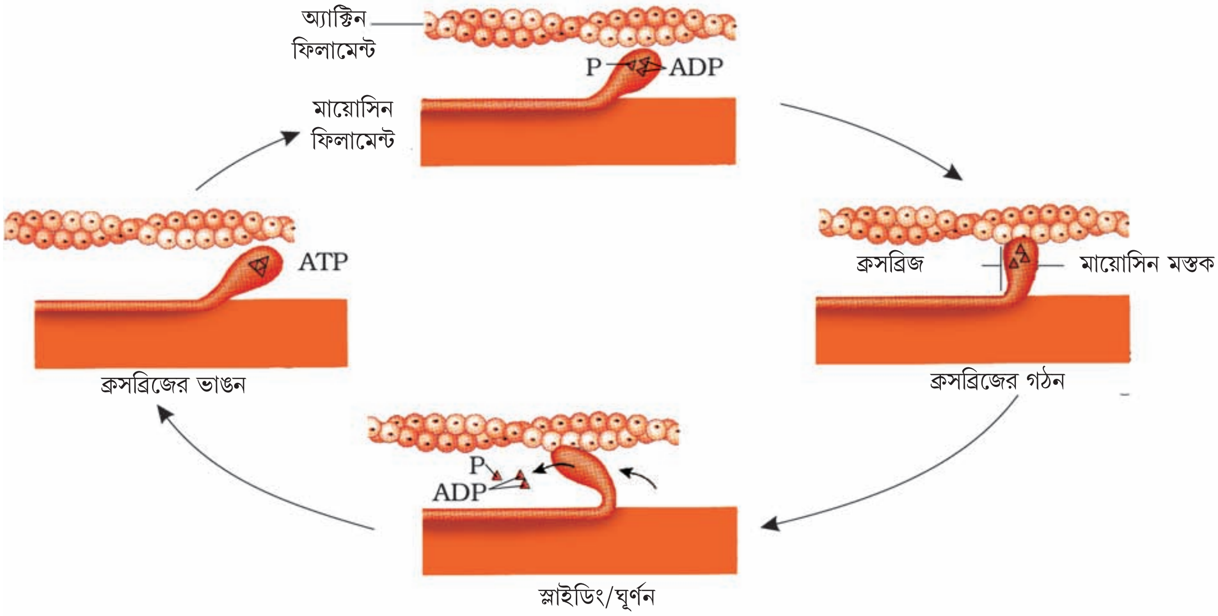

চিত্র 20.4 ঃ ক্রসব্রিজ তৈরির বিভিন্ন ধাপসমূহ, মস্তকের ঘূর্ণন ও ক্রসব্রিজের ভাঙন।

এই ক্রসব্রিজ এর সাথে যুক্ত অ্যাক্টিন ফিলামেন্টগুলোকে A ব্যান্ডের কেন্দ্রের দিকে টেনে নিয়ে আসে। সেই সঙ্গে এটি এই অ্যাক্টিন ফিলামেন্টগুলোর সঙ্গে যুক্ত Z রেখাকেও ভিতরের দিকে টেনে নিয়ে আসে। এর ফলে সারকোমিয়ারের দৈর্ঘ্য হ্রাস পায় অর্থাৎ সংকোচন ঘটে। উপরিউক্ত ধাপগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পেশির দৈর্ঘ্য হ্রাসের সময় অর্থাৎ সংকোচনকালে, I ব্যান্ডগুলোর দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়। অপরদিকে A ব্যান্ডগুলোর দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকে (চিত্র 20.5 দেখো)। মায়োসিন থেকে ADP এবং Pi মুক্ত হওয়ার পর এটি শিথিল অবস্থায় ফিরে যায়। একটি নতুন ATP এর সংযুক্তি ঘটলে ক্রসব্রিজটি ভেঙে যায় (চিত্র 20.4 দেখো) ।

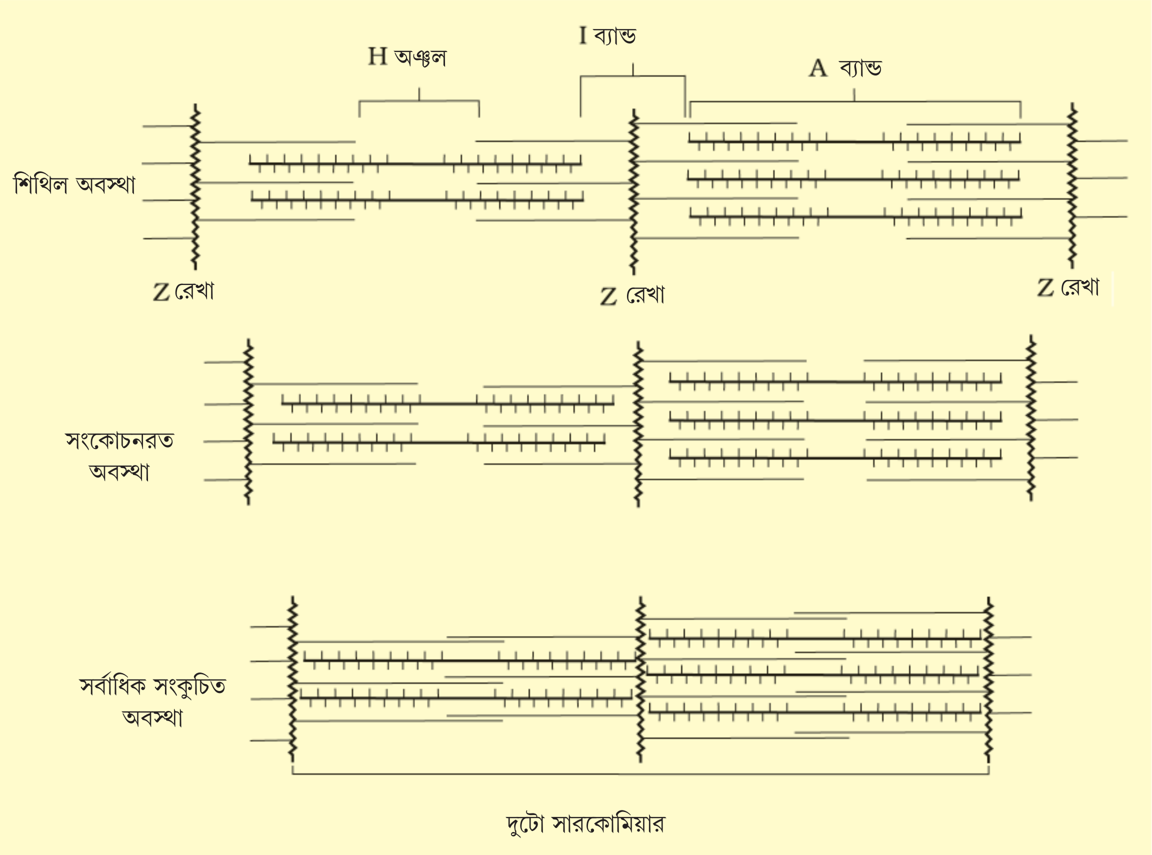

চিত্র 20.5 ঃ পেশি সংকোচনের স্লাইডিং ফিলামেন্ট তত্ত্ব (পাতলা ফিলামেন্টগুলোর চলন এবং I ব্যান্ড ও H অঞ্চলের তুলনামূলক আকৃতি)।

মায়োসিনের মস্তকের সাহায্যে ATP এর আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘটলে ক্রসব্রিজের গঠিত হওয়া ও ভেঙে যাওয়ার চক্রাকার পর্যায়টির পুনরাবৃত্তি ঘটে। এর ফলে পেশি ফিলামেন্টগুলোয় আবারও গ্লাইডিং ঘটে। Ca^{++} আয়ন পুনরায় সারকোপ্লাজমের সিস্টারনাতে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে। এর ফলস্বরূপ অ্যাক্টিন ফিলামেন্টের সংযুক্তি স্থানটি আবারও ঢেকে যায়। এর ফলে Z রেখাগুলো তাদের পূর্ব অবস্থানে ফিরে যায় অর্থাৎ পেশি শিথিল হয়। পেশিতন্তুগুলো বিক্রিয়াকাল বিভিন্ন পেশিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়। পেশিকে বার বার উদ্দীপিত করলে এতে গ্লাইকোজেনের অবাত জারণ ঘটার কারণে ল্যাকটিক অ্যাসিড জমা হতে পারে, এর ফলে পেশি অসাড় হয়ে যায়। পেশিতে অক্সিজেন সঞ্চয়কারী লাল বর্ণের একটি রঞ্জক মায়োগ্লোবিন রয়েছে। কিছু কিছু পেশিতে মায়োগ্লোবিনের পরিমাণ বেশি থাকায় এদের লালচে দেখায়। এ ধরনের পেশিগুলোকে লোহিত পেশিতন্তু বলে। এই পেশিগুলোতে প্রচুর পরিমাণ মাইটোকনড্রিয়াও থাকে, যারা ATP উৎপাদনের জন্য লোহিত পেশিতে সঞ্চিত প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন ব্যবহার করতে পারে। এজন্য এই পেশিগুলোকে সবাত পেশিও বলা যেতে পারে। অপরপক্ষে কিছু কিছু পেশিতে খুব অল্প পরিমাণ মায়োগ্লোবিন থাকে, তাই এদের ফ্যাকাশে অথবা সাদাটে দেখায়। এগুলোকে শ্বেত পেশিতন্তু বলে এবং এ ধরনের পেশিতে **মাইটোকনড্রিয়ার** সংখ্যা ও খুব কম থাকে কিন্তু সারকোপ্লাজমিক রেটিকুলামের পরিমাণ খুব বেশি থাকে। এই পেশিগুলো শক্তির জন্য অবাত প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

20.3. কঙ্কালতন্ত্র (Skeletal System)

অস্থি এবং কিছু তরুণাস্থি নির্মিত একটি কাঠামো কঙ্কালতন্ত্র গঠন করে। দেহে সংঘটিত চলনে এই তন্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রত্যঙ্গ অস্থিগুলোর সাহায্য ছাড়া ঘুরে বেড়ানো এবং চোয়ালের অস্থির সাহায্য ছাড়া খাদ্যের চর্বণ সম্ভব হবে কি? কল্পনা করো। অস্থি এবং তরুণাস্থি হল বিশেষিত যোগ কলা। ক্যালশিয়াম লবণের উপস্থিতির জন্য অস্থি কলার ধাত্র অত্যন্ত দৃঢ় হয় এবং কনড্রয়টিন লবণের উপস্থিতির জন্য তরুণাস্থির ধাত্র কিছুটা নমনীয় হয়। মানবদেহে এই তন্ত্রটি 206 টি অস্থি এবং কিছু তরুণাস্থি নিয়ে গঠিত। অস্থিতন্ত্রটি দুটি প্রধানবিভাগে বিভক্ত, অক্ষীয় কঙ্কাল এবং উপাক্ষীয় কঙ্কাল।

আমাদের দেহের প্রধান অক্ষ বরাবর 80টি অস্থি রয়েছে এবং এদের সমন্বয়ে **অক্ষীয় কঙ্কালটি** গঠিত হয়। করোটি (Skull), মেরুদণ্ড (Vertebral Column), উরঃফলক (Sternum) এবং পর্শুকাসমূহ (Ribs) অক্ষীয় কঙ্কাল গঠন করে। **করোটিটি** (চিত্র 206 দেখো) ক্রেনিয়ামের অস্থি এবং মুখমণ্ডলের অস্থি — এই দুই সেট অস্থির সমন্বয়ে গঠিত এবং এই দুই অংশে মোট 22 টি অস্থি থাকে। ক্রেনিয়াম 8টি অস্থি

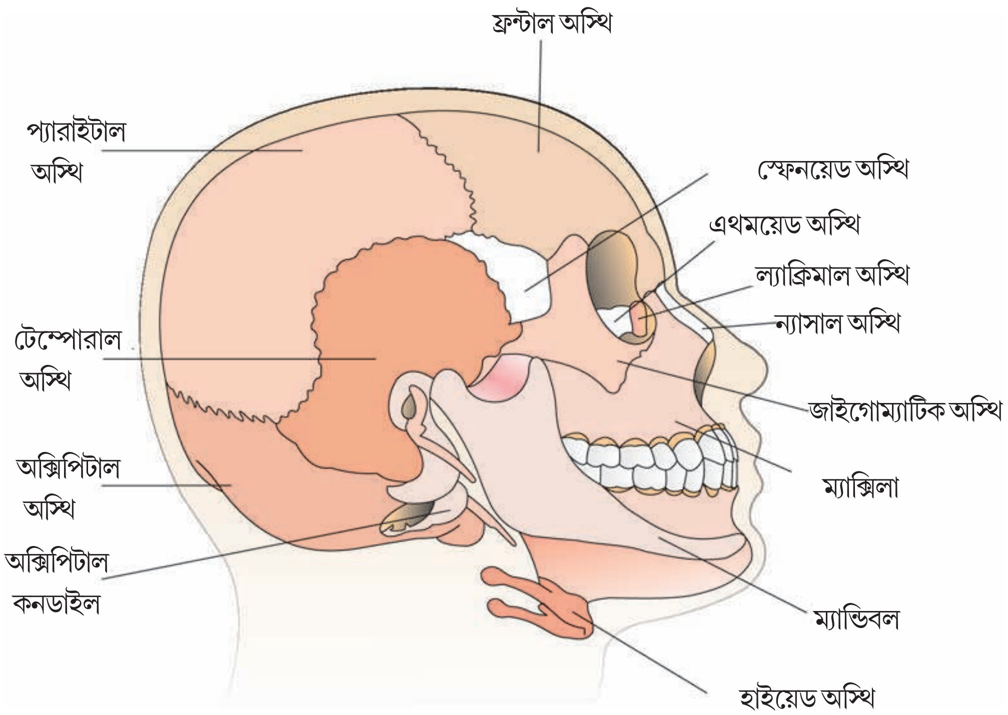

চিত্র 20.6 ঃ মানব করোটির চিত্ররূপ।

নিয়ে গঠিত। এই অস্থিসমূহ মস্তিষ্কের জন্য একটি শক্ত রক্ষণাত্মক বহিঃআবরণী গঠন করে, একে ক্রেনিয়াম (Cranium) বলে। মুখমণ্ডলীয় অঞ্চলটি 14টি কঙ্কাল উপাদান বা অস্থির সমন্বয়ে গঠিত হয় যা করোটির সম্মুখ অংশ গঠন করে। মুখ গহ্বরের গোড়ায় একটি একক 'U' আকৃতির অস্থি বর্তমান, একে হাইয়েড অস্থি (Hyloid) বলে। এই অস্থিটিও করোটির অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি মধ্যকর্ণে মেলিয়াস, ইনকাস এবং স্টেপিস-এই তিনটি ক্ষুদ্র অস্থি বর্তমান এবং এদের এক সাথে **কর্ণাস্থি (Ear ossicle)** বলে।

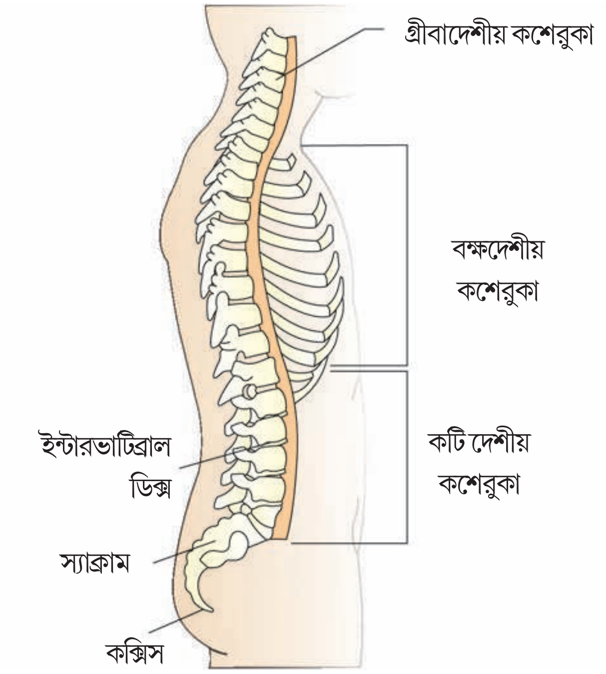

চিত্র 20.7 ঃ মেরুদণ্ড (ডানপৃষ্ঠীয় দৃশ্য)

করোটি অঞ্চলটি দুইটি অক্সিপিটাল কনডাইলের সাহায্যে মেরুদণ্ডের উর্ধ্বাংশের সাথে সন্ধি স্থাপন করে তাই এই ধরনের করোটিকে ডাইকনডাইলিক করোটি বলে।

আমাদের মেরুদণ্ডটি (চিত্র 20.7 দেখো) দেহের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করে এবং এটি ধারাবাহিকভাবে সজ্জিত অস্থি এককের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এই অস্থি একক গুলোকে কশেরুকা (vertebrae) বলে। মেরুদণ্ডটি করোটির তলদেশ থেকে বর্ধিত হয়ে দেহকাণ্ডের মূল কাঠামোটি গঠন করে। প্রতিটি কশেরুকার একটি কেন্দ্রীয় ফাঁপা অংশ রয়েছে (Neural Canal) যার মধ্য দিয়ে সুষুম্মাকাণ্ড (spinalcord) অগ্রসর হয়। মেরুদণ্ডের প্রথম কশেরুকাটি হল অ্যাটলাস এবং এটি অক্সিপিটাল কনডাইলের সাথে সন্ধি স্থাপন করে। করোটির দিক থেকে মেরুদণ্ডটি গ্রীবাদেশীয় বা সারভাইক্যাল (7), বক্ষদেশীয় বা থোরাসিক (12), কটি বা লাম্বার (5), ত্রিকাস্থিয় বা স্যাক্রাল (1 মিলিত), অঞ্চলে বিভেদিত থাকে। মানুষ সহ প্রায় সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর মেরুদণ্ডে 7 টি গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা বর্তমান। মেরুদণ্ড, সুষুম্মাকাণ্ড (spinalcord) কে সুরক্ষা প্রদান করে, মস্তিষ্কের ভার বহন করে এবং এটি পর্শুকা বা পাঁজরের অস্থি এবং পৃষ্ঠদেশীয় পেশির সংযোগস্থল হিসাবে কাজ করে। বক্ষদেশের অঙ্কীয় মধ্যরেখার উপর যে চ্যাপ্টা অস্থিটি অবস্থিত তাকে **উরঃ ফলক বা স্টারনাম** বলে।

মানবদেহে 12 জোড়া **পাঁজরের অস্থি** থাকে। প্রতিটি পর্শুকা বা পাঁজর হল একটি পাতলা চ্যাপ্টা অস্থি যা পৃষ্ঠদেশে মেরুদণ্ড ও অঙ্কীয়দেশে উরঃফলক বা স্টারনামের সাথে যুক্ত থাকে। প্রতিটি পাঁজরের পৃষ্ঠীয় প্রান্তের উপর দুটি সন্ধিতল বর্তমান। তাই পাঁজরকে বাইসেফালিক (bicephalic) বলা হয়। প্রথম সাতজোড়া পাঁজর বা পর্শুকাকে প্রকৃত পর্শুকা (True ribs) বলে। হায়ালিন তরুণাস্থির সাহায্যে পাঁজরগুলো উরঃফলক বা স্টারনামের সাথে এবং পৃষ্ঠদেশে গ্রীবাদেশীয় কশেরুকার সাথে যুক্ত থাকে। অষ্টম, নবম এবং দশম পর্শুকা জোড়া উরঃফলক বা স্টারনামের সাথে সরাসরি সন্ধিস্থল গঠন করে না কিন্তু **হায়ালিন তরুণাস্থির** সাহায্যে সপ্তম পর্শুকার সাথে যুক্ত থাকে। এদের ভার্টিব্রোকনড্রাল বা অপ্রকৃত পর্শুকা (False rib) বলে। শেষ দুই জোড়া (একাদশ ও দ্বাদশ) পর্শুকা অঙ্কদেশে কোথাও যুক্ত হয় না, তাই এদের ভাসমান পর্শুকা (floating ribs) বলা হয়। বক্ষদেশীয় কশেরুকা, পর্শুকা এবং স্টারনাম একত্রে বক্ষপিঞ্জর (ribcage) গঠন করে (চিত্র 20.6 দেখো)।

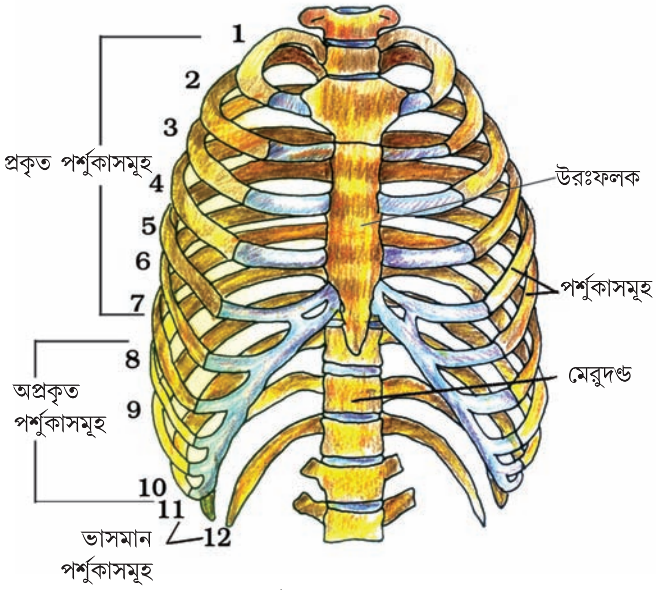

চিত্র 20.8 ঃ পর্শুকাসমূহ এবং বক্ষগহ্বর

উপাঙ্গিক কঙ্কালটি প্রত্যঙ্গের অস্থিসমূহ এবং এদের গার্ডেল অস্থির সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি **প্রত্যঙ্গ** 30টি অস্থির সমন্বয়ে গঠিত।

হাতের (অগ্রপদ) অস্থিগুলো হল— হিউমেরাস, রেডিয়াস এবং আলনা, কার্পাল (কব্জির অস্থিসমূহ 8 টি) এবং মেটাকার্পাল (হাতের তালুর অস্থিসমূহ 5 টি) এবং ফ্যালাঞ্জেস (হাতের আঙুল সমূহ 14 টি অস্থি) (চিত্র 20.9 দেখো)। পায়ের (পশ্চাদপদ) অস্থিগুলো হল ফিমার (উরু অস্থি), টিবিয়া এবং ফিবিউলা, টার্সাল (গোড়ালির অস্থিসমূহ 7 টি অস্থি) মেটাটার্সাল (5টি অস্থি) এবং ফ্যালাঞ্জেস (পায়ের আঙুল সমূহ- 14 টি অস্থি) (চিত্র 20.10 দেখো)। কাপ আকৃতির প্যাটেলা অস্থিটি হাঁটুর অঙ্কীয়দেশকে আবৃত করে রাখে (মালাইচাকি অর্থাৎ kneecap)।

উরশ্চক্র (Pectoral girdle) এবং **শ্রোণিচক্রের** (Pelvic girdle) অস্থিগুলো যথাক্রমে অগ্রপদ এবং পশ্চাদপদের সাথে অক্ষীয় কঙ্কালের সন্ধি গঠনে সাহায্য করে। প্রতিটি গার্ডেল দুটো অর্ধাংশ নিয়ে গঠিত। উরশ্চক্রের প্রতিটি অর্ধ একটি ক্ল্যাভিক্যাল ও একটি স্ক্যাপুলা অস্থি নিয়ে গঠিত (চিত্র 20.9 দেখো)। স্ক্যাপুলা একটি বৃহৎ ত্রিকোনাকার চ্যাপ্টা অস্থি যা বক্ষদেশের পৃষ্ঠীয় অংশে দ্বিতীয় ও সপ্তম কশেরুকার মধ্যে অবস্থান করে। স্ক্যাপুলা অস্থির পৃষ্ঠীয় চ্যাপ্টা ত্রিকোনাকার দেহে একটি কিছুটা উঁচু একটি স্থান দেখা যায়, একে স্পাইন বলে। এটি একটি চ্যাপ্টা, প্রসারিত, প্রবর্ধক হিসাবে বেরিয়ে আসে, একে অ্যাক্রোমিয়ন (Acromion) বলে। ক্ল্যাভিক্যাল অস্থিটি এই অ্যাক্রোমিয়নের সাথে সন্ধিস্থল গঠন করে। অ্যাক্রোমিয়ন অংশের ঠিক নীচে একটি অবনত স্থান রয়েছে একে গ্লিনয়েড গহ্বর (Glenoid Cavity) বলে। হিউমেরাস অস্থির মস্তক এই গ্লিনয়েড গহ্বরের সাথে সন্ধিস্থল গঠনের মাধ্যমে স্কন্ধ সন্ধি (Shoulder Joint) গঠন করে। প্রতিটি ক্ল্যাভিক্যাল লম্বা দুটি বক্রতা সমন্বিত সরু অস্থি। সচরাচর এই অস্থিটিকে কলার অস্থি (Collar bone) বলে।

শ্রোণি চক্রটি দুটি কঙ্কাল অস্থির সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি কঙ্কাল অস্থি ইলিয়াম (Ilium), ইশ্চিয়াম (Ischium) এবং পিউবিস (Pubis) এই তিনটি অস্থি মিলে গিয়ে গঠিত হয়। তিনটি অস্থি যে স্থানে মিশে যায় সেখানে একটি গহ্বরের সৃষ্টি হয়, একে অ্যাসিটাবুলাম (acctabulum) বলে। উরুর অস্থি অ্যাসিটাবুলামের সাথে সংযোগ সন্ধি স্থাপন করে। শ্রোণিচক্রের দুটো অর্ধাংশ অঙ্কীয়দেশে মিলিত হয়ে তন্তুময় তরুণাস্থিত সমন্বিত পিউবিক সিমফাইসিস (Pubic Symphysis) গঠন করে।

20.4 অস্থিসন্ধি (Joints) ঃ

দেহের অস্থিময় অংশে উপস্থিত অস্থিসন্ধিগুলো সব ধরনের চলনের জন্য আবশ্যক। গমন সম্পর্কিত চলনেও এর ব্যতিক্রম ঘটে না।

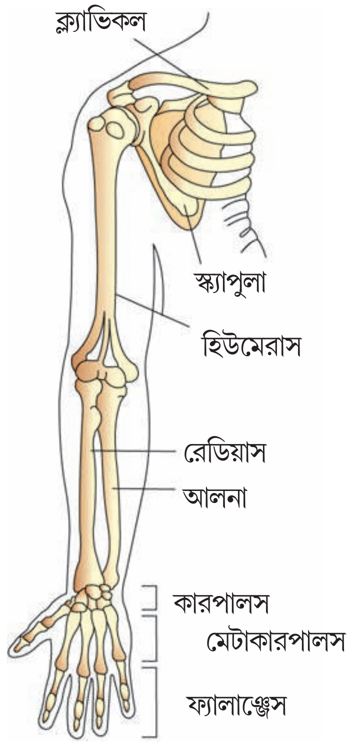

চিত্র 20.9 ঃ ডান পেক্টোরাল গার্ডল এবং ঊর্ধ্ব বাহু (সম্মুখদৃশ্য)

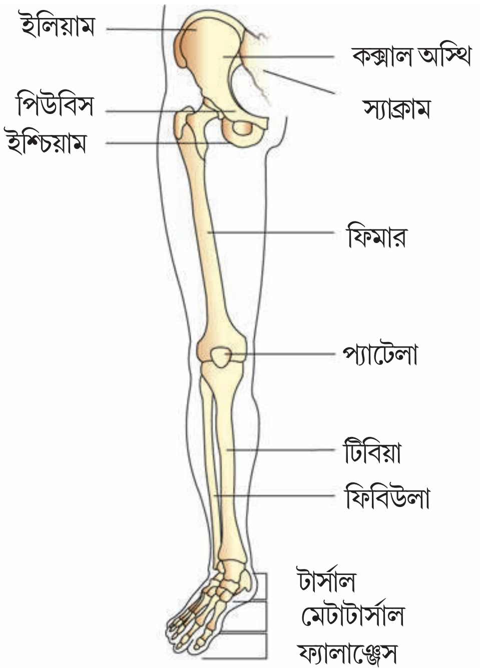

চিত্র 20.10 ঃ ডান পেলভিক গার্ডল বা শ্রোণিচক্রসমূহ (সম্মুখ দৃশ্য)

অস্থিগুলোর মধ্যে অথবা অস্থি এবং তরুণাস্থির মধ্যে যে সংযোগস্থল রয়েছে তাদের অস্থিসন্ধি বলে। অস্থিসন্ধির মাধ্যমে চলন সম্পন্ন করার জন্য পেশিজ ক্রিয়ায় উৎপন্ন বল ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে অস্থিসন্ধিটি আলম্বের মতো কাজ করে। এই অস্থিসন্ধিগুলোতে বিচলন, বিভিন্ন প্রভাবকের উপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন হয়। অস্থিসন্ধিগুলো তিনটি প্রধান গাঠনিক রূপে শ্রেণিবিভক্ত থাকে। এগুলো হল তন্তুময় (Fibrous) অস্থিসন্ধি, তরুণাস্থিময় (Cartilaginous) অস্থিসন্ধি এবং সাইনোভিয়াল (Synovial) অস্থিসন্ধি।

তন্তুময় অস্থিসন্ধিগুলো কোনো প্রকার চলন ঘটায় না। করোটির চ্যাপ্টা অস্থিগুলোতে এই ধরনের অস্থিসন্ধি দেখা যায় যেখানে ক্রেনিয়াম গঠনে ঘন তন্তুজ যোগকলার সাহায্যে অস্থিগুলো শুরু থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এমনভাবে মিশে যায় যাকে দেখে সেলাই করা হয়েছে বলে মনে হয়।

তরুণাস্থিময় অস্থিসন্ধিতে, অস্থিসন্ধি গঠনকারী অস্থিগুলো তরুণাস্থির সাহায্যে পরস্পর যুক্ত থাকে। মেরুদণ্ড সংলগ্ন কশেরুকাগুলোর মধ্যে এই সন্ধি দেখা যায় এবং এটি সীমিত চলনে সাহায্য করে।

সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল দুটি অস্থির সংযোগতলের মধ্যে একটি তরলপূর্ণ সাইনোভিয়াল গহ্বরের উপস্থিতি। এই ধরনের সজ্জাক্রম যথেষ্ট নড়াচড়ায় সাহায্য করে। এই অস্থিগুলো গমন এবং অন্যান্য আরও চলনে সাহায্য করে। এই প্রকার অস্থিসন্ধির কিছু উদাহরণ হল — বল ও সকেট অস্থিসন্ধি (হিউমেরাস এবং উরঃশ্চক্রের অস্থির মধ্যে, কব্জা অস্থিসন্ধি (কনুই অস্থিসন্ধি), পিভট অস্থিসন্ধি (অ্যাটলাস ও অ্যাক্সিস অস্থির মধ্যে), গ্লাইডিং অস্থিসন্ধি (কারপালের অস্থিগুলোর মধ্যে) এবং স্যাডাল অস্থিসন্ধি (বুড়ো আঙুলের কারপাল এবং মেটাকারপাল অস্থির মধ্যে)।

20.4 পেশি এবং কঙ্কালতন্ত্রের গোলযোগসমূহ (Disorders of muscular and skeletal system) ঃ

মায়াসথেনিয়া গ্রেভিস ঃ স্ব অনাক্রম্যতা বিঘ্নিত হলে এই রোগে আমাদের স্নায়ুপেশির সংযোগস্থল আক্রান্ত হয় এবং এর ফলে অস্থিপেশির অবসাদ, দুর্বলতা এবং অসাড়তা হতে দেখা যায়।

মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি ঃ প্রধানত বংশগত ত্রুটির কারণে এই রোগ হয়। এই রোগে অস্থিপেশি ক্রমাগত ক্ষয় হতে থাকে।

টিটেনি ঃ দেহতরলে Ca^{++} আয়নের পরিমাণ হ্রাস পেলে পেশিতে দ্রুত সংকোচন বা খিঁচুনি দেখা যায়।

আরথ্রাইটিস ঃ অস্থিসন্ধির প্রদাহ

অস্টিওপোরোসিস ঃ বার্ধক্যজনিত এই ব্যাধির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল অস্থির উপাদান হ্রাস পাওয়া ও অস্থি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়া। এই রোগটি সচরাচর ইস্ট্রোজেনের মাত্রা হ্রাস হওয়ার কারণে হয়।

গাউট ঃ গাউট বলতে অস্থিসন্ধির প্রদাহকে বোঝায় যা ইউরিক অ্যাসিডের ক্রিস্টাল জমে যাওয়ার কারণে হয়।

সার সংক্ষেপ

চলন হল সজীব বস্তুর একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। প্রাণীদেহে দেখা যায় এমন কিছু চলনের ধরন হল প্রোটোপ্লাজমের প্রবাহ, সিলিয়ারি চলন, পাখনা, প্রত্যঙ্গা, ডানা ইত্যাদির চলন। যে ইচ্ছাধীন চলনের ফলে প্রাণীদের স্থানান্তরণ ঘটে তাকে গমন বলে। খাদ্য, আশ্রয়, সঙ্গী, প্রজনন ক্ষেত্র, অনুকূল জলবায়ু সন্ধানের জন্য বা তাদের নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য প্রাণীরা সাধারণত গমন করে।

মানবদেহের কোশসমূহে অ্যামিবয়েড, সিলিয়ারি এবং পেশিজ চলন দেখা যায়। গমন এবং অন্যান্য বহু চলনের জন্য সমন্বায়িত পেশিজ ক্রিয়ার প্রয়োজন। আমাদের দেহে তিন ধরনের পেশি বর্তমান। অস্থি পেশি কঙ্কাল উপাদন অর্থাৎ অস্থির সাথে যুক্ত থাকে। এরা ঐচ্ছিক এবং বাহ্যিকভাবে সরেখ প্রকৃতির। আন্তরযন্ত্রের অন্তঃপ্রাকারে বর্তমান আন্তঃযন্ত্রীয় পেশিগুলো অরেখ এবং অনৈচ্ছিক প্রকৃতির হয়। হৃৎপিণ্ড স্থিত পেশিদের হৃদপেশি বলে। এরা সরেখ, শাখান্বিত এবং অনৈচ্ছিক প্রকৃতির হয়। উত্তেজিতা, প্রসার্যতা, সংকোচনশীলতা এবং স্থিতিস্থাপকতা হল পেশির ধর্ম।

পেশির শারীরস্থানিক একক হল পেশি তন্তু। প্রতিটি পেশিতন্তুতে সমান্তরালে সজ্জিত বহু মায়োফাইব্রিল রয়েছে। প্রতিটি মায়োফাইব্রিল ধারাবাহিকভাবে সজ্জিত বহু এককের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং এরাই হল মায়োফাইব্রিলের কার্যকরী একক। প্রতিটি সারকোমিয়ারে রয়েছে পুরু মায়োসিন ফিলামেন্ট নির্মিত কেন্দ্রীয় A ব্যান্ড এবং এই A ব্যান্ডের উভয় পাশে Z রেখা দ্বারা চিহ্নিত পাতলা অ্যাক্টিন ফিলামেন্ট নির্মিত I ব্যান্ডের দুটি অর্ধাংশ। অ্যাক্টিন এবং মায়োসিন হল সংকোচনশীল প্রোটিনের পলিমার। বিশ্রামরত অবস্থায় অ্যাক্টিন ফিলামেন্টস্থিত মায়োসিনের জন্য সক্রিয় স্থানটি ট্রোপোনিন প্রোটিনের দ্বারা ঢাকা থাকে। মায়োসিনের মস্তকে ATPase উৎসেচক, ATP -র সংযুক্তি স্থান এবং অ্যাক্টিনের জন্য সক্রিয় স্থান রয়েছে। একটি চেষ্টীয় নিউরোন পেশিতন্তুতে উদ্দীপনা প্রেরণ করে যার ফলে পেশিতন্তুতে ক্রিয়াবিভব সৃষ্টি হয়। এর ফলে সারকোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে Ca^{++} এর মুক্তি ঘটে। Ca^{++} অ্যাক্টিন ফিলামেন্টগুলোকে সক্রিয় করার ফলে এটি মায়োসিনের মস্তকের সঙ্গো যুক্ত হয়ে একটি ক্রসব্রিজ গঠন করে। এই ক্রসব্রিজগুলো অ্যাকটিন ফিলামেন্ট গুলোকে টানার ফলে এগুলো মায়োসিন ফিলামেন্টের উপর গড়িয়ে চলে এবং যার ফলে পেশির সংকোচন ঘটে। Ca^{++} এরপর সারকোপ্লাজমিক রেটিকুলামে ফিরে আসে, ফলস্বরূপ অ্যাক্টিনগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ক্রসব্রিজগুলো ভেঙে যায় এবং পেশি শিথিল হয়।

পেশিকে বারবার উদ্দীপিত করলে পেশিক্লান্ত বা অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে। পেশিতে লাল বর্ণের মায়োগ্লোবিনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে মুখ্যত পেশিকে লোহিত পেশি এবং শ্বেত পেশি এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

আমাদের কঙ্কালতন্ত্র অস্থি এবং তরুণাস্থির সমন্বয়ে গঠিত। কঙ্কালতন্ত্রটি অক্ষীয় কঙ্কাল এবং উপাঙ্গীয় কঙ্কাল এই দুই ভাগে বিভক্ত। করোটি, মেরুদণ্ড, পাঁজর এবং উরঃফলকের সমন্বয়ে অক্ষীয় কঙ্কাল গঠিত। প্রত্যঙ্গ অস্থি (Limb bones) এবং গার্ডেলগুলো (Girdles) নিয়ে উপাঙ্গীয় কঙ্কালটি গঠিত। অস্থিগুলোর মধ্যে অথবা অস্থি এবং তরুণাস্থির মধ্যে তিন ধরনের অস্থিসন্ধি দেখা যায়। এগুলো হল— তন্তুময় অস্থিসন্ধি, তরুণাস্থিময় অস্থিসন্ধি এবং সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি। সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি যথেষ্ট নড়াচড়ায় সাহায্য করে এবং এই কারণে এই সন্ধি গমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অনুশীলনী

1. অস্থি পেশিস্থিত একটি সারকোমিয়ারের চিত্র অঙ্কন করো এবং বিভিন্ন অঞ্চলগুলো চিহ্নিত কর।
2. পেশি সংকোচন সংক্রান্ত স্লাইডিং ফিলামেন্ট তত্ত্বটির সংজ্ঞা দাও।
3. পেশি সংকোচনের গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলো বর্ণনা করো।

4. বিবৃতিটির পাশে সত্য অথবা মিথ্যা লেখো। যদি মিথ্যা হয় তবে বক্তব্যটিকে এমনভাবে পরিবর্তন করো যাতে বক্তব্যটি সঠিক হয়।
   ক) পাতলা (thin) ফিলামেন্টে অ্যাক্টিন উপস্থিত।
   খ) সরেখ পেশিতন্তুর 'H' অঞ্চলটি পুরু (thik) এবং পাতলা (thin) উভয় ফিলামেন্টগুলোকে উপস্থাপন করো।
   গ) মানব কঙ্কালে 206 টি অস্থি বর্তমান।
   ঘ) মানব দেহে 11 জোড়া পাঁজর (rib) আছে।
   ঙ) দেহের অঙ্কীয়দেশে উরঃ ফলক উপস্থিত।
5. পার্থক্য লেখো ঃ
   ক) অ্যাক্টিন এবং মায়োসিন
   খ) লোহিত পেশি এবং শ্বেতপেশি
   গ) উরশ্চক্র এবং শ্রোণিচক্র
6. 1 নং স্তম্ভের সাথে 2 নং স্তম্ভটি মেলাও

স্তম্ভ- ক	স্তম্ভ - খ
ক) মসৃণ পেশি	(i) মায়োগ্লোবিন
খ) ট্রপোমায়োসিন	(ii) পাতলা ফিলামেন্ট (thin)
গ) লোহিত পেশি	(iii) সুচার
ঘ) করোটি	(iv) অনৈচ্ছিক

7. মানব দেহের কোশে কী কী বিভিন্ন ধরনের চলন দেখা যায়?
8. একটি অস্থিপেশি ও একটি হৃদপেশির মধ্যে তুলনা কীভাবে করবে?
9. নিম্নলিখিতগুলোর মধ্যে উপস্থিত অস্থিসন্ধিগুলোর নাম লেখো।
   ক) অ্যাটলাস / অ্যাক্সিস
   খ) কারপাল/বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মেটাকারপাল
   গ) ফ্যালাঞ্জেস বা আঙুলের অস্থিগুলোর মধ্যে
   ঘ) ফিমার / অ্যাসিটাবুলাম
   ঙ) ক্রেনিয়ামের অস্থিসমূহের মধ্যে
   চ) শ্রোণিচক্রে উপস্থিত পিউবিক অস্থিসমূহের মধ্যে
10. শূন্যস্থান পূরণ করো :
   ক) সব স্তন্যপায়ী (কিছু প্রাণী ব্যতীত) প্রাণীতে —— টি গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা বর্তমান।
   খ) মানুষের প্রতিটি প্রত্যঙ্গে ফ্যালাঞ্জেসের সংখ্যা ——।
   গ) মায়োফাইব্রিলের পাতলা (thin) তন্তুতে থাকে দুটি 'F' অ্যাক্টিন এবং অন্য দুটি প্রোটিনের নাম হল —— ও ——।
   ঘ) পেশিতন্তুতে Ca^{++} ——এ সঞ্চিত থাকে।
   ঙ) —— ও —— জোড়া কশেরুকাকে ভাসমান কশেরুকা বলে।
   চ) মানুষের ক্রেনিয়াম (Cranium) গঠিত হয় —— টি অস্থি দ্বারা।

অধ্যায় — ২১ (Chapter 21)
স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয়সাধন
(Neural Control and Co-ordination)

21.1. স্নায়ুতন্ত্র

21.2. মানুষের স্নায়ুতন্ত্র

21.3. নিউরোন— স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত ও কার্যগত একক

21.4. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র

21.5. প্রতিবর্ত ক্রিয়া ও প্রতিবর্ত চাপ

21.6. সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনা গ্রহণ এবং তার প্রসেসিং বা বিশ্লেষণ

তোমরা জান যে, আমাদের দেহের সাম্যবস্থা বজায় রাখার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বা অঙ্গাতন্ত্রগুলোর কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন প্রয়োজন। যে প্রক্রিয়ায় দুটো বা তার বেশি অঙ্গ পরস্পরের সঙ্গো ক্রিয়া করে এবং কাজের ক্ষেত্রে একে অপরের পরিপূরক হয় তাকে কো-অর্ডিনেশান বা সমন্বয়সাধন বলে। উদাহরণস্বরূপ আমরা যখন কায়িক শ্রম করি তখন পেশি ক্রিয়ার হার বেড়ে যায়। এই বর্ধিত হার বজায় রাখার জন্য দেহে শক্তির চাহিদা বৃদ্ধি পায়, ফলে অক্সিজেনের সরবরাহও বৃদ্ধি পায়। শ্বসন হার, হৃদ্স্পন্দনের হারের বৃদ্ধি এবং রক্তবাহের মধ্য দিয়ে রক্তপ্রবাহ বেড়ে যাওয়ার কারণে অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। দৈহিক অনুশীলন বন্ধ হলে স্নায়ু, ফুসফুস, হৃদপিন্ড এবং বৃক্কের কার্যকারিতা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। সুতরাং দৈহিক অনুশীলনকালে পেশি, ফুসফুস, হৃদপিন্ড, রক্তবাহ, বৃক্ক এবং অন্যান্য অঙ্গগুলোর কাজ সমন্বায়িত ভাবে হয়। আমাদের দেহে স্নায়ুতন্ত্র এবং অন্তঃক্ষরাতন্ত্র একত্রে দেহের অঙ্গাসমূহের সব কার্যাবলির সমন্বয় সাধন এবং একত্রীকরণ করে যাতে অঙ্গাগুলোর কার্যাবলি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

স্নায়ুতন্ত্র দ্রুত সমন্বয়সাধনের জন্য নিউরোনগুলোর মধ্যে প্রান্ত থেকে প্রান্তে সংযোগের একটি সংগঠিত স্নায়ুজালক গঠন করে। অন্তঃক্ষরাতন্ত্র হরমোনগুলোর মাধ্যমে রাসায়নিক সমন্বয়সাধন করে। এই অধ্যায়ে তোমরা মানুষের স্নায়ুতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্রের সমন্বয়সাধন প্রক্রিয়া, যেমন স্নায়ুস্পন্দন প্রেরণ, সাইন্যাপস অর্থাৎ স্নায়ুসন্নিধি বরাবর স্নায়ুস্পন্দন পরিবহণ এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়ার শারীরস্থান সম্পর্কে জানবে।

21.1. স্নায়ুতন্ত্র (Neural System) :

সব প্রাণীদের স্নায়ুতন্ত্র অত্যন্ত বিশেষিত কোশসমূহ নিয়ে গঠিত। এই কোশগুলোকে নিউরোন বলে। যারা বিভিন্ন ধরনের উদ্দীপকের শনাক্তকরণ, গ্রহণ এবং প্রেরণ করতে পারে।

নিম্নশ্রেণির অমেরুদন্ডী প্রাণীদের স্নায়ুতন্ত্রের সংগঠন খুবই সরল হয়। উদাহরণস্বরূপ, হাইড্রার স্নায়ুতন্ত্রটি নিউরোনের একটি জালক নিয়ে গঠিত। পতঙ্গাদের দেহে অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে সংগঠিত স্নায়ুতন্ত্র থাকে, যেখানে মস্তিষ্কটি কিছু সংখ্যক গ্যাংলিয়া এবং স্নায়ুকলা সহযোগে উপস্থিত থাকে। মেরুদন্ডী প্রাণীদের স্নায়ুতন্ত্র আরও সুগঠিত হয়।

21.2. মানুষের স্নায়ুতন্ত্র (Human Neural System) :

মানুষের স্নায়ুতন্ত্রকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

(i) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (CNS)

(ii) প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (PNS)

মস্তিষ্ক ও সুষন্নাকান্ড হল কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং এই স্থানটি হল তথ্যের বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের (মস্তিষ্ক ও সুষুন্নাকান্ড) সঙ্গে যুক্ত দেহের সমস্ত স্নায়ুগুলো নিয়ে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত হয়। প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুতন্তুগুলো দুই প্রকার যথা—

(ক) অন্তর্বাহী স্নায়ুতন্তু

(খ) বহির্বাহী স্নায়ুতন্তু

অন্তর্বাহী স্নায়ুতন্তুগুলো স্নায়ুস্পন্দন কলা বা অঙ্গা থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র প্রেরণ করে এবং বহির্বাহী স্নায়ুতন্তুগুলো কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে সংশ্লিষ্ট প্রান্তীয় কলা বা অঙ্গো নিয়ন্ত্রণকারী স্পন্দন প্রেরণ করে।

প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রকে দুভাগে ভাগ করা হয়, যথা — সোমাটিক স্নায়ুতন্ত্রে ও স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র। সোমাটিক স্নায়ুতন্ত্র কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে স্নায়ুস্পন্দন অস্থিপেশিতে নিয়ে যায়। অপরদিকে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে দেহের অনৈচ্ছিক অঙ্গাসমূহে ও মসৃণ পেশিতে স্নায়ুস্পন্দন প্রেরণ করে। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রকে আবার দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে, যথা — স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র ও পরাস্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র।

আন্তরযন্ত্রীয় স্নায়ুতন্ত্র পরাস্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের একটি অংশ যা অনেকগুলো স্নায়ুতন্তু, গ্যাংলিয়া এবং শাখান্বিত স্নায়ুজালকের (Plexuses) সমন্বয়ে গঠিত, যার দ্বারা স্নায়ুস্পন্দন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে আন্তরযন্ত্রে এবং আন্তরযন্ত্র থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পরিবাহিত হয়।

21.3. নিউরোন - স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত ও কার্যগত একক (Neuron as Structural and functional unit of neuron system) :

নিউরোন একটি আণুবীক্ষণিক গঠন যা তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত, যথা — কোশদেহ, ডেনড্রাইট ও অ্যাক্সন (চিত্র 21.1 দেখো)। কোশদেহটি সাইটোপ্লাজম সমন্বিত এবং এই সাইটোপ্লাজমে আদর্শ কোশীয় অঙ্গাণু ও কিছু দানাদার বস্তু বর্তমান। এই দানাদার বস্তুগুলোকে নিজল দানা বলে। কোশদেহের বাইরে প্রবর্ধিত ও বারংবার শাখান্বিত ক্ষুদ্র তন্তুসমূহ যারা নিজলদানা সমন্বিত হয়, তাদের ডেনড্রাইটস বলে। এই তন্তুগুলো স্নায়ু উদ্দীপনা কোশদেহের অভিমুখে প্রেরণ করে।

অ্যাক্সন একটি দীর্ঘ তন্তু। যার দূরবর্তী প্রান্তটি শাখান্বিত হয়। অ্যাক্সনের দূরবর্তী প্রান্তের প্রতিটি শাখার শেষ প্রান্ত বাল্বের ন্যায় গঠন বিশিষ্ট হয়। একে স্নায়ু সন্নিধিস্ফীতি বলে। এই স্নায়ু সন্নিধিস্ফীতির ভেতরে রাসায়নিক পদার্থপূর্ণ সন্নিধি থলি বর্তমান। এই রাসায়নিক পদার্থগুলোকে নিউরোট্রান্সমিটার বলে। অ্যাক্সন স্নায়ুস্পন্দন কোশদেহ থেকে দূরবর্তী স্নায়ুসন্নিধিতে বা স্নায়ুপেশির সংযোগস্থলে প্রেরণ করে। ডেনড্রন ও অ্যাক্সনের সংখ্যার উপর নির্ভর করে স্নায়ুকোশকে তিনভাগে ভাগ করা হয়, যথা — মাল্টিপোলার বা বহুমেরু নিউরোন (একটি অ্যাক্সন এবং দুই বা তার বেশি ডেনড্রাইট সমন্বিত, গুরুমস্তিষ্কে পাওয়া যায়), বাইপোলার বা দ্বিমেরু নিউরোন (একটি মাত্র অ্যাক্সন ও একটিমাত্র ডেনড্রন সমন্বিত, চোখের রেটিনাতে পাওয়া যায়) এবং ইউনিপোলার বা একমেরু নিউরোন (কেবলমাত্র একটি অ্যাক্সন সমন্বিত কোশদেহ, সাধারণত ভ্রুণ অবস্থায় দেখা যায়)। দুই প্রকার অ্যাক্সন রয়েছে যথা — মায়োলিনযুক্ত এবং মায়োলিন বিহীন। মায়োলিনযুক্ত স্নায়ুতন্ত্রগুলোতে সোয়ান কোশ সমন্বিত আবরণ থাকে। সোয়ান কোশগুলো অ্যাক্সনকে ঘিরে মায়োলিন সিদ গঠন করে। দুটো মায়োলিন সিদ্-এর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকে ব্যানভিয়ারের পর্ব বলে। করোটি স্নায়ু ও সুষুম্নাস্নায়ুতে মায়োলিনযুক্ত স্নায়ুতন্ত্র দেখা যায়। মায়োলিন বিহীন স্নায়ুতন্তুতে সোয়ান কোশ বর্তমান থাকলেও এই সোয়ান কোশগুলো অ্যাক্সনকে ঘিরে মায়োলিন সিদ্ গঠন করে না। স্বয়ংক্রিয় ও সোমাটিক স্নায়ুতন্ত্রে মায়োলিন বিহীন স্নায়ুতন্তু দেখা যায়।

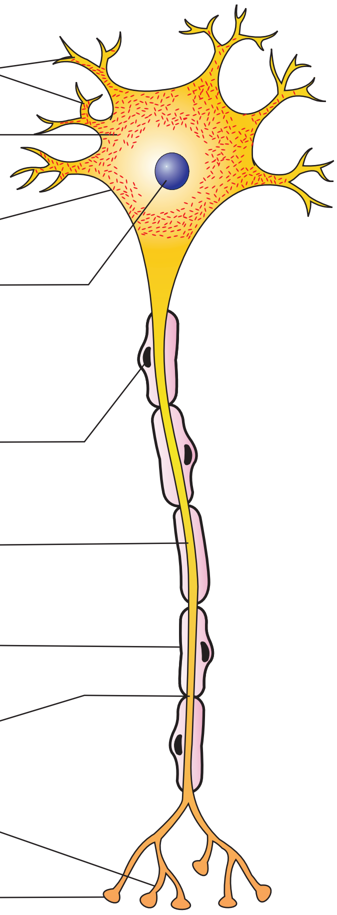

চিত্র 21.1 ঃ নিউরোনের গঠন

21.3.1. স্নায়ুস্পন্দনের উৎপত্তি এবং প্রবাহ (Generation and Conduction of Nerve Impulse) :

স্নায়ুকোশের কোশপর্দা সমবর্তিত অবস্থা থাকার কারণে স্নায়ুকোশসমূহ উত্তেজক ধর্মী হয়। তোমরা কি জান কেন নিউরোনের কোশপর্দা সমবর্তিত অবস্থায় থাকে? স্নায়ুকোশের কোশপর্দায় বিভিন্ন ধরনের আয়ন চ্যানেল বর্তমান। এই আয়ন চ্যানেলগুলো বিভিন্ন ধরনের আয়নের জন্য প্রভেদক ভেদ্য। যখন কোনো নিউরোনের ভেতর দিয়ে স্নায়ুস্পন্দন পরিবাহিত হয় না অর্থাৎ বিশ্রামরত অবস্থায় অ্যাক্সন ঝিল্লি তুলনামূলকভাবে পটাশিয়াম (K^+) আয়নের প্রতি বেশি ভেদ্য হয় এবং সোডিয়াম (Na^+) আয়নের জন্য প্রায় অভেদ্য হয়। অনুরূপভাবে, অ্যাক্সনের ঝিল্লিপর্দা অ্যাক্সোপ্লাজমে উপস্থিত ঋণাত্মক আধানযুক্ত প্রোটিনের প্রতি ও অভেদ্য হয়। ফলস্বরূপ অ্যাক্সনের অ্যাক্সোপ্লাজমের মধ্যে পটাশিয়াম (K^+) আয়নের ঘনত্ব ও ঋণাত্মক আধানযুক্ত প্রোটিনের পরিমান বেশি থাকে এবং সোডিয়াম (Na^+) আয়নের ঘনত্ব কম থাকে। বিপরীতভাবে অ্যাক্সন বহিঃস্থ তরলে K^+এর ঘনত্ব কম থাকে, Na^+ এর ঘনত্ব বেশি থাকায় একটি ঘনত্বের নতিমাত্রা তৈরি হয়। বিশ্রামরত অবস্থায় পর্দার মধ্য দিয়ে আয়নের এই নতিমাত্রা সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প দ্বারা আয়নের সক্রিয় পরিবহণের মাধ্যমে বজায় থাকে। এই সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প 3টি Na^+ ও 2টি K^+ যথাক্রমে কোশের বাইরে ও ভেতরে পরিবহণ করে।

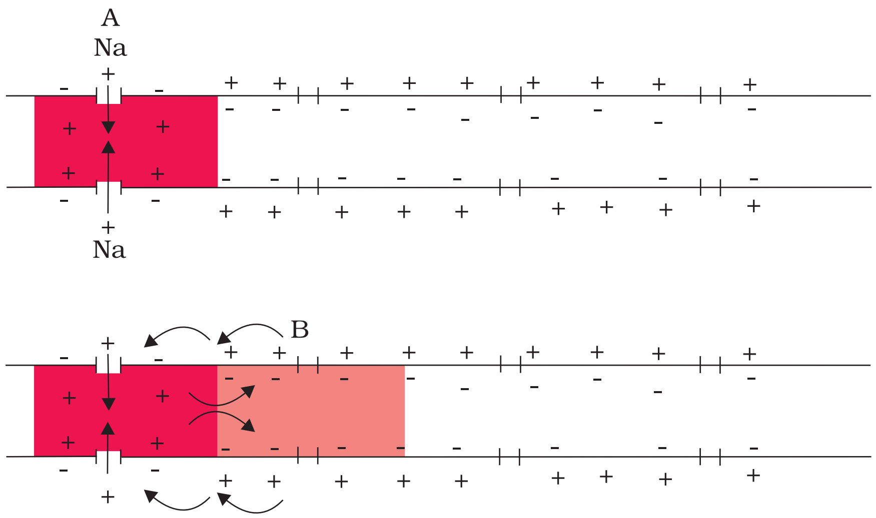

চিত্র 21.2 ঃ অ্যাক্সনের মধ্য দিয়ে স্নায়ুস্পন্দন পরিবহণের চিত্ররূপ (A এবং B স্থানে)

এরফলে অ্যাক্সন ঝিল্লির বহির্পৃষ্ঠ ধনাত্মক আধান যুক্ত হয়। যেখানে ভেতরের পৃষ্ঠে ঋণাত্মক আধান বজায় থাকে। এই অবস্থাকে ঝিল্লির সমবর্তিত বা পোলারাইজড অবস্থা বলে। স্থিতাবস্থায় কোশপর্দার মধ্য দিয়ে যে তড়িৎ বিভবের পার্থক্যের সৃষ্টি হয়, তাকে স্থিতিবিভব বলে।

অ্যাক্সন বরাবর স্নায়ুস্পন্দনের সৃষ্টি এবং পরিবহণের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে তোমরা কৌতুহলী হতে পারো। যখন সমবর্তিত ঝিল্লির একটা নির্দিষ্ট স্থানে (চিত্র 21.2, উদাহরণ A বিন্দুতে) উদ্দীপনা প্রয়োগ করা হয়, ঝিল্লির ওই স্থান (A স্থান) Na^+ এর জন্য সহজভেদ্য হয়ে পড়ে। এরফলে দ্রুত Na^+ ঝিল্লির ভেতরে প্রবেশ করে, সেই সাথে ওই স্থানের বিসমবর্তন ঘটে। অর্থাৎ স্নায়ুঝিল্লির বহির্পৃষ্ঠ ঋণাত্মক আধানে আহিত ও অন্তর্পৃষ্ঠ ধনাত্মক আধানে আহিত হয়। A বিন্দুতে পর্দার মেরুপ্রবণতা উল্টো হয়ে যায়, অর্থাৎ ওই বিন্দুতে পর্দাটির বিসমবর্তন ঘটে। A বিন্দুতে কোশপর্দার মধ্য দিয়ে তড়িৎ বিভবের পার্থক্যকে ক্রিয়াবিভব (Action Potential) বলে যাকে প্রকৃত অর্থে স্নায়ুস্পন্দন বলে। ওই স্থানগুলোর ঠিক সামনে অ্যাক্সন (উদাহরণ B বিন্দুতে) ঝিল্লির বহির্পৃষ্ঠে ধনাত্মক আধান থাকে ও ভেতরের পৃষ্ঠে ঋণাত্মক আধান থাকে। এরফলে ঝিল্লির অন্তর্পৃষ্ঠে A বিন্দু থেকে B বিন্দুতে তড়িৎ প্রবাহ ঘটে। তড়িৎ বর্তনীর মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ সম্পূর্ণ করার জন্য তড়িৎপ্রবাহ বহির্পৃষ্ঠে B স্থান থেকে A স্থানের দিকে ঘটে (চিত্র 21.2 দেখো)। তাই এই স্থানে মেরুপ্রবণতা উল্টে যায় এবং B স্থানে ক্রিয়াবিভবের সৃষ্টি হয়। এভাবে, A স্থানে সৃষ্ট স্নায়ুস্পন্দন (ক্রিয়া বিভব) B স্থানে পৌঁছায়। অ্যাক্সনের দৈর্ঘ্য বরাবর এই ক্রমিক ঘটনাবলির পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং ফলস্বরূপ স্নায়ুস্পন্দনের পরিবহণ ঘটে। উদ্দীপক প্রভাবিত Na^+ এর ভেদ্যতা বৃদ্ধি খুব কম সময়ের জন্য স্থায়ী হয়। এরপরই কোশপর্দার মধ্য দিয়ে K^+ এর ভেদ্যতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে K^+ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় দ্রুত ঝিল্লির বাইরে বেরিয়ে যায় এবং উদ্দীপনা স্থানে পুনরায় স্থিতিবিভব তৈরি হয় ও তন্তুটি আবার নূতন কোনো উদ্দীপনায় সাড়া দিতে অধিক সক্ষম হয়।

21.3.2. স্নায়ুস্পন্দন প্রেরণ পদ্ধতি (Transmission of Impulses):

স্নায়ুস্পন্দন একটি নিউরোন বা স্নায়ুকোশ থেকে অন্য স্নায়ুকোশে যে সংযোগস্থলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তাকে স্নায়ুসন্নিধি (Synaptic) বলে। একটি স্নায়ুসন্নিধি প্রাক্‌সন্নিধি নিউরোন (Pre Synaptic) ও পশ্চাদ সন্নিধি (Post Synaptic) নিউরোনের পর্দাগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয়। স্নায়ুসন্নিধিতে দুটি পর্দার মধ্যে কোনো ফাঁকা স্থান থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। এই ফাঁকা স্থানটিকে সন্নিধিপ্রণালী (Synaptic Cleft) বলে। স্নায়ুসন্নিধি দুই ধরনের হয়। যথা — তড়িৎ স্নায়ুসন্নিধি (Electrical Synapses) এবং রাসায়নিক স্নায়ুসন্নিধি (Chemical Synapses)। তড়িৎ স্নায়ু সন্নিধিতে প্রাক্ ও পশ্চাদসন্নিধি নিউরোনের পর্দাগুলো খুবই কাছাকাছি থাকে। এই সন্নিধিগুলোর মধ্য দিয়ে একটি নিউরোন থেকে অপর নিউরোনে তড়িৎপ্রবাহ সরাসরি ঘটতে পারে। তড়িৎ স্নায়ুসন্নিধির মধ্য দিয়ে স্নায়ু স্পন্দনের পরিবহণ অনেকটা একটি একক অ্যাক্সনের মধ্য দিয়ে স্নায়ু স্পন্দন পরিবহণের মতোই হয়। রাসায়নিক স্নায়ুসন্নিধির তুলনায় তড়িৎ স্নায়ুসন্নিধির মধ্য দিয়ে স্নায়ুস্পন্দনের পরিবহণ সবসময়ই দ্রুত হয়। আমাদের স্নায়ুতন্ত্রে তড়িৎ স্নায়ুসন্নিধির উপস্থিতি খুবই কম দেখা যায়।

একটি রাসায়নিক স্নায়ুসন্নিধিতে প্রাক্‌সন্নিধি ঝিল্লি ও পশ্চাদসন্নিধি ঝিল্লি একটি তরলপূর্ণ স্থান দ্বারা পৃথক থাকে একে সন্নিধি প্রণালী (Synaptic Cleft) বলে (চিত্র 21.3 দেখো)। তোমরা কি জান কীভাবে প্রাক্‌সন্নিধি নিউরোন সন্নিধি প্রণালীর মধ্য দিয়ে স্নায়ুস্পন্দন (ক্রিয়া বিভব) পশ্চাদসন্নিধি নিউরোনে প্রেরণ করে? এইসব স্নায়ুসন্নিধিগুলোতে যে রাসায়নিক পদার্থসমূহ স্নায়ুস্পন্দন পরিবহণের কাজ করে থাকে তাদের নিউরোট্রান্সমিটার বলে। অ্যাক্সনের শেষপ্রান্তে উপস্থিত থলিগুলো এইসব নিউরোট্রান্সমিটার পূর্ণ হয়।

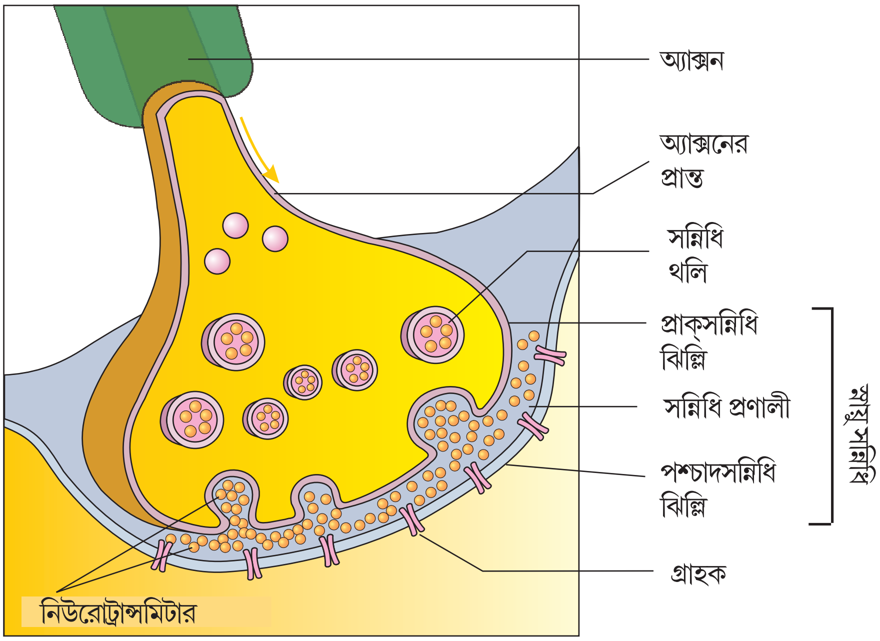

চিত্র 21.3 ঃ চিত্রের মাধ্যমে অ্যাক্সনের প্রান্ত এবং স্নায়ুসন্নিধি দেখানো হল

যখন একটি স্নায়ুস্পন্দন (ক্রিয়াবিভব) অ্যাক্সন প্রান্তে এসে পৌঁছায়, এটি পর্দা অভিমুখে সন্নিধিথলিগুলোর চলনকে উদ্দীপিত করে যেখানে এই থলিগুলো পর্দার সাথে মিলিত হয় এবং তাদের নিউরোট্রান্সমিটারগুলো সন্নিধি প্রণালীতে মুক্ত হয়। সন্নিধিথলি থেকে নির্গত নিউরোট্রান্সমিটারগুলো তাদের নির্দিষ্ট গ্রাহকের সাথে যুক্ত হয়। এই সংযুক্তির ফলে আয়ন চ্যানেলগুলো উন্মুক্ত হয় ও আয়নগুলো পশ্চাদসন্নিধি নিউরোনে প্রবেশ করে, যার ফলে এই নিউরোনটিতে একটি নতুন ক্রিয়াবিভব সৃষ্টি হতে পারে। সৃষ্ট এই নতুন বিভবটি উদ্দীপকধর্মী বা প্রতিরোধধর্মী হতে পারে।

21.4 কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Neural System) :

মস্তিষ্ক হল আমাদের দেহের কেন্দ্রীয় তথ্য বিশ্লেষণকারী অঙ্গ যা দেহের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ তন্ত্র হিসাবে কাজ করে। এটি ঐচ্ছিক চলন, দেহের ভারসাম্য রক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ অনৈচ্ছিক অঙ্গাসমূহের কাজ (উদাহরণ ফুসফুস, হৃৎপিন্ড, বৃক্ক ইত্যাদি), দেহ উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, আমাদের দেহের সারকার্ডিয়ান ছন্দ (প্রতি 24 ঘণ্টায় সংঘটিত ছান্দিক ঘটনাপ্রবাহ), বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কার্যকারিতা ও মানুষের আচরণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। এটি দর্শন, শ্রবণ, বাকশক্তি, স্মৃতি, বুদ্ধিমত্তা, আবেগ এবং চিন্তাভাবনা ইত্যাদি কাজগুলোর বিশ্লেষণ স্থান রূপে কাজ করে।

মানুষের মস্তিষ্ক করোটি দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। করোটির মধ্যে মস্তিষ্কটি ক্রেনিয়েল মেনিনজেস (Cranial meninges) দিয়ে আবৃত থাকে। মানুষে এই ক্রেনিয়েল মেনিনজেস ত্রিস্তরীয় হয়, বাইরের স্তরটিকে বলে ডুরা ম্যাটার (dura mater), মধ্যবর্তী খুবই পাতলা স্তরটিকে বলে অ্যারকনয়েড (arachnoid) এবং ভেতরের স্তরটিকে (যারা মস্তিষ্ক কলার সংস্পর্শে থাকে) পিয়া ম্যাটার (Pia mater) বলে। মস্তিষ্ককে তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা যেতে পারে (i) অগ্রমস্তিষ্ক (Fore brain) (ii) মধ্যমস্তিষ্ক (Mid brain) (iii) পশ্চাদ মস্তিষ্ক (hind brain) (চিত্র 21.4 দেখো)।

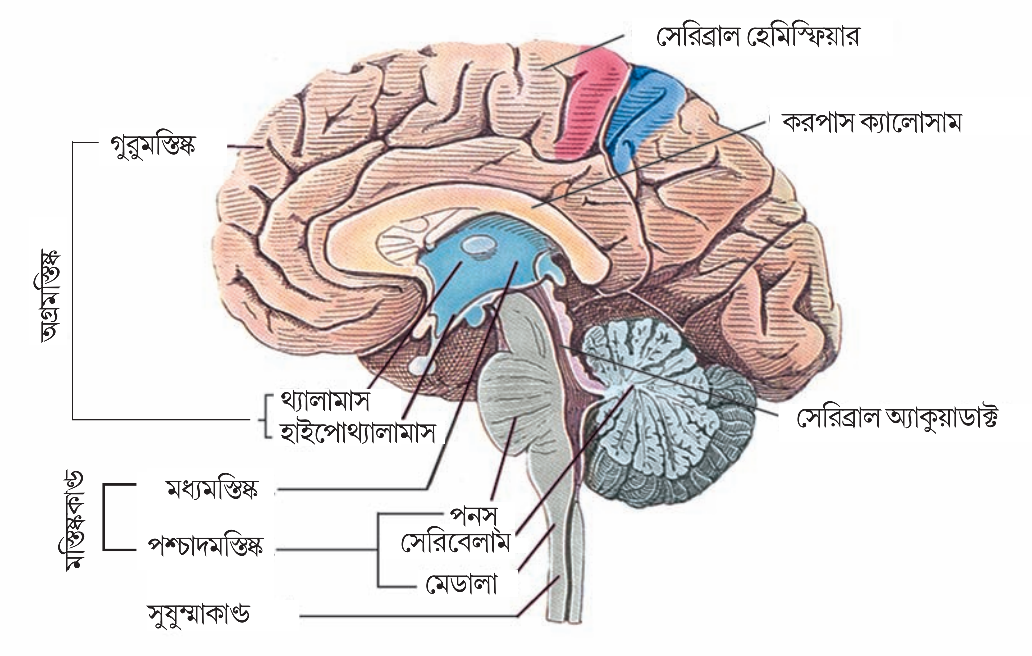

চিত্র 21.4 ঃ মানুষের মস্তিষ্কের লম্বচ্ছেদের চিত্ররূপ

21.4.1. অগ্রমস্তিষ্ক (Fore brain) :

অগ্রমস্তিষ্ক গুরুমস্তিষ্ক, থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস নিয়ে গঠিত (চিত্র 21.4 দেখো)। মানুষের মস্তিষ্কের বেশির ভাগ অংশ গুরুমস্তিষ্ক নিয়ে গঠিত। একটি গভীর খাঁজ গুরুমস্তিষ্ককে লম্বালম্বিভাবে দুটি গোলার্ধে বিভক্ত করে, এদের বাম সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার ও ডান সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার বলে। গোলার্ধ দুটি করপাস ক্যালোসাম নামক স্নায়ুযোজক দ্বারা সংযুক্ত থাকে। সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারকে যে কোশস্তর আবৃত করে রাখে তাকে সেরিব্রাল কর্টেক্স বলে এবং এই কোশসমূহ পরবর্তীতে বহু সুস্পষ্ট ভাঁজ গঠন করে। বাহ্যিক দিক থেকে ধূসর বর্ণের হওয়ায় গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্স অংশটিকে ধূসর বস্তু বলে। এই অঞ্চলে নিউরোনের কোশদেহগুলো ঘনীভূত হয়ে এই ধূসর বর্ণ ধারণ করে। গুরুমস্তিষ্কটি চেষ্টীয় অঞ্চল, সংজ্ঞাবহ অঞ্চল এবং চেষ্টীয় ও সংজ্ঞাবহ কোনোটিই নয় এমনকিছু বৃহৎ অঞ্চল সমন্বিত হয়। এই অঞ্চলগুলোকে বলা হয় সহযোগী অঞ্চল (association area) যা দুটি আন্তঃসংজ্ঞাবহ সংযোগ, স্মৃতি এবং যোগাযোগের মত জটিল কাজগুলো সম্পাদনের জন্য দায়ী। স্নায়ুপথ গঠনকারী তন্তুসমূহ মায়োলিন সিদ্ দিয়ে আবৃত থাকে এবং এই তন্তু সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের ভেতরের অংশ গঠন করে। ভেতরের এই অংশ বাহ্যিকভাবে অস্বচ্ছ সাদা দেখায় এবং তাই একে শ্বেতবস্তু বলে। গুরুমস্তিষ্ক যে গঠনকে ঘিরে থাকে তাকে থ্যালামাস বলে যা আজ্ঞাবহ ও সংজ্ঞাবহ সংকেতের মুখ্য সমন্বয়সাধন কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। হাইপোথ্যালামাস মস্তিষ্কের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা থ্যালামাসের মূলদেশে অবস্থান করে। হাইপোথ্যালামাসে দেহের তাপমাত্রা, খাদ্যগ্রহণ এবং তৃষ্ণা নিবারণের স্পৃহা নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রগুলো অবস্থিত। হাইপোথ্যালামাসে নিউরোসিক্রেটারি কোশের বেশ কিছু গুচ্ছও রয়েছে যারা হরমোন ক্ষরণ করে। এই হরমোনগুলোকে হাইপোথ্যালামিক হরমোন বলে। সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের ভেতরের অংশ এবং অ্যামিগডালা, হিপ্পোক্যাম্পাস ইত্যাদির মতো গভীরে অবস্থিত সহযোগী গঠনগুলো একটি জটিল গঠনের সৃষ্টি করে, একে লিম্বিকতন্ত্র বলে। হাইপোথ্যালামাস সহ এই তন্ত্রটি যৌন আচরণ, আবেগের বহিঃপ্রকাশ (উত্তেজনা, আনন্দ, ক্রোধ ও ভয়) এবং প্রেষণা নিয়ন্ত্রণ করে।

21.4.2. মধ্যমস্তিষ্ক (Mid Brain) :

অগ্রমস্তিষ্কের থ্যালামাস অথবা হাইপোথ্যালামাসের মধ্যে এবং পশ্চাদ মস্তিষ্কের পনস্-এর মধ্যবর্তী স্থানে মধ্যমস্তিষ্ক অবস্থিত। মধ্যমস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে একটি প্রণালী অতিক্রম করে যাকে সেরিব্রাল অ্যাকুয়াডাক্ট (Cerebral aqueduct) বলে। মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠীয় অংশ চারটি গোলাকার স্ফীত খণ্ডক সমন্বিত হয়, এদের করপোরা কোয়াড্রিজেমিনা (**corpora quadrigemina**) বলে। মধ্যমস্তিষ্ক ও পশ্চাদমস্তিষ্ক মস্তিষ্ককাণ্ড গঠন করে।

21.4.3. পশ্চাদ মস্তিষ্ক (Hind Brain) :

পনস্, লঘুমস্তিষ্ক এবং মেডালা (মেডালা অবলংগাটা) মিলে পশ্চাদমস্তিষ্ক গঠন করে। পনস সেইসব স্নায়ুপথ সমূহের সমন্বয়ে গঠিত যেগুলো মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চলগুলোকে পরস্পরের সাথে যুক্ত রাখে। বহু নিউরোনের জন্য অতিরিক্ত স্থান প্রদানের নিমিত্ত সেরিবেলামের উপরিতল অত্যন্ত কুণ্ডলীত হয়। মস্তিষ্কের মেডালা অংশ সুষুম্নাকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে। মেডালায় অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রগুলো শ্বসন, কার্ডিওভাসকুলার রিফ্লেক্স ও গ্যাসট্রিক রস ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

21.5 প্রতিবর্ত ক্রিয়া ও প্রতিবর্ত চাপ (Reflex action and Reflex Arc) :

শরীরের কোনো অংশ আকস্মিকভাবে অতিরিক্ত গরম, ঠান্ডা, সূচালো বস্তু বা ভীতিকর অথবা বিষাক্ত কোনো প্রাণীর সংস্পর্শে এলে তৎক্ষণাৎ সেই অংশকে সরিয়ে নেওয়ার অভিজ্ঞতা তোমাদের সবারই আছে। প্রান্তীয় স্নায়বিক উদ্দীপনায় সাড়া দানের এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি যেটি অনৈচ্ছিকভাবে অর্থাৎ সচেতন প্রচেষ্টা বা চিন্তা ছাড়াই এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের একটি অংশের দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে। প্রতিবর্ত ক্রিয়াপথে কমপক্ষে একটি অন্তর্বাহী নিউরোন (গ্রাহক) ও একটি বহির্বাহী নিউরোন (কারক অথবা উত্তেজক) থাকে যেগুলো সঠিক ক্রমে সজ্জিত থাকে (চিত্র 21.5 দেখো)। অন্তর্বাহী নিউরোন সংজ্ঞাবহ অঙ্গ থেকে সংকেত গ্রহণ করে এবং তা পৃষ্ঠীয় স্নায়ুমূলের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে (সুষুম্নাকাণ্ডে) প্রেরণ করে। বহির্বাহী নিউরোন তখন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে সংকেত কারক অঙ্গে প্রেরণ করে। উদ্দীপনা ও তার প্রতিক্রিয়া এইভাবে একটি প্রতিবর্ত পথ তৈরি করে যা নীচে হাঁটু ঝাঁকি প্রতিবর্তের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। হাঁটু ঝাঁকি প্রক্রিয়াটি বোঝার জন্য তোমরা যত্ন সহকারে (চিত্র 21.5) অধ্যয়ন করবে।

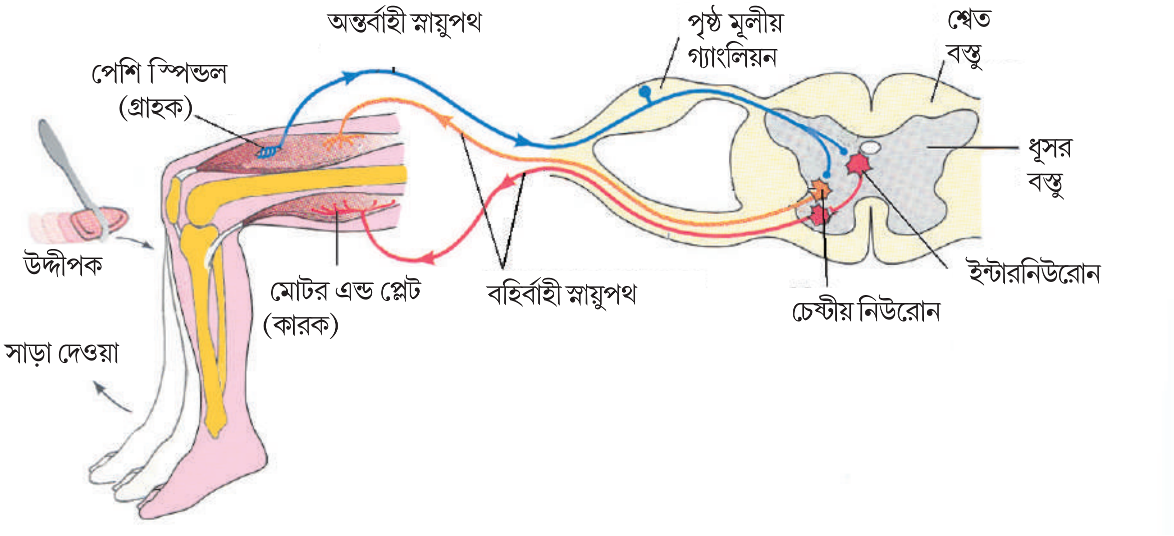

চিত্র 21.5 ঃ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার চিত্ররূপ (হাঁটু ঝাঁকি প্রতিবর্ত প্রদর্শন করা হল)

21.6 সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনা গ্রহণ ও তার বিশ্লেষণ (Sensory Reception and Processing) :

তোমরা কি কখনও ভেবেছ, তোমরা কীভাবে পরিবেশে জলবায়ু পরিবর্তন অনুভব কর? তোমরা কীভাবে কোনো জিনিস ও তার বর্ণ বা রং দেখতে পাও? তোমরা কীভাবে শব্দ শুনতে পাও? জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো পরিবেশের সমস্ত পরিবর্তনগুলো শনাক্ত করে এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে সঠিক সংকেত পাঠায় যেখানে সকল প্রকার গৃহীত সংবাদের প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ ঘটে। এরপর এই সংকেতগুলো মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে বা কেন্দ্রে প্রেরিত হয়। এভাবেই, তোমরা পরিবেশের পরিবর্তনগুলোকে অনুধাবন করতে পারো। পরবর্তী অংশগুলোতে তোমরা চোখের (দর্শনেন্দ্রিয়) এবং কর্ণের (শ্রবণেন্দ্রিয়) গঠন ও কাজ সম্বন্ধে পরিচিত হবে।

জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ (Sense Organs):

আমরা নাক দ্বারা বস্তুর গন্ধ শুঁকি, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করি, কানের সাহায্যে শুনি এবং চোখের সাহায্যে বিভিন্ন বস্তু দেখি। গন্ধ শোঁকার জন্য নাকে মিউকাস দ্বারা আবৃত কিছু বিশেষিত গ্রাহক বর্তমান। এদেরকে অলফেক্টরি গ্রাহক (ঘ্রাণগ্রাহক) বলে। এগুলো অলফেক্টরি এপিথেলিয়াম সমন্বিত তিন ধরনের কোশসমূহ নিয়ে গঠিত। অলফেক্টরি এপিথেলিয়ামের নিউরোণগুলো বর্হিপরিবেশ থেকে বিস্তৃত হয়ে সরাসরি একজোড়া ব্রডবীন আকারের অঙ্গে গিয়ে শেষ হয়। এই অঙ্গাগুলোকে অলফেক্টরি বাল্ব বলে যারা মস্তিষ্কের লিম্বিকতন্ত্রের প্রসারিত অংশ।

নাক এবং জিহ্বা উভয়ই দ্রবীভূত রাসায়নিক পদার্থগুলোকে শনাক্ত করতে পারে। স্বাদ ও ঘ্রাণের রাসায়নিক গ্রাহকগুলো কার্যগতভাবে এক এবং একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। জিহ্বা স্বাদগ্রাহক সমন্বিত স্বাদ কোরকের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের স্বাদ শনাক্ত করে। খাবার খেলে বা পানীয়তে চুমুক দিলে প্রতিটি ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক স্বাদ কোরক থেকে আসা বিভিন্ন ধরনের স্নায়বিক বার্তাকে একীভূত করে এবং এর ফলে একটি জটিল স্বাদ অনুভূত হয়।

21.6.1 চোখ (Eye):

আমাদের চক্ষুদ্বয় করোটির যে কুঠুরিগুলোতে অবস্থান করে তাদের অক্ষিকোটর বলে। নিম্নে মানুষের চোখের গঠন ও কাজ সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

21.6.1.1 চোখের বিভিন্ন অংশ (Parts of an eye) :

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের অক্ষিগোলক প্রায় গোলাকার হয়। এই চক্ষুগোলকের প্রাচীর ত্রিস্তরী হয় (চিত্র 21.6 দেখো)। বাইরের স্তরটি ঘন যোজককলা দ্বারা তৈরি, তাকে বলে স্ক্লেরা (Sclera)। এই স্তরের সম্মুখ অংশকে বলে কর্ণিয়া (Cornea)। মধ্যস্তরের কোরয়েড (Choroid) বহু রক্তবাহ সমন্বিত হয় এবং একে নীলাভ দেখায়। অক্ষিগোলকের পশ্চাদদিকের দুই-তৃতীয়াংশ কোরয়েড স্তর পাতলা হয়। কিন্তু এটি সম্মুখ অংশে মোটা হয়ে সিলিয়ারি বডি গঠন করে। সিলিয়ারি বডি সম্মুখ দিকে প্রসারিত হয়ে একটি রঞ্জকযুক্ত এবং অস্বচ্ছ গঠন তৈরি করে, একে আইরিস বলে। আইরিস হল চোখের দৃশ্যমান বর্ণময় অংশ। অক্ষিগোলকে একটি স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো লেন্স থাকে। এটি সিলিয়ারি বডির সাথে যুক্ত লিগামেন্টের সাহায্যে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। লেন্সের সম্মুখ ভাগে আইরিস দ্বারা পরিবেষ্টিত অংশটিকে তারারন্ধ্র (Pupil) বলে। আইরিস এর পেশিতন্তু দ্বারা তারারন্ধ্রের ব্যাস নিয়ন্ত্রিত হয়।

অক্ষিগোলকের একেবারে ভেতরের স্তরটি হল রেটিনা এবং এতে তিনটি স্তর দেখা যায়। ভেতর থেকে বাইরের দিকে অবস্থানরত কোশগুলো হল — গ্যাংলিয়ন কোশ, বাইপোলার কোশ এবং আলোকগ্রাহী কোশ (Photoreceptor cells)।

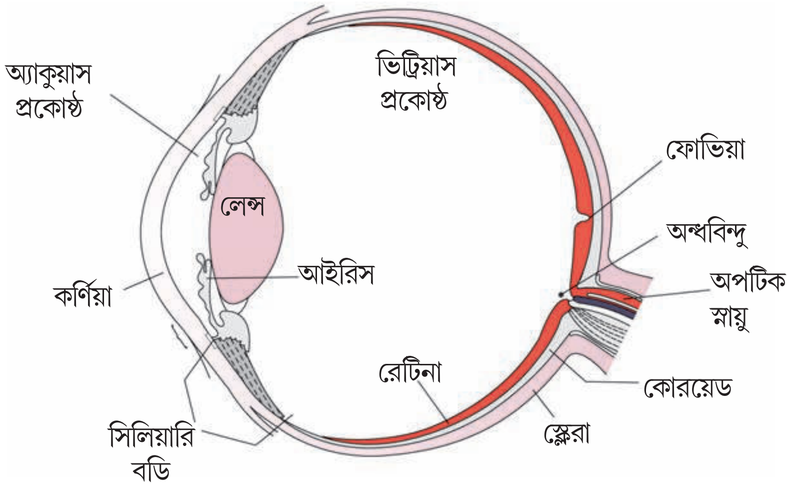

চিত্র 21.6 ঃ চিত্রে চক্ষুর বিভিন্ন অংশ দেখানো হয়েছে।

রেটিনাতে দুই রকমের আলোকগ্রাহী কোশ দেখা যায় — রড কোশ ও কোন কোশ। এই কোশগুলোতে বর্তমান আলোক সংবেদী প্রোটিনগুলোকে ফটোপিগমেন্ট (Photopigment) বলে। কোন কোশ দিবালোকে (Photopic) কোনো বস্তুকে দেখতে এবং কোনো বস্তুর বর্ণ বা রং (Scotopic) শনাক্ত করতে সাহায্য করে। রড কোশগুলো মৃদু আলোতে কোনো বস্তুকে দেখতে সাহায্য করে। রড কোশে রডোপসিন বা ভিসুয়েল পার্পাল নামক বেগুনি-লাল বর্ণের প্রোটিন থাকে যার মধ্যে ভিটামিন A এর লব্ধ পদার্থও থাকে। মানুষের চোখে তিন ধরনের কোন কোশ থাকে এবং এদের প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত আলোক সংবেদী রাসায়নিক পদার্থ থাকায় এরা লাল, সবুজ ও নীল আলোকে সাড়া দেয়। এই তিন প্রকার কোন কোশ ও তাদের রঞ্জকের বিভিন্ন সমন্বয় দ্বারা বিভিন্ন রঙের সংবেদনের সৃষ্টি হয়। কোন কোশগুলো যখন সমভাবে উদ্দীপিত হয় তখন একটি সাদা আলোকের সংবেদনের সৃষ্টি হয়।

অক্ষিগোলকের পশ্চাদমেরুর কিছুটা উপরে এবং মধ্যবর্তী স্থানে রেটিনার রক্তবাহ প্রবেশ করে এবং অপটিক স্নায়ু বেরিয়ে আসে। এই অঞ্চলে কোনো আলোক গ্রাহী কোশ থাকে না। তাই একে অন্ধবিন্দু বলে। চক্ষুর পশ্চাদমেরুতে অন্ধবিন্দুর পাশে যে হলুদাভ রঞ্জক বিন্দু থাকে তাকে ম্যাকুলা লুটিয়া বলে, এর কেন্দ্রীয় কূপটিকে ফোবিয়া বলে। রেটিনার পাতলা উদ্‌গত অংশটিকে বলে ফোবিয়া যেখানে কোন কোশগুলো ঘনসন্নিবিষ্ট অবস্থায় থাকে। রেটিনার এই অংশেই কোনো বস্তুর সবচেয়ে স্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

লেন্স ও কর্ণিয়ার মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠটিকে অ্যাকুয়াস প্রকোষ্ঠ বলে এবং এই প্রকোষ্ঠটি পাতলা জলীয় তরল পূর্ণ থাকে, এই তরলটিকে অ্যাকুয়াস হিউমর বলে। লেন্স ও রেটিনার মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠটিকে ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠ বলে। এই প্রকোষ্ঠটি স্বচ্ছ জেলির মতো তরলে পূর্ণ থাকে। এই জেলির মতো তরলকে ভিট্রিয়াস হিউমর বলে।

21.6.1.2 দর্শন পদ্ধতি (Mechanism of Vision) :

দৃশ্যমান তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মিগুলো কর্ণিয়া ও লেন্সের মধ্য দিয়ে রেটিনায় আপতিত হয় এবং রড ও কোন কোশে স্নায়ুস্পন্দন সৃষ্টি করে। আগেই বলা হয়েছে মানুষের চোখ আলোক সংবেদী যৌগ সমন্বিত হয়। এগুলো হল অপসিন (একটি প্রোটিন) এবং রেটিনাল (ভিটামিন A এর অ্যালডিহাইড)। আলোক অপসিন থেকে রেটিনালের বিযুক্তিকে উদ্দীপিত করে। এরফলে অপসিন প্রোটিনের গঠনের পরিবর্তন ঘটে। এই কারণে কোশপর্দার ভেদ্যতার পরিবর্তন ঘটে। ফলস্বরূপ আলোক সংবেদী কোশে বিভবের পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। এটি একটি সংকেতের সৃষ্টি করে যা বাইপোলার কোশের মধ্য দিয়ে গ্যাংলিয়ন কোশে ক্রিয়াবিভব সৃষ্টি করে। এই ক্রিয়াবিভবগুলো (স্পন্দনসমূহ) অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের দর্শনকেন্দ্রে (Visual Cortex) প্রেরণ করে। এই স্থানে স্নায়ুস্পন্দনগুলোর বিশ্লেষন ঘটে ও রেটিনায় গঠিত প্রতিবিম্বের পূর্বের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে শনাক্তকরণ হয়।

21.6.2. কর্ণ ঃ (The ear)

আমাদের দুটি কর্ণ শ্রবণ এবং দেহের ভারসাম্য বজায় রাখা এই দুটি সংজ্ঞাবহ কাজ সম্পাদন করে। শারীর স্থানিকভাবে কর্ণকে তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা যেতে পারে — এগুলো হল বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃ কর্ণ (চিত্র 21.7 দেখো)।

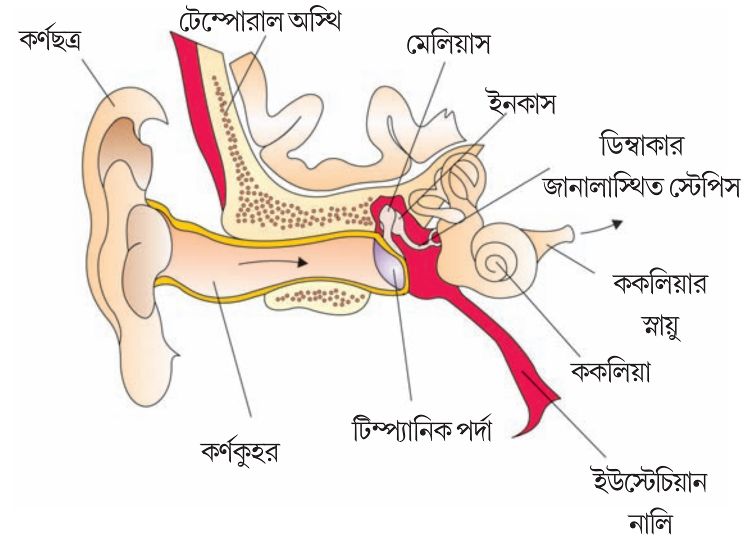

চিত্র 21.7 ঃ কর্ণের চিত্ররূপ

বহিঃকর্ণ কর্ণছত্র (Pinna) এবং কর্ণকুহর (External auditory Canal) নিয়ে গঠিত। কর্ণছত্র বা পিনার মাধ্যমে সংগৃহীত বায়ুবাহিত শব্দ কম্পনই শব্দের সৃষ্টি করে। কর্ণকুহরটি ভেতরের দিকে অগ্রসর হয় ও কর্ণপটহ (টিম্প্যানিক পর্দা) পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। কর্ণচ্ছত্র ও কর্ণকুহরের ত্বকে কিছু অত্যন্ত সূক্ষ্ম রোম ও মোম ক্ষরণকারী গ্রন্থি থাকে। কর্ণপটহের বাইরের অংশটি ত্বকে আবৃত যোজক কলা এবং ভেতরের মিউকাস ঝিল্লি দ্বারা গঠিত হয়। মধ্যকর্ণে তিনটি অস্থি থাকে, এগুলো হল — মেলিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস। এই অস্থিত্রয় শিকলের ন্যায় একে অপরের সাথে যুক্ত হয়। মেলিয়াস অস্থিটি কর্ণপটহের সাথে এবং স্টেপিস অস্থিটি ককলিয়ার ওভাল উইন্ডোর বা ডিম্বাকার জানালার সাথে যুক্ত থাকে। এই অস্থিগুলো অন্তঃকর্ণে শব্দতরঙ্গ প্রেরণের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে। একটি ইউস্টেচিয়ান নালি মধ্যকর্ণের গহ্বরের সাথে গলবিলকে যুক্ত করে। এই নালি কর্ণপটহের উভয় পাশে বায়ু চাপের সমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

তরল পূর্ণ অন্তঃকর্ণকে ল্যাবাইরিন্থ বলে। এটি অস্থিময় ও পর্দাময় ল্যারাইরিন্থ এই দুটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। বেশ কিছু প্রণালীর ক্রমিক সজ্জাক্রম অস্থিময় ল্যাবাইরিন্থ গঠন করে। এই প্রণালীগুলোর ভেতরে পর্দাময় ল্যাবাইরিন্থ অবস্থান করে যা পেরিলিম্ফ নামক এক ধরনের তরল দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। পর্দাময় ল্যাবাইরিন্থ এন্ডোলিম্ফ নামক তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে। ল্যাবাইরিন্থের কুণ্ডলীকৃত অংশকে ককলিয়া বলে। ককলিয়া গঠনকারী পর্দা দুটি হল — রিসনার ও ব্যাসিলার পর্দা। এই দুই পর্দা পেরিলিম্ফ তরলপূর্ণ অস্থিময় ল্যাবাইরিন্থকে উপরের দিকে স্ক্যালা ভেস্টিবিউলি ও নীচের দিকে স্ক্যালা টিম্প্যানিতে বিভক্ত করে (চিত্র 21.8 দেখো)। ককলিয়ার মধ্যেকার স্থানটিকে স্ক্যালামিডিয়া বলে এবং এটি এন্ডোলিম্ফ পূর্ণ থাকে। ককলিয়ার মূলদেশে স্ক্যালা ভেস্টিবিউলিটি, ওভাল উইন্ডো অপরদিকে স্ক্যালা টিম্প্যানি রাউন্ড উইন্ডোতে গিয়ে শেষ হয়। রাউন্ড উইন্ডোটি আবার মধ্যকর্ণে উন্মুক্ত হয়।

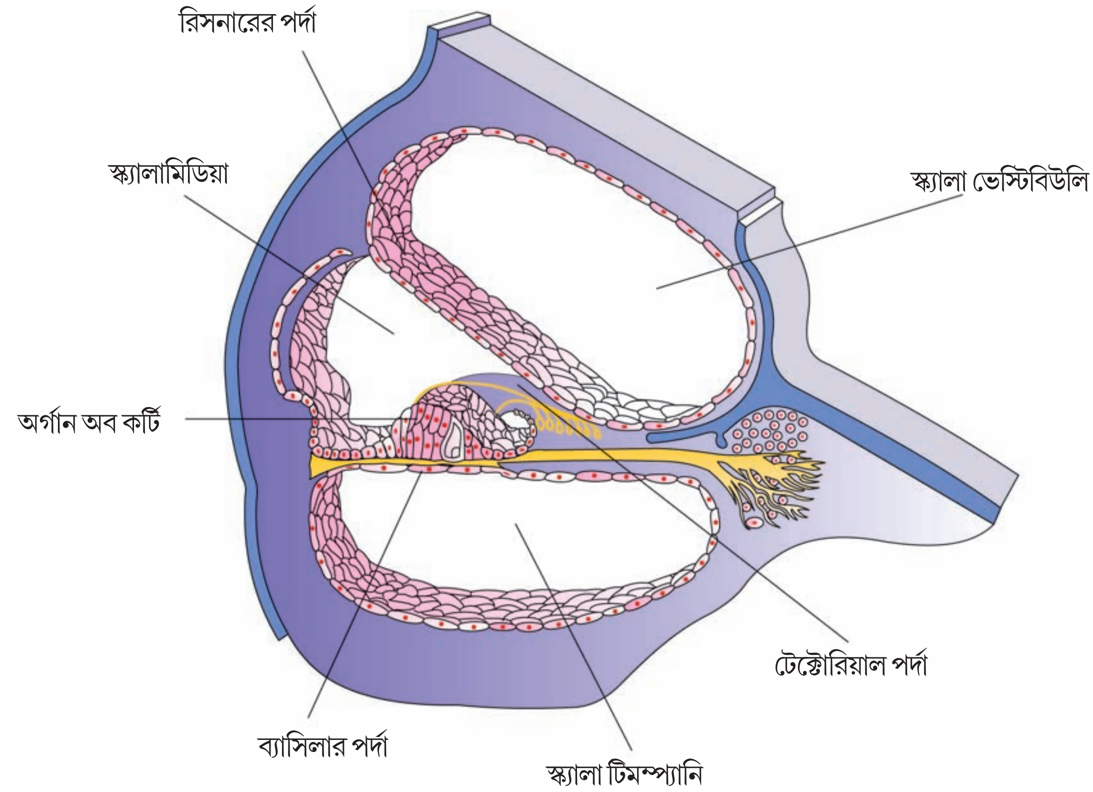

চিত্র 21.8 ঃ ককলিয়ার ছেদ দৃশ্য।

ব্যাসিলার পর্দাস্থিত রোমশ কোশ সমন্বিত গঠনকে অর্গান অব কর্টি (Organ of Corti) বলে। অর্গান অব কর্টি শ্রবণ গ্রাহক রূপে কাজ করে। এই রোমশ কোশগুলো অর্গান অব কর্টির ভেতরের দিকে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করে। রোমশ কোশের ভিত্তিপ্রান্ত অন্তর্বাহী স্নায়ুতন্তুর নিবিড় সংস্পর্শে থাকে। প্রতিটি রোমশ কোশের অগ্রভাগ থেকে অসংখ্য সূত্রাকার গঠন উদ্গত হয়, এদের স্টিরিও সিলিয়া বলে। রোমশ কোশের সারিগুলোর উপরে একটি পাতলা স্থিতিস্থাপক পর্দা থাকে যাকে টেক্টোরিয়াল পর্দা (Tectorial membrane) বলে।

অন্তঃকর্ণও একটি জটিল তন্ত্র সমন্বিত হয়, তাকে ভেস্টিবিউলার যন্ত্র (Vestibular apparatus) বলে। ভেস্টিবিউলার যন্ত্রটি ককলিয়ার উপরের স্থানে অবস্থান করে। ভেস্টিবিউলার যন্ত্র তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালি এবং স্যাকুলি এবং ইউট্রিকল সমন্বিত অটোলিথ যন্ত্র নিয়ে গঠিত। প্রতিটি অর্ধবৃত্তাকার নালি বিভিন্ন তলে পরস্পরের সাথে সমকোণে অবস্থান করে। পর্দাময় নালিগুলো অস্থিময় নালির পেরিলিম্ফে নিমজ্জিত থাকে। নালিগুলোর মূলদেশ স্ফীত হয় এই স্ফীত অংশকে অ্যাম্পুলা বলে। অ্যাম্পুলাতে রোমশ কোশ সমন্বিত উদ্গত একটি উঁচু অংশ বর্তমান, একে ক্রিস্টা অ্যাম্পুলারিস (Crista ampullaris) বলে। স্যাকুলি ও ইউট্রিকলে উদ্গত একটি উঁচু অংশ থাকে, একে ম্যাকুলা বলে। ক্রিস্টা ও ম্যাকুলা হল ভেস্টিবিউলার যন্ত্রের নির্দিষ্ট গ্রাহক, যারা দেহভঙ্গি ও দেহের ভারসাম্য বজায় রাখে।

20.6.2.1 শ্রবণ পদ্ধতি (Mechanism of hearing) :

কীভাবে কর্ণ শব্দতরঙ্গাকে স্নায়বিক স্পন্দনে রূপান্তরিত করে, যে স্পন্দন মস্তিষ্ক দ্বারা অনুভূত এবং বিশ্লেষিত হয়ে আমাদের কোনো একটি শব্দকে শনাক্ত করতে সাহায্য করে? বহিঃকর্ণ শব্দতরঙ্গাকে গ্রহণ করে এবং একে সরাসরি কর্ণপটহে (Eardrum) প্রেরণ করে। শব্দতরঙ্গের প্রভাবে কর্ণপটহ কম্পিত হয় এবং এই কম্পনসমূহ কর্ণাস্থির (মেলিয়াস, ইনকাস এবং স্টেপিস) মাধ্যমে ওভাল উইন্ডোতে প্রেরিত হয়। এই কম্পনসমূহ ককলিয়াস্থিত তরলে আসে যেখানে এরা লিম্ফের মধ্যে তরঙ্গ সৃষ্টি করে। লিম্ফে সৃষ্ট এই তরঙ্গসমূহ ব্যাসিলার পর্দায় মৃদু আন্দোলনের সৃষ্টি করে। ব্যাসিলার পর্দার এই আন্দোলন রোমশ কোশগুলোকে কিছুটা অবনমিত করে এবং এদের টেক্টোরিয়াল পর্দার বিপরীতে চেপে ধরে। ফলস্বরূপ, সংলগ্ন অন্তর্বাহী স্নায়ুতে স্নায়বিক স্পন্দন সৃষ্টি হয়। এই স্পন্দনসমূহ অডিটরি স্নায়ুর মাধ্যমে অন্তর্বাহী তন্তু দ্বারা মস্তিষ্কের অডিটরি কর্টেক্স বা শ্রবণ অঞ্চলে পৌঁছায়। মস্তিষ্কের এই অঞ্চলেই স্নায়ু স্পন্দনগুলো বিশ্লেষিত হয় ও আমরা শব্দটিকে শুনতে পাই।

সার সংক্ষেপ

স্নায়ুতন্ত্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সংযোগ স্থাপন করে এবং তৎসঙ্গে অঙ্গসমূহের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে। স্নায়ুতন্ত্রের কার্যগত একক নিউরোন হল উত্তেজক কোশ। কারণ তাদের কোশপর্দার উভয়দিকে আয়নের গাঢ়ত্বের নতিমাত্রা থাকে। বিশ্রামরত অবস্থায় একটি নিউরোনের কোশপর্দার মধ্য দিয়ে যে তড়িৎ বিভবের পার্থক্য থাকে তাকে স্থিতিবিভব বলে। একটি স্নায়ুতন্তুর অ্যাক্সন পর্দার মধ্য দিয়ে স্নায়ুপ্রবাহ বিসমবর্তন ও পুনঃসমাবর্তনের তরঙ্গ রূপে পরিবাহিত হয়। একটি স্নায়ুসন্নিধি প্রাক্‌সন্নিধি ঝিল্লি ও পশ্চাদসন্নিধি ঝিল্লি নিয়ে গঠিত এবং এরা একটি ফাঁকা স্থান সন্নিধি প্রণালী দ্বারা পৃথক থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। রাসায়নিক স্নায়ুসন্নিধিতে যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে স্নায়ু স্পন্দন প্রেরিত হয় তাদের নিউরোট্রান্সমিটার বলে।

মানুষের স্নায়ুতন্ত্র দুটি অংশ বিভক্ত যথা — কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (CNS) ও প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (PNS)। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে গঠিত। মস্তিষ্কের 3টি প্রধান অংশ হল — (i) অগ্রমস্তিষ্ক, (ii) মধ্যমস্তিষ্ক, (iii) পশ্চাদ মস্তিষ্ক। অগ্রমস্তিষ্কের প্রধান তিনটি অংশ হল — গুরুমস্তিষ্ক, থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস। গুরুমস্তিষ্ক অনুদৈর্ঘ্যভাবে দুটি অর্ধাংশে বিভক্ত থাকে এবং এই দুটি অর্ধাংশ করপাস ক্যালোসাম দ্বারা যুক্ত থাকে। অগ্রমস্তিষ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল হাইপোথ্যালামাস যা দেহের তাপমাত্রা, খাদ্যগ্রহণ, জলপান ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। গুরুমস্তিষ্কের কিছু অংশ এবং তাদের গভীরে অবস্থিত সহযোগী অংশ নিয়ে জটিলতন্ত্র গঠিত হয়, তাকে লিম্বিকতন্ত্র বলে। এই তন্ত্র ঘ্রাণানুভূতি, স্বয়ংক্রিয় কার্যের নিয়ন্ত্রণ, যৌন আচরণ, আবেগ ও আবেগ জনিত আচরণ, অনুপ্রেরণা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মধ্যমস্তিষ্ক, দর্শন, স্পর্শানুভূতি, শ্রবণ ইত্যাদির সংবেদন গ্রহণ করে ও তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। পনস্, লঘু মস্তিষ্ক ও মেডালা মিশে পশ্চাদ মস্তিষ্ক গঠিত। লঘু মস্তিষ্ক, কর্ণের অর্ধ বৃত্তাকার নালিকা এবং শ্রবণ তন্ত্র থেকে বার্তা গ্রহণ করে ও তাদের সমন্বয় সাধন করে। মেডালায় অবস্থিত কেন্দ্রগুলো শ্বাসকার্য কার্ডিওভাসকুলার রিফ্লেক্স বা গ্যাস্ট্রিক ক্ষরণ ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে। পনস্ এমন কতগুলো স্নায়ুপথ নিয়ে গঠিত যারা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চলগুলোকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে। প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের উদ্দীপনায় অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়ার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে।

পরিবেশীয় পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাবলি সংবেদী অঙ্গের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা গৃহীত হয় ও সেখানে গৃহীত তথ্যাবলির প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ হয়ে থাকে। তখনই সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় সংকেতগুলো প্রেরিত হয়। মানুষের অক্ষিগোলক ত্রিস্তরীয়। বাহিরের স্তরটি কর্ণিয়া ও স্ক্লেরা নিয়ে গঠিত। স্ক্লেরার ভেতরের স্তর অর্থাৎ মধ্যস্তরকে কোরয়েড বলে। সবচেয়ে ভেতরের স্তর রেটিনায় দুই ধরনের আলোক সংবেদী কোশ থাকে তাদের রড ও কোন কোশ বলে। দিনের আলোয় (ফোটোপিক) দর্শন ও বর্ণ বা রঙের শনাক্তকরণ কোন কোশের কাজ, অন্যদিকে ঈষৎ বা কম আলোয় (স্কোটোপিক) দর্শন রড কোশের কাজ। কর্ণিয়া, লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রবিষ্ট আলোক রেটিনার উপর বস্তুর প্রতিবিম্ব তৈরি করে।

কর্ণের তিনটি অংশ — বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ। মধ্যকর্ণ তিনটি অস্থি নিয়ে গঠিত এরা হল — মেলিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস। তরলপূর্ণ অন্তঃকর্ণকে ল্যাবাইরিন্থ বলে এবং ল্যাবাইরিন্থের কুণ্ডলীত অংশকে ককলিয়া বলে। ব্যাসিলার পর্দাস্থিত রোমশ কোশ সমন্বিত গঠনকে অর্গান অব কর্টি বলে এবং এটি শ্রবণ গ্রাহক রূপে কাজ করে। কর্ণপটহে সৃষ্ট কম্পন কর্ণাস্থি এবং ওভাল উইন্ডোর মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে তরলপূর্ণ অন্তঃকর্ণে পৌঁছায়। অন্তঃকর্ণে স্নায়ুস্পন্দনের সৃষ্টি হয় এবং এই স্নায়ুস্পন্দন অন্তর্বাহী স্নায়ুতন্তুর মাধ্যমে বাহিত হয়ে মস্তিষ্কের অডিটরি কর্টেক্সে পৌঁছায়। অন্তঃকর্ণে ককলিয়ার উপরে একটি জটিলতন্ত্রও দেখা যায়, একে ভেস্টিবিউলার যন্ত্র বলে। অভিকর্ষ এবং চলন দ্বারা এটি প্রভাবিত হয় এবং আমাদের দেহভঙ্গি ও দেহের ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে।

অনুশীলনী

1. **নিম্নলিখিতগুলোর গঠন সংক্ষেপে বিবৃত করো :**

   (ক) মস্তিষ্ক (খ) চক্ষু (গ) কর্ণ

2. **নিম্নলিখিতগুলোর মধ্যে তুলনা করো :**

   (ক) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র এবং প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র

   (খ) স্থিতিবিভব এবং ক্রিয়াবিভব

   (গ) কোরোয়েড এবং রেটিনা

3. **নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলো বর্ণনা করো :**

   (ক) একটি স্নায়ুতন্তুর ঝিল্লির সমবর্তন।

   (খ) স্নায়ুতন্তুর ঝিল্লির বিসমবর্তন।

   (গ) স্নায়ুতন্তুর মধ্য দিয়ে স্নায়ুস্পন্দন পরিবহণ।

   (ঘ) রাসায়নিক স্নায়ুসন্নিধির মধ্য দিয়ে স্নায়ুস্পন্দন প্রেরণ।

4. **নিম্নলিখিত গঠনগুলির চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো**

   (ক) নিউরোন (খ) মস্তিষ্ক (গ) চক্ষু (ঘ) কর্ণ

5. নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর সংক্ষিপ্ত টিকা লেখো :

(ক) স্নায়বিক সমন্বয়সাধন (খ) অগ্রমস্তিষ্ক (গ) মধ্যমস্তিষ্ক (ঘ) পশ্চাদ মস্তিষ্ক (ঙ) রেটিনা (চ) কর্ণাস্থি (ছ) ককলিয়া (জ) অর্গান অব কর্টি (ঝ) স্নায়ুসন্নিধি।

6. সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও ঃ

(ক) স্নায়ুসন্নিধির মধ্য দিয়ে স্নায়বিক স্পন্দন পরিবহণ পদ্ধতি

(খ) দর্শন পদ্ধতি

(গ) শ্রবণ পদ্ধতি

7. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) কীভাবে তুমি কোনো বস্তুর বর্ণকে শনাক্ত করতে পারো?

(খ) আমাদের দেহের কোন্ অংশ দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে?

(গ) চক্ষু কীভাবে রেটিনায় আপতিত আলোর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে?

8. ব্যাখ্যা করো :

(ক) ক্রিয়াবিভব সৃষ্টিতে Na^+ আয়নের ভূমিকা।

(খ) রেটিনাতে আলোক উদ্দীপিত স্পন্দন সৃষ্টির পদ্ধতি।

(গ) অন্তঃকর্ণে শব্দের স্নায়ু স্পন্দন সৃষ্টির পদ্ধতি।

9. পার্থক্য লেখো :

(ক) মায়োলিন যুক্ত এবং মায়োলিন বিহীন অ্যাক্সন।

(খ) ডেনড্রাইট এবং অ্যাক্সন।

(গ) রড এবং কোন কোশ।

(ঘ) থ্যালামাস এবং হাইপোথ্যালামাস।

(ঙ) গুরুমস্তিষ্ক এবং লঘুমস্তিষ্ক।

10. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) কর্ণের কোন্ অংশ শব্দের তীক্ষ্ণতা নির্ধারণ করে?

(খ) মানুষের মস্তিষ্কের কোন্ অংশ সবচেয়ে বেশি উন্নত?

(গ) আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোন্ অংশটি মাস্টার ক্লক হিসাবে কাজ করে?

11. মেরুদণ্ডী প্রাণীর চক্ষুর রেটিনার যে অংশ থেকে অপটিক স্নায়ু নির্গত হয় তাকে বলে —

(ক) ফোবিয়া

(খ) আইরিস

(গ) অন্ধবিন্দু

(ঘ) অপটিক কায়াজমা।

12. পার্থক্য নিরূপণ করো :

(ক) অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী-নিউরোন।

(খ) মায়োলিন যুক্ত এবং মায়োলিন বিহীন স্নায়ুতন্তুর মধ্য দিয়ে স্নায়বিক স্পন্দন পরিবহণ।

(গ) অ্যাকুয়াস হিউমর এবং ভিট্রিয়াস হিউমর।

(ঘ) অন্ধবিন্দু এবং পীতবিন্দু।

(ঙ) মস্তিষ্ক স্নায়ু এবং সুষুম্না স্নায়ু।

অধ্যায় — 22
রাসায়নিক সমন্বয় সাধন এবং একত্রীকরণ (Chemical Coordination and Integration)

22.1. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি এবং হরমোনসমূহ

22.2. মানুষের অন্তঃক্ষরা তন্ত্র

22.3. হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক এবং পাচননালি থেকে ক্ষরিত হরমোনসমূহ

22.4. হরমোনের কার্যপদ্ধতি

তোমরা ইতিমধ্যেই জেনেছো যে, স্নায়ুতন্ত্র সরাসরি দেহের অঙ্গাগুলোর মধ্যে দ্রুত সমন্বয়সাধন করে। স্নায়বিক সমন্বয় সাধন দ্রুত কিন্তু স্বল্পস্থায়ী হয়। যেহেতু স্নায়ুতন্তুগুলো দেহের সব কোশে পৌঁছায় না অথচ কোশীয় কার্যাবলি অবিরাম নিয়ন্ত্রিত হওয়াও প্রয়োজন, তাই একটি বিশেষ ধরনের সমন্বয় সাধন ও একত্রীকরনের ব্যবস্থা দেহে রয়েছে। আমাদের দেহে হরমোন এই বিশেষ কাজটি সম্পন্ন করে। স্নায়ুতন্ত্র এবং অন্তঃক্ষরা তন্ত্র একত্রে দেহের শারীরবৃত্তীয় কাজগুলোর সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করে।

22.1. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি এবং হরমোনসমূহ (Endocrine glands and Hormones) :

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলো নালিবিহীন হওয়ায় এদের অনাল গ্রন্থি বলে এবং এই গ্রন্থিগুলোর ক্ষরণকে হরমোন বলে। প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী হরমোন হল এমন একটি রাসায়নিক বস্তু যা অন্ত:ক্ষরা গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়ে রক্তের মাধ্যমে উৎপত্তিস্থল থেকে দূরবর্তী কোনো অঙ্গে পৌঁছায় এবং সেখানে ক্রিয়াশীল হয়। হরমোনের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা হল **হরমোন একপ্রকার বিশেষ অপরিপোষক রাসায়নিক দ্রব্য ঃ যা কোশে অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে আন্তঃকোশীয় বার্তাবহরূপে কাজ করে।** অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলো থেকে ক্ষরিত হরমোন ছাড়া আরও অনেক নতুন জৈব অণু এই নতুন সংজ্ঞার আওতায় এসেছে। অমেরুদন্ডি প্রাণীদের অন্তঃক্ষরাতন্ত্র খুবই সরল প্রকৃতির হয় এবং এই তন্ত্র থেকে ক্ষরিত হরমোনের সংখ্যাও অল্প। অপরদিকে মেরুদন্ডি প্রাণীর ক্ষেত্রে অসংখ্য রাসায়নিক পদার্থ হরমোন হিসাবে কাজ করে এবং দেহে রাসায়নিক সমন্বয় সাধন করে। এই অধ্যায়ে মানুষের অন্তঃক্ষরাতন্ত্র বর্ণনা করা হয়েছে।

22.2 মানবদেহের অন্তঃক্ষরাতন্ত্র: (Human Endoerine System) :

আমাদের দেহের বিভিন্ন অংশে উপস্থিত সংগঠিত অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থানরত হরমোন উৎপাদনকারী কলা এবং কোশসমূহ সংগঠিত হয়ে অন্তঃক্ষরা তন্ত্র গঠন করে। পিট্যুইটারি, পিনিয়াল, থাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল, অগ্ন্যাশয়, প্যারাথাইরয়েড, থাইমাস ও গোনাড (পুরুষের ক্ষেত্রে শুক্রাশয় এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে ডিম্বাশয়) হল আমাদের দেহে উপস্থিত সংগঠিত অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (চিত্র (22.1 দেখো)। উপরে বর্ণিত গ্রন্থিগুলো ছাড়াও আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন যকৃৎ, বৃক্ক, হৃৎপিণ্ড এবং পরিপাক তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ থেকেও হরমোন ক্ষরিত হয়। এই অধ্যায়ে, পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে মানবদেহের সব প্রধান অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি এবং হাইপোথ্যালামাসের গঠন ও কাজ সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

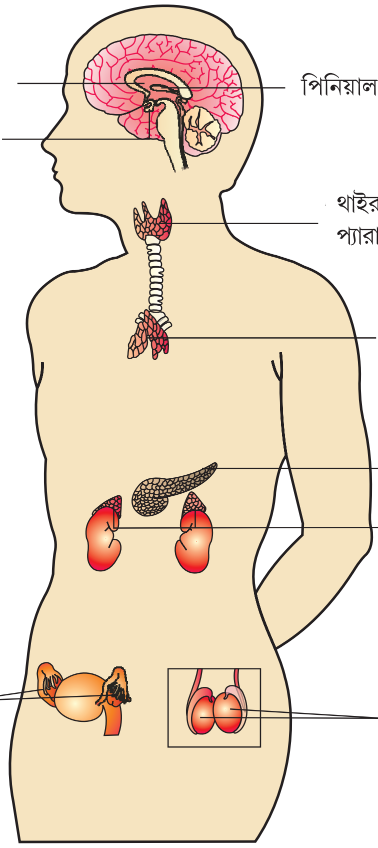

চিত্র 22.1 মানবদেহে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর অবস্থান।

22.2.1 হাইপোথ্যালামাস (The hypothalamus)

তোমরা জেনেছ যে, হাইপোথ্যালামাস হল অগ্রমস্তিষ্কের অন্তর্গত ডায়ানসেফালনের সাধারণ অংশ যা দেহের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। এটি নিউরোসিক্রেটরি কোশের অনেকগুলো গুচ্ছ নিয়ে গঠিত। এই কোশগুলোকে নিউক্লিয়াস বলে এবং এরা হরমোন উৎপন্ন করে। এই হরমোনগুলো পিটুইটারি হরমোনগুলোর সংশ্লেষ এবং ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। তবে হাইপোথ্যালামাসে উৎপন্ন হরমোনগুলো দুই ধরনের হয় — রিলিজিং হরমোন (যা পিটুইটারি হরমোনের ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে) এবং ইনহিবিটিং হরমোন (যা পিটুইটারি হরমোনের ক্ষরণ প্রতিহত করে)। উদাহরণস্বরূপ হাইপোথ্যালামাস থেকে ক্ষরিত গোনাডোট্রপিন রিলিজিং হরমোন (**GnRH**) পিটুইটারি গ্রন্থির ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে এবং ফলস্বরূপ গোনাডোট্রপিন নামক হরমোন ক্ষরিত হয়। অপরদিকে হাইপোথ্যালামাস থেকে ক্ষরিত সোমাটোস্টেটিন পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে বৃদ্ধি উদ্দীপক হরমোন ক্ষরণে বাধা দেয়। এই হরমোনগুলো হাইপোথ্যালামিক নিউরোনে উৎপন্ন হয়ে স্নায়ুকোশের অ্যাক্সনের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়ে স্নায়ুপ্রান্তে পৌঁছায় এবং স্নায়ুপ্রান্ত থেকে ক্ষরিত হয়। এই হরমোনগুলো পোর্টাল সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে সংবাহিত হয়ে পিটুইটারি গ্রন্থিতে পৌঁছায় এবং অগ্র পিটুইটারির কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে। পশ্চাৎ পিটুইটারি আবার সরাসরি হাইপোথ্যালামাসের স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণাধীন (চিত্র 22.2 দেখো)।

22.2.2. পিটুইটারি গ্রন্থি Pituitary Gland :

এই গ্রন্থি মস্তিষ্কের মূলদেশে সেলা টারসিকা নামক একটি অস্থি নির্মিত গহ্বরে অবস্থিত। এটি মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের সঙ্গে একটি বৃন্তের সাহায্যে যুক্ত থাকে। (চিত্র 22.2 দেখো) শারীরস্থানিকভাবে এটি **অ্যাডিনোহাইপোফাইসিস** এবং **নিউরোহাইপোফাইসিসে** বিভক্ত। অ্যাডিনোহাইপোফাইসিস পার্স ডিসটেলিস এবং পার্স ইন্টারমিডিয়া নামক দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। পিটুইটারি গ্রন্থির পার্স ডিসটেলিস অঞ্চলটিকে সচরাচর অগ্র পিটুইটারি বলে এবং এর থেকে **গ্রোথ হরমোন (GH), প্রোল্যাকটিন (PRL), থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন (TSH), অ্যাড্রিনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন (ACTH), লিউটিনাইজিং হরমোন (LH) এবং ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH)** ক্ষরিত হয়। অন্যদিকে পার্স ইন্টারমিডিয়া থেকে একমাত্র **মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোনটি (MSH)** ক্ষরিত হয়। তবে মানুষের ক্ষেত্রে পার্স ইন্টারমিডিয়া, পার্স ডিসটালিসের সঙ্গে প্রায় মিশে থাকে। নিউরোহাইপোফাইসিসকে (পার্স নারভোসা) পশ্চাৎ পিটুইটারিও বলে। এই অংশে যে দুটি হরমোন সঞ্চিত হয় এবং এর থেকে মুক্ত হয় এদের **অক্সিটোসিন** এবং **ভেসোপ্রেসিন** বলে। এই হরমোনগুলো প্রকৃতপক্ষে হাইপোথ্যালামাসে সংশ্লেষিত হয়ে অ্যাক্সনের মাধ্যমে নিউরোহাইপোপাইসিসে পৌঁছায়। গ্রোথ হরমোনের অতিক্ষরণ ঘটলে দেহের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়। একে অতিকায়ত্ব (Gigantism) বলে এবং এই হরমোনের স্বল্প ক্ষরণে দেহের সামগ্রিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এই অবস্থাকে পিটুইটারিজনিত বামনত্ব (Pituitary dwarfism) বলে। প্রাপ্তবয়স্ক বিশেষত মাঝবয়সী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে গ্রোথ হরমোনের অত্যধিক ক্ষরণ দেহের ভীষণ রকমের দৈহিক (বিশেষত মুখমণ্ডলের) বিকৃতি ঘটায়। একে **অ্যাক্রেমেগালি** বলে। এই হরমোনের অতিক্ষরণ যদি নিয়ন্ত্রণে না আনা যায়, তাহলে অনেক ধরনের গুরুতর জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং ব্যক্তির অকাল মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এই রোগটি প্রাথমিক অবস্থায় নির্ণয় করা খুবই কঠিন, এমনকি রোগী বহু বছর ধরে ভুগলেও এটি ধরা পড়ে না অর্থাৎ যতক্ষণ না পর্যন্ত রোগীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনগুলো পরিলক্ষিত না হয়, ততক্ষন পর্যন্ত রোগটি ধরা পড়ে না। **প্রোল্যাকটিন** হরমোন স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি ও এতে দুগ্ধ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। TSH থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরয়েড হরমোনের সংশ্লেষণ ও ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ACTH অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে ক্ষরিত গ্লুকোকর্টিকয়েড নামক স্টেরয়েড হরমোনের সংশ্লেষ এবং ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে। LH এবং FSH গোনাডের কার্যকারিতাকে উদ্দীপিত করে। তাই এদের **গোনাডোট্রফিন** (Gonadotraphins) বলে। পুরুষদের ক্ষেত্রে LH **শুক্রাশয়ে** এন্ড্রোজেন হরমোনের সংশ্লেষ এবং এর ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে আবার পুরুষের ক্ষেত্রে শুক্রাণু উৎপাদন প্রক্রিয়াকে (Spermatogenesis) FSH এবং **এন্ড্রোজেন** নিয়ন্ত্রণ করে। মহিলাদের ক্ষেত্রে LH সম্পূর্ণরূপে পরিণত ফলিকল (গ্রাফিয়ান ফলিকল) থেকে ডিম্বাণু নিঃসরণে (Ovulation) সহায়তা করে এবং বিদীর্ণ গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে সৃষ্ট করপাস লুটিয়াম-এর স্থায়িত্ব বজায় রাখে। FSH স্ত্রী দেহের ডিম্বথলি (Ovarian follicle)এর বৃদ্ধি এবং বিকাশকে উদ্দীপিত করে। MSH মেলানোসাইটের (মেলানিনযুক্ত কোশ) উপর কাজ করে। এটি ত্বকের স্বাভাবিক বর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে। অক্সিটোসিন আমাদের দেহের মসৃণ পেশিসমূহের উপর কাজ করে এবং এদের সংকোচনকে উদ্দীপিত করে।

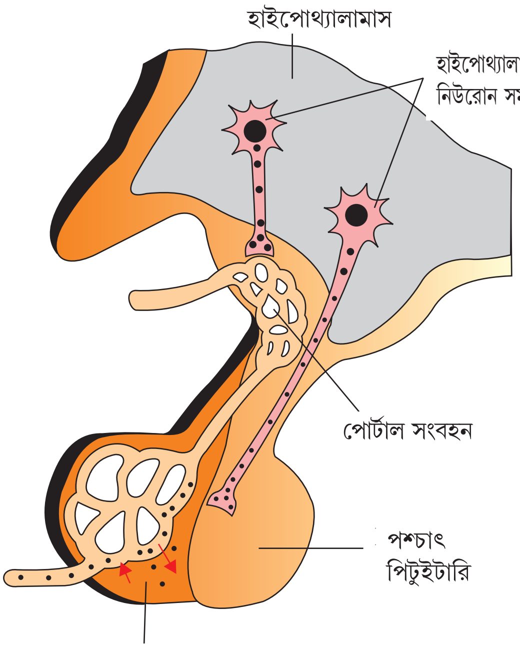

চিত্র 22.2 পিটুইটারি এবং হাইপোথ্যালামাসের সঙ্গে এই গ্রন্থির সম্পর্কের চিত্ররূপ প্রদর্শন।

মহিলাদের ক্ষেত্রে শিশুর জন্মের সময় এই হরমোনটি জরায়ুর (ইউটেরাসের) তীব্র সংকোচনকে উদ্দীপিত করে এবং স্তনগ্রন্থি থেকে দুগ্ধ নিঃসরণ ঘটায়। ভেসোপ্রসিন মূলত বৃক্কের উপর ক্রিয়া করে এবং দূর সংবর্ত নালিকা দ্বারা জল ও তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের পুনঃশোষণকে উদ্দীপিত করে এবং এতে মূত্রের মাধ্যমে জলের অপচয় হ্রাস পায়। তাই এই হরমোনকে **অ্যান্টি ডাই ইউরেটিক হরমোন** ADH বলে।

দেহের কোনো বৈকল্যের কারণে ADH এর সংশ্লেষণ ও ক্ষরণ প্রভাবিত হলে বৃক্কের জল সংরক্ষণ করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। এর ফলে দেহ থেকে জল বেরিয়ে যায় এবং দেহে জল শূন্যতা দেখা যায়। এই অবস্থাকে **ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস** বলে।

22.2.3 পিনিয়াল গ্রন্থি (Pineal gland) :

পিনিয়াল গ্রন্থি অগ্রমস্তিষ্কের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করে। এই গ্রন্থি থেকে **মেলাটোনিন** হরমোনটি ক্ষরিত হয়। মেলাটোনিন আমাদের দেহের 24 ঘন্টার ছান্দিক আবর্তন নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, এটি আমাদের দেহের স্বাভাবিক নিদ্রা জাগরণ চক্র (Sleep-wake cycle) এবং দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া বিপাক, ত্বকের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ, রজঃচক্র ও এর পাশাপাশি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপরও এর প্রভাব রয়েছে।

22.2.4. থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid Glands) :

থাইরয়েড গ্রন্থিটি দুটি খণ্ডকের সমন্বয়ে গঠিত (চিত্র 22.3 দেখ)। এই খণ্ডক দুটি একটি পাতলা যোগকলা নির্মিত পাতের সাহায্যে পরস্পর যুক্ত থাকে এবং এই পাতলা পাতটিকে ইস্থমাস বলে। থাইরয়েড গ্রন্থি থাইরয়েড **ফলিকল** এবং **ধাত্র গঠনকারী কলা** নিয়ে গঠিত। প্রতিটি থাইরয়েড ফলিকল একটি গহ্বরকে ঘিরে উপস্থিত ফলিকিউলার কোশসমূহ নিয়ে গঠিত হয়। এই ফলিকিউলার কোশগুলো দুটি হরমোনের সংশ্লেষ ঘটায়। এগুলো হল — **টেট্রা আয়োডোথাইরোনিন** (T_4) বা **থাইরক্সিন** ও **ট্রাই আয়োডোথাইরোনিন** (T_3)। থাইরয়েড গ্রন্থিতে স্বাভাবিক হারে হরমোন সংশ্লেষণের জন্য আয়োডিনের প্রয়োজন হয়। আমাদের খাদ্যে আয়োডিনের অভাবজনিত কারণে **হাইপোথাইরয়ডিজম** দেখা যায় এবং থাইরয়েড গ্রন্থির স্ফীতি ঘটে। একে সচরাচর **গয়টার** বলে। গর্ভাবস্থায় হাইপোথাইরয়ডিজমের কারণে বর্ধনশীল শিশুর বিকাশ ও পরিণমন ব্যাহত হয় এবং এর ফলে শিশুটির বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় (ক্রেটিনিজম), শিশুর মানসিক ভারসাম্যহীন হয়, কম বুদ্ধাঙ্ক বিশিষ্ট হয়, ত্বক অস্বাভাবিক হয়, মুকবধির হয় ইত্যাদি। প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে হাইপোথাইরয়েডিজম অনিয়মিত রজঃচক্রের কারণ হতে পারে। থাইরয়েড গ্রন্থির ক্যান্সার অথবা থাইরয়েড গ্রন্থিতে সৃষ্ট গুটির কারণে থাইরয়েড হরমোনের সংশ্লেষণ এবং ক্ষরণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। এই অবস্থাকে **হাইপারথাইরয়ডিজম** বলে যা দেহের শারীরবৃত্তকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

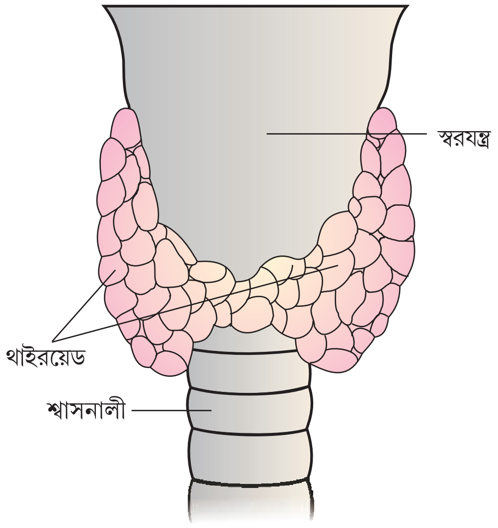

(ক)

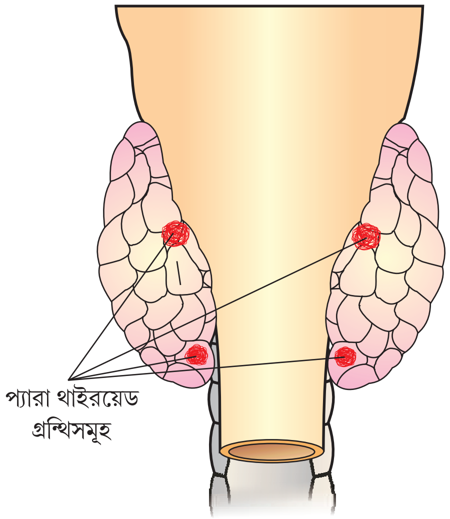

(খ)

চিত্র 22.3 থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির অবস্থানের চিত্ররূপ। (ক) অঙ্কীয় দেশ (খ) পৃষ্ঠীয় দেশ

হাইপোথাইরয়েডিজমের একটি বিশেষ ধরন হল এক্সাপথ্যালমিক গয়টার। এই রোগের লক্ষণজনিত বৈশিষ্ট্যগুলো হল — থাইরয়েড গ্রন্থির বেড়ে যাওয়া, অক্ষিগোলকগুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসা, মৌল বিপাকীয় হার বেড়ে যাওয়া এবং ওজন কমে যাওয়া। এই রোগটিকে গ্রেভস রোগও বলে।

থাইরয়েড হরমোনগুলো দেহের মৌলবিপাকীয় হার (BMR) নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই হরমোন লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদনেও সহায়তা করে। এই হরমোনগুলো দেহে শর্করা, প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। এই হরমোন দেহে জল ও তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়টিকেও প্রভাবিত করে। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরোক্যালসিটোনিন (TCT) নামক প্রোটিন হরমোন ক্ষরিত হয় এবং এটি রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

22.2.5. প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid gland):

মানবদেহে থাইরয়েড গ্রন্থির পশ্চাদভাগে চারটি প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি অবস্থান করে। থাইরয়েড গ্রন্থির দুই খন্ডকের প্রতিটিতে একজোড়া করে এই প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থিগুলো রয়েছে (চিত্র 22.3 দেখো)। প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থিগুলো থেকে যে পেপটাইড হরমোন ক্ষরিত হয় তাকে **প্যারাথাইরয়েড হরমোন** (PTH) বলে। রক্তে সংবাহিত Ca^{++} এর মাত্রা দ্বারা PTH এর ক্ষরণ নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্যারাথাইরয়েড হরমোন (PTH) রক্তে ক্যালসিয়াম আয়নের (Ca^{2+}) মাত্রা বৃদ্ধি করে। PTH অস্থির উপর ক্রিয়া করে এবং অস্থি কঙ্কাল থেকে অস্থিকলার বেরিয়ে আসার (অস্থির ভাঙন/ অস্থি থেকে খনিজের অপসরণ) প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে। প্যারাথাইরয়েড হরমোন বৃক্কীয় নালিকায় Ca^{2+} এর পুন:শোষণকে ও উদ্দীপিত করে এবং পাচিত খাদ্য থেকে Ca^{2+} এর পুন:শোষণ বৃদ্ধি করে। তাহলে এটা স্পষ্ট যে, PTH একটি হাইপারক্যালসিমিক হরমোন অর্থাৎ এটি রক্তে Ca^{2+} এর মাত্রা বৃদ্ধি করে। TCT সহ এই হরমোন (PTH) দেহে ক্যালসিয়ামের ভারসাম্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

22.2.6 থাইমাস (Thymus) :

থাইমাস একটি খণ্ডক সমন্বিত গ্রন্থি, যা দুটি ফুসফুসের মাঝে উরঃফলকের (Steanum) পেছনে মহাধমনির অঙ্কদেশের উপর অবস্থিত। থাইমাস গ্রন্থি অনাক্রম্যতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এই গ্রন্থি পেপটাইড হরমোন **থাইমোসিন** ক্ষরণ করে। **কোশভিত্তিক অনাক্রম্যতা** প্রদানকারী **T লিম্ফোসাইটের** পৃথকীকরণে থাইমোসিন মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তার সঙ্গে থাইমোসিন অ্যান্টিবডিও তৈরি করে যেগুলো **রসভিত্তিক অনাক্রম্যতা** প্রদান করে। বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে থাইমাস গ্রন্থিটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং থাইমোসিন হরমোনের উৎপাদন হ্রাস পায়। এরফলে বৃদ্ধদের অনাক্রম্য সাড়া দুর্বল হয়ে পড়ে।

22.2.7. অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি (Adrenal gland) :

আমাদের দেহে উপস্থিত প্রতিটি বৃক্কের সম্মুখভাগে একটি করে মোট একজোড়া অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি বর্তমান (চিত্র 22.4 ক দেখো)। এই গ্রন্থি দুই ধরনের কলার-সমন্বয়ে গঠিত। এই গ্রন্থির কেন্দ্রীয় অংশে উপস্থিত কলাকে **অ্যাড্রিনাল মেডালা** এবং পরিধির দিকে অবস্থিত কলাকে **অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স** বলে। (চিত্র 22.4 খ দেখো)।

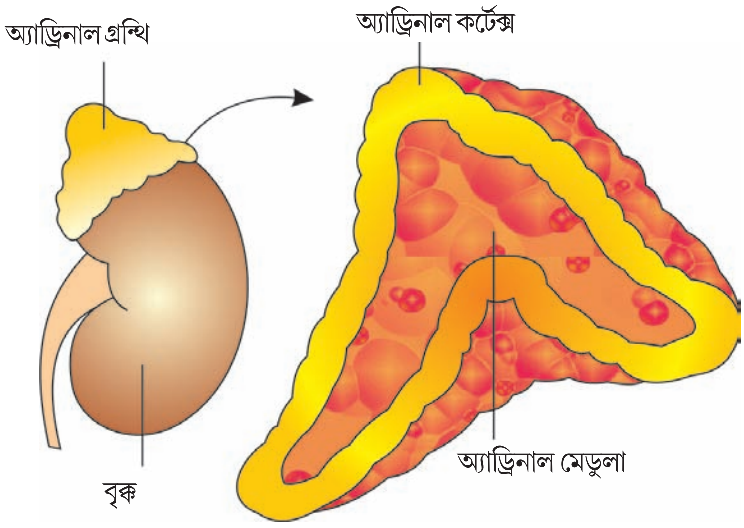

চিত্র 22.4 চিত্ররূপ প্রদর্শন : (ক) বৃক্কের উপরিস্থি অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি (খ) ছেদের সাহায্যে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির দুটি অংশ দেখানো হল।

অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে ক্ষরিত হরমোনগুলোর স্বল্পক্ষরণ কার্বোহাইড্রেড বিপাকে বিঘ্ন ঘটায় এবং এই কারণে দেহ অত্যন্ত দুর্বল ও অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এর ফলশ্রুতিতে যে রোগ দেখা দেয় তাকে অ্যাডিসনবর্ণিত রোগ বলে। অ্যাড্রিনাল মেডালা দুই ধরনের হরমোন যথা — **অ্যাড্রিনালিন বা এপিনেফ্রিন** এবং **নর অ্যাড্রিনালিন বা নর এপিনেফ্রিন** ক্ষরণ করে। এরা সচরাচর **ক্যাটেকোলামাইন** নামে পরিচিত। আপৎকালীন অবস্থায় এবং যেকোনো ধরনের চাপ মোকাবিলায় অ্যাড্রিনালিন এবং নর অ্যাড্রিনালিনের দ্রুত ক্ষরণ ঘটে। তাই এদের আপৎকালীন হরমোন (Fight or Flight hormone) বলে। এই হরমোনগুলো সতর্কতা বৃদ্ধি, তারারন্ধ্রের প্রসারণ, ত্বকের রোম খাড়া হওয়া, এবং ঘর্ম নি:সরণ ইত্যাদি কাজ করে। এপিনেফ্রিন এবং নরএপিনেফ্রিন এই দুটি হরমোনই হৃদস্পন্দনের হার, হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ক্ষমতা এবং শ্বসন হার বৃদ্ধি করে। ক্যাটেকোলামাইন গ্লাইকোজেনের ভাঙনকে উদ্দীপিত করে রক্তে শর্করার গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি করে। এছাড়াও এরা প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থকেও ভাঙতে সাহায্য করে।

অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায় : জোনা রেটিকুলারিস (অভ্যন্তরীণ স্তর), **জোনা ফেসিকিউলেটা** (মধ্যবর্তী স্তর) **জোনা গ্লোমেরুলোসা** (বহি:স্তর), অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স অনেকগুলো হরমোন ক্ষরণ করে যারা সাধারণত কর্টিকয়েড নামে পরিচিত। যে সমস্ত কর্টিকয়েডগুলো শর্করা বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে তাদের গ্লুকোকর্টিকয়েড বলে। আমাদের দেহের প্রধান গ্লুকোকর্টিকয়েডটি হল কর্টিসোল। যে কর্টিকয়েডগুলো দেহে জল ও তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে তাদের মিনারেলোকর্টিকয়েড বলে। অ্যালডোস্টেরন হল আমাদের দেহের প্রধান মিনারেলোকর্টিকয়েড।

গ্লুকোকর্টিকয়েডগুলো গ্লুকোনিওজেনেসিস, লাইপোলাইসিস, প্রোটিওলাইসিসকে উদ্দীপিত করে এবং কোশে অ্যামাইনো অ্যাসিডের প্রবেশ ও তার ব্যবহারে বাধাদান করে। কর্টিসোল কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমের পাশাপাশি বৃক্কের কার্যাবলি চালু রাখার কাজে অংশগ্রহণ করে। গ্লুকোকর্টিকয়েডগুলো বিশেষত কর্টিসোল প্রদাহ বিরোধী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং অনাক্রম্য সাড়া প্রদানকে অবদমিত করে।

কর্টিসোল লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদনকে উদ্দীপিত করে। অ্যালডোস্টেরন প্রধানত বৃক্কীয় নালিকায় ক্রিয়াশীল হয় এবং সেখানে এটি Na^+ ও জলের পুনঃশোষণ এবং $K+$ ও ফসফেট আয়নের রেচনকে উদ্দীপিত করে। তাই অ্যালডোস্টেরন তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ, দেহতরলের পরিমাণ, অভিস্রবণ চাপ এবং রক্তচাপ বজায় রাখতে সাহায্য করে। অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে অল্প পরিমাণ এন্ড্রোজেনিক স্টেরয়েড ক্ষরিত হয়। বয়ঃসন্ধিকালে বগলের লোম, যৌনাঙ্গের লোম, মুখের দাঁড়ি গোঁফের বৃদ্ধিতে এর ভূমিকা রয়েছে।

22.2.8 অগ্ন্যাশয় (Pancrcas)

অগ্ন্যাশয় একটি মিশ্রগ্রন্থি (চিত্র 22.1 দেখো)। এটি অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা উভয় প্রকার গ্রন্থি হিসাবে কাজ করে। অগ্ন্যাশয়ের অন্তঃক্ষরা অংশটি ল্যাঙ্গারহ্যান্সের দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গঠিত। মানুষের স্বাভাবিক অগ্ন্যাশয়ে প্রায় 1 থেকে 2 মিলিয়ন ল্যাঙ্গারহ্যান্সের দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে যা অগ্ন্যাশয় কলার মাত্র 1 থেকে 2 শতাংশ অংশ। ল্যাঙ্গারহ্যান্সের দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত দুই ধরনের কোশ হল **α** ও **β** কোশ। **α** কোশ থেকে **গ্লুকোগন** এবং **β** কোশ থেকে **ইনসুলিন** ক্ষরিত হয়।

গ্লুকোগন একটি পেপটাইড হরমোন। এটি রক্তে শর্করার স্বাভাবিক মাত্রা বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্লুকাগন প্রধানত যকৃতের কোশ সমুহের (হেপাটোসাইট) উপর কাজ করে এবং গ্লাইকোজেনেলাইসিস প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে। ফলস্বরূপ রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পায় (**হাইপারগ্লাইসিমিয়া**)। এছাড়াও এই হরমোনটি গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে। এর ফলেও হাইপারগ্লাইসিমিয়া হতে পারে। গ্লুকাগন কোশের মধ্যে গ্লুকোজের প্রবেশ ও এর ব্যবহার হ্রাস করে। তাই গ্লুকাগন একটি হাইপার গ্লাইসেমিক হরমোন।

ইনসুলিন একটি পেপটাইড হরমোন যা দেহের অভ্যন্তরে গ্লুকোজের সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। ইনসুলিন সাধারণত হেপাটোসাইট এবং এডিপোসাইটের (অ্যাডিপোস কলার কোশসমূহ) উপর ক্রিয়া করে এবং কোশের গ্লুকোজ গ্রহণ ক্ষমতা এবং এর ব্যবহার এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এরফলে রক্ত থেকে হেপাটোসাইট এবং অ্যাড্রিপোসাইটে গ্লুকোজের দ্রুত পরিবহণ ঘটে এবং যার ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা হ্রাস পায় (**হাইপোগ্লাইসিমিয়া**)। ইনসুলিন নির্দিষ্ট কোশে গ্লুকোজ এর গ্লাইকোজেনে রূপান্তরকরণকেও (গ্লাইকোজেনেসিস) উদ্দীপিত করে। ইনসুলিন এবং গ্লুকাগন হরমোন দুটি যৌথভাবে রক্তে গ্লুকোজের সাম্যাবস্থা বজায় রাখে। দীর্ঘস্থায়ী **হাইপারগ্লাইসিমিয়া** একটি জটিল রোগ সৃষ্টি করতে পারে যাকে **ডায়াবেটিস মেলিটাস** বলে। এই রোগের লক্ষণ হিসাবে মুত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে গ্লুকোজের অপসারণ ঘটে এবং দেহে কিটোনবডির মতো ক্ষতিকারক যৌগ সৃষ্টি হয়। ইনসুলিন থেরাপির সাহায্যে ডায়াবেটিস রোগীকে সফলভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব।

22.2.9. শুক্রাশয় (Testis)

পুরুষের ক্ষেত্রে একজোড়া শুক্রাশয় একটি থলিতে (তলপেটের বাইরে) অবস্থান করে (চিত্র 22.1 দেখো)। একে বলে স্ক্রোটাম। শুক্রাশয় দ্বৈত ভূমিকা পালন করে।

একদিকে এটি প্রাথমিক যৌনাঙ্গ হিসাবে এবং অন্যদিকে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসাবেও কাজ করে। শুক্রাশয় **সেমিনিফেরাস টিউবিউলস** এবং **স্ট্রোমাল/ ইন্টারস্টিসিয়াল কলা** নিয়ে গঠিত। **লেডিগের কোশসমূহ** বা **ইন্টারস্টিসিয়াল কোশ** শুক্রাশয়ের আন্তঃনালিকা স্থানে অবস্থিত। এই কোশগুলো হরমোন তৈরি করে এবং এই হরমোনগুলোকে **এন্ড্রোজেন** হরমোন বলে। এদের মধ্যে **টেস্টোস্টেরন** অন্যতম।

অ্যান্ড্রোজেন হরমোনগুলো পুরুষের ক্ষেত্রে এপিডিডাইমিস, ভাসডিফারেন্স, সেমিনাল ভেসিকেলস, প্রোস্টেট গ্রন্থি, ইউরেথ্রা ইত্যাদির মত অতিরিক্ত যৌনাঙ্গাগুলোর বিকাশ, পরিণমন ও কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। এই হরমোনগুলো পেশির বৃদ্ধি, দাঁড়িগোফ এবং বগলের চুলের বৃদ্ধি, উগ্রতা, মৃদুস্বর ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। অ্যান্ড্রোজেন স্পার্মাটোজেনেসিস (শুক্রাণু তৈরি হওয়া) প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করতে একটি প্রধান উদ্দীপকের ভূমিকা পালন করে। অ্যান্ড্রোজেন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর কাজ করে এবং পুরুষের যৌন আচরণকে প্রভাবিত করে। এই হরমোনগুলো শর্করা ও প্রোটিনের উপচিতি (সংশ্লেষী) বিপাককে প্রভাবিত করে।

22.2.10 ডিম্বাশয় (Ovary)

স্ত্রীদেহের উদরগহ্বরে একজোড়া ডিম্বাশয় অবস্থিত (চিত্র 22.1 দেখো) ডিম্বাশয় স্ত্রী দেহের প্রধান যৌনাঙ্গ যা প্রতিটি ঋতুচক্রকালে একটি করে ডিম্বাণু উৎপাদন করে। এছাড়াও ডিম্বাশয় দুটি গোষ্ঠীর স্টেরয়েড হরমোন তৈরি করে। এরা হল — **ইস্ট্রোজেন** ও **প্রোজেস্টেরন**। ডিম্বাশয় ডিম্বথলি ও স্ট্রোমাল কলা নিয়ে গঠিত। ইস্ট্রোজেন প্রধানত বর্ধনশীল ডিম্বথলির দ্বারা সংশ্লেষিত হয় এবং ক্ষরিত হয়। ডিম্বানু নিঃসরণের পর বিদীর্ণ ফলিকল, করপাস লিউটিয়াম-এর মতো একটি গঠনে পরিবর্তিত হয়।এবং এই **করপাস লিউটিয়াম** প্রধানত **প্রোজেস্টেরন** ক্ষরণ করে। মহিলাদের গৌণ যৌনাঙ্গের বৃদ্ধি এবং ক্রিয়াশীলতা, বর্ধনশীল ডিম্বথলির বিকাশ, স্ত্রীদেহে গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ (উদাহরণ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ইত্যাদি), স্তনগ্রন্থির বিকাশ এইরকম ক্ষেত্রেই ইস্ট্রোজেন হরমোন বিস্তৃত পরিসরে ক্রিয়াশীল হয়। ইস্ট্রোজেন মহিলাদের যৌন আচরণও নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রোজেস্টেরন গর্ভাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে। প্রোজেস্টেরন স্তনগ্রন্থিতেও ক্রিয়াশীল হয় এবং অ্যালভিউলাই (দুগ্ধ সঞ্চয়কারী থলির মত গঠন) গঠনও দুগ্ধ ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে।

22.3 হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক এবং পাচননালির হরমোনসমূহ (Hormones of heart, kidney and Gastrointestinal Tract) :

এখন তোমরা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলো এবং এদের থেকে ক্ষরিত হরমোনগুলো সম্পর্কে জেনেছ। পূর্বে উল্লিখিত বক্তব্য অনুযায়ী অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি নয় এমন কিছু কোশ থেকেও হরমোন ক্ষরিত হয়। আমাদের হৃৎপিণ্ডের অলিন্দের প্রাকার থেকে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পেপটাইড হরমোন ক্ষরিত হয়। এটিকে অ্যাট্রিয়েল নেট্রিইউরেটিক **ফ্যাক্টর** (ANF) বলে, যা, হৃৎপিণ্ডে রক্তচাপ কমায়। যখন রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় ANF ক্ষরিত হয় যা রক্তবাহের প্রসারণ ঘটায় ফলে রক্তচাপ কমে যায়।

বৃক্কের জাক্সট্রাগ্লোমেরুলার কোশগুলো একটি পেপটাইড হরমোন তৈরি করে যাকে **এরিথ্রোপোয়েটিন** বলে। যা এরিথ্রোপোয়েসিস (RBC তৈরি প্রক্রিয়া) পদ্ধতিকে উদ্দীপিত করে। পাচন নালির বিভিন্ন অংশে উপস্থিত অন্তঃক্ষরা কোশসমূহ চারটি প্রধান পেপটাইড হরমোন ক্ষরণ করে। এগুলো হল **গ্যাস্ট্রিন, সিক্রেটিন, কেলিসিসটোকাইনন** (CCK) এবং **গ্যাসট্রিক ইনহিবিটারী পেপটাইড** (GIP)। গ্যাসট্রিন পাচকগ্রন্থিগুলোতে ক্রিয়াশীল এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও পেপসিনোজেন ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে। সিক্রেটিন অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা অংশে ক্রিয়াশীল হয় এবং জল ও বাইকার্বোনেট আয়নের নিঃসরণকে উদ্দীপিত করে।

CCK অগ্ন্যাশয় এবং পিত্তথলি উভয়ের উপর ক্রিয়া করে এবং যথাক্রমে উৎসেচকের নিঃসরণ এবং পিত্তরনের ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে। GIP গ্যাসট্রিক রস নিঃসরণ এবং পাকস্থলীর চলনে বাধাপ্রদান করে। অন্তঃক্ষরা নয় এমন বেশ কিছু সংখ্যক কলা কোশও হরমোন ক্ষরণ করে এবং এগুলোকে গ্রোথ ফ্যাক্টর বলে। এই গ্রোথ ফ্যাক্টরগুলো কলার স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং এদের ক্ষয়পূরণ বা পুনরুৎপাদনের জন্য জরুরি।

22.4. হরমোনের কার্যপদ্ধতি (Mechanism of Hormone Action) :

হরমোনগুলো কেবলমাত্র উদ্দীষ্ট কলায় (Target Tissue) অবস্থিত নির্দিষ্ট প্রোটিনসমূহ অর্থাৎ হরমোন গ্রাহকগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে উদ্দীষ্ট কলার উপর এদের প্রভাব সৃষ্টি করে। উদ্দীষ্ট কোশসমূহের কোশ পর্দার উপর অবস্থিত গ্রাহকগুলোকে পর্দাবৃত গ্রাহক বলে। যে গ্রাহকগুলো উদ্দীষ্ট কোশের ভেতরে অবস্থান করে তাদের অন্তঃকোশীয় গ্রাহক বলে। এরা মূলত নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ গ্রাহক (প্রধানত নিউক্লিয়াসে বর্তমান) হরমোনের সঙ্গে গ্রাহকের সংযুক্তির ফলে একটি হরমোন গ্রাহক জোট (Hormone receptor Complex) গঠিত হয়। (চিত্র 21.1.5 ক, খ দেখো) হরমোন গ্রাহক জোট গঠিত হলে উদ্দীষ্ট কলায় কিছু জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। হরমোন এইভাবে উদ্দীষ্টকোশের বিপাক এবং শারীরবৃত্তীয় কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। রাসায়নিক প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে হরমোনকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে —

(i) **পেপটাইড, পলিপেপটাইড, প্রোটিন হরমোন সমূহ** (উদাহরণ ইনসুলিন, গ্লুকাগন, পিট্যুইটারি হরমোন, হাইপোথ্যালামিক হরমোন)

(ii) **স্টেরয়েড হরমোন** (উদাহরণ কর্টিসল, টেস্টোস্টেরন, এস্ট্রাডিয়ল এবং প্রোজেস্টেরন)

(iii) **আয়োডো থাইরোনিনস** (থাইরয়েড হরমোন)

(iv) **অ্যামাইনো অ্যাসিড লব্ধ হরমোন** (উদাঃ এপিনেফ্রিন)

যে সমস্ত হরমোন পর্দাবৃত গ্রাহকের সাথে আন্তঃক্রিয়া করে তারা সাধারণত উদ্দীষ্ট কোশে প্রবেশ করে না কিন্তু দ্বিতীয় বার্তাবহসমূহ (উদাহরণ চক্রাকার AMP, IP_3, Ca^{++} ইত্যাদি) সৃষ্টি করে যারা পরবর্তীতে কোশীয় বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে (চিত্র 22.5 ক দেখো)। যে সব হরমোন অন্তঃকোশীয় গ্রাহকের সাথে আন্তঃক্রিয়া করে (উদাহরণ স্টেরয়েড হরমোন, আয়োডোথাইরোনিন ইত্যাদি)। এরা প্রধানত হরমোন গ্রাহক জোটের সাথে জিনোমের আন্তঃক্রিয়ার দ্বারা জিনের অভিব্যক্তি এবং ক্রোমোজোমের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। ক্রমবর্ধিত জৈব রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে কোশে শারীরবৃত্তীয় এবং বিকাশজনিত পরিবর্তন সাধিত হয়। (চিত্র 22.5 খ দেখো)।

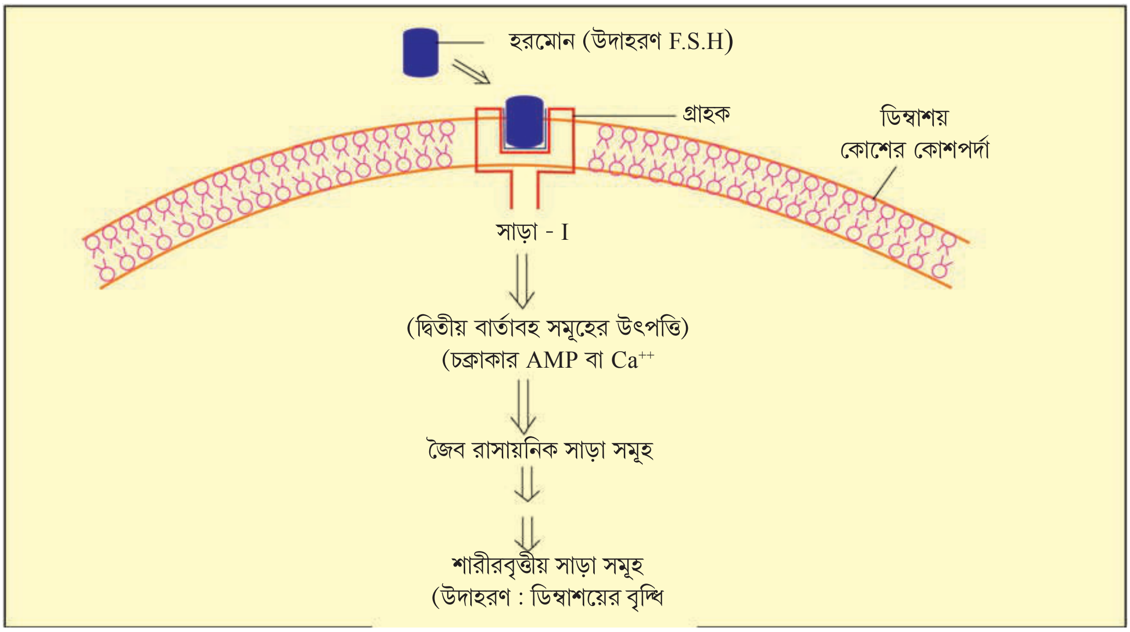

(ক)

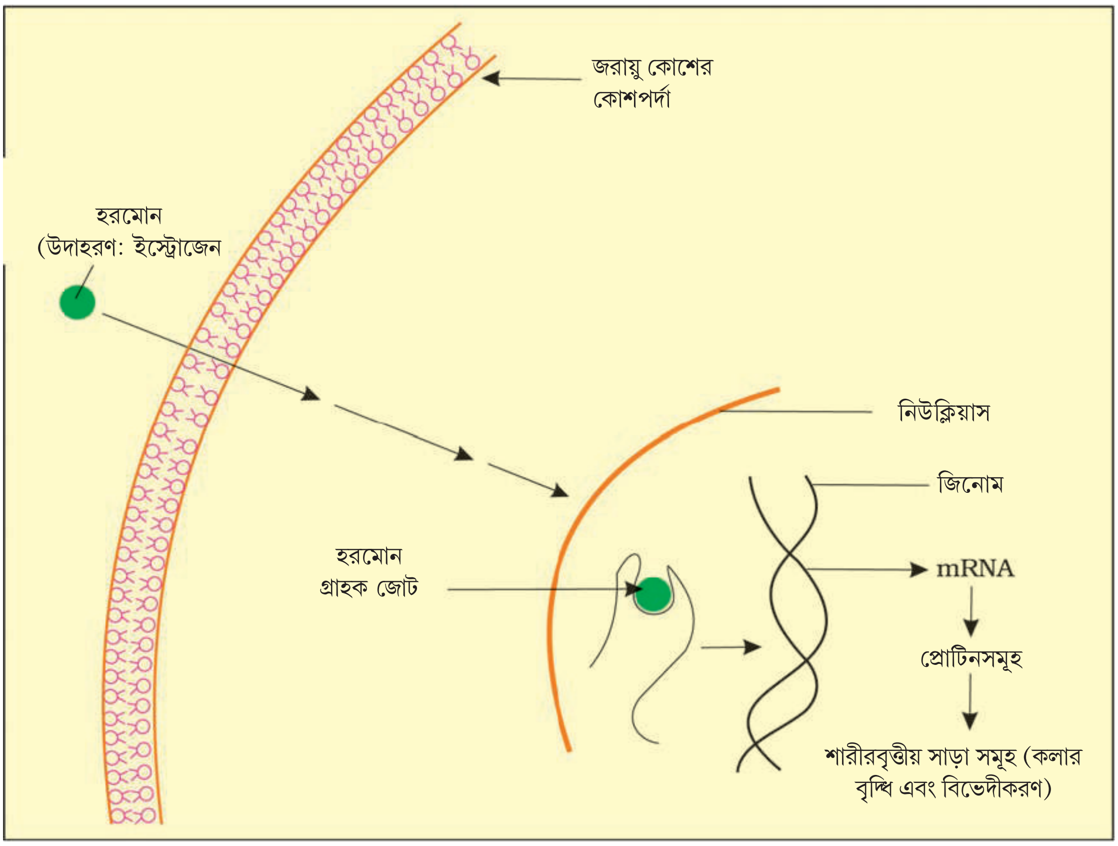

(খ)

চিত্র 22.5 হরমোনের কার্যপদ্ধতির চিত্ররূপ (ক) প্রোটিন হরমোন (খ) স্টেরয়েড হরমোন

সারসংক্ষেপ

কিছু বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্য হরমোন রূপে কাজ করে এবং আমাদের দেহে রাসায়নিক সমন্বয়সাধন, একত্রীকরণ এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এই হরমোনগুলো আমাদের দেহের কোশসমূহ, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি এবং বিভিন্ন অঙ্গসমূহের বিপাক ক্রিয়া, বৃদ্ধি ও বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। অন্তঃক্ষরাতন্ত্র হাইপোথ্যালামাস, পিটুইটারি এবং পিনিয়াল, থাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল প্যানক্রিয়াস, প্যারাথাইরয়েড, থাইমাস এবং গোনাডের (শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয়) সমন্বয়ে গঠিত হয়। এগুলো ছাড়াও পৌষ্টিকনালি, বৃক্ক, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি কিছু অঙ্গসমূহেও হরমোন উৎপাদন হয়। পিটুইটারি গ্রন্থি তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত। যথা পার্স ডিস্টালিস, পার্স ইন্টারমিডিয়া এবং পার্স নার্ভোসা। পার্স ডিস্টালিস অংশে ছয়টি ট্রপিক হরমোন উৎপন্ন হয়। পার্স ইন্টারমিডিয়া কেবলমাত্র একটি হরমোন ক্ষরণ করে আবার পার্স নার্ভোসা (নিউরোহাইপোফাইসিস) থেকে দুটি হরমোন ক্ষরিত হয়। পিটুইটারি হরমোনসমূহ অঙ্গজ কোশের বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং প্রান্তীয় অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। পিনিয়াল গ্রন্থি থেকে মেলাটোনিন নামক হরমোন ক্ষরিত হয় যা আমাদের দেহের 24 ঘন্টার (দিবা রাত্রি) ছান্দিক আবর্তন নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (উদাহরণ ঘুমিয়ে পড়া এবং জেগে থাকার ছান্দিক আবর্তন, দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি)। থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনসমূহ দেহের মৌল বিপাকীয় হার, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ ও পরিনমন, লোহিত রক্ত কণিকা উৎপাদন, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্নেহপদার্থের বিপাকে এবং রজঃচক্রের নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপর একটি থাইরয়েড হরমোন অর্থাৎ থাইরোক্যালসিটোনিন ক্যালসিয়ামের পরিমাণ হ্রাস করার মাধ্যমে আমাদের রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত প্যারাথাইরয়েড হরমোন (PTH) রক্তে Ca^{2+} আয়নের মাত্রা বৃদ্ধি করে এবং দেহে ক্যালসিয়ামের সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণে একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। থাইমাস গ্রন্থি নিঃসৃত থাইমোসিন হরমোন কোশের মাধ্যমে অনাক্রম্যতা প্রদানকারী T লিম্ফোসাইটের বিভেদিকরণে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এছাড়া থাইমোসিন রসমাধ্যম অনাক্রম্যতা প্রদানের জন্য অ্যান্টিবডির উৎপাদনও বৃদ্ধি করে। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি কেন্দ্রীয় অ্যাড্রিনাল মেডুলা এবং পরিধিস্থ অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স নিয়ে গঠিত। অ্যাড্রিনাল মেডুলা থেকে এপিনেফ্রিন এবং নরএপিনেফ্রিন নামক হরমোন ক্ষরিত হয়। এই হরমোনগুলো সতর্কতা, তারারন্ধ্রের প্রসারণ, ত্বকের লোম খাড়া হওয়া, ঘর্ম নিঃসরণ, হৃদস্পন্দনের হার, হৃৎপিন্ডের সংকোচন ক্ষমতা, শ্বসনের হার, গ্লাইকোজেনোলাইসিস, লাইপোলাইসিস এবং প্রোটিওলাইসিস বৃদ্ধি করে। অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে গ্লুকোকর্টিকয়েড এবং মিনারোলাকর্টিয়েড হরমোন ক্ষরিত হয়। গ্লুকোকর্টিকয়েডগুলো গ্লুকোনিওজেনেসিস, লাইপোলাইসিস, প্রোটিওলাইসিস, লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন, সংবহনতন্ত্র, রক্তচাপ এবং গ্লোমেরুলার পরিস্রুতের হার ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলোকে উদ্দীপিত করে এবং অনাক্রম্য প্রতিক্রিয়া অবদমনের মাধ্যমে প্রদাহ রোধ করে। মিনারেলোকর্টিকয়েডগুলো দেহে জল এবং তড়িৎ বিশ্লেষ্যবস্তুর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। প্যানক্রিয়াসের অন্তঃক্ষরা অংশ থেকে ইনসুলিন ও গ্লুকাগন ক্ষরিত হয়। গ্লুকাগন গ্লাইকোজেনোলাইসিস এবং গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে ফলে হাইপার গ্লাইসেমিয়া দেখা যায়। ইনসুলিন কোশের গ্লুকোজ গ্রহণ ক্ষমতা ও এর ব্যবহার এবং গ্লাইকোজেনেসিসকে উদ্দীপিত করে ফলে হাইপোগ্লাইসিমিয়া দেখা দেয়। দেহে ইনসুলিনের অভাবে বা দেহের কোশগুলো ইনসুলিনকে কার্যকরী ভাবে ব্যবহার করতে না পারলে (Insulin Resistance) ডায়াবেটিস মেলিটাস নামক রোগ হয়।

শুক্রাশয় অ্যান্ড্রোজেন ক্ষরণ করে যা পুরুষের অতিরিক্ত যৌনাঙ্গের বিকাশ, পরিণমন ও কার্যকারিতা, গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যগুলোর বহিঃপ্রকাশ, শুক্রাণুর উৎপাদন, পুরুষের যৌনাচরণ, উপচিতি বিপাক এবং লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন এবং গৌণ যৌন লক্ষণগুলো প্রকাশকেও উদ্দীপিত করে।

প্রোজেস্টেরন গর্ভাবস্থার স্থায়িত্ব বজায় রাখতে এবং এর পাশাপাশি স্তনগ্রন্থির বিকাশ ও দুগ্ধক্ষরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। হৃৎপিণ্ডের অলিন্দের প্রাচীর অ্যাট্রিকেল নেট্রিইউরেটিক ফ্যাক্টর উৎপন্ন করে যা রক্তচাপ হ্রাস করে। বৃক্কে এরিথ্রোপয়েটিন হরমোন উৎপন্ন হয় যা লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে। পাচননালী থেকে গ্যাস্ট্রিন, সিক্রেটিন, কোলেসিস্টোকাইনিন এবং গ্যাস্ট্রিক ইনহিবিটারি পেপটাইড ক্ষরিত হয়। এই হরমোনগুলো পাচক রসের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরিপাকে সহায়তা করে।

অনুশীলনী

1. **নিম্নলিখিত গুলোর সংজ্ঞা দাও :**
   (ক) বহিঃক্ষরা গ্রন্থি
   (খ) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি
   (গ) হরমোন।
2. চিত্রের সাহায্যে আমাদের দেহের বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর অবস্থান নির্দেশ করো :
3. নিম্নলিখিতগুলো থেকে ক্ষরিত হরমোনগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করো :
   (ক) হাইপোথ্যালামাস (খ) পিটুইটারি (গ) থাইরয়েড (ঘ) প্যারাথাইরয়েড
   (ঙ) অ্যাড্রিনাল (চ) প্যানক্রিয়াস (ছ) শুক্রাশয় (জ) ডিম্বাশয়
   (ঝ) থাইমাস (ঞ) অলিন্দ (ট) বৃক্ক (ঠ) পৌষ্টিকনালি
4. **শূন্যস্থান পূরণ করো**

হরমোন	**যে অঙ্গের উপর কাজ করে**
(ক) হাইপোথ্যালামিক হরমোন	————————
(খ) থাইরোট্রফিন (TSH)	————————
(গ) কর্টিকোট্রফিন (ACTH)	————————
(ঘ) গোনাডোট্রফিন (LH, FSH)	————————
(ঙ) মেলানোট্রফিন	————————

5. **নিম্নলিখিত হরমোনগুলোর কার্যাবলির উপর সংক্ষিপ্ত টিকা লিখো —**
   (ক) প্যারাথাইরয়েড হরমোন (PTH) (খ) থাইরয়েড হরমোন সমূহ
   (গ) থাইমোসিন (ঘ) অ্যান্ড্রোজেন সমূহ
   (ঙ) ইস্ট্রোজেন (চ) ইনসুলিন এবং গ্লুকাগন
6. **উদাহরণ দাও :**
   (ক) হাইপার গ্লাইসেমিক এবং হাইপোগ্লাইসেমিক হরমোন
   (খ) হাইপার ক্যালসিমিক হরমোন
   (গ) গোনাডোট্রফিক হরমোন
   (ঘ) প্রোজেস্টেসনাল হরমোন
   (ঙ) রক্তচাপ হ্রাসকারী হরমোন
   (চ) অ্যান্ড্রোজেন সমূহ এবং ইস্ট্রোজেনসমূহ

7. **কোন্ হরমোনের স্বল্পক্ষরণ নিম্নোক্ত অবস্থার জন্য দায়ী**

(ক) ডায়াবেটিস ম্যালিটাস (খ) গয়টার (গ) ক্রেটিনিজম

8. **সংক্ষেপে FSH হরমোনের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা করো।**

9. জোড় মেলাও

স্তম্ভ -I	**স্তম্ভ -II**
(ক) T_4	(i) হাইপোথ্যালামাস
(খ) PTH	(ii) থাইরয়েড
(গ) GnRH	**(iii)** পিটুইটারি
(ঘ) LH	**(iv)** প্যারাথাইরয়েড।